Boighar.com

রোকন

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

শেষ প্রহরী

শফীউদ্দীন সরদার

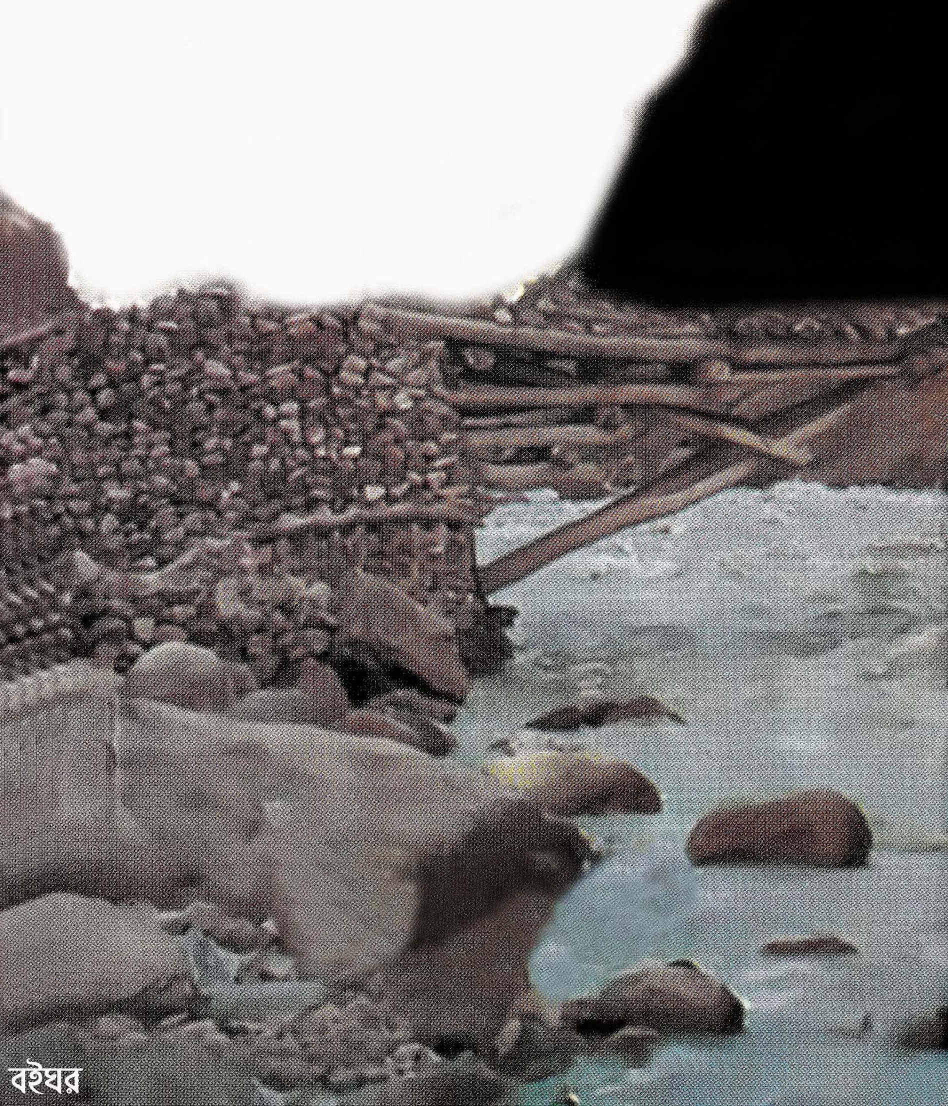

বইঘর

শেষ প্রহরী

www.boighar.com

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.boighar.com

শাখা ঃ ৫৫বি. পুরানা পল্টন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০

শেষ প্রহরী

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক

মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে

মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ

রবিউস সানি : ৪১৯ হিজরী

শ্রাবণ ১৪০৫ বাংলা

আগস্ট ১৯৯৮ ইংরেজী

www.boighar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ

জমাঃ সানিঃ ১৪২৫ হিজরী

শ্রাবণ ১৪১১ বাংলা

আগস্ট ২০০৪ ইংরেজী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

www.boighar.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মদীনা প্রিন্টার্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ১৩৫ ০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-8367-71-3

www.boighar.com

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দু'টি কথা

www.boighar.com

"শেষ প্রহরী" আমার ঐতিহাসিক উপন্যাস সিরিজের সাত নম্বর উপন্যাস। একে সিরিজ বলা হলেও, আমার এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর কোনটাই কোনটির অবশিষ্ট অংশ নয়। প্রত্যেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ কম্‌প্লীট উপন্যাস। ঐতিহাসিক কাল অনুসারে বাংলার মুসলিম ইতিহাসের একটার পর একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে এক একটি উপন্যাস রচনা করা হয়েছে বলেই একে সিরিজ বলা যায়। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী দ্বারা বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে অদ্যতক্ বাংলার মুসলমান শাসন ও সমাজ কি পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েছে, এর সুদিন-দুর্দিন, ইতিহাস-ঐতিহ্য এই উপন্যাসগুলোতে চিত্রিত করা হয়েছে। উপন্যাসগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	নাম	ঘটনা বা সময়	প্রকাশক
১.	বখতিয়ারের তলোয়ার	বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়	মদীনা পাবলিকেশন্স
	গৌড় থেকে সোনার গাঁ	বাংলায় স্বাধীন সাল্‌তানাত প্রতিষ্ঠা	আধুনিক প্রকাশনী
৩.	যায় বেলা অবেলায়	গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর রাজত্বকাল	মদীনা পাবলিকেশন্স
৪.	বিদ্রোহী জাতক	রাজা গণেশের রাজত্বকাল	বাংলা সাহিত্য পরিষদ
৫.	বার পাইকার দুর্গ	সুলতান বারবাক শাহ ও দরবেশ ইসমাইল গাজী	আধুনিক প্রকাশনী
৬.	রাজ বিহঙ্গ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহর রাজত্বকাল	আধুনিক প্রকাশনী
৭.	শেষ প্রহরী	দাউদ খাঁন কাররানী ও কালাপাহাড়	মল্লিক ব্রাদার্স (কলিকাতা) মদীনা পাবলিকেশন্স (বাংলাদেশ)
৮.	প্রেম ও পূর্ণিমা	সুবাদার শায়েস্তা খানের সময়	আধুনিক প্রকাশনী
৯.	বিপন্ন প্রহর	নবাব মুর্শিদকুলী ও সরফরাজ খান	আধুনিক প্রকাশনী
১০.	সূর্যাস্ত	পলাশীতে সূর্যাস্ত	বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি
১১.	পথহারা পাখী	পলাশীর পরে ফকির মজনু শাহ	বার্ড পাবলিকেশন্স
১২.	বৈরী বসতি	সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, তিতুমীর	আধুনিক প্রকাশনী যন্ত্রস্থ

এই পর্যন্ত লেখা ও প্রকাশ পাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে। আর চার-পাঁচখানা উপন্যাসের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীকে কভার করার ইরাদা রাখি। সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। এই বইয়ের ব্যাপারে সম্মানিত প্রকাশকগণসহ এ কাজে আমাকে যারা উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করেছেন তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অধ্যাপক আঃ গফুর, কথাশিল্পী ইউসুফ শরীফ, বন্ধুবর হাসিবুল হাসান ও মদীনা পাবলিকেশন্স-এর মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ভাইসাহেব ও তাঁর পুত্রদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলে তবেই আমার সার্থকতা। www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

(

শেষ প্রহরী

www.boighar.com

শেষ প্রহরী

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

আমাদের প্রকাশিত উপন্যাস

* যায় বেলা অবেলায়/শফীউদ্দীন সরদার
* বখতিয়ারের তলোয়ার/শফীউদ্দীন সরদার
* ইরান দুহিতা/ফরাজী জুলফিকার হায়দার
* সুলতানা বিলকিস/জহির বিন কদ্দুস
* স্পেনের আর্তনাদ/নসীম হিযাযী
* পথহারা দিগন্ত/সাইমুম হাবীব
* হাশিম সালমার প্রেম ফসল/ফরাজী জুলফিকার হায়দার
* ইন্টারভিউ/শামসুন নাহার মাহমুদ

www.boighar.com

www.boighar.com

এক

"উড়ো-উড়ো, হে স্বাধীন বাঙ্গালার স্বর্ণোজ্জ্বল নিশান, দাউদ খান কাররানীর দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ, ততক্ষণ তুমি সগৌরবে উড়তে থাকো। দাউদ খানের প্রাণ যদি মিলিয়ে যায় বাতাসে, দুশমন এসে তোমায় যদি মিশিয়ে দেয় ধুলোয়, তুমি সেখান থেকেই পথিকদের ডেকে বলো– বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কাররানী জান দিয়েছেন,তবু মান দেননি, তিনি কখনো মান দেননি–"

আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বাঙ্গালার সুলতান দাউদ খান কাররানী। রাজমহলের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তিনি সামরিক কায়দায় সালাম জানালেন উড্ডীন পতাকায়। মনপ্রাণ ঢেলে মোনাজাত করলেন আল্লাহ তায়ালার দরবারে। অতঃপর তিনি চোখ মুছেই লাফিয়ে উঠলেন অশ্বে। কোষবদ্ধ তলোয়ার ক্ষিপ্রহস্তে টেনে ঊর্ধ্বমুখী করলেন। রবির করে ঝলসে উঠলো তলোয়ার। জ্বলে উঠলো দাউদ খানের দুই চোখ। তিনি মুখ ফিরিয়ে বীর সেনানী কালাপাহাড়কে বললেন–জঙ্গীচাচা, জানবাজী–রাজমহল–

লাগাম টেনে দাউদ খান অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। চমকে উঠে সেনাপতি কালাপাহাড় মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে গেলেন দশ বছর অতীতে। তিনি যেন শুনতে পেলেন–জঙ্গীচাচা, জানবাজী–ঐ বজরা–

লহমাখানেক তন্ময় থেকেই লাগাম টানলেন তিনিও। সজ্জিত বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েই তিনিও ছুটতে লাগলেন সুলতানের পশ্চাতে।

০ www.boighar.com ০ ০

দশ বছর আগে। দুশমন ত্রাস কালাপাহাড় বাঙ্গালার সুলতান সোলায়মান খান কাররানীর অধীনে তখন একজন ফৌজদার। সবে তিনি নও-মুসলিম। বিস্ময়কর রণনৈপুণ্য আর বিগ্রহ বিদ্বেষের কারণে তামাম নাম হারিয়ে তখনও তিনি পুরোপুরি কালাপাহাড় হননি। তখনও তিনি রাজু খান বা রেজা খান। মুহাম্মদ রেজা খান। চাঁদ খান বা অন্য নামেও ডাকেন তাঁকে কেউ কেউ। সুলতান দাউদ খান কাররানী তখন তরুণ যুবক। তিনি তখন শাহজাদা দাউদ। দিল্লীর ফৌজের আনাগোনা তখন থেকেই তাই দুইয়ের না-পছন্দ।

বইঘর.কম ও রোকন

গঙ্গা নদীর তীর বরাবর শাহজাদা দাউদ খান অশ্ব পৃষ্ঠে ছুটছেন। ঘোড় সওয়ারী বিদ্যা আরো রপ্ত করে নিচ্ছেন। সঙ্গে আছেন বাঘা ফৌজদার রেজা খান। ঘোড় সওয়ারী বিদ্যায় রেজা খানের পারদর্শিতা অনন্য। প্রভুপুত্র দাউদ খানের নিত্যসঙ্গী তিনি। দাউদ খানের সমর বিদ্যায় অনেক তালিম তাঁরই দেয়া। উভয়ের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। মন মানসিকতা এক।

গঙ্গার তীরে উভয়েই পাশাপাশি ছুটছেন। কখনও বা ক্ষিপ্রবেগে কখনও বা ধীর লয়ে। দূর থেকে ফেরার পথে তাঁরা এক নজর দেখলেন, একটা ছুটন্ত বজরা তাণ্ডার দিকে আসছে। মাঝি-মাল্লা ছাড়া বজরার বহিরাংশে আর কাউকে না দেখে তাঁরা তা ভ্রূক্ষেপের মধ্যে নিলেন না। বজরাটাকে পেছনে ফেলে চলে এলেন।

দীর্ঘক্ষণ ছুটোছুটি করার পর বিরামের প্রয়োজনে তাঁরা অশ্বের লাগাম টেনে ধরলেন এবং সামনে পিছে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবেই কাটলো। এরপর আকস্মিক এক আর্তনাদে তাঁরা চমকে উঠে সামনে চেয়ে দেখলেন, নদীর তীর পাহারাদার এক প্রহরী তাঁদের দিকে ছুটে আসছে আর আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে বলছে–হুজুর-হুজুর, দুশ্‌মন। www.boighar.com

পাহারাদার কাছে আসতেই দাউদ খান প্রশ্ন করলেন–দুশ্‌মন! কোথায়?

পেছনে ইংগিত করে পাহারাদার ব্যস্ত কণ্ঠে বললো–ঐ হুজুর, ঐ–

সঙ্গে সঙ্গে সামনে চেয়ে শাহজাদা দাউদ খান আর ফৌজদার রেজা খান সবিস্ময়ে দেখলেন, তাণ্ডার একপ্রান্তে বস্তির এক ঘাটে ছুটন্ত ঐ বজরাটি এসে ভিড়েছে এবং একদল সশস্ত্র সেপাই বজরা থেকে নেমে ঘাটের উপর জটলা করছে। তা দেখে দাউদ খান বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন–ওরা কারা?

জবাবে প্রহরীটি বললো–ফৌজ হুজুর, ফৌজ। দিল্লীর বাদশাহর ফৌজ।

সচকিত হয়ে শাহজাদা বললেন–দিল্লীর বাদশাহর ফৌজ!

ঃ জি হুজুর। একদল সেপাই আর একজন সালার।

ঃ ওরা এখানে কেন?

ঃ নৌ-ভ্রমণে এসেছে। ওরা ঐ বস্তির ওদিকে যাবে।

ঃ কেন–কেন?

ঃ উদ্দেশ্য ওদের সন্দেহজনক হুজুর। বোধ হয় কোন বদ মতলবে এসেছে।

ঃ তাজ্জব! বাঙ্গালার জমিনে বিদেশী ফৌজ! সুলতানের অনুমতি আছে ওদের?

ঃ জি না। সেই কথা বলতেই ওরা আমাকে ধরে বেদম প্রহার করেছে হুজুর!

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা দাউদ ও ফৌজদার রেজা খান একসঙ্গে চমকে উঠলেন। এতক্ষণে তাঁরা খেয়াল করে দেখলেন, প্রহরীটির পরিধেয় ছিন্নভিন্ন, চেহারা বিধ্বস্ত। উভয়ে একসঙ্গে সরোষে বললেন–প্রহার করেছে তোমাকে?

কাঁদো কাঁদো হয়ে প্রহরীটি বললো–মেরেই ফেলতো হুজুর। হাতে পায়ে ধরে আমি জান বাঁচিয়ে এসেছি। তারা হুংকার ছেড়ে বলছে– দিল্লীর বাদশাহর ফৌজ আমরা। তুচ্ছ এই বাঙ্গালার অধিপতির অনুমতি নিতে হবে আমাদের, না তাকে পরোয়া করি আমরা?

দাউদ খানের দুই চোখ জ্বলে উঠলো। তিনি রেজা খানের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন। রেজা খানও এ খবরে গরম হয়ে উঠেছিলেন। স্পর্দ্ধা এদের বরদাস্ত করার বাইরে, এ চিন্তা তিনিও করছিলেন। কিন্তু তাঁরা স্রেফ দুইজন। দুশমনেরা একপাল। একটা সশস্ত্র বাহিনী। সুতরাং, রাজধানীতে ফিরে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসবেন কিনা ভাবতেই শাহজাদা দাউদ কোষ থেকে তলোয়ার টেনে বের করলেন এবং রেজা খানকে উদ্দেশ্য করে সবিক্রমে বললেন–জঙ্গীচাচা, জানবাজী–ঐ বজরা–

বলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। রেজা খান কথা বলার কোনই মওকা পেলেন না। শাহজাদার এই আকস্মিক পদক্ষেপে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। করার কিছুই নেই দেখে, তিনিও তৎক্ষণাৎ শাহজাদার সাহায্যার্থে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন।

বিদ্যুৎবেগে ছুটে দিল্লীর ফৌজের সামনে এসেই শাহজাদা দাউদ খান হুংকার দিয়ে বললেন–হঠাও বজরা, জলদি–

দিল্লীর সালার দাউদ খানকে চেনেন না। তিনিও গর্জে উঠে বললেন–হুঁশিয়ার। দিল্লীর বাদশাহ শাহানশাহ জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবর শাহর ফৌজ। ফের বেত্তমিজী করলে–

ঃ খামুশ কম্ বখ্ত্! ভাগ যাও হিঁয়াসে, আভি–

ঃ কেয়া বাত! পাক্ড়ো ইয়ে নাদানকো–

সেপাইদের ইংগিত দিয়েই দিল্লীর সালার তলোয়ার টেনে দাউদ খানের দিকে এগুলেন। দাউদ খান সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর উপর। শুরু হলো লড়াই। সেপাইরাও এক সঙ্গে ছুটে এসে দাউদ খানকে ঘিরে ধরার উদ্যোগ করলো। ইতিমধ্যে রেজা খান ছুটে এসে উল্কাবৎ তাদের সামনে পড়লেন এবং ক্ষিপ্রবেগে অশ্ব ও অসি চালনা করে তাদের তটস্থ করে তুললেন। অশ্বারূঢ় দাউদ খানের সামনে এক লহমাও টিকে থাকতে না পেরে দিল্লীর সালারটি ছিটকে এসে সেপাইদের দলে ঢুকলেন এবং সকলে একযোগে এই দুইজনের সাথে লড়তে লাগলেন।

তারা দুইজন অশ্বারোহী হলেও পদাতিক দিল্লীর ফৌজ সংখ্যায় অনেক। অল্পক্ষণের মধ্যেই দিল্লীর ফৌজ চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলো তাঁদের। একমাত্র অতুলনীয় রণনৈপুণ্য

ছাড়া, এদের এঁটে ওঠা তো দূরের কথা, জান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ারও অবকাশ আর ছিল না। কিন্তু রেজা খানের সে নৈপুণ্য অপরিসীম ছিল। শাহজাদা দাউদও ইতিমধ্যেই শক্ত একজন লড়াকু। তাই এই সমবেত হামলার মুখে তারা সবিক্রমে টিকে রইলেন এবং মরিয়া হয়ে লড়তে লাগলেন।

ভাবনায় পড়লেন দিল্লীর সালার। অতি সহজেই কব্জা করবেন এঁদের, এই ছিল তাঁর ধারণা। কিন্তু কব্জা করতে গিয়ে যে নিজেরাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন, এটা তিনি ভাবেন নি। এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন, এরা কোন সাদামাটা অশ্বারোহী নন, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। দিল্লীর বাদশাহর প্রতি বাঙ্গালার সুলতানের নমনীয় ভাব দেখে সবাই তাঁরা ভেবেছিলেন, দিল্লীর ফৌজের নাম শুনলেই চুপ্‌সে যাবে বাঙ্গালার মানুষ, টু শব্দ কেউ করবে না। বরং ভয়ে তরাসে সবাই তাঁদের সম্মান সমাদর করবে। এমনই এক পুলকের বশবর্তী হয়ে বাঙ্গালার জমিনে তাঁরা রঙ্গ করতে এসেছিলেন। এক্ষণে এইভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় প্রমাদ গুণলেন্ দিল্লীর সালার। একে ভিন মুলুক, তাতে ফের খবর পেয়ে শহর থেকে আরো কিছু সেপাই এসে এদের সাথে যোগ দিলে, কি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়তে হবে তাঁদের, তা আন্দাজ করে তিনি শিউরে উঠলেন।

ইতিমধ্যেই রেজা খানের বেপরোয়া আঘাতে কয়েকজন দিল্লীর সেপাই গুরুতর ভাবে জখম হয়ে বজরার দিকে দৌড় দিলো। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে দিল্লীর সালার তাঁর সেপাইদের তড়িৎ বেগে বজরায় উঠার নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও পড়িমরি করে বজরায় উঠে গিয়ে ভাসিয়ে দিলেন বজরা।

দুশমনদের তাড়া করে শাহজাদা ও রেজা খান ঘাটের নিচে এসেছিলেন। তরবারি কোষবদ্ধ করে এবার তাঁরা ঘাট থেকে উপরে উঠে এলেন এবং অশ্ব থেকে নেমে জমিনে বসে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। ছোটখাটো কিছু আঘাত তাঁদের গায়েও লেগেছিল। উষ্ণীষ ছিঁড়ে তাঁরা তাঁদের ক্ষতস্থান বাঁধতে শুরু করলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। এর পরেই হঠাৎ তাঁরা পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে উঠলেন এবং তলোয়ার খুলে হাঁক দিলেন– খবরদার–

প্রাসঙ্গিক ঘটনা। ইতিমধ্যেই আর একখানা বজরা এসে ঘাটের পাশে থামলো এবং ঘাটে ভেড়ার উদ্যোগ করলো। মাঝি-মাল্লা ছাড়া এ বজরারও বাইরে কেউ ছিল না। ভেতরে কারা আছে তা–অজ্ঞাত। ফলে, বজরা দেখেই গর্জে উঠলেন উভয়েই। লাগাম টেনে শাহজাদা ঘাটের কাছে এগিয়ে এলেন এবং হুংকার দিয়ে বললেন–হুঁশিয়ার। জানের মায়া থাকলে, বাঙ্গালার জমিনে পা রাখার দুঃসাহস কেউ করবে না।

মাঝি-মাল্লারা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বজরার গতি থামিয়ে দিয়ে ঘাটের পাশে ভাসতে লাগলো। ঘটনা কি, কিছুই তারা বুঝে উঠতে পারলো না। খানিক পরে মাঝি-মাল্লাদের একজন সাহস করে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললো–আমাদের কসুর কি হুজুর? কি করেছি আমরা?

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা থমকে গেলেন। তিনি খেয়াল করে দেখলেন, এ বজরার ধরণ-গড়ন আলাদা। খেয়াল করেই তিনি উচ্চকণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলেন—কার বজরা এটা?

জবাবে মাঝি বললো—জি হুজুর, আমাদের কহল গাঁওয়ের মালিকের।

ঃ কারা আছে বজরায়?

ঃ যাত্রী হুজুর, যাত্রী আছে।

ঃ যাত্রীবাহি বজরা এটা?

ঃ জি-জি। কিছু যাত্রী এই ঘাটে নামবে।

ঃ হুঁশিয়ার, ছলনা করলে জান দিতে হবে।

ঃ ছলনা! কিসের ছলনা হুজুর?

ঃ বজরায় কোন্ সেপাই-সালার, চর-গোয়েন্দা নেই তো?

মাঝিটা হক্‌চকিয়ে গেল। একটু চিন্তা করে বললো—তা কি করে বলবো হুজুর, আমরা ভাড়া নিয়ে যাত্রী বই। একঘাট থেকে আর এক ঘাটে পৌঁছাই। কে সেপাই, কে গোয়েন্দা,—তা কি করে জানবো?

ঃ না জানলে ঐ সদর ঘাটে যাও। ওখানে সরকারী দপ্তর আছে, পরিচয় দিয়ে যাত্রী ওখানে নামাও।

মাঝিরা হতাশ হলো। কি করবে তারা, ভাবতে লাগলো। এমন সময় বজরার ভেতর থেকে এক রমণী কণ্ঠের আওয়াজ এলো—মাঝি, বজরা আরো ঘাটের কাছে নাও। আমি কথা বলবো।

সাহস পেয়ে "জি আচ্ছা—জি আচ্ছা" বলতে বলতে মাঝিরা দাঁড় টেনে বজরাটাকে ঘাটের কাছে এগিয়ে নিতে লাগলো। তা দেখে পুনরায় গর্জে উঠলেন শাহজাদা দাউদ খান। বললেন—তবে রে মোনাফেক, জান দিতে হবে।

জবাবে মাঝিটা ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—ঘাটে ভেড়াবো না হুজুর। এক জেনানা কথা বলবেন হুজুরের সাথে, তাই একটু কাছে নিচ্ছি।

শাহজাদা সবিস্ময়ে বললেন—জেনানা!

ঃ জি হুজুর, এক মহিলা যাত্রী।

বজরা আরো কাছে এলো। শাহজাদা দাউদ খান রেজা খানকে বললেন—আপনি একটু দাঁড়ান চাচা, আমি ব্যাপারটা কি দেখি—

শাহজাদা পাড় থেকে ঘাটের নিচে নেমে এলেন। বজরার ভেতর থেকে এক বোরখাবৃতা তরুণী বেরিয়ে এসে শাহজাদাকে লক্ষ্য করে বললেন—এ কি জুলুম! আমরা আমাদের মকানে যেতে পারবো না?

শাহজাদা সসম্ভ্রমে বললেন–মকান! কোথায় মকান আপনার?

ঃ এই তো এইখানে। শহরের এই প্রান্তে ঐ সামনের বস্তিতে।

ঃ এই তাণ্ডা শহরে বাড়ি আপনার?

ঃ জি, এই ঘাটই আমাদের ঘাট। এই ঘাট হয়েই এখানকার লোকজন নানা দিকে যায়। এখানে বজরা ভেড়ানো নিষেধ তো কখনও ছিল না?

শাহজাদা লজ্জিত হলেন। তিনি ইতস্ততঃ করে বললেন–না, ঠিক তা নয়। তবে–

ঃ এ নির্দেশ কি খোদ সুলতান বাহাদুরের, না আপনার নিজের?

তরুণীর এই সাহস দেখে শাহজাদা তাজ্জব হলেন। তিনি পাল্টা সওয়াল করলেন–আপনি আমাকে চেনেন?

তরুণীটি শক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন–কাউকে চিনে বেড়ানো কাজ নয় আমার। কোন সরকারী নিষেধাজ্ঞা থাকলে, তা বলুন। যথেষ্ট তকলিফের কারণ হলে, সদর ঘাটেই নামি গিয়ে অগত্যা।

ঃ সদর ঘাটেই যাবেন?

ঃ কি করবো? সরকারী আদেশ তো আর অমান্য করা যাবে না?

শাহজাদা প্রীত হলেন। তিনি উৎসাহ ভরে প্রশ্ন করলেন–আর সরকারী আদেশ না হলে?

ঃ তাহলে এখানেই ভিড়বে বজরা।

ঃ এখানেই ভিড়বে?

ঃ জরুর। এ মুলুক কোন অরাজকতার মুলুক নয়।

ঃ আমি ভিড়তে না দিলে?

ঃ আপনি কোন্ সুলতান যে নিজের হুকুম চালাবেন?

ঃ সুলতান না হলেও সুলতানেরই লোক আমি।

ঃ সুলতানের হুকুম ছাড়া, তাঁর লোকজনের আলাদা কোন হুকুম থাকতে পারে না। আর থাকলেও তা মানতে আমরা রাজী নই।

ঃ রাজী নন?

ঃ কখনো না। এক মুলুকে পাঁচজনের পাঁচ রকম হুকুম চলে না।

ঃ এত বল কোত্থেকে পেলেন আপনি?

ঃ তরুণী একটু ভড়কে গেলেন। একটু চিন্তা করেই ফের তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বললেন–কানুন থেকে। সব দেশেই কানুন থাকে ধরা বাঁধা। কানুন ছাড়া কেউই খেয়ালখুশি মতো দেশ চালাতে পারে না।

ঃ বটে!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তাছাড়া যতটা আমি শুনেছি আর জেনেছি, এ মুলুকের সুলতানও খেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারী নন। প্রজাদের উপর অন্যায় জুলুম নিজে তিনি করেন না, আর তাঁর কোন লোকের বা কর্মচারীর জুলুমও বরদাস্ত তিনি করেন না। আমার ভয় কিসের?

ঃ আচ্ছা।

ঃ আপনি তাঁর কর্মচারী বা যে-ই হোন, আপনার আলাদা আর অন্যায় আদেশ মানবো কেন?

ঃ না মানলে কি করবেন?

ঃ আপাতত করতে কিছুই পারবো না। তবে জরুর জানবেন, এ জুলুমের জন্যে সুলতানের কাছে কৈফিয়ত চাইবো আমরা।

ঃ কৈফিয়ত চাইবেন?

ঃ কেন নয়? আমরা কি তাঁর প্রজা নই? আমাদের দাবি নেই তাঁর উপর?

ঃ সাব্বাস-সাব্বাস।

পরম খোশে শাহজাদা হাততালি বাজালেন। এরপর তিনি মাঝিদের লক্ষ্য করে বললেন–বজারা ভেড়াও, কোন ভয় নেই।

মাঝিরা খুশি হয়ে বললো–ভেড়াবো হুজুর?

শাহজাদা হাসিমুখে বললেন–আলবত ভেড়াবে। আমার কি কানুনের ভয় নেই?

এ কথায় মাঝিরা ফের দমে গেল। নিষ্প্রভ কণ্ঠে বললো–হুজুর–

শাহজাদা সাহস দিয়ে বললেন–আরে বলছিই তো, ভয় নেই। বজরা ভেড়াও। অনেক তকলিফ দিয়েছি আমি উনাদের।

মাঝিরা আবার দাঁড় টানতে লাগলো। দণ্ডায়মানা তরুণীর দিকে শাহজাদা দাউদ খান কাররানী এক ধেয়ানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন, গোটা বাঙ্গালার জেনানারা এমন সাহসী হতো যদি! সুলতান আর কানুনের প্রতি এমন আস্থাও মুলুকের তামাম লোকের থাকতো যদি!

বজরা এসে ঘাটে ভিড়লো। বোরখাবৃতা তিন চারজন মহিলা কয়েকটা বালবাচ্চা ও জনাকয়েক বৃদ্ধ বজরার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঐ তরুণীটিসহ সবাই তাঁরা বজরা থেকে নামার উদ্যোগ করতেই শাহজাদা ঘাট থেকে সরে এলেন এবং পাড়ের উপর উঠে এসে রেজা খানকে হাসিমুখে বললেন–চলুন চাচা, জব্দ হলেম জব্বর। এবার ফেরা যাক।

ফৌজদার রেজা খান তন্ময়ভাবে বললেন–তাজ্জব! মেয়েটার তারিফ না করে পারা যায় না। কে এই মেয়ে?

জবাবে শাহজাদা বললেন–জানিনে ঠিক। তবে এই বস্তিতেই নাকি বাড়ি।

ঃ একটা বস্তির মেয়ে এত তেজী? এ যে ছাইয়ের মধ্যে আগুন!

ঃ জি চাচা, অনেক সময় এমনই দেখা যায়।

ঃ না। অনেক সময় দেখা যায় না। কদাচিৎ দেখা যায়।

শাহজাদার দীলেও এমন প্রশ্নই ছিল। কিন্তু তাতে তিনি গুরুত্ব না দিয়ে হাসিমুখে বললেন–তাই নাকি চাচা?

ঃ অবশ্যই। মেয়েটা ভাবিয়ে তুললে দেখছি!

ঃ আর ভেবে কাজ নেই। ঐ দেখুন, চারদিকে লোক জমে যাচ্ছে। এবার চলুন-

এদিকের বস্তিটা ঘাট থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মাঝখানে এক ফালি মাঠ। অকস্মাৎ ঘাটের উপর লড়াই শুরু হওয়ায়, বস্তিবাসিরা ভয়ে সবাই বস্তির মধ্যে চুপচাপ ছিল। এক্ষণে লড়াইটা থেমে যাওয়ায় আর সেপাই-সেনা অন্তর্হিত হওয়ায়, ঘটনাটা জানার জন্যে তারা দু'এক জন করে ভয়ে ভয়ে ঘাটের দিকে এগুতে শুরু করলো। কয়েকজন ইতিমধ্যেই আশেপাশে পৌছেও গিয়েছিল। তা লক্ষ্য করে ফৌজদার রেজা খান বললেন–হ্যাঁ, তাই চলুন। খামোখা এদের কৌতূহল বাড়িয়ে কাজ নেই।

উভয়েই অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন।

বজরা থেকে নেমে ঘরে ফেরার খানিক পরেই সেই তরুণীটির কাছে ছুটে এলেন পাশের বাড়ির ফিরোজাবানু। এসেই তিনি দুই চোখ কপালে তুলে বললেন–ওম্মা! সে কি লো দৌলত? সে কি কথা?

তরুণীর নাম দৌলত। মা নাম দিলেন দৌলতুন্নেসা। বাপ বললেন, দৌলতজাহান দুইজনে দুইদিক ধরে সমানে টানাটানি করার পর আম্মাজান হেরে গেলেন, আব্বারটাই টিকে রইলো। দৌলতজাহান সবিস্ময়ে বললেন–কি কথা ভাবী?

ফিরোজাবানু বললেন–এক লাফে একদম এতদূর?

ঃ কি রকম?

ঃ তুমি আসলে আউরত না সেপাই?

ঃ আউরত না সেপাই! তোমার কি মনে হয়?

ঃ এতদিন তো আউরতই ভেবেছি। মুখ টিপলে একটা কথা বেরোয়নি। কিন্তু এখন তো দেখছি বিলকুল সেপাই।

ঃ তো আর কি। এখন তোমার খসম্‌কে বলে সুলতানের বাহিনীতে আমার একটা নকরী যুগিয়ে দাও।

ঃ আমার খসম্ তোমাকে দেবে নকরী যুগিয়ে? তাঁর নকরীটা মজবুত করার জন্যে এখন তোমাকেই তো ধরতে হবে তাঁর।

ঃ আমাকেই ধরতে হবে?

ঃ হবে না? তুমি এখন একটা কথা ছুঁড়ে মারলে তার দাম লক্ষ মুদ্রা।

ঃ লক্ষ মুদ্রা?

ঃ তারও বেশি। বাঘের নাকে দড়ি পরাতে পারে যে, তার কথা ফেলতে পারে কেউ?

দৌলতজাহান নীরব হয়ে গেলেন। এরপর কপট গাম্ভীর্যে বললেন– কয়দিন আমি বাড়ি ছিলাম না। এরই মধ্যে এই কাণ্ড করে বসেছো?

ঃ এই কাণ্ড!

ঃ শুনেছি তোমার নানাজান নাকি গুলি খেতেন। দিনরাত নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। তুমিও শেষ পর্যন্ত সেই পথেই গেলে?

ঃ তার মানে? আমি নেশা করতে শুরু করেছি?

ঃ শুরু করছো মানে কি? পুরোদস্তুর নেশা করে এসেছো। নেশা করে না এলে এমন আবোল-তাবোল বকতে পারে কেউ?

ঃ কেউ কি বলছো? এ কথা এ পাড়ার সবাই তো বলছে। সবাই তারা নেশা করেছে এক সাথে?

ঃ সবাই এই কথা বলছে?

ঃ শুধুই বলা? তোমার তারিফে পাড়াটা গোটাই গরম হয়ে উঠেছে। বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্? পড়বি তো পড় একদম বাঘের ঘাড়ে!

ঃ বাঘের ঘাড়ে!

ঃ বাঘ বলে বাঘ? বিলকুল বুনোবাঘ। কোন খাঁচা-খোঁয়াড়ের নয়।

ঃ কোন্ সে বুনোবাঘ?

ঃ ঐ শাহজাদা দাউদ খান। এই মুলুকের খোদ ছোট বাহাদুর। ভয়ে কেউ যার সামনে দিয়ে পথ চলতে পারে না।

ঃ কেন, উনি কি মানুষ খান?

ঃ মানুষ খান না ঠিকই। কিন্তু যে রকম দুর্দান্ত আর বেপরোয়া, তাতে মানুষকে ঘায়েল করতে কতক্ষণ?

ঃ হুঁ! তা আমি তাঁর কি করলাম?

ঃ এক ধমকে তুমি তাঁকে খামোশ করে দিলে?

ঃ খামোশ করে দিলাম?

ঃ তাইতো সবাই বলছে। তোমার ধমক খেয়ে বাঘটা নাকি সুড়সুড় করে সরে পড়লো?

ঃ তাজ্জব! কে বলছে সে কথা?

ঃ যারা দেখেছে তারা বলছে। অন্যেরা সব্বাই তাদের মুখে শুনে বলছে।

দৌলতজাহান এবার সত্যি সত্যিই গম্ভীর হলেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করে তিনি বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—সেকি! এবার একটু খোলাসা করে বলোতো, কখন আর কোথায় বাঘ তাড়ালাম?

ঃ এই কিছুক্ষণ আগে আমাদের ঐ নদীর ঘাটে।

ঃ নদীর ঘাটে?

ঃ একপাল সেপাইকে যে মেরেপিটে তাড়িয়ে দিলো, তাকেই তুমি এক ধমকে ঠাণ্ডা করে দিলে!

ঃ ভাবী!

ঃ তোমাদের বজরাটা কি কেউ আটকিয়ে দিয়েছিলেন? কোন সওয়ারী?

ঃ হ্যাঁ, এক সওয়ারী তাই দিয়েছিলেন।

ঃ কে ঐ সওয়ারী? উনিই তো সেই বুনোবাঘ দাউদ খান। খোদ সুলতানের ছোটছেলে। কার সাধ্য ছিল তাঁর হুকুম অমান্য করে বজরা ঘাটে ভেড়ায়? তুমিই নাকি আচ্ছামতো ধমকিয়ে তাঁকে ভাগিয়ে দিয়েছো ঘাট থেকে?

দৌলতজাহান এতক্ষণ এই সন্দেহই করছিলেন। এক্ষণে তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় তিনি যারপরনাই তাজ্জব হলেন। বাক হারিয়ে ফেলে তিনি ভাবতে লাগলেন, যাকে তিনি সুলতানের এক মামুলি কর্মচারী ঠাউরেছিলেন, সে লোক খোদ শাহজাদা দাউদ খান? শাহজাদার সাথে তিনি ঐ আচরণ করেছেন? উনিই যে শাহজাদা, এটা ঘুণাক্ষরেও জানলে তো ঐ আচরণ তিনি করতেন না! ছিঃ-ছিঃ! কত কটু কথাই না শুনিয়েছেন তিনি তাঁকে!

দৌলতজাহানকে ভাবতে দেখে ফিরোজাবানু প্রশ্ন করলেন—কি হলো, কথাটা ঠিক কিনা?

দৌলতাজাহান আনমনাভাবে বললেন—হ্যাঁ, অনেকটা ঠিক।

ফিরোজাবানু বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—তাজ্জব! এতটাও সম্ভব?

ঃ ভাবী!

ঃ ব্যাপারটা কি বলতো? তোমার মতো অবলা এক আউরতের কথা শুনেই শাহজাদা দাউদ খান ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন? এর মাহাত্ম্যটা কি? মুখের ঢাকনা তোলা ছিল নাকি তোমার?

আড়চোখে চেয়ে ফিরোজাবানু হাসতে লাগলেন। দৌলতজাহান সবিস্ময়ে বললেন—কেমন?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ যদি তোমার মুখখানা উনি দেখতে পেয়ে থাকেন, তাহলে আর তাজ্জব হবার কিছু নেই। এমনটিই স্বাভাবিক।

ঃ মানে?

ঃ রূপ বলে রূপ! জ্বলন্ত আগুন। এ আগুনের ছোঁয়া লাগলে বন-জঙ্গল ঝলসে যায়, উনি তো একটা মানুষ!

ঃ তাজ্জব!

ঃ আর স্রেফ মানুষই নন, শুনেছি, একেবারেই কাঁচা বয়স। এরপর আর লাগে কি?

ঃ এসব কি বলছো?

ঃ কি আর বলবো? ঐ কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে এসেছো নাকি, তাই বলছি। রূপ যদি দেখতে পেয়ে থাকেন তোমার–

দৌলতজাহান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি রুষ্টকণ্ঠে বললেন– আহ্ ভাবী! থামতো। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি পথে ঘাটে সবাইকে শুধু রূপ দেখিয়েই বেড়াই!

ফিরোজাবানু দমলেন না। তিনি আরো জিদ্ ধরে বললেন–তা না বেড়ালে এমনটি সম্ভব হলো কি করে? আসমানী মোজেজায়?

ঃ তা হবে কেন? ন্যায্য কথা বলার জন্যে। যা সত্য আর ন্যায় তা সঠিক ভাবে তুলে ধরার জন্যে।

ঃ সত্যিই তাই?

ঃ সত্যি নয়তো মিথ্যা? দেখলাম, উনিও জ্ঞানী মানুষ। ভাললোক। ন্যায় অন্যায়টা সহজেই উনি বুঝতে পারলেন আর তাই জিদ ধরে থাকলেন না।

ঃ এত বিশ্বাস করতে হবে আমাকে? খোদ শাহজাদাকে ন্যায় অন্যায় সমঝিয়ে দেয়ার মতো জ্ঞান আর বুকের পাটা কোন মামুলি আউরতের থাকা সম্ভব?

ঃ কেন, মামুলি আওরতেরা কি মানুষ নয়? মামুলি বলেই কি সত্যি কথাটা বলার মতো জ্ঞানবুদ্ধি আর সাহস কারোই তাদের থাকবে না?

ঃ আমি তা ভাবতে পারিনি।

ঃ তা পারবে কি করে? তুমি তো কুনোব্যাঙ। তোমার কাজের মধ্যে কাজ শুধু খসমের পায়ে কদমবসি করা আর দুইবেলা হাঁড়ি ঠেলা। দুনিয়াটাও দেখলে না, এর হাল হকিকতও জানলে না।

ফিরোজাবানু হেসে বললেন–জানিনে বলেই তো জানতে চাচ্ছি। সেই হাল হকিকতের কথাটাই শোনাও একটু আমাকে। শুনে আমি কান জুড়াই।

ঃ আমার দায় পড়েছে।

ঃ দায়টা তোমারই। ঘুরলে তোমার মাথাই ঘুরছে। আমারটা ঘুরছে না।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমার মাথা ঘুরছে মানে?

ঃ তোমার মুখে বোরখা ছিল বুঝলাম, কিন্তু শাহজাদা নিশ্চয়ই বোরখা পরে তোমার সামনে দাঁড়াননি। তুমি তাকে আপাদমস্তকই দেখেছো।

ঃ তাতে কি হয়েছে?

ঃ হবে আবার কি? তোমার ভাই একদিন বললেন, রমণীকূলের মস্তকগুলো সুস্থ রাখার প্রয়োজনেই নাকি শাহজাদা দাউদের বোরখা পরে বাইরে বেরোনো উচিত। তার ঐ কথা শুনেই বলছি।

ঃ মানে?

ঃ মানে ঐ শাহজাদার সুরতটা নাকি বড়ই বেয়াড়া। তিনি শহরের মধ্যে ঢুকলেই নাকি রাস্তার দুই পাশের জানালাগুলো খটাখট খুলে যায়। তুমি তাকে সামনা-সামনিই দেখেছো। তোমার দীলের কয়টা জানালা খুলে গেছে সেই ফাঁকে,মাথা মগজের অবস্থাটা কি তোমার, এই সমস্ত হাল হকিকতের কথা এই কুনোব্যাঙকে শোনাও একটু। চোখের নাহোক, কানের পর্দা খুলুক আমার।

ফিরোজাবানু সকৌতুকে হাসতে লাগলেন। দৌলতজাহান ক্ষণিকের জন্য নীরব হয়ে গেলেন। কিছুটা বেশি করে বললেও একেবারেই মিথ্যা বলেননি ফিরোজাবানু! শাহজাদার সুরতটা দেখার মতোই বটে। কথা বলার ফাঁকে দৌলতজাহান যে বার কয়েক লক্ষ্য করেননি সেটা, শাহজাদার বিনম্র আর সহৃদয় আচরণে আদৌ যে আকৃষ্ট হননি দৌলতজাহান, দৌলতজাহানের এটা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। তবে একান্তই তাৎক্ষণিক ব্যাপার এসব। তন্ময় হওয়ার মতো এনিয়ে দৌলতজাহানের কোন কিছুই ঘটেনি। তাই ফিরোজাবানুর এ কথায় তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন–ভাবী, তুমি কি স্রেফ এইসব রঙ্গ করতেই এসেছো? আর কি কোনই কথা নেই তোমার?

ঃ আর কথা কি থাকবে? লোকটা যে ভাল, তা তুমি নিজেই স্বীকার করলে। তার সুরতটা কেমন লাগলো তোমার, এটা জানার চেয়ে আর বড় কথা কি থাকবে আমার বলো?

ফিরোজাবানু পূর্ববৎ হাসতে লাগলেন। দৌলতজাহান সরোষে বললেন–বটে! তাহলে তুমি তোমার ঐ কথা নিয়েই থাকো, আমি আমার কাজে যাই–

বলেই দৌলতজাহান কপট গোস্বায় উঠতে গেলেন। ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে মুরাদ খান এসে তাঁদের সামনে হাজির হলেন। দৌলতজাহানকে দেখেই তিনি আরো অধিক উতলা হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন–কি মুসিবত–কি মুসিবত! তোমরাও এসে তুফানের মধ্যে পড়েছো? কি সর্বনাশ! আম্মাজান কৈ, তোমার আম্মা?

মুরাদ খান। প্রৌঢ় লোক। দৌলতজাহানের দাদু সাহেব। আপন নন তবু আপনের চেয়েও বড়। দৌলত আর তাঁর আম্মা দিনারবানুকে নিয়ে মুরাদ খানের সংসার। মুরাদ

বইঘর.কম ও রোকন
খান নকরী করেন বাঙ্গালার অধিপতির। মামুলি এক নকরী। অনেকটা তাঁর রোজগারেই সংসার চলে দৌলতজাহানদের।

তাঁদের ঘাটের উপর লড়াইয়ের খবর শুনতে পেয়েই মুরাদ খান ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছেন বাড়িতে। দৌলতেরা কহলগাঁওয়ে (খিলগাঁও) আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আজকেই যে ফিরে এসেছেন তাঁরা, মুরাদ খান তা জানেন না। লড়াই হয়েছে শুনেই তিনি ছুটে এসেছেন নিজের বাড়ির আর প্রতিবেশীদের খবর নিতে। এক্ষণে দৌলতজাহানকে দেখে তিনি আরো অধিক অস্থির হয়ে উঠলেন এবং অস্থির কণ্ঠে এই প্রশ্ন করলেন।

জবাবে দৌলতজাহান বললেন—আম্মা ঐ অন্দরে। কিন্তু তুফান মানে? কিসের তুফান দাদু?

মুরাদ খান আসমান থেকে পড়লেন। বললেন—আরে, বলে কি! একটু আগে জব্বর এক জঙ্গ হয়ে গেল এখানে, আর এ বলে কিসের তুফান? তোমরা কোন ঝুট্ ঝামেলায় পড়োনি তো? মানে সহি সালামতে মকানে ফিরতে পেরেছো তো?

একটু চিন্তা করেই দৌলতজাহান বললেন—জি, সহি সালামতেই ফিরেছি। ঝুট ঝামেলা আর এমন কি?

ঃ না হলেই ভাল। যে কাণ্ড ঘটে গেল এদিকে, আমি ঘরবাড়ির ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত, তার মধ্যে ফের তোমরা। নেহায়েত আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতেই বেঁচে গেছো তাহলে। নইলে যে কি হতো—

মুরাদ খান হাঁপাতে লাগলেন। ফিরোজাবানু প্রশ্ন করলেন—সে খবর আপনি এতক্ষণে পেলেন দাদু?

পূর্ববৎ ব্যস্ত কণ্ঠে মুরাদ খান বললেন—হ্যাঁ, এই একটু আগে। থাকি তো শাহী এলাকার এক কিনারে। তা যাক। এদিকের, মানে আমাদের এই পাড়াটার কোন ক্ষয়ক্ষতি করেনি তো সেপাইরা?

ফিরোজাবানু বললেন—জি না দাদু। লড়াইটা ঐ ঘাটের উপরই শুরু হয়ে ঘাটের উপরই থেমে গেছে। ওর কোন ঝাপটা এই পাড়াতে এসে লাগেনি।

ঃ আলহামদু লিল্লাহ! বাঁচা গেল! খবর শুনেই ভাবলাম, যাঃ! আমাদের পাড়াটা বুঝি পুড়িয়েই দিলে পরদেশীরা।

ঃ তাই নাকি?

ঃ ভাববো না? এ নিয়ে শাহী এলাকায় হৈচৈ পড়ে গেছে। খোদ ছোট শাহজাদা আর ডাকসাইটে ফৌজদার রাজু খানের হাতে পায়ে চোট্ লেগেছে অনেকগুলো। একি চাট্টিখানিক কথা?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ঘটনা কি দাদু? লড়াই বাধলো কেন?

ঃ কেন আবার? ভিনদেশী সেপাই বজরা নিয়ে এই মুলুকে হাওয়া খেতে এসেছিল। তাও আবার একদম শাহজাদা দাউদ খানের সামনে। মরার আর জায়গা পায়নি ব্যাটারা।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এর উপর সাথে ঐ রাজু খান। আর কিছু লাগে?

ঃ রাজু খান না রেজা খান?

ঃ হলেই হলো। আগে তো রাজুই ছিল নামটা।

ঃ শুধু রাজু কেন? কালাচাঁদ না আরো কি কি কি ছিল। কিন্তু এখন কি তাই আছে? এখন তো–

ঃ আরে নামে কি এসে যায়? নামটা বড় না হিম্মতটা বড়? স্রেফ দুইজন লোক মিলে ঐ একপাল ভিনদেশী সেপাইদের যে কুকুর তাড়া করে বজরায় তুলে দিলো, সে দিকটা দেখছো না?

ঃ তাই নাকি দাদু? তাইতো লড়াইটা অল্পতেই থেমে গেল।

ঃ যাবে না? শক্ত ঘা পড়েছে যে।

ঃ দাদু?

ঃ কিন্তু শাহীমহলে তাই বলে লড়াই এখনও থামেনি। এর জের সেখানে চলছেই।

ঃ কি রকম?

ঃ বড় শাহজাদা বায়াজিদ খান রেগে তেতে আগুন। তাঁকে কেন খবর দেয়া হয়নি, সেপাইদের কেন তলব দেয়া হয়নি, পরদেশী সেপাই নিয়ে বজরা কি করে ভেড়ে এখানে, গোয়েন্দারা করছে কি,–এই কিসিমের হাজার প্রশ্ন।

ঃ তাই?

ঃ পাহারাদার থাকতে কার বজরা, কি সমাচার, বজরা ভেড়ার আগেই এ সব প্রশ্ন করবে না? যাত্রীবাহি বজরা না সেপাইদের বজরা এটা লক্ষ্য করবে না?

ফিরোজাবানু ও মুরাদ খান বাতচিত করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন দৌলতজাহান। লড়াইয়ের খবর কিছু পরে দৌলতজাহানও শুনেছিলেন। কিন্তু আসল ঘটনা জানতেন না। এতক্ষণে তাঁর কাছে পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি এতক্ষণে বুঝতে পারলেন, বজরা দেখেই কেন শাহজাদা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ওটা যে তাঁর খেয়ালখুশি ছিল না, এর পেছনে কারণ ছিল যথেষ্ট, এটা বুঝতে পেরে দৌলতজাহান আর এক দফা শরমিন্দা বোধ করলেন। এতটার পর লোকটা যে এত অল্পতে হাল ছাড়লেন, তাঁর এত কথা ঐভাবে হজম করলেন, এটা ভেবে কেবলই তিনি তাজ্জব হতে লাগলেন।

বুইঘর.কম ও রোকন

কথার ফাঁকে ফিরোজাবানু এক সময় রসিকতা করে বললেন-লড়াই কিন্তু শাহজাদা স্রেফ ঐ সেপাইদের সাথেই করেননি দাদু, আপনার এই নাতনীর সাথেও করেছেন।

বুঝতে না পেরে মুরাদ খান বললেন—কি রকম?

ফিরোজা বললেন— লড়াইয়ের একটু পরেই ওদের বজরা এসে ঘাটে ভিড়তে গেলে শাহজাদা বাধা দিলেন। আর যায় কোথায়? আপনার এই নাতনীটা তাঁকে এমন ধোলাই দিলেন যে, বাছাধন ঐ বিদেশী ফৌজের মতো পড়ি-মরি করে দে ছুট্—

ফিরোজাবানু হাসতে লাগলেন। মুরাদ খান শংকিত কণ্ঠে বললেন—তার মানে—তার মানে! ধোলাই দিল মানে? কাকে ধোলাই দিল?

ঃ ঐ শাহজাদা দাউদ খানকে?

ঃ সেকি! শাহজাদার সাথে কথা বলেছে দৌলত?

ঃ শুধুই কথা বলেছে? সেপাইয়ের মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রীতিমত বহাস্ করেছে।

ঃ কে, এই দৌলত?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনার এই জঙ্গী নাতনী। শুনলাম, হাতাহাতিটাই বাকি ছিল শুধু।

দৌলতের দিকে বাঁকা নজরে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগলেন ফিরোজা। মুরাদ খান অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, সেকি কথা— সে কি কথা! তা কি করে হবে—এ কি করে হয়?

ফিরোজা বানু বৃদ্ধটাকে আরো একটু তাতিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে জোরালো কণ্ঠে বললেন—আমার কথা বিশ্বাস না হয়, পাড়ার মধ্যে গিয়ে একবার দেখুন, সবার মুখেই শুনতে পাবেন, কি কাণ্ডটাই না করে এসেছে নাতনী আপনার।

মুরাদ খান মাথায় হাত দিলেন। তিনি প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠলেন—গেল-গেল, আমার নকরীটাই শেষ অবধি গেলরে! হায়-হায়-হায়! কি সাংঘাতিক কথা! খোদ শাহাজাদার সাথে বেত্তমিজী!

মুরাদ খানকে হায় হায় করতে শুনে দৌলতজাহানের আম্মা দিনারবানু অন্দর থেকে ছুটে এলেন এবং সবিস্ময়ে বললেন— কি হলো চাচা? আপনি এমন হায়-হায় করছেন কেন?

দিনারবানুকে দেখে মুরাদ খান আরো অধিক উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। আহাজারীটা আরো খানিক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—গেল-গেল, নকরীটা আমার মাঠে মারা গেল আম্মিজান, এখন মাথাটা থাকলে হয়।

দিনারবানু বললেন—তার মানে?

ঃ তোমার ঐ বেটি, ঐ দৌলত। খোদ শাহজাদা দাউদ খানকে নাকি যারপরনাই অপমান করে এসেছে। কি গজব—কি গজব! কখন বুঝি সেপাই আসে ধরতে আমাদের এখানে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ চাচা

ঃ একি মামুলি কোন ব্যাপার? আচ্ছা আচ্ছা আমির— উমরাহ যাঁর সামনে মাথা তুলতে পারে না, তাকে একদম ঐ বজরা ঘাটে মুখোমুখি অপমান? তাও আবার পুঁচকে একটা লেড়কী হয়ে? শাহজাদা দাউদ খান এটাকে সহজভাবে ছেড়ে দেবেন ভেবেছ?

দিনারবানু ঘটনাটা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে বললেন—কেন, ঐ শাহজাদা এতই বদমেজাজী? খুব বড় বেশি উচ্ছৃঙ্খল?

www.boighar.com

মুরাদ খান থমকে গেলেন। ফের তিনি তাজ্জব হয়ে বললেন— উচ্ছৃঙ্খল? কে, ঐ ছোট শাহজাদা?

ঃ তোমার কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।

ঃ তওবা-তওবা! তা হবে কেন? মস্ত বড় শরীফ আদমি। কি উম্‌দা তাঁর আদব-কায়দা! আমার মতো একটা নগণ্য লোকের সাথেও কত আদবের সাথে কথা বলেন তিনি।

ঃ তবে যে এত ভয় পাচ্ছো?

ঃ ঐ বেয়াদবি। বেয়াদবির জন্যে। কারো কোন বেয়াদবি, কারো কোন হামবড়া ভাব জাররা মাত্র বরদাস্ত তিনি করেন না। তোমার ঐ বাহাদুর বেটি তাঁকেই নাকি যাচ্ছে তাই বলে চোরের অধিক অপদস্ত করেছে। নকরী আমার আর থাকে?

দিনার বানু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তা এ নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছ কেন? কি ও বলেছে, তা তো আমি জানিই। আমি তো সাথেই ছিলাম।

ঃ এ্যাঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো ছিলে।

ঃ শাহজাদা হিসাবে বলাটা কিঞ্চিৎ বেশি হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু ও যা বলেছে, তা এমন কোন অন্যায় কথা নয়।

ঃ এ্যাঁ, তাই নাকি?

ঃ লোকটা যে শাহজাদা তা আমিও বুঝিনি, দৌলতও বুঝতে পারেনি। ভাবলাম, কোন কর্মচারীকে বলছে। আমি পাশে থাকলে হয়তো এতটা বলতে দিতাম না। কিন্তু ভেতরে থেকে আমি বজরার দরজার কাছে আসতে আসতেই কথাবার্তা ওদের শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে কি হয়েছে?

মুরাদ খান ইতস্ততঃ করে বললেন—শাহজাদা যদি গোস্বা হয়ে থাকেন?

ঃ এত অল্পতেই গোস্বা হবেন তিনি?

ঃ তা কি বলা যায়? গোস্বা হয়ে থাকলে তো নকরী আমার—

দিনারবানু অভিযোগ করে বললেন— দিন দিন তুমি একদম ছাপোষা হয়ে যাচ্ছো চাচা। এত তোমার নকরীর ভয়?

ঃ তা– মানে–

ঃ গোস্বা হলে তখনই তিনি হতেন। তুমি ভেতরে এসো তো এবার। হাত-মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দাও। এত অল্পতেই যদি নকরী যায়, সে নকরী যাক। তাতে করে একবারেই না খেয়ে আমরা মরবো না।

ঃ তা ঠিক—তা ঠিক।

ঃ বাড়িতে কিছু মেহমান আছেন। হৈ চৈ না করে ভেতরে এসো—

অনেকটা শান্ত হয়ে দিনারবানুর পিছু পিছু মুরাদ খান অন্দরে প্রবেশ করলেন। রসিকতার পরিমাণটা অধিক হয়ে যাওয়ার জন্যে ফিরোজাবানু অপ্রস্তুত হয়ে শূন্যের দিকে চেয়েছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে দৌলতজাহান এবার কপটরোষে বললেন—বাব্বা। কাব্য করতে পারো তুমি বটে!

বাঙ্গালার অধিপতি হয়রত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী বিব্রত হয়ে পড়েছেন। পুত্র দাউদ খানের উপর তিনি নাখোশ। দিল্লীর ফৌজের সাথে পুত্রের এই আচরণ তাঁর অভিপ্রেত নয়।

বাঙ্গালার অধিপতি সোলায়মান খান কাররানী। তাঁর তখ্‌তে আসার ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। হোসেনশাহী বংশের বিলুপ্তির পর পাল্টে গেল বাঙ্গালা মুলুকের রাজনৈতিক রঙ্গালয়। তড়িদ্‌বেগে ঘটতে লাগল বিচিত্র উত্থান পতন। পরিবর্তিত হতে লাগল রাষ্ট্রনৈতিক রীতিনীতি। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পরে তদীয় পুত্র নসরত শাহ, পৌত্র ফিরোজ শাহ এবং তৎপরে হোসেন শাহর অপর পুত্র গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ বাঙ্গালার তখতে এলেন। এ পর্যন্ত বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীনতা দুশো বছর কাল অবধি টিকে রইল এবং বাঙ্গালা মুলুকের ইতিহাসে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রইল।

শেরশাহের হাতে গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের মসনদচ্যুতির পরেই শুরু হলো মুঘল পাঠান দ্বন্দ্ব। এই মাহমুদ শাহের মসনদচ্যুতির পরপরই দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন বাঙ্গালা মুলুক দখল করলেন। হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরশাহ শূরী পুনরায় বাঙ্গালা-সহ দিল্লী সাম্রাজ্য অধিকার করে নিলেন। বাঙ্গালা ও বিহার মুলুকের শাসন অতঃপর চলে গেল দিল্লী থেকে নিযুক্ত শাসনকর্তাদের হাতে। নওয়াজিস্‌ খান হলেন বাঙ্গালা মুলুকের শাসনকর্তা, বিহারে এলেন সোলায়মান খান কাররানী। তাজ খান কাররানী ও তাঁর ভাই সোলায়মান খান কাররানী ছিলেন শেরশাহের প্রধান অমাত্যবর্গের অন্যতম। সেই সুবাদে সোলায়মান খান কাররানী বিহার মুলুকের শাসনকর্তার পদ পেলেন।

শেরশাহ ও তদীয় পুত্র ইসলাম খানের রাজত্বকালে বাঙ্গালা মুলুক স্বাধীনতা হারিয়ে দিল্লীর অধীনস্থ হল। ইসলাম খানের মৃত্যুর পরেই বাঙ্গালার তৎকালীন শাসনকর্তা

বইঘর.কম ও রোকন

মুহম্মদ খান মুহম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করে স্বাধীন সুলতান রূপে বাঙ্গালার তখ্‌তে বসলেন। এ সময় থেকে পরবর্তী বিশ বছর যাবত বাঙ্গালা মুলুক পুনরায় স্বাধীন মুলুকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো।

মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খিজির খান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ নামে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান হলেন। তাঁর পরে তাঁর ভাই জালালউদ্দীন শূর দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন জালাল শাহ নামে বাঙ্গালার তখতে বসলেন। পাশাপাশি, বিহারের শাসনকর্তা সোলায়মান খান কাররানীও বিহারে তার দখল মজবুত করে নিতে লাগলেন। এই দুই মুলুকের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে উঠতে লাগল।

দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন জালাল শাহ শূরের পর তাঁর একমাত্র পুত্র মাস সাতেক বাঙ্গালার তখ্‌তে আসীন থাকতেই তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন নাম ধারণকারী জনৈক আফগান নেতা তাঁকে হত্যা করে বাঙ্গালার মসনদ জবরদখল করলেন। তা দেখে ছুটে এলেন সোলায়মান খান কাররানীর ভ্রাতা তাজ খান কাররানী। তাজ খান কাররানীর সাথে লড়াইয়ে এই তৃতীয় গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু ঘটলে বাঙ্গালা মুলুকে শূর বংশ বিলুপ্ত ও কাররানী বংশ প্রতিষ্ঠিত হলো।

তাজ খান কাররানী বাঙ্গালার তখ্‌তে আরোহণ করার এক বছরের মধ্যেই ইন্তেকাল করায় তাঁর ভ্রাতা সোলায়মান খান কাররানী এখন বাঙ্গালার তখ্‌তে উঠেছেন। বিহারে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে, তিনি বাঙ্গালা ও বিহার—এই উভয় মুলুকের অধিপতি হয়েছেন। বাঙ্গালার রাজধানী এতদিন গৌড়ে ছিল। গৌড়ের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ায় সোলায়মান খান কাররানী মসনদে উঠেই বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় থেকে গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই তাণ্ডায় স্থানান্তর করেছেন। তিনি যখন বাঙ্গালার তখতে আসীন হলেন, দিল্লী সাম্রাজ্যের সম্রাট তখন হুমায়ুনের পুত্র জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবর শাহ। দিল্লীর শক্তি তখন থেকেই এক অপ্রতিহত শক্তি। রাজ্যজয়ের নেশায় তখন থেকেই আকবর শাহ ব্যাকুল।

বাঙ্গালার তখ্‌তে আসীন হওয়ার পর থেকেই সোলায়মান খান কাররানীর শক্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। হুমায়ুন কর্তৃক দিল্লীর মসনদ পুনর্দখলের ফলে, এবং পরে আকবর শাহর উত্তরোত্তর রাজ্য বিস্তারের মুখে, হিন্দুস্থানের আফগান শক্তি ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। বাঙ্গালার অধিপতি সোলায়মান খান কাররানীই এখন আফগান শক্তির ধারক হয়ে উঠেছেন। মুঘলদের নিকট পরাজিত হয়ে উত্তর ভারতের প্রায় তামাম আফগান নেতাই এখন বাঙ্গালার দিকে ছুটে এসেছেন এবং সোলায়মান খান কাররানীর অধীনে একত্রিত হয়েছেন। আফগান নেতারা অনেকেই এখন সোলায়মান খানের সভাসদ ও কর্মচারী। ফলে সোলায়মান খান কাররানীর শক্তিও এখন এক দুর্বার শক্তি।

এতদ্‌সত্ত্বেও সোলায়মান খান কাররানী ভিন্ন নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। দিল্লীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টিকে থাকতে পারবেন না বোধে দিল্লীর প্রতি তিনি বিনয়ী-নীতি

বইঘর.কম ও রোকন
অবলম্বন করেছেন। পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে থাকলেও, তিনি নিজেকে প্রকাশ্যভাবে সুলতান বলে ঘোষণা দেননি। দেশের সবাই তাঁকে সুলতান বলে জানলেও, দিল্লীর বাদশাহকে খুশি রাখার অভিপ্রায়ে তিনি 'হযরত-ই-আলা' উপাধি নিয়েই তুষ্ট আছেন এবং বিহারে থাকতে দিল্লীর দরবারে যে ভেট্ বা উপঢৌকন পাঠানো শুরু করেন, এখনও তা অব্যাহত রয়েছে।

রাজধানী তাণ্ডার দরবার। বাঙ্গালা ও বিহারের অধিপতি হযরত -ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী দরবারে এসে বসলেন। উজির আমির সভাসদেরা সকলেই হাজির আছেন। শাহজাদা বায়াজিদ খানও নিজ আসনে উপবিষ্ট। দরবারে এসেই সোলায়মান খান কাররানী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা দাউদ খান ও ফৌজদার রেজা খানকে তলব দিলেন এবং তৎপরে দরবারের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

হযরত-ই-আলা প্রথমেই দিল্লীর বাদশাহর দরবারে ভেট পাঠানোর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনা কিছুদূর এগুতেই দরবারে এসে হাজির হলেন শাহজাদা দাউদ খান ও রেজা খান। তাঁরা এসে হাজির হতেই হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী আলোচনা বন্ধ করে তাঁদের দিকে নজর দিলেন এবং শাহজাদা দাউদ খানকে লক্ষ্য করে ঈষৎ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—শুনলাম, শাহজাদা দাউদ খান সমর বিদ্যায় জিয়াদা কামিয়াবী হাসিল করেছেন। খবরটা জরুর খোশখবর। কিন্তু তাঁর সেই দক্ষতা তিনি লড়াইয়ের ময়দানে জাহির না করে পথে ঘাটে জাহির করবেন, এটা কোন খোশখবর নয়। আর সে জন্যই আমি তার সেই দক্ষতার তারিফ করতে পারছিনে।

শাহজাদা দাউদ খান পিতার এই হেঁয়ালীর অর্থ যথার্থই আঁচ করলেন। তিনি নতমস্তকে বললেন—জনাব!

ঃ জোয়ানীর জোশ অধিক হলে কাণ্ডজ্ঞানটা খাটো হয়। এই দুইয়ের সামঞ্জস্যটা বাঞ্ছনীয়।

এর জবাবে শাহজাদা দাউদ খান কিছু বলার কোশেশ করতেই, হযরত-ই-আলা ফৌজদার রেজা খানের দিকে নজর ফিরিয়ে নিলেন এবং ঐ একই কণ্ঠে বললেন—ফৌজদার সাহেবের তারিফ আমি অবশ্যই করবো। কারণ, শাহজাদার প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে তিনি তাঁর কর্তব্যটাই করেছেন। তবে প্রাণরক্ষায় গিয়ে মধ্যস্থতা করেও তিনি সে কাজটা করতে পারতেন। প্রচণ্ডভাবে রণেলিপ্ত হওয়ার কোন জরুরত ছিল বলে মনে হয় না আমার।

ফৌজদার রেজা খান তাজিমের সাথে বললেন—জাঁহাপনা যদি নদীর তীরে দিল্লীর ফৌজের সাথে আমাদের সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন তুলে থাকেন, তাহলে আমার কিছু বলার আছে।

বইঘর.কম ও রোকন

হযরত-ই-আলা মৃদু হেসে বললেন—দববারের সবাই জানেন, চৌকস ফৌজদার রেজা খান স্রেফ হিম্মতদারই নন, তিনি যেমনই এলেমদার, তেমনই বুদ্ধিমান। সুতরাং আমি যে সেই প্রসঙ্গেই বলছি, এ নিয়ে দীলে তাঁর সংশয় থাকা সমীচীন নয়। তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

রেজা খান বললেন—জনাবের কাছে যাঁরা এ সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তাঁরা তাহলে পরিস্থিতিটা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। মধ্যস্থতা করার অবকাশ তো দূরের কথা, তলোয়ার খুলতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলে, শাহজাদার জানটাই বিপন্ন হয়ে পড়তো। প্রতিপক্ষ এমন হিংস্রভাবে তাঁর উপর চড়াও হয়েছিল যে—

তাঁর কথার মাঝেই হযরত-ই আলা বললেন—তা হবেই। সাধ করে কেউ যদি আগুনে ঝাঁপ দেয়, আগুন তাকে পোড়াবেই।

রেজা খান থমকে গেলেন। শাহজাদা দাউদ খান মাথা তুলে বললেন–আমার কি কিছু বলার অবকাশ আছে জনাব?

শাহজাদার মুখের দিকে স্থির লক্ষ্যে চেয়ে থেকে হযরত-ই আলা বললেন—জরুর। এসব ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই শাহজাদাদের দরবারে আহ্বান করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে তাঁদের একাত্মতা থাকা চাই।

ঃ জাঁহাপনা।

ঃ শাহজাদা কি বলতে চান, তাই আগে শুনি।

ঃ সাধ করে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নটা আমার কাছে স্পষ্ট নয় জাঁহাপনা।

হয়রত-ই-আলা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–ঐ সেপাইরা যে দিল্লীর বাদশাহর সেপাই এটা কি শাহজাদা জানতেন না?

ঃ জি জনাব, জানতাম।

ঃ তারা যে এ মুলুক দখল করতে আসেনি, সফরে এসেছে, এটা?

ঃ জি, এ রকম একটা কথাও শুনেছিলাম।

ঃ তাহলে তাদের উপর চড়াও হওয়ার হেতুটা কি?

ঃ এ মুলুকে সফরে আসার আগে জনাবের কি কোন অনুমতি নিয়েছিল তারা?

ঃ তা না নিলেও, তারা ছিল এ মুলুকের মেহমান। অনুমতিটা পরেও হয়তো নিতে পারতো তারা। মেহমানদের উপর শাহজাদার ঐ আচরণ আদৌ কি বাহবা পাওয়ার যোগ্য?

উঠে দাঁড়ালেন শাহজাদা বায়াজিদ খান। হযরত-ই-আলার জ্যেষ্ঠ তনয়। তিনি সবিস্ময়ে বললেন–তাজ্জব! এ মুলুকটা কি একটা এতিম মুলুক জাঁহাপনা?

বইঘর.কম ও রোকন

হযরত-ই-আলার চোখের নজর তীক্ষ্ণ হলো। তিনি প্রশ্ন করলেন– তার অর্থ কি শাহজাদা বায়াজিদ খান?

বায়াজিদ খান বললেন–পূর্ব যোগাযোগ ছাড়াই ভিন-দেশের ফৌজ এসে এ মুলুকে ঢুকবে আর তা দেখেও মেহমান মনে করে সকলেই খামোশ হয়ে থাকবে, এ রহস্য মাথায় আমার ঢুকছে না। এ মুলুক কি এতটাই লা-ওয়ারিশ?

সমর্থন পেয়ে শাহজাদা দাউদও শক্ত হয়ে গেলেন। তিনিও জোরদার কণ্ঠে বললেন–যোগাযোগ করে মেহমান হয়ে এলে, ভিন মুলুকের রাজপুরুষ বা বেসামরিক রাজনৈতিক দল আসবে। সামরিক কর্মকর্তারাও আসতে পারেন। কিন্তু দাওয়াত-আহ্বান ছাড়াই ভিনদেশী সৈন্যবাহিনী এসে অতর্কিতে এই মুলুকে ঢুকবে, আর আমরা কি সবাই পুতুল যে, তাই চেয়ে চেয়ে দেখবো? এদেশ কি এতিমের দেশ? গোস্তাকী হলেও জনাবকে আমি জানাতে চাই, আমার কসুরটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

বায়াজিদ খান এবার শাহজাদা দাউদ খানকে দোষারোপ করে বললেন–কসুর জরুর হয়েছে। ভিনদেশী ফৌজ এসে দম্ভভরে বাঙ্গালা মুলুকে নামল, আর সে খবরটা সদরে না পৌঁছিয়ে একা একা ছুটে যাওয়াটা আলবত কসুর।

দাউদ খান নত মস্তকে বললেন–ভাইজান!

বায়াজিদ খান বললেন–খবরটা যদি পেতাম, তাহলে ঐ দাম্ভিকেরা জিন্দা হালে বজরা ভাসিয়ে পালিয়ে যেতে পারতো না। ওদের লাশ দিয়ে বজরাটা ভর্তি করে তবেই ভাসিয়ে দিতাম বজরা।

আওলাদের কথায় ওয়ালেদ সোলায়মান খান কাররানী বিব্রতও হলেন যেমন, নাখোশও হলেন তেমনই। এর জবাবে তিনি রুষ্ট-কণ্ঠে বললেন–তাহলে তাতে শাহজাদা বায়াজিদ খানের আহম্মকিটাই প্রকাশ পেত, বাহাদুরি কিছু মিলতো না।

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে বায়াজিদ খান বললেন— জাঁহাপনা!

হযরত-ই-আলা বললেন— আমি তো আগেই বলেছি—ওরা দিল্লীর সেপাই?

বায়াজিদ খানের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি উত্তেজিত হয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললেন–আর আমরা কি সব ভেড়ীর বাচ্চা? জাঁহাপনা কি এই ধারণাই পোষণ করেন?

শাহজাদার আচরণে হযরত-ই-আলা থমকে গিয়ে বললেন–তাজ্জব!

বলেই চললেন বায়াজিদ খান–দিল্লীর সেপাই বলেই তারা এমন কি আসমানী ফৌজ যে, তাদের নাম শুনলেই, আমাদের হাত-পাগুলো পেটের মধ্যে ঢুকে যাবে? বাঙ্গালা মুলুকের অধিপতির দীল এতটা কমজোর তা জানতাম না।

সোলায়মান খান কাররানী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন–শাহজাদা বায়াজিদ!

বায়াজিদ খান সম্বিতে ফিরে এলেন। হুঁশ হতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করলেন এবং অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন–গোস্তাকী মাফ হয় মেহেরবান। আফসোসের আধিক্যে আমি আদব রাখতে পারিনি।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আধিক্যে জ্ঞান হারায় অর্বাচীন আর নাদানরা। শাহজাদা কি নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করতে চান?

ঃ আমি অনুতপ্ত জাঁহাপনা।

হযরত-ই-আলা নারাজভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কথা ধরলেন হযরত-ই-আলার প্রধান উজির প্রবীণ লোদী খান। তিনি বললেন— দিল্লীর সেপাইদের শাহজাদা এভাবে দেখছেন কেন? তারা তো আমাদের দুশমন নয়, দোস্ত।

শাহজাদা বায়াজিদও নীরব হয়ে গেলেন। তিনি আর তৎক্ষণাৎ কোন কথাই বললেন না। কথা বললেন শাহজাদা দাউদ খান। উজিরে আজম লোদী খানের মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে চেয়ে তিনি বললেন — দোস্ত? দিল্লীর ফৌজ বাঙ্গালা মুলকের দোস্ত?

ঃ জি, ছোট শাহজাদা। তারা আমাদের মিত্র। তাদের সাথে সম্পর্ক আমাদের মিত্রতার সম্পর্ক।

খেদ প্রকাশ করে শাহজাদা দাউদ খান বললেন—হায়রে মিত্রতা! বললে হয়তো ভাইজানের মতো আমারও গোস্তাকী নেবে দরবার। তাদের পরিচয়টুকু জানতে চাইলেও আমাদের ঐ মিত্রেরা কিল ফেলে আমাদের পিঠে, তবু তারা মিত্র। আফসোস্! এই দুঃখটুকু প্রকাশ করার মওকাও আমাদের নেই।

এ কথায় হযরত-ই-আলা সচকিত হয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন—তার অর্থ?

দাউদ খান বললেন—আমি দুঃখিত জনাব। যেটা আক্ষেপের বিষয়, তা ব্যক্ত করতে গেলে আফসোসটা মূর্ত হয়ে উঠবেই। দরবার তাতে নাখোশ হলে, আমাদের আর কথা বলার মওকা কোথায়?

ঃ আফসোস প্রকাশ করতে গিয়ে কাউকে অশালীন হতে দেয়ারই বা মওকা কোথায় দরবারের?

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ আমি কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, কি একটা অসন্তোষ শাহজাদাদের দীলে দানা বেঁধে উঠেছে। আজ তার ফয়সালা হওয়া উচিত।

ঃ জনাব!

ঃ কিল ফেলে মানে? কার পিঠে কিল ফেললে কে?

ঃ ঐ দিল্লীর সিপাইরা। জনাবে আলার অনুমতি সাপেক্ষে তারা এখানে এসেছে কি না, নদীতীর পাহারাদার প্রহরী এটা জানতে চাইলে তাকে অমানুষিক প্রহার করেছে ঐ সেপাইরা। প্রহরীদের এই কাজেই রাখা হয়েছে সেখানে। এটা প্রহরীর কোন অপরাধ নয়।

পর পর কয়েকটা ভাঁজ পড়লো হযরত-ই-আলার ললাটে। তিনি সবিস্ময়ে বললেন—সে কি! প্রহরীকে প্রহার করেছে তারা?

ঃ তা না করলে পরিস্থিতি নিশ্চয়ই এত খারাবির দিকে যেত না। মিত্রেরা মিত্রের মতো আচরণ করলে কলহের কোন প্রশ্নই উঠতো না।

ঃ তাজ্জব! ফৌজদার রেজা খান, আপনি তো এসব কথা কিছুই বললেন না?

রেজা খান বললেন—বলেছি জাঁহাপনা। জাঁহাপনাকে যাঁরা এই খবর দিয়েছেন, ঘটনাটা পুরোপুরি না জেনেই তারা দিয়েছেন, একথা আমি বলেছি।

এ কথায় উজির লোদী খান বললেন—তাহলে আর ছোট শাহজাদার কসুর ধরা যায় না জনাব। যারা বিনা অনুমতিতে এসেছে, তাদেরই তো সংযত থাকা উচিত ছিল। বিষয়টি আমি যথাস্থানে পৌছাবো।

হযরত-ই-আলা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। অন্যেরাও আর কেউ কোন কথা বললেন না। ক্ষণকাল নীরব থাকার পর হযরত-ই-আলা শাহজাদা বায়াজিদ খানকে প্রশ্ন করলেন-শাহজাদা বায়াজিদ খানের আফসোস্টা কি এই নিয়েই।

বায়াজিদ খান বললেন—গোস্তাকী মাফ হওয়ার অভয় পেলে আমি বলবো, আমার আফসো্স শুধু ঐ টুকুই নয়। আমার আফসোস, শত্রু হোক, মিত্র হোক, অনুমতি বা আহ্বান ব্যতিরেকে এক মুলুকের ফৌজ অন্য মুলুক ঢুকবে কেন?

আবার কিঞ্চিৎ নীরব হলেন হযরত-ই-আলা। এরপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন—অনেকটা সঙ্গত প্রশ্ন। আর কি কোন ক্ষোভ আছে শাহাজাদার দীলে? কোন অভিযোগ?

ঃ থাকলেও তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় জাঁহাপনা। মুরুব্বিদের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা শ্রুতিকটুও বটে, বেয়াদবিও বটে। জাঁহাপনা মেহেরবানী করে এ প্রশ্ন আমাকে না করলে আমি বাধিত হবো।

ঃ কিন্তু জাঁহাপনা তাতে খুশি হতে পারবেন না। জাঁহাপনার পদক্ষেপ নিয়ে শাহজাদাদের বিভ্রান্ত থাকা কোন সুস্থির রাজ্য পরিচালনার পরিচয় নয়।

শাহজাদা বায়াজিদ খান নতমস্তকে বললেন—তবু আমি এ মুহূর্তে তা গুছিয়ে বলতে অপারগ জনাব। আমার গোস্তাকী মাফ হয়।

হযরত-ই-আলা হোঁচট খেলেন। অতঃপর কি বলবেন তিনি ভাবতে লাগলেন। শাহজাদা দাউদ খান এই ফাঁকে বললেন—মঞ্জুর হলে, ভাইজানের কথাগুলো আমি বলতে চাই জাঁহাপনা। সেই সাথে আমারও কিছু বক্তব্য আমি পেশ করতে চাই। প্রসঙ্গ যখন উঠছেই তখন এসব আর চেপে রাখা সমীচীন হবে না আমাদের।

হযরত-ই-আলা উৎসাহ দিয়ে বললেন—আলবত-আলবত! শুধু শাহজাদারাই নন, দরবারের আর কারো দীলে কোন প্রশ্ন থাকলে, তারাও তা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবেন আজ, আমি এই আহ্বান জানাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি, উজিরে আলা লোদী খান সাহেব পাটনায় দিল্লীর ফৌজের সাথে বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর থেকেই দরবারের এক অংশের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জরণ শুরু হয়েছে। তা নিরসন হওয়া দরকার।

বইঘর.কম ও রোকন

দরবারে প্রাণ ফিরে এলো। এতক্ষণ দরবারীরা নীরব হয়েছিলেন। এবার অনেকেই মুখ খুললেন এবং সমর্থনসূচক সাড়া দিলেন হযরত-ই-আলার আহ্বানে। হযরত-ই-আলা ফের বললেন— শাহজাদা দাউদ খানের বক্তব্যটা আগে শুনতে চাই।

তিনি দাউদ খানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। দাউদ খান ইতস্ততঃ করে বললেন—এসব আলোচনায় জাঁহাপনার অভয় আর ধৈর্যের আশ্বাস বড় প্রয়োজন। কারণ, কথাগুলো প্রথম থেকেই অনভিপ্রেত হতে পারে!

দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হযরত-ই-আলা বললেন—সংকোচের কোন কারণ নেই। শাহজাদা তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য নির্ভয়ে পেশ করতে পারেন।

দাউদ খান বললেন—এককথায় বললে আমি বলবো দিল্লীর প্রতি জাঁহাপনার এই নতজানু নীতি আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ও পীড়াদায়ক।

হযরত-ই-আলা নির্লিপ্তকণ্ঠে বললেন—সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যুক্তি বহন করে না। মন্তব্যের ব্যাখ্যা করবেন শাহজাদা।

ঃ দিল্লীর বাদশাহর দরবারে ভেট পাঠানোর প্রসঙ্গটাই আগে আসে জনাব। তার পরেই আসে আর কিছু বিস্ময়কর পদক্ষেপের কথা। আমাদের স্বগোত্রীয় ও মিত্রশক্তি খান-ই-জামান সাহেব দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহের কোপে পড়ে মদদ চাইলেন আমাদের। তা তো আমরা দিলামই না, তদুপরি রোহটাস্ দুর্গ অধিকার করতে আমরাই আগে সে দুর্গ অবরোধ করলাম। কিন্তু আকবর শাহ সে দুর্গ অধিকার করার খাহেশ পোষণ করায় তার মনোরঞ্জনার্থে আমরা আমাদের বাহিনী গুটিয়ে নিয়ে সেখান থেকে খোশদীলে ফিরে এলাম। বিষয়গুলো আমরা ধাতস্ত করতে পারিনি।

হযরত-ই-আলার ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হলো। তিনি কণ্ঠস্বর হাল্কা করে বললেন—হুঁ! শাহজাদা দাউদ খান বয়সে নবীন হলেও, রাজনীতির অনেক গভীরে বিচরণ করেন তিনি। খুবই আনন্দের কথা। এ জবাব পরে দেব। তারপর?

ঃ সুলতান উপাধি না নিয়ে জাঁহাপনা হযরত-ই-আলা উপাধি ধারণ করেছেন। অন্যের কাছে কিছুটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলেও এ নিয়ে কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু সম্মানিত উজিরে আযম সাহেব দিল্লীর প্রতিনিধির সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে এসেছেন, তা বিতর্কের অতীত নয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী বাঙ্গালা মুলুক যে একটা আজাদ মুলুক, দিল্লীর অধীন প্রদেশ নয়, এটা জোর দিয়ে বলার রাহা নেই। হিম্মত, তাকত, বল, বীর্য, সেপাই, সেনা, গজ, অশ্ব-কোন্ দিক দিয়ে আমরা খাটো? তাবৎ পাঠানশক্তি বাঙ্গালার পেছনে। আমরা কেন তাদের কাছে ইজ্জত খোয়াতে যাবো?

বইঘর.কম ও রোকন

উষ্ণ সমর্থন এলো বেশ কিছু দরবারীদের পক্ষ থেকে। দরবারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সভাসদ এ প্রেক্ষিতে বলে উঠলেন—ঠিক-ঠিক। এ প্রশ্ন আমাদেরও জাঁহাপনা। বিষয়টি আমরা হজম করতে পারছিনে।

সেনাপতি গুজার খান এদের মুখপাত্র হয়ে বললেন—আকবর শাহের নামে খোত্‌বা পাঠ, তার নামে মুদ্রা জারি— এ সবই যদি ঐ চুক্তির শর্ত হয়, তাহলে আমাদের অস্তিত্ব কোথায়? স্বকীয়তা বলতে রইল কি?

উজির লোদী খান বললেন—জবাবটা আমিই দেই জাঁহাপনা—

—বলেই তিনি সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললেন—আমাদের স্বকীয়তা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কিছুই এতে ব্যাহত হচ্ছে না। সবই অটুট থাকছে। এটা শুধু রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে দিল্লীর বাদশাহকে মিত্র করে রাখার একটা কৌশল। আমরা তাদের নির্ধারিত কর দিতেও যাচ্ছিনে, আমাদের উপর তারা প্রভুত্ব করতেও আসছে না। সার্বভৌমত্ব নিয়ে আমরা নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে পারছি।

শাহজাদা দাউদ খান বললেন—এ সার্বভৌমত্বের গৌরবটা কোথায়? সার্বভৌমত্ব হবে সূর্যের মতো তীর্যক আর ভাস্বর। এ নিয়ে এই লুকোচুরি কেন? স্বাধীনতার নামে পরতুষ্টি হাসিলের এই হীন উদ্যোগ কেন?

হযরত-ই-আলা বললেন—অন্য কোন কারণে না হলেও, শাহজাদার এ বোধ নিশ্চয়ই আছে যে, মুরুব্বি বা বড়দের তুষ্ট রাখা ছোটদের জন্যে অগৌরবের নয় বা হীন আচরণ নয়?

শাহজাদা দাউদ খান সবিস্ময়ে বললেন—বড়দের!

ঃ আলবত্‌। দিল্লীর সাম্রাজ্য বিশাল সাম্রাজ্য। তার তুলনায় বাঙ্গালা মুলুক এক টুকরো জমিন মাত্র। তার সাথে বাঙ্গালা মুলুকের সুসম্পর্ক রাখা বা তার কাছে বাঙ্গালা মুলুকের ছোট হয়ে থাকা দোষের কিছু নয়?

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ তাছাড়া শাহান শাহ আকবর শাহ একজন মুসলমান বাদশাহ। তাঁর তুলনায় বাঙ্গালার হযরত-ই-আলা একজন নগণ্য শাসক। একজন মুসলমান বড় বাদশাহর প্রাধান্য অন্য একজন মুসলমান ছোট শাসকের মেনে চলার নজীর এই নতুন নয়। বরং সারা জাহানের মুসলমানদের এই নীতিই মেনে চলা উচিত।

ঃ অবশ্যই তা ঠিক জনাব। কিন্তু তারও একটা ক্ষেত্র আছে। পাত্রাপাত্র ভেদ আছে। বাঙ্গালার হযরত-ই-আলা একজন মজবুত ঈমানের সাচ্চা মুসলমান। শরিয়তের বিধান তিনি শক্তভাবে পালন করেন। তার তিল পরিমাণ বিচ্যুতিও বরদাস্ত তিনি করেন

বইঘর.কম ও রোকন
না। বালা-মুসিবত ঝুট-ঝামেলা উপেক্ষা করে হররোজ ফজরের নামাজের পর শতাধিক ধর্মপ্রাণ আলেম-উলামা সহকারে প্রহরের অধিক কাল ধরে বিশিষ্ট চিত্তে আল্লাহ তায়ালার জেকের আজ্‌কার করা তাঁর চাই-ই। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া মুসলমান কারো কাছে মাথা নত করে না, এ কথা জাঁহাপনারই আত্মপ্রত্যয়ের কথা।

ঃ শাহজাদা!

ঃ যদি খোলাফায়ে রাশেদীন বা তৎপর্যায়ের কোন খাঁটি মুসলমান দিল্লীর তখ্‌তে আসীন থাকতেন, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কেন, তাঁর একান্ত অনুগত প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যচালনা করাকে, তাঁর নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করাকে আমি মোবারকবাদ জানাতাম এবং গৌরবের কাজ মনে করতাম। কিন্তু আকবর শাহের কাছে এই নতি-স্বীকার কেন? মুসলমানদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার কোন যোগ্যতা আছে তাঁর, আর কোন্ দাবি রাখেন তিনি?

ঃ শাহজাদা দাউদ!

ঃ নিজেই যিনি ইসলামের আচার বিধি উপেক্ষা করে চলেন, নিজের হেরেমকে যিনি একাধিক হিন্দু আউরত এনে পূজা অর্চনা আর বেদাতির ময়দান বানিয়ে রেখেছেন, তাদের কাউকেই মনে প্রাণে মুসলমান বানিয়ে ইসলামের আদব আব্রু আর বিশ্বাসের মধ্যে আবদ্ধ করতে পারেন নি, বা করতে তিনি চান নি। একজন পাক্কা মুসলমান তাঁকে মুরুব্বি বলে কবুল করতে পারেন কি করে? একজন মজবুত ঈমানের মুসলমান শ্রদ্ধাশীল হবেন আর একজন মজবুত ঈমানের মুসলমানের কাছে। একজন দুর্বল ঈমানের নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলমানের কাছে তিনি নতজানু হবেন কেন?

বিভিন্নজনের সমর্থনসূচক গুঞ্জরণে দরবার আবার উষ্ণ হয়ে উঠলো। তা দেখে লোদী খান বললেন—শাহজাহাদার বক্তব্য সম্পূর্ণ ঠিক। বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সাথে শাহজাদাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, রাজনীতি ভিন্ন জিনিস। দেশের ও দশের কল্যাণার্থে এখানে বিভিন্ন রকম কূটকৌশলের প্রয়োজন। নইলে বিপর্যয় রোধ করা যায় না।

ঃ অর্থাৎ?

কোণঠাসা হয়ে গিয়ে হযরত-ই-আলা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এবার তিনি রুষ্ট কণ্ঠে সরাসরি বললেন—সর্বশক্তি নিয়ে দিল্লীর সম্রাট আমাদের উপর চড়াও হলে, কোন শাহজাদা বা কোন কেউ কি পারবেন তা সামাল দিতে? রাখতে পারবেন এ মুলুকের অস্তিত্ব?

দাউদ খানও মজবুত কণ্ঠে বললেন—যতক্ষণ পারি, প্রাণপণে তা সামাল দেয়ার চেষ্টা করবো। না পারলে মরবো। শেয়ালের মতো শত বছর বেঁচে থাকার চেয়ে, শেরের মতো একদিন বেঁচে থাকাও আমি বেহতর বলে মনে করি জনাব।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ এসব ছেঁদো কথা দায়িত্বহীন হুজুগেদের কথা। কায়দা করে চলে সর্বস্ব সামাল দেয়ার চিন্তা হুজুগেদের মাথায় কখনও খেলে না।

শাহজাদা বায়াজিদ খান এবার বললেন—গোস্তাকী মাফ হয় জনাব। এরপর আর মুখ না খুলে পারলাম না। কায়দা করে চলে অনিবার্যকে কয়দিন ঠেকিয়ে রাখা যায়? তোয়াজ করে সবলকে প্রভু বানানোই যায়, মিত্র করে রাখা যায় তাকে কয়দিন?

জবাব দিলেন লোদী খান। তিনি বললেন—অনেকদিনই যায় শাহজাদা। আমাদের এই নরম নীতির বলেই আজও আমরা বহাল রেখেছি আমাদের স্বকীয়তা-সার্বভৌমত্ব। সংঘর্ষে লিপ্ত হলে, এর অনেক আগেই বাঙ্গালা মুলুক বিশাল দিল্লী সাম্রাজ্যের উদরে লীন হয়ে যেত।

ঃ রক্ষা করতে না পারলে তা যাবেই। বালির বাঁধ দিয়ে প্লাবনকে রোধ করা যাবে না। আপনারা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তা দাওয়াই দিয়ে বিমারীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার পদ্ধতি। বিমার মুক্তির নয়।

ঃ শাহজাদা!

ঃ আকবর শাহ আজ অন্যদিকে ব্যস্ত আছেন। ঘরের আর পারিপার্শ্বিক সমস্যার সমাধানে লিপ্ত আছেন। এদিকে নজর দেয়ার অবকাশ তাঁর আপাতত নেই। তাই আপনারা সর্বস্ব বহাল রাখার আত্মতৃপ্তি ভোগ করছেন। তার আগ্রাসী মতলবের যা খবর আমার জানা আছে, তাতে ঐ সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেই তিনি নজর ফেরাবেন এদিকে। আমাদের যদি নিতান্তই কমজোর বলে মনে করেন তিনি, তাহলে ঐ ভেট খেয়েই তুষ্ট তিনি থাকবেন না। পুরোটাই গ্রাস করতে চাইবেন। সুতরাং, তোষণনীতির পরিবর্তে নিজের বাহু মজবুত করে নিয়ে যদি শক্ত হয়ে থাকি আমরা, তবেই হয়তো তাঁর গ্রাস থেকে বাঙ্গালা মুলুক রেহাই পেতে পারে।

সেনাপতি ইসমাইল খান, গুজার খান, সিকান্দার উজবেক, কতলু খান, সুলতানের ভ্রাতুস্পুত্র জুনায়েদ খান সহ বেশ কিছু সংখ্যক সভাসদ এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন— একেবারেই আখেরী কথা। দিল্লীর শক্তি চিরশত্রু বাঙ্গালার। সম্রাট বাবর শাহ আর হুমায়ুন শাহর পর ইসলামের রীতিনীতির ধস্ নেমেছে মুঘলদের দীলে। বাঙ্গালার মুসলমানদের মতো এ বিষয়ে এত মজবুত আর মুঘলেরা নয়। ওরা আমাদের মিত্র বলে মানবে না। থাবা একদিন মারবেই।

কিন্তু এ সমর্থন অখণ্ডতা অর্জন করতে পারল না। গরিষ্ঠতাও নয়। প্রথম থেকেই বিপরীত একটা গুঞ্জরণ অস্পষ্টভাবে বিরাজমান ছিল। শাহজাদাদের ওজস্বিতার সামনে এতক্ষণ তা স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। কথায় কথায় সে গুঞ্জরণ এবার বিকট আকার ধারণ করলো এবং ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে গেলেন বিপুল সংখ্যক বিপরীত ধারার সমর্থক। শুরু হলো বিতণ্ডা। গোটা দরবারটাই দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল। হযরত ই-আলার জামাতা ও

বইঘর.কম ও রোকন

ভ্রাতুষ্পুত্র হাস্‌নু ওরফে হাঁসু, অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্র, রাজপুরুষ ও সেনাধ্যক্ষ সহ অবিশিষ্ট দরবারটাই এই নরম নীতির পক্ষ সমর্থন করলো এবং লোদী খানের চুক্তিকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার আলোকবর্তিকা রূপে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলো।

মূলকথা, শুরু থেকেই হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী নম্রনীতি অনুসরণ করায় এবং এর প্রচার ও তাৎক্ষণিক সাফল্যের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ায়, অন্যকথায়, এই নীতিই কালক্রমে ধাতস্থ হয়ে উঠায়, সিংহভাগ সাভাসদরাই ঐ শক্তনীতির ঝুঁকিটাকে সমর্থন করতে পারলেন না বা হযরত-ই-আলার মানসিকতার বিরুদ্ধে আকস্মিকভাবে একটা বৈপ্লবিক হুজুগে শরিক হতে চাইলেন না।

এতে করে সংখ্যালঘু হয়ে এবং দরবারের ঐক্য রক্ষার মানসে শক্ত নীতির প্রবক্তারা আস্তে আস্তে থেমে গেলেন।

হযরত-ই-আলা হাত তুলে অন্যান্যদেরও থামিয়ে দিলেন। ক্ষণিকের জন্যে দরবারে নিঝুম নীরবতা নেমে এলো। আভ্যন্তরীণ বিভেদের সম্ভাবনা দেখে হযরত-ই আলা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মুখে স্বীকার না করলেও শাহজাদাদের উপলব্ধি তিনি অসার বোধে উপেক্ষা করতেও পারলেন না। এই দুই ধারার সমন্বয়ের মধ্যেই তিনি তাঁর সঠিক বৈদেশিক নীতির সন্ধান পেলেন। তাঁর অবচেতন মনে যে নীতি ঘুমিয়ে ছিল, সেটা এবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এ নিয়ে কিছু বলার উদ্যোগ করতেই তাঁর নজর পড়লো এক পাশে নতমস্তকে দণ্ডায়মান ফৌজদার রেজা খানের উপর। ফৌজদার হলেও তাঁর বীরত্বে, বিশ্বস্ততায় ও বুদ্ধিদীপ্ত নির্মল মানসিকতায় হযরত-ই আলা তার উপর অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। তিনি তাঁকে স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন। তাঁর উপর নজর পড়তেই হযরত-ই-আলা সাগ্রহে বললেন-ফৌজদার সাহেবের কোন মতামতই জানা যায়নি এতক্ষণ। এ প্রেক্ষিতে তাঁর অভিমত কি?

অনেকের ধারণা ছিল, এরপর ফৌজদার সাহেবও ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্রোতেই গা ভাসিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁদের বিপুল বিস্ময় ঘটিয়ে ফৌজদার রেজা খান জবাবে বললেন–শাহজাদাদের দর্শন যেমন স্পষ্ট তেমনই বাস্তব। আবেগের কোন ফাঁক নেই এখানে। সুতরাং এর অতিরিক্ত বা বিপরীত কোন দর্শন আমার নেই জাঁহাপনা।

প্রতিবাদে হযরত-ই-আলার জামাতা হাঁসু খান সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতেই রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁকে বসিয়ে দিলেন হযরত-ই-আলা। অতঃপর হযরত-ই-আলা উত্তাপহীন স্বাভাবিক কণ্ঠে রেজা খানকে প্রশ্ন করলেন–আপনিও তাহলে ঐ চরমনীতি অবলম্বন করে দিল্লীর বিরুদ্ধে আমাকে তলোয়ার খুলতে বলেন?

রেজা খানও স্বচ্ছ কণ্ঠে বললেন–তা কেন বলবো জনাব? রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা সমীচীন, তা রাষ্ট্রপতিই নির্ধারণ করবেন। কিস্তির হাল যাঁর হাতে তিনিই ভাল বুঝবেন, কোন ভাবে হাল ঘোরালে কিস্তির গতি ঠিক থাকবে।

ঃ ফৌজদার সাহেব।

ঃ আমরা আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা আর দর্শনের কথা বলেছি। গ্রহণ-বর্জনের মালিক জাঁহাপনা।

ঃ আপনার দর্শন আমার তো মনঃপুত নাও হতে পারে?

ঃ খুবই স্বাভাবিক। সকলের চিন্তাভাবনা এক হবে, এমন কোন কথা নেই জাঁহাপনা।

ঃ সেক্ষত্রে আপনাদের ভূমিকা কি?

ঃ অন্যের কথা বলতে পারিনে, তবে আমার ভূমিকা, জনাবের আদেশ শিরোধার্য করে চলা।

ঃ রেজা খান সাহেব!

ঃ আদেশের দায়দায়িত্ব মাথার। নিতান্তই বিমারগ্রস্ত বা পঙ্গু না হলে সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনও মস্তিস্কের নির্দেশের অন্যথা করে না। আমার দ্বারাও তিল পরিমাণ অন্যথা হওয়ার কারণ নেই জনাব।

ঃ বহুত খুব। শাহজাদাদের কি আর কিছু বলার আছে?

শাহজাদা বায়াজিদ খান বললেন—আমাদের কথা বলেছি আমরা। নীতির ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেছি। কোন্ নীতি গ্রহণ করবেন জাঁহাপনা, এটা তাঁরই বিবেচ্য। এর পরের কথা, শাহজাদারা কেউ বেয়াদব বা বিশ্বাসঘাতক নয়। সর্বাবস্থাতেই যে ওয়ালেদের আদেশ পালন করা তাঁদের পবিত্র কর্তব্য, এ জ্ঞান শাহজাদাদের লোপ পাওয়ার কোন কারণ নেই।

ঃ সাব্বাস! সালার আর সভাসদ সাহেবেরা কি বলেন?

চরম বা শক্তনীতির সমর্থকদের মুখপাত্র হিসাবে গুজার খান বললেন শাহজাদাদের কথাই আমাদেরও কথা জনাব। আমাদের মত অগ্রাহ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এর প্রতিক্রিয়া আমাদের ভূমিকার উপর পড়বে। জনাবকে ও দেশকে আমরা ভালবাসি। কোন অবস্থাতেই আমাদের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন উঠার অবকাশ নেই জাঁহাপনা।

ঃ মারহাবা-মারহাবা! আপনাদের সবার কথাই শুনলাম। এবার আপনারা আমার কথা শুনুন। চরমপন্থার দিক আমি অগ্রাহ্য করলাম না! এর গুরুত্ব আমি আন্তরিকভাবে অনুভব করলাম। এটা আমার বিবেচনায় রইলো। যে কৌশলগত নমনীয় নীতি নিয়েছি আমি, আপাতত আপনারা আমাকে আমার সেই নীতিতেই চলতে দিন। উজির লোদী খান সাহেবের চুক্তিও আমাকে রক্ষা করতে দিন। এ চুক্তি আমার কাছেও পীড়াদায়ক। নিচে নামার এই আমার শেষ ধাপ। এর চেয়ে আরো বেশি নিচে নামার প্রশ্ন যদি আসে কখনও, মিত্রতা অগ্রাহ্য করে আকবর শাহ যদি গোলাম বানাতে চায়

বইঘর.কম ও রোকন

আমাদের, শাহজাদা সালার আর সভাসদদের অমি আশ্বাস দিচ্ছি, জাত লড়াকুর রক্ত আমার সর্বাঙ্গে প্রবহমান, সেক্ষেত্রে একা হলেও লড়াই করে শহিদ হবো, তবু বাঙ্গালার স্বকীয়তা ও স্বাধীন অস্তিত্ব ঐ কমজোর ঈমানের মুসলমান আকবর শাহর হাতে কখনও তুলে দেবো না।

স্রেফ অখণ্ডতাই নয়, দরবার এবার নিরঙ্কুশ ঐক্যে পৌছে খোশ প্রকাশ করলো- আলহামদুলিল্লাহ!

দুই

ধাবমান গঙ্গানদী। অফুরন্ত বারিধারা দুর্বার আবেগে সাগর পানে দৌড়াচ্ছে। মায়ের কোলে ঠাঁই লাভের দুরন্ত আকর্ষণে আধোবোল বাচ্চা সব কলকণ্ঠে ছুটছে। পাক খাওয়া স্রোতধারা ভাঁজ খাওয়া তীরের ঐকান্তিক অবরোধকে অপেক্ষমান মাতৃক্রোড়ের সামনে আলিঙ্গনেচ্ছু অনাত্মীয়ার প্রসারিত বাহুর মতোই বাহুল্যবোধ করছে আর বিপন্ন আর্তনাদে সে অবরোধ দলে মথে মাতৃক্রোড়ে ছুটছে। প্রতিকূল বায়ুবেগ ছুটন্ত সন্তানের কেশদাম আন্দোলিত করার মতোই ঢেউয়ের গায়ে ঢেউ ভেঙ্গে মাথা কুটে মরছে, গতিরোধের অহেতুক প্রয়াস তার সফলকাম হচ্ছে না।

এ এক অকৃত্রিম প্রবাহ। আদিম ও অবিনশ্বর। সৃষ্টির প্রবাহের প্রাণবন্ত প্রতীক। জিন্দেগীর কাফেলার জ্বলন্ত ফলক। প্রশান্তিবিচ্যুত অস্থির অস্তিত্ব ঐ একইভাবে নিয়তই প্রশান্তির কোলে গিয়ে লীন হয়ে যাচ্ছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ক্ষুদ্রগণ্ডি পেরিয়ে বিশালের বক্ষে গিয়ে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তবু ক্ষয় নেই প্রবাহের, লয় নেই কাফেলার। ভরা নদীর অন্তহীন স্রোতধারার মতোই জিন্দেগীর প্রবাহ আসছে আর আসছেই, যাচ্ছে আর যাচ্ছেই। ইতি নেই আগমনের, স্থিতি নেই গতির। ছুটছে আর ছুটছেই একটানা, অবিরাম।

অপরাহ্নের গঙ্গা। মধ্যাহ্নের প্রদাহ প্রশমিত হওয়ায় কর্মব্যস্ত নদী বক্ষে শান্তির একপাত পলেস্তরা পড়েছে। উজান-ভাটি ধাবমান নিরন্তর নৌযানে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রশান্তির উক্তি, উৎসারিত হচ্ছে হৃদয়ের আবেগ। ভরাট গলায় গান ধরে দাঁড়ি-মাল্লা-মাঝিরা দাঁড়ের টান খোশদীলে ক্ষিপ্রতর করেছে। মধ্যাহ্নের শান্ত হাওয়া অপরাহ্নে সজীব হয়ে মন্থর গতি যানের পালে পিঠ লাগিয়ে দিয়েছে। মৎসান্বেষী নৌবহর জড়ানো জাল খুলে নিয়ে বাঁকে বাঁকে শোর তুলেছে নবজাত উদ্যমে। চরে-তীরে বেড়ে গেছে মীনভোজী পক্ষিকুলের প্রাণান্ত প্রয়াস। কুঞ্জের নৃত্যবৎ জোরদার হয়ে উঠেছে শুশুককূলের পিঠ প্রদর্শন প্রক্রিয়া।

www.boighar.com

জলভাগের ব্যস্ততায় সমানে তাল দিচ্ছে স্থলভাগের তৎপরতা। জিন্দেগীর প্রবাহে অবিরাম পাক খাচ্ছে পশু-পাখি-মানুষ। হেলেরা হাল নিয়ে, গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে,

বইঘর.কম ও রোকন
ভারিরা ভার নিয়ে সীমাহীন ব্যস্ত। কর্ম-মুখর মানুষের ঘর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে ঘরের দিকে বিরামহীন আবর্ত! মাঠে-ক্ষেতে-প্রান্তরে পাল পাল পশু, রাজপথে মেঠোপথে সারি সারি পথচারী, খগে-বনে-ময়দানে ঝাঁক ঝাঁক বিহঙ্গ জিন্দেগীর যোগানে অনুক্ষণ মত্ত। অন্যকথায়, লয়প্রাপ্তির প্রয়াসে নিয়তই তৎপর। জিন্দেগীর যোগানদারী করার নামে লয়ের দিকেই জিন্দেগীকে এগিয়ে নিচ্ছে সকলে। সৃষ্টিটা আকস্মিক, স্থিতিটা ক্ষণিক, দুনিয়া থেকে লয়টাই জিন্দেগীর অবস্থানের আলয়। তাই যেন লয় প্রাপ্তির অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় নদীস্রোত জীবনস্রোত পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছে।

বসে বসে এ দৃশ্য অবলোকন করছেন তরুণ শাহজাদা দাউদ খান কাররানী। নজর তাঁর মূলতঃ নদীবক্ষে নিবদ্ধ। ছাড়প্রাপ্ত অশ্বটির খবর করার তাগিদে মাঝে মাঝে শাহজাদার চোখ যাচ্ছে ডাঙায়। এতে করে একপাশের ধাবমান স্রোতধারা ও চারপাশের চলমান জীবনধারা একই সাথে শাহজাদা চেয়ে চেয়ে দেখছেন। অলস কৌতুকে দেখছেন আর ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে চলে যাচ্ছেন জিন্দেগীর বিশ্লেষণে। পুরাতনকে নতুন করে উপলব্ধি করছেন। অনুভব করছেন জিন্দেগীর পরিণতি। নিশ্চিত ও অবধারিত পরিণতি। ভাবছেন, জীবন যেখানে একান্তই ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু যেখানে অনিবার্য, সেখানে সিংহের মতো জীবনের স্বাদ উপভোগ না করে শৃগালের মতো জীবনটাকে আড়াল করার অর্থ কি ? বুযদীলের জীবনটা কি অবিনশ্বর? কুঁজো হয়ে চললেই কি ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে চিরস্থায়ী করা যায়? তা যদি না যায়, মৃত্যুর উপস্থিতি সেখানেও যদি সমভাবে বিদ্যমান, তাহলে আর সোজা হয়ে চলাতে মৃত্যুর এত ভয় কেন? সংকোচ কেন বেড়িবদ্ধ জড়তার বদলে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনবোধে? মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের স্বাধীনতার পাশে লাটাইয়ের সূতো পরা ঘুড়ির বিচরণে বৈচিত্র্য কোথায়?

পিতার প্রতি আনুগত্য অবিচল থাকলেও, পিতার ঐ নতশির নীতির গ্লানি তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না। আলস্যে ও অবসরে সে গ্লানির পরশ তাঁর সজীব দীলটাকে ম্রিয়মান করে দিচ্ছে। ভারাক্রান্ত দীলে শাহজাদা এসব কথাই ভাবছেন আর পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী চেয়ে চেয়ে দেখছেন। দেখছেন, চিত্রকরের চিত্রবৎ দিগন্তের ভালে অপর পাড়ের অস্পষ্ট বনাঞ্চলের চুম্বন, নদীবক্ষে ঊর্মিশিরে হাজার তারার চমক, মার্তণ্ডের অনল মুখে লজ্জালাল তরুণীর বিনম্র শ্রী।

অন্তরের দর্শন আর বাইরের দৃশ্যের মাঝে সমাহিত ছিলেন তিনি। অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গ। নিশির ডাকের মতো অকস্মাৎ তাঁর কানে এলো এক আকর্ষণীয় মিষ্টি হাসি। একান্তই নিকটে। হাতের এ পাশে।

আজ সকাল থেকেই শাহজাদা বিমনা। কিছু অবাঞ্ছিত খিটিমিটির মধ্যে দিয়ে তার সকাল দুপুর কেটেছে। নির্ধারিত দাপ্তরিক কাজ তাঁর শেষ হয়েছে দুপুরেই। বিকেলে তার অখণ্ড অবসর। কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গ। নিত্য সঙ্গী রেজা খান বিদ্রোহ দমনে দূর

বইঘর.কম ও রোকন
এলাকায় গিয়েছেন। এতে করে তাঁদের নিয়মিত ঘোড়-সওয়ারী কয়দিন ধরে বন্ধ আছে। শাহী প্রাসাদের বাইরে উন্মুক্ত ফুল বাগিচায় বিগত কয়েকদিন তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাগান, রক্ষক মুরাদ খান ও মালী মজুরদের সাথে কথা বলে কাটিয়েছেন। দুপুরের পর আজও তিনি সেই উদ্দেশ্যেই বেরুলেন। কিন্তু আজ আর তিনি এতে তেমন উৎসাহ খুঁজে পেলেন না। মন তার উড়ু উড়ু করতে লাগলো। নিয়মিত অভ্যাসের টানে পথ থেকে ফিরে এসে একাই তিনি অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। অশ্ব ছুটিয়ে শাহী চত্বরের বাইরে চলে এলেন। কোনদিকে যাবেন তা নির্দিষ্ট কিছু ছিল না। ঘোড়-দৌড়ের ময়দানও তাঁকে আকর্ষণ করতে পারল না। অবচেতন মনের এক অজ্ঞাত টানে অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি ছুটে এলেন গঙ্গার তীরে। চলে এলেন সেদিনের সেই বজরা-ভেড়া ঘাটের কাছে। অন্তরের গহিনে অলক্ষ্যে ঠাঁই প্রাপ্ত ক্ষীণ একটা আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ক্ষীণ একটা উম্মিদ-যদি তিনি সন্ধান পান অনন্যা সেই তরুণীর! সাক্ষাৎ যদি হয়ই আবার সেদিনের সেই তেজস্বিনী বস্তি-বালার সাথে! ফৌজদার রেজা খানের মতো শুক্‌নোদীল মানুষকেও যে তরুণী ভাবিয়ে তোলে, সে তরুণী সামান্যা নয় কুত্রাপিও।

কিন্তু সেই নির্দিষ্ট ঘাটে এসে দেখলেন, ঘাট একদম নির্জন। একখানা বড় রকমের ছইবিশিষ্ট নৌকাই শুধু ভেড়ানো আছে ঘাটে, কিন্তু সে নৌকা শূন্য। উন্মুক্ত ছইখানার ভেতরে বা বাইরে কেউ কোথাও নেই। মাঝি মাল্লারও হদিস-পাত্তা নেই। যাত্রী নামানো যাত্রী উঠানোর প্রয়োজনে কোন বজরা এই বেসরকারী বজরাঘাটে ভেড়েনি। কোন বজরা-পানসির আনাগোনাও ঘাটখানার ত্রিসীমানায় নেই। নেই ঐ বস্তির কোন বাসিন্দারও উপস্থিতি।

শাহজাদা নিরাশ হলেন। এটা তিনি জানতেনও। তিনি এলেন আর অমনি তিনি সাক্ষাৎ পেলেন অজ্ঞাত সেই তরুণীর, তাঁর হদিস পেলেন তৎক্ষণাৎ, এটা যে কল্পনা ছাড়া বাস্তবে সম্ভব নয়, তা তিনি জানতেন আর প্রস্তুতও ছিলেন সেজন্যে। তাই অশ্ব ছুটিয়ে দিয়ে তখনই তিনি ঘাট ছেড়ে সামনের দিকে ছুটলেন এবং ঘাট ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে আনমনে আগে পিছে ছুটলেন। কিছুক্ষণ একা একাই ছুটোছুটি করে আবার তিনি ফিরে এলেন বস্তির সেই ঘাটের পাশে। ঘাট তখনও আগের মতোই ফাঁকা। অতঃপর প্রাসাদে ফেরার উদ্যোগ করতেই তিনি খেয়াল করলেন, সবে তখন বিকেল। শেষ বিকেলও নয়। শেষ বিকেলের পূর্বক্ষণ। দুপুরের পরে পরেই ঘর ছেড়েছেন তিনি। ফুলবাগানে না গিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে নদীর তীরে আসা আর এই অশ্ব পৃষ্ঠে তাঁর বরাবর ছুটোছুটি করা অধিকক্ষণের ব্যাপার নয়। এসব করে তিনি বিকেলটাকে ঠেলেঠুলে শেষ বিকেলের কাছাকাছি এনেছেন, শেষ বিকেলে পৌঁছে দিতে পারেননি। এত সময় হাতে নিয়ে মহলে ফিরে করবেন কি তিনি? নির্ধারিত কোন কর্মসূচি হাতে নেই। মহলে ফেরার অর্থই এখন ফিরে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা।

বইঘর.কম ও রোকন

ঘাটের পাশে এসে অশ্বের লাগাম টেনে ধরলেন শাহজাদা। মহলে তাঁর মন বসেনি বলেই তিনি মহল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। অশ্বের লাগাম টেনে ধরে কি করবেন, ভাবতে লাগলেন। এই মুহূর্তে নদীর তীরে মঞ্চের মতো মনোরম এক জায়গা শাহজাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অশ্ব থেকে নামলেন তিনি। নদীর তীরের পরেই অনেকখানি পতিত জমিন। এরপরেই মুক্ত মাঠ। পতিত ভুঁইয়ে লক লক করছে কচি ঘাসের ডগা। পশুপালের আকর্ষণীয় খাদ্য। অশ্বের লাগাম খুলে দিয়ে অশ্বটিকে তিনি ঘাসের দিকে ছেড়ে দিলেন। পোষমানা অশ্ব। পরম আগ্রহে অশ্বটি তৃণভক্ষণে মন দিলো। নিজে তিনি চলে এলেন মনোরম সেই স্থানটিতে।

ঘাটটির একপাশে মনোরম এই স্থানটি। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ঘাট থেকে অল্প একটু ফাঁকে। নদীস্রোত এখানে খাড়াভাবে পাড় ভেঙে স্থানটিকে মঞ্চের আকার দিয়েছে। সুমসৃণ দুর্বাঘাসে ঢাকা এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচুও। এখানে বসে নদীটাকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দেখা যায়। ওদিকে আবার পেছনের ঐ মাঠটিও এখান থেকে সুস্পষ্ট। এখানেই এক বড়সড় বাবলা গাছের ছায়ায় শাহজাদা দাউদ খান বসে পড়লেন। বসেই তাঁর মনে হলো, রঙ্গমঞ্চে উপবিষ্ট তিনি এক সম্রাট। মঞ্চের নিচে ধাবমান অফুরন্ত স্রোতধারা তাঁর অগণিত দর্শক। বাবলা গাছের ডালপালা তার মাথার উপর শামিয়ানা। পশ্চাতে তাঁর প্রহরীবৎ বাবলা গাছের গুঁড়ি। এক পাশে সৈনিকবৎ কাতার ধরে দাঁড়িয়ে গুল্মাকারের কচি কচি আরো অনেক বাবলাগাছ। পাতলা একটা বেড়ার মতো এই ছোট ছোট বাবলা গাছের সারি পাড় থেকে সরলরেখায় পানির কাছে এসেছে।

এই বাবলা গাছের বেড়ার বিপরীত দিকে মঞ্চ বিলকুল উদাম। শাহজাদা বসেছেন এই বেড়াটির পাড় ঘেষে। বেড়াটির ওপাশে ঘাটের দিকে বিশাল এক কদম গাছ। গাছ থেকে পাতাবহুল প্রকাণ্ড এক ডাল ঘাটের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘাটটাকে আড়াল করে রেখেছে। ঘাটটা এই আড়াল করা ডালের একদম নিচেই। একদিকে এই ডালের বেড়া, অন্যদিকে সারিবদ্ধ কচি কচি বাবলা গাছের ডালপালার প্রাচীর। এতে করে কদমগাছের তলে আগাছাহীন মাঝের ঐ স্থানটুকু সুন্দর একটা আব্রু করা আঙ্গিনার রূপ নিয়েছে। এই আঙ্গিনা থেকেই শাহজাদার কানে এলো ঐ আকর্ষণীয় মিষ্টি হাসি।

মঞ্চবৎ ঐ স্থানে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন শাহজাদা। চিন্তার আবর্তে আর চলমান দৃশ্যের মধ্যে মগ্ন ছিলেন তিনি। অকস্মাৎ এই মিষ্টি হাসির শব্দে তিনি চমকে উঠে পাশ ফিরে তাকালেন। যা দেখলেন, তা অকল্পনীয়!

দেখলেন, প্রস্ফুটিত যৌবনের দুটি তরুণী কদমগাছের তলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উচ্ছ্বসিত মধুর হাসির সাথে তারা নিম্নসুরে কথা বলছেন। দুজনের হাতেই গা থেকে খুলে নেয়া নিজ নিজ বোরখা। পরিধেয় বসনে দেহ তাদের যথাযথ আবৃত থাকলেও, বোরখা খুলে নেয়ার ফলে তাদের মস্তক ও মুখমন্ডল পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয়ে আছে। রৌদ্রঝরা

বইঘর.কম ও রোকন
পরিচ্ছন্ন দিন। বৃক্ষের সামান্য ছায়াটুকু ছাড়া ঐ স্থানও বাইরের মতো সমোজ্জ্বল। তদুপরি শাহজাদার একেবারেই পাশে।

অপরিসীম বিস্ময়ে সরাসরি তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শাহজাদা। দেখলেন, তরুণীদ্বয়ের একজনের রুপশ্রী মোটামুটি বেশ ভালই। কিন্তু অপরজনের রূপ-লাবণ্য একেবারেই অতুলনীয়। এমন অপরিসীম রূপ মাধুর্য জিন্দেগীতে কমই তিনি দেখেছেন। মনের মাধুরী দিয়ে ভাস্করদের গড়া অনেক নারীমূর্তিই শাহজাদা দেখেছেন। কিন্ত তাঁর মনে হলো, এ তরুণীর গড়ন-বরণ, নাক-চোখ, মুখ-চিবুক যেন তার চেয়েও নিখুঁত, তার চেয়েও চিত্তহারী। দুধে আলতায় বিধৌত মনোরম মুখমণ্ডলের সাথে সুডৌল মাথায় তাঁর অনুপম খোপাটিও আর একটি দর্শনীয় বস্তু। শুধু পরিপাটিই নয়, আকারেও খোপাটি এত বলিষ্ঠ যে, খুলে দিলে ঐ কেশ তাঁর হাঁটুর নিচে নেমে আসবে, এ নিয়ে শাহজাদার তিল পরিমাণ সন্দেহ রইলো না।

দেখার আকস্মিকতায় শাহজাদার অনুভূতিতে আতিশয্য ছিল। তবে বাস্তবেও এ তরুণী ছিলেন প্রকৃতই রূপবতী। তাই, কোন আউরতের মুখের দিকে এক ধেয়ানে চেয়ে থাকা শাহজাজা দাউদ খানের স্বভাবসম্মত না হলেও, তরুণীটির ঐ উপচীয়মান রূপরাশি শাহজাদাকে বিবশ করে দিল। প্রথম নজরে দেখলেন তিনি দু'জনকেই। অতঃপর ঐ একখানি মুখের দিকেই অপলক নেত্রে তিনি চেয়ে রইলেন নিরন্তর।

তিনি চেয়ে চেয়ে দেখলেন, অনুচ্চ আলাপ আর উজ্জ্বল হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে তরুণীদ্বয় রোরখা বদল করলেন। একের বোরখা অপরে নিয়ে পরিধান করার পর ঘুরে দাঁড়াতেই বাবলা গাছের ঝাড়ের আড়ালে উপবিষ্ট শাহজাদা দাউদ খানের উপর নজর পড়লো ঐ অপরূপা তরুণীর। নজর পড়তেই বাঘ দেখারও অধিক তিনি আঁতকে উঠে আওয়াজ দিলেন— ও-ম্মা।

দ্বিতীয় তরুণীটি সবিস্ময়ে বললেন— কি ?

প্রথমজন বললেন— ঐ—

শাহজাদাকে দেখে দ্বিতীয়জনও সমভাবে চমকে উঠে বললেন— ওমা! কে?

প্রথমজন বললেন— ঐ শাহজাদা।

দ্বিতীয়জন আওয়াজ দিলেন— মরেছি—

পড়ি-মরি করে উভয়েই ঘাটের দিকে ছুটলেন। চমক ভাঙলো শাহজাদারও। তিনিও চমকে উঠে শশব্যস্তে দাঁড়ালেন এবং ওদের গমন পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু লোক এসে ঘাটের উপর জড়ো হয়েছে। নানা বয়সের মহিলা ও পুরুষ মানুষ। ঘাটে বাঁধা নৌকাটির মাঝি-মাল্লাও এসে গেছে এরই মাঝে। ঘাটের দিকে এসেই ঐ দ্বিতীয় তরুণীটি জনাকয়েক মহিলা ও পুরুষ সহ নৌকায় গিয়ে উঠলেন। ঐ অপরূপা প্রথম তরুণীটি সহ অবশিষ্ট নারী-পুরুষ ঘাটের উপর

বইঘর.কম ও রোকন
দাঁড়িয়ে নৌকার আরোহীদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। অতঃপর মাঝিরা নৌকা ভাসিয়ে দিল এবং ঘাটের উপর দণ্ডায়মান নারী-পুরুষ সকলেই অপসৃত হলেন।

বিমুগ্ধ শাহজাদা ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন ওখানে। দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলেন, কে ঐ অপরূপা তরুণী?

অপরূপা তরুণীটি দৌলতজাহান। অপর তরুণী দৌলতেরই সখীতুল্যা পড়শী ও ভাবী ফিরোজাবানু। ফিরোজাবানুর পিত্রালয় এই ঘাটেরই ক্রোশ দুয়েক ভাটির দিকে। সেখানে এক আত্মীয়ার শাদির অনুষ্ঠানে খসম সহ ফিরোজাবানুকে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছেন ফিরোজাবানুর আব্বা। নৌকাটিও সেখান থেকেই এসেছে। ফিরোজাদের নৌকায় তুলে দেয়ার জন্যে ফিরোজা ও দৌলতদের আত্মীয় পড়শী অনেকেই ঐ বস্তি থেকে নদীর ঘাটে এসেছেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে দৌলতজাহানও এসেছেন। ঘাটে এসে জড়ো হওয়ার পর নৌকায় উঠার প্রাক্কালে দৌলতজাহানের আকস্মাৎ খেয়াল হলো, ফিরোজাবানুর বোরখাটি একেবারেই সাদামাটা আটপৌরে বোরখা। বিয়ে শাদির ব্যাপার। অনেক গণ্যমান্য পুরুষ মহিলাই হাজির হবেন সেখানে। ভেতরের লেবাস যা-ই থাক, বোরখার এই দীনতা দারিদ্রের স্বাক্ষর হয়ে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করবে ফিরোজাবানুর মর্যাদায়। দৌলতজাহান বরাবরই ছিমছাম ও শৌখিন গোছের মেয়ে। তাঁর গায়ের বোরখাটা ফিরোজাবানুর বোরখার চেয়ে অনেক বেশি আভিজাত্যপূর্ণ ও জৌলুশদার। দৌলতজাহান ফিরোজাকে বোরখা বদলের প্রস্তাব দিলেন। দৌলতজাহানের যুক্তি মনে ধরলো ফিরোজারও। কিন্তু চেনাজানা আত্মীয় পড়শী হলেও, এত লোকের সামনে তারা বেপর্দা হতে পারলেন না। এই বোরখা বদলের ইরাদায় তাঁরা ঘাটের পাশে ঐ কদম গাছের ঘেরাঢাকা আঙ্গিনায় চলে এলেন।

তাঁরা ছিলেন আপনভাবে মগ্ন। বেলা শেষ হয়ে আসায় তাকিদও ছিল তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠার। ফলে কোনদিকে নজর দেয়ার খেয়াল তাঁদের ছিল না। কদমতলায় এসেই তারা বোরখা খোলায় ব্যস্ত হলেন। উভয়েই একসাথে বোরখা খুলতে গিয়ে তাঁরা স্বভাবজাত পুলকে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। বোরখা খুলে হাতে নিয়ে পলকখানেক তাঁরা সরস কৌতুকে হাসাহাসি করলেন এবং সেই সাথে চাপা কিছু রসালাপও করলেন। অতঃপর ক্ষিপ্রগতিতে বোরখা বদল করে নিয়ে পুনরায় তাঁরা বোরখা পরায় প্রবৃত্তি হলেন।

নসীবের পরিহাস! চেনা জানা আত্মীয় পড়শীর সামনে বেপর্দা হওয়া সমীচীনবোধ না করে, তাঁরা এসে যে এ মুলুকের এক বেগানা শাহজাদার একেবারেই সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বেপর্দা হবেন, এটা কি তাঁরা ভাবতে কখনও পেরেছিলেন? যখন তা পারলেন, তখন তাঁরা শরমে ও সংকোচে দিশেহারা!

বইঘর.কম ও রোকন

পরের দিন শাহী চত্বরে অকস্মাৎ হৈ চৈ পড়ে গেল। আচানক এক ঝড় উঠলো রেজা খানের বিরুদ্ধে। রেজা খান সাক্ষাৎ আর এক কালাপাহাড়। সাক্ষাৎ ঐ দিল্লীর মিয়াঁ মুহাম্মাদ ফারমুলী। তার মতোই তিনিও অন্ধ খেয়ালে আর গায়ের জোরে মন্দির-বিগ্রহ ভেঙে তছনছ করে ফেলেছেন। ভিন্নধর্মীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছেন রেজা খান।

ফৌজদার রেজা খান বাঙ্গালা মুলুকের উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে গিয়েছিলেন। হোসেন শাহী বংশের বিলুপ্তির প্রাক্কালে কোচ জাতীয় জনৈক বিশ্বসিংহ কুচবিহারে কোচরাজ্য নামক নয়া এক হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। এই কোচরাজ্যের সীমান্তে বাঙ্গালা মুলুকের অধীন কয়েকজন হিন্দু জমিদার ছিলেন। শূর বংশের বিদায় আর কাররানী বংশের আগমনের হুটপাটে বাঙ্গালার প্রশাসন এই প্রত্যন্ত এলাকায় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে, বর্তমান কোচরাজ নরনারায়নের উস্কানীতে এই হিন্দু জমিদারগণ বাঙ্গালা মুলুকের প্রতি আনুগত্য পরিহার করে কোচরাজ্যের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই জমিদারদের উৎসাহে ও সহযোগিতায় বাঙ্গালার এ অঞ্চল কোচ রাজ্যের খোলাবাজারে পরিণত হয়। বেসামরিক লোকজন, ব্যবসায়ী, দালাল-ফড়ে, চোর-ডাকু ছাড়াও কোচরাজ্যের সীমান্তরক্ষী সৈন্যরা তাদের সীমান্ত রেখা পেরিয়ে বাঙ্গালা মুলুকের এ অঞ্চলে ঢুকে পড়ে ও অবাধে এ অঞ্চলে বিচরণ করতে থাকে। সুযোগ ও সময়ে তারা বাঙ্গালা মুলুকের আরো গভীরে ঢুকে লুটতরাজও শুরু করে।

খবর পেয়ে বাঙ্গালার হযরত-ই-আলা ফৌজদার রেজা খানকে সহকারী সালার পদে উন্নীত করে একদল সৈন্যসহ তাঁকে এই ঘটনা তদন্তে ও প্রয়োজনে বিদ্রোহীদের দমন করার নিমিত্তে প্রেরণ করেন।

রেজা খান এসে দেখলেন, শুধু বিচরণ করাই নয়, কোচরাজ্যের সীমান্তরক্ষীর একটা মস্তবড় দল এই জমিদারদের জমিদারির এপারে এসে বাঙ্গালা মুলুকের অভ্যন্তরে সামরিক এক ঘাঁটি খুলে বসেছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন, এই জমিদারেরা এর প্রতিবাদ তো করেনই নি, বরং নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এই ঘাঁটিটাকে সত্বর মজবুত করে তোলার পেছনে সর্ববিধ মদদ যুগিয়ে যাচ্ছেন। কোচরাজ্যের এখানে একটা শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন হয়ে গেলেই, এই জমিদারেরা প্রকাশ্যভাবে কোচরাজের সাথে একাত্ম ঘোষণা করতে পারেন।

এ অঞ্চলের সীমান্ত সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালার ভূতপূর্ব প্রশাসন এখানে লাগাতার এই কয়েকটি শক্তিশালী জমিদারি সৃষ্টি করেন এবং সীমান্ত পাহারার ভার এই জমিদারদের উপরই অর্পণ করেন। ছোটখাটো উৎপাত তাঁরাই সামলাবেন, বড় ধরনের ব্যাপার হলে সুলতানকে খবর দেবেন। আফসোস! এক্ষণে এই বেড়াতেই ক্ষেত খেতে শুরু করেছে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঘটনাটির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে রেজা খান এসেই জমিদারদের তলব দিলেন। কিন্তু জমিদারেরা একজনও তাঁর তলবে সাড়া দিলেন না। তাঁরা তাঁকে এড়িয়ে দূরে দূরে রইলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে রেজা খান এবার ঐ কোচ সেনাদের ঘাঁটির দিকে সৈন্য চালনা করলেন। তাঁর ধারণা ছিল,বাঙ্গালার ফৌজের উপস্থিতির খবর পেলেই কোচরাজ্যের সীমান্তরক্ষীরা তাঁদের অবৈধ ঘাঁটি উঠিয়ে নিয়ে নিজ এলাকায় সরে পড়বে। কিন্তু ধারণা তাঁর পাল্টে গেল। ঐ ঘাঁটির কাছে আসতেই সীমান্তরক্ষীরা বিপুল বিক্রমে তাঁর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে, শুরু হলো লড়াই। মুহূর্তেই সে লড়াই প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। রেজা খান আরো লক্ষ্য করলেন, ঐ জমিদারেরা তাঁর সাহায্যে তো এলেনই না, বরং আড়ালে থেকে ঐ দুশমনদেরই নানাভাবে মদদ যোগাতে লাগলেন। সীমান্তরক্ষীরা সংখ্যায় ছিল অনেক। সে তুলনায় রেজা খানের বাহিনী ক্ষুদ্র এক বাহিনী। তিনি আভ্যন্তরীণ গোলমাল বা বিদ্রোহ দমনে এসেছেন। বাইরের শক্তির সাথে কোন পূর্ণযুদ্ধের ইরাদা নিয়ে আসেননি। বাইরের রাজ্যে প্রবেশ করতেও আসেননি। এতে করে জমিদারদের ধারণা হলো, বাঙ্গালার ঐ ক্ষুদ্রবাহিনী কোচ সেনাদের সঙ্গে কিছুতেই এটে উঠতে পারবে না। এই ভরসায় তাঁরাও তাঁদের রক্ষী প্রহরী লেঠেল বাহিনী নিয়ে অদূরে তৈরি হয়ে রইলেন। রেজা খানের বাহিনীর মধ্যে বিপর্যয়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া মাত্রই তাঁরাও প্রকাশ্যভাবে কোচ বাহিনীর পক্ষে ময়দানে নেমে পড়বেন, এই মতলব নিয়ে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্যকথায়, সুবিধাবাদীর ভূমিকা নিয়ে তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁরা হতাশ হলেন। রেজা খানের অনন্য রণনৈপুণ্য ও সৈন্যচালনার অভূতপূর্ব কৌশলের সামনে ঐ সীমান্তরক্ষীরা অধিকক্ষণ টিকে থাকতে পারল না। অচিরেই তারা প্রচণ্ড মার খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং পড়িমরি করে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে লাগল। রেজা খানের সেপাইরা তাদের ধাওয়া করে ফিরতে লাগল। এই দেখে জমিদারেরা ভোল বদল করলেন। রেজা খানের পক্ষাবলম্বনের জন্যেই তাঁরা প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, এমনই একটা ভাব প্রদর্শন করতে লাগলেন।

ছত্রভঙ্গ দুশমনেরা অধিকাংশই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পালিয়ে গেল। অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে আটকে গেলেন সীমান্ত রক্ষীদের অধিনায়ক। নিজদেশে পলায়নের পথ না পেয়ে তাঁরা আত্মগোপনের স্থান খুঁজতে লাগলেন। ঐ জমিদারদের একজন গোপনে তাঁদের নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর বিশাল এক দেব মন্দিরের মধ্যে তাদের তুলে দিয়ে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সন্ধান পেয়ে রেজা খান স্বসৈন্যে এসে ঐ দেবমন্দির ঘিরে ফেললেন। জমিদারটি প্রথমে এখানে কেউ নেই বলে এবং পরে গোপনীয়তা ফাঁস

বইঘর.কম ও রোকন

হয়ে গেলে, ওরা কখন এসে ঢুকেছে তা তিনি জানেন না বলে, সাফাই গাইতে লাগলেন।

রেজা খান অবরুদ্ধ কোচ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান জানালেন। ভরসা দিলেন, আত্মসমর্পণ করলে তাঁদের জানের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং বাঙ্গালার সুলতানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে ক্ষমাও তাঁরা পেতে পারেন। কিন্তু ঐ অধিনায়ক এ আহ্বানে সাড়া দিলেন না বা মন্দিরের দ্বারও খুললেন না। ঐ জমিদারের পরামর্শে তিনি বুঝেছিলেন, দেবমন্দির নিরাপদ স্থান। বাঙ্গালার সুলতানেরা স্বাভবতঃই পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু। স্বেচ্ছায় দ্বার খুলে না দিলে, সুলতানের কোপ নজরে পড়ার ভয়ে বাঙ্গালার এই মুসলমান ফৌজ নিশ্চয়ই মন্দিরে প্রবেশ করবে না।

কিন্তু রেজা খান ছিলেন ভিন্নধাতের লোক। তাঁর এ জড়তা ছিল না। পুনঃপুনঃ আহ্বানে ফল না হওয়ায় তিনি সেপাইদের মন্দিরের দ্বার ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন। দেশের অভ্যন্তরে বহিঃশত্রু বিদ্যমান রেখে তিনি রাজধানীতে ফিরে যাওয়া সমীচীন বোধ করলেন না। সেপাইরা মন্দিরের দ্বার ভেঙে ফেললো। কিন্তু বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে ঐ বিদেশী ফৌজ তলোয়ার খুলে দাঁড়ালো। ফলে, মন্দিরের মধ্যেই শুরু হলো খণ্ড লড়াই। এতে করে মন্দিরের বিগ্রহপ্রভৃতি তছনছ হয়ে গেল। অনেক ধস্তাধস্তির পর বাঙ্গালার ফৌজ ঐখানে সীমান্তরক্ষীদের পাকড়াও করতে সমর্থ হলো। হত্যা না করে রেজা খান তাদের কয়েদ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রেজা খান দুশমনদের আশ্রয়দানকারী ঐ জমিদারটিকেও কয়েদ করলেন। অন্যান্য জমিদারদের, কেন তাঁদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হবে না, এই মর্মে বাঙ্গালার হযরত-ই-আলার কাছে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনের পরোয়ানা জারি করে কয়েদীদের নিয়ে তাণ্ডায় ফিরে এলেন।

রেজা খান কয়েদীদের এনে কয়েদখানায় ঢোকালেন সকালে। বিকেলেই রাজধানীতে ঢল নামলো মানুষের। অন্যান্য জমিদারেরা নিজেদের অপরাধ চাপা দিয়ে জমিদারি রক্ষা করার মতলবে বিপুল সংখ্যক প্রজামণ্ডলী সহকারে রেজা খানের বিরুদ্ধে জুলুমের আওয়াজ দিতে দিতে রাজধানীতে এসে হাজির হলেন। তাঁরা ধুয়া তুললেন, অন্যায় ও ইচ্ছাকৃতভাবে কালাপাহাড় মিয়াঁ মুহাম্মাদ ফারমুলীর অনুকরণে সেনাপতি রেজা খান তাঁদের তামাম দেবমন্দির ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। হযরত-ই-আলার একান্ত অনুগত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রচণ্ডতম আঘাত হেনেছেন রেজা খান। বাঙ্গালা মুলুকে তিনি একজন বিগ্রহ বিদ্বেষী কালাপাহাড়। বিধর্মীদের দীলে তিনি আতংকের পয়দা করেছেন। হযরত-ই-আলার কাছে তাঁরা এর বিচার ও বিহিত চান।

দিল্লীর সুলতান বাহলুল লোদীর ভাগিনেয় মিয়াঁ মুহাম্মদ ফারমুলী একজন কঠোর বিগ্রহ বিদ্বেষী ছিলেন। কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কারণে নয়, ব্যক্তিগত খেয়ালে

বইঘর.কম ও রোকন
ও অন্ধ আক্রোশে বিগ্রহ ধ্বংসের প্রচণ্ড এক নেশায় তিনি উন্মাদ হয়ে উঠেন এবং ক্ষ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বিগ্রহ ধ্বংস করে বেড়ান। প্রশাসনিক বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে মূর্তি বিগ্রহ দেখলেই পাহাড়ের মতো অটল সংকল্প নিয়ে তিনি তার উপর পাহাড় ভেঙে পড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং বিগ্রহ ভেঙে চুরমার করতেন। আতঙ্কিত হিন্দুকুল তাঁর ঐ দুর্দান্ত আচরণের জন্যে তাকে কালাপাহাড় নামে আখ্যায়িত করেন এবং তাঁকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসে দিল্লীর সুলতানকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। রেজা খানকেও ঐ রকম কালাপাহাড় নামে আখ্যায়িত করে জমিদারগণ তার বিহিত দাবি করলেন।

রেজা খানের কাছে এই জমিদারদের বেঈমানীর কথা হযরত-ই-আলা ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন। কিন্তু রেজা খানের এই আচরণের খবর তিনি জানতেন না। ফলে, তখনই তিনি রেজা খানকে তলব দিলেন। রেজা খান এসে হাজির হলে, হযরত-ই- আলা তাঁকে সরাসরি বললেন—সালার রেজা খানকে আমি বিদ্রোহ দমন করার জন্যে ঐ অঞ্চলে পাঠিয়েছিলাম। মন্দির-বিগ্রহ ধ্বংস করতে পাঠাইনি। বিদ্রোহ দমন করার সাথে উনি এ কাজটিও করবেন, এটা আমি চিন্তা করতে পারছিনে!

রেজা খান ঘটনাটা আঁচ করতে পারলেন। উনি বিনীত কণ্ঠে বললেন—জনাব!

হযরত-ই-আলা প্রশ্ন করলেন—ওখানে কি কোন বিগ্রহ ভেঙে এসেছেন আপনি বা আপনারা?

রেজা খান বললেন—জি জনাব। বিগ্রহ কিছু ভাঙা পড়েছে ওখানে।

হরত-ই-আলা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—তাজ্জব! যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মুসলমান আঘাত হানবে, এ শিক্ষা কোথায় পেলেন আপনি? তাদের হেফাজত করা, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে চলতে দেয়া ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান। পরধর্মের প্রতি ইসলামের সহিষ্ণুতার দিকটা এখনও পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেননি?

ঃ তা জরুর পেরেছি জনাব। স্বেচ্ছায় কোন মন্দির বিগ্রহ আমি বা আমরা ভাঙিনি। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই ভাঙা পড়েছে ওগুলো।

ঃ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই ও এলাকার তামাম বিগ্রহ ভাঙা পড়লো?

রেজা খান সবিস্ময়ে বললেন—ও এলাকার তামাম বিগ্রহ!

কথার মাঝেই উপস্থিত জমিদারদের একজন বলে উঠলেন—তামাম বিগ্রহ হুজুর, সমুদয় বিগ্রহ। ও অঞ্চলের একটা বিগ্রহও অভগ্ন রেখে উনি আসেননি। অকারণেই সবগুলো চুরমার করে এসেছেন। এই যে এই বিশাল জনতা দেখছেন হুজুর, এরা সবাই ও অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ নিরীহ অধিবাসী। বিষয়টি এদের অন্তরে চরমভাবে লেগেছে বলেই এরা নিজ গরজে প্রতিবাদ করতে এসেছে। এরা সবাই এ ঘটনার সাক্ষী।

বইঘর.কম ও রোকন

উপস্থিত জনতার প্রতি হযরত-ই-আলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জমিদারটি ফের জনতার উদ্দেশ্যে বললেন—আপনারা বলুন, আমার কথা সত্য কিনা?

উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠলো—সত্য-সত্য, দিনের মতো সত্য। আমাদের ও অঞ্চলের প্রচুর বিগ্রহ ভাঙা পড়েছে হুজুর।

হযরত-ই-আলা তাদের প্রশ্ন করলেন—প্রচুর বিগ্রহ?

জনতার পক্ষ থেকে এবার এক নেতৃস্থানীয় লোক বললেন—প্রচুর হুজুর। আশেপাশের কোন মন্দিরেই বিগ্রহ আর অক্ষত নেই।

ঃ প্রমাণ করতে পারবেন? এখনই যদি তদন্তে পাঠাই কাউকে, তাকে তা দেখাতে পারবেন?

ঃ দেখাতে পারবো কি হুজুর? দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে বা আমাদের সবাইকে এখানে বেঁধে রেখে যে কাউকে পাঠানো হোক, গেলে তিনি নিজেই দেখতে পাবেন, সর্বত্রই ভাঙ্গা বিগ্রহ। একটা হোক দুটো হোক, সব মন্দিরেই ভাঙা বিগ্রহ আছে।

হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এতবড় প্রত্যয় সম্পন্ন নির্ভীক উক্তি তিনি অবিশ্বাস করতে পারলেন না। ওদিকে আবার রেজা খানও যে মিথ্যা কথা বলার লোক নন, তা তিনি জানেন। গোলকধাঁধায় পড়ে তিনি বললেন—রেজা খান সাহেব?

রেজা খান বললেন—মিথ্যা জনাব। এটা নির্ঘাৎ একটা ষড়যন্ত্র। একটা মন্দিরের বিগ্রহ তছনছ হয়েছে ঠিক, কিন্তু অন্য কোথাও কোন বিগ্রহের খবর আমি জানিও না, বা সে সব ভাঙতে আমি যাইওনি।

অন্য আর এক জমিদার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বললেন—একশো বার উনি গিয়েছেন জনাব। আমরা তো বলছিই, আমাদের বেঁধে রেখে এখনই তদন্ত করা হোক। আমাদের কথা মিথ্যা হলে, আমরা মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে রাজী আছি।

হযরত-ই-আলা বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—একি অসম্ভব কথা বলছেন আপনারা!

বক্তা জমিদারটি বললেন—এতে বিস্মিত হওয়ার তো কিছুই নেই জনাব। অতীতে অনেক বিগ্রহ ধ্বংস করেছেন উনি। শুনেছি এক কালে বিগ্রহ ধ্বংস করাই ছিল উনার একমাত্র কাজ। জনাবও এ খবর নিশ্চয়ই রাখেন। নেশা যার বিগ্রহ ধ্বংস করা, তিনি বিগ্রহ ধ্বংস করবেন,এটা তো তাজ্জব কিছুই নয় জাঁহাপনা?

হতবুদ্ধি অবস্থায় হযরত-ই-আলা রেজা খানের মুখের দিকে তাকালেন এবং এরপর বললেন—আপনি নিজেও তো স্বীকার করছেন, ভাঙা হয়েছে কিছু বিগ্রহ?

রেজা খান বললেন—ভাঙা হয়নি জনাব, ভাঙা পড়েছে। একটা মন্দিরের বিগ্রহ তামামই ভাঙা পড়েছে। তবে কিভাবে তা ভাঙা পড়েছে, সে কাহিনী শুনলেই জনাবের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বইঘর.কম ও রোকন

—বলেই তিনি কোচরাজ্যের সীমান্তরক্ষীদের মন্দিরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা থেকে তাদের কয়েদ করা পর্যন্ত তামাম ঘটনা হযরত-ই-আলাকে বয়ান করে শোনালেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই, জমিদারেরা কয়েকজন একসাথে বলে উঠলেন—মিথ্যা, মিথ্যা কথা হুজুর। একদম তৈরি করা গল্প। এমন কোন ঘটনাই ওখানে ঘটেনি। মন্দিরের মধ্যে লড়াই, এ একটা নিছক আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

রেজা খানের রাগ হলো। হযরত-ই—আলার এযাযৎ নিয়ে তিনি বললেন—আষাঢ়ে গল্প?

তাঁরা বললেন—একদম-একদম।

রেজা খান বললেন—এ কথা আপনাদের মুখেই শোভা পায়। বিদেশের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার জন্য যাঁরা তৎপর হয়ে আছেন, বিদেশী ফৌজ এনে যাঁরা নিজ এলাকায় লালন করছেন, তাদেঁর মুখে সব কিছুই শোভা পায়।

এর জবাবে জমিদারদের একজন তৎক্ষণাৎ বললেন—বিদেশী ফৌজ এনে লালন করা মানে? কোথায় তা করলাম আমরা?

ঃ কোথায় করলেন তা আপনারা জানেন না? কোচরাজ্যের সেনাবাহিনী যে আমাদের উপর চড়াও হলো, তাদের সাথে যে আমাদের লড়াই হলো, তা কি কোচরাজ্যে, না আপনাদের এলাকায়?

ঃ ওসব সৈন্যের খবর আমরা কি জানি? কখন যে ওরা চুপি চুপি হঠাৎ এসে ঢুকে পড়েছে ওখানে, আমরা কি তা টের পেয়েছি? টের পেলে আর ঢুকতে পারে ওরা?

ঃ সাব্বাস্! বিপুল সংখ্যক কোচ সেনা আপনাদের এলাকায় এসে প্রকাশ্যে ঘাঁটি খুলে বসে রইলো, আর আপনারা বলছেন, চুপি চুপি হঠাৎ এসেছে ওরা?

ঃ অসম্ভব। আমাদের এলাকায় কখনো ওরা ঘাঁটি খোলেনি জনাব!

রেজা খান এবার হযরত-ই-আলাকে অনুরোধ করে বললেন—আর আমার তর্ক করার রুচি নেই জাঁহাপনা। কয়েদী কোচবাহিনীর অধিনায়ককে এখানে হাজির করে জনাব তাঁর কাছেই এবার তামাম ঘটনা যাচাই করে দেখতে পারেন।

হযরত-ই-আলা তাই করলেন। কাউকে কোন কথা বলতে বা ইঙ্গিত দিতে কড়া ভাষায় নিষেধ করে কোচবাহিনীর অধিনায়ককে তিনি তখনই এনে হাজির করালেন। অধিনায়ক এসে হাজির হলে হযরত-ই-আলা অধিনায়ককে বললেন—আপনি যে গুরু অপরাধে অপরাধী তা নিজেও বুঝতে পারছেন। আপনার বিচারের আগে কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে করব আমি। এর সঠিক জবাব পেলে আপনার প্রতি সদয় হওয়ার অবকাশ থাকবে আমার। মিথ্যা বললে, আপনার প্রাণদণ্ডের আদেশ আমি আগেই দিয়ে রাখলাম, ওটা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা হবে।

অধিনায়কটি একজন আদি কোচ। অর্থাৎ ঐ কোচ উপজাতির পাহাড়ী জগত থেকে সদ্য আগত ব্যক্তি। তাঁর সেই অকৃত্রিম আদিম আচরণ পরিহার করে সভ্যতার মেকী আচরণ এখনও তিনি পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেন নি। হযরত-ই-আলার কথার জবাবে তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বললেন—জাঁহাপনা ইতিমধ্যেই জেনেছেন আমি একজন অধিনায়ক। কয়েদ হয়েছি বলেই অধিনায়ক মিথ্যা কথা বলবে, এ কখনও হয় না। কথা আমার বিশ্বাস করা না করা বা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া না দেয়া জনাবের অভিরুচি। ও নিয়ে আমার পরোয়া নেই।

হযরত-ই-আলা বললেন—সাব্বাস্!

অধিনায়কটি ফের সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—তবে সব কথার উত্তর যে আমি দেবো, এ অঙ্গীকার আমি করবো না। সম্ভবপর প্রশ্নগুলিরই উত্তর দেবো শুধু।

হযরত-ই-আলা বললেন—বেশ, তাই দিন। কতদিন ধরে বাঙ্গালা মুলুকের ভেতরে আপনারা ছিলেন?

ঃ তা অনেকদিনই হবে এইটুকু বলতে পারি। সঠিক দিন মাস হিসেব করতে সময় লাগবে।

ঃ এই যে অনেকদিন ছিলেন আপনারা, তা কি লুকিয়ে পালিয়ে ছিলেন?

ঃ কার ভয়ে? আমরা কাপুরুষ নই। লুকিয়ে পালিয়ে থাকার জন্যে আমরা বাঙ্গালা মুলুকে আসিনি। প্রকাশ্যে ঘাঁটি গেড়ে সিনা টান করে থেকেছি। লড়াইয়ে হেরে না গেলে এখনও তাই থাকতাম।

ঃ সত্যি?

ঃ বিলকুল। আমরা যে ওখানে ঘাঁটি খুলেছিলাম, জনাবের সেপাইসালার তা স্বচক্ষে দেখেছেন।

ঃ ওখানকার জমিদারেরা?

ঃ তামাম লোকই দেখেছেন।

ঃ জমিদারেরা এর কোন প্রতিবাদ করেননি?

ঃ একটু থেমে অধিনায়কটি বললেন—এ প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না।

ঃ কারণ?

ঃ এটা আমাদের রাজনৈতিক দিক।

হুঁ! আমার আর একটা কথার জবাব দিন। আমার সেপাইরা আপনাদের কোথায় কয়েদ করেছেন?

www.boighar.com

ঃ ওখানকারই এক জমিদারের দেব মন্দিরে।

দেব মন্দিরে গেলেন কেন আপনারা?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমাদের আত্মগোপনের প্রয়োজন ছিল।

ঃ মন্দিরের খোঁজ পেলেন কি করে?

ঃ এ প্রশ্নেরও জবাব আমি দেবো না।

ঃ ভাল। তা ওখানেও কি লড়াই করেছেন আপনারা!

ঃ অবশ্যই। হাতে তলোয়ার থাকতে কোন বীরই স্বেচ্ছায় কয়েদ হতে চায় না।

ঃ মন্দিরের বিগ্রহ-আদি ভাঙা পড়েছে তাহলে?

ঃ অবশ্যই পড়েছে।

ঃ কে ভেঙেছে বিগ্রহ?

ঃ তা কি করে বলা সম্ভব? লড়াইয়ের হুটোপাটির মাঝেই ভেঙে গেছে বিগ্রহগুলো। আমরা আর আমাদের প্রতিপক্ষেরা সবাই আমরা ভেঙেছি। কে বা কার দ্বারা ভাঙা পড়লো ওগুলো, সে হদিস সঠিকভাবে কারও দেয়া সম্ভব নয়।

ঃ আমি আবার বলি, সাব্বাস্!

ঃ জাঁহাপনা!

www.boighar.com

ঃ হযরত-ই-আলা নড়েচড়ে বললেন—এবার আপনার বিচার। আপনার অপরাধের শাস্তি অবশ্যই আপনার প্রাপ্য। সেই সাথে আপনার সততার আর বীরোচিত আচরণের পুরস্কারও আপনার প্রাপ্য। আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীদের সবাইকে আমি সসম্মানে মুক্তি দিলাম। আপনারা স্বমুলুকে যাত্রা করুন।

বিমুগ্ধ অধিনায়কের মুখ থেকে এই প্রেক্ষিতে শুধু একটা কথাই বেরুলো—জাঁহাপনা জরুর এক দেউতা আদমী!

হযরত-ই-আলার ইঙ্গিতে অধিনায়ক সহকারে কারারক্ষী বিদায় হলো। হযরত-ই-আলা এবার তাঁর সান্ত্রিদের লক্ষ্য করে বললেন—এই জমিদার কয়জনকে কয়েদ কর—এক্ষুণি।

জমিদারেরা আর্তনাদ করে উঠলেন। হযরত-ই-আলা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সান্ত্রিরা জমিদারদের কয়েদ করলে, হযরত-ই-আলা ফের বললেন—কয়েদখানায় নিয়ে যাও—

জমিদারেরা আর্তকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। হযরত-ই-আলা এর জবাবে শক্ত কণ্ঠে বললেন—ক্ষমা শাস্তি এখন নয়, বিচারের পর।

সান্ত্রিরা জমিদারদের কয়েদখানায় নিয়ে গেল। ভয়ে ও আতঙ্কে উপস্থিত জনতা নিঃশ্চুপ হয়ে রইলো। হযরত-ই-আলা এবার তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—আপনাদের কথার সত্যতা যাচাইয়ের পালা এখন।

সঙ্গে সঙ্গে জনতা আর্তকণ্ঠে আওয়াজ দিলো—আমরা নির্দোষ হুজুর, আমরা নির্দোষ!

বইঘর.কম ও রোকন

হযরত-ই-আলা বললেন—দোষ-ত্রুটির কথা নয়। আপনারা যা বললেন, তা এখন তদন্ত করে দেখতে হবে আমাকে।

জনতার মধ্যে থেকে কয়েকজন মাতব্বর শ্রেণীর লোক হাতজোড় করে বলে উঠলেন—তদন্তের আর প্রয়োজন নেই হুজুর। ঐ একটা মন্দিরের বিগ্রহ ছাড়া ওখানে আর কোন বিগ্রহ ভাঙা এখনও হয়নি। তবে ভাঙার ব্যবস্থা করে রেখেই উনারা এখানে এসেছে। লোক লাগিয়ে রেখেছেন, তদন্তে কেউ রওনা হলেই আসল বিগ্রহ সরিয়ে রেখে কিছু বাতিল ও ফালতু মূর্তি ভাঙা হবে। তদন্তে কেউ গেলে ভাঙা বিগ্রহই দেখতে পাবেন।

ঃ তাজ্জব। তারা তা করবেন কেন?

ঃ স্বার্থের খাতিরে হুজুর। তাঁদের জমিদারিগুলো বাজেয়াপ্ত যাতে না হয়, সেইজন্যে। হুজুরের-সালার সেপাইদের ঘাড়ে এই মারাত্মক দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের অপরাধগুলো ধামাচাপা দেয়ার জন্যে।

ঃ বলেন কি!

ঐ ভাবেই জোড়হাতে মাতব্বরেরা বললেন—আমাদের কসুর নেবেন না হুজুর। আমরা ঐ জমিদারদের প্রজা। জমিদারদের ভয়ে আর প্রলোভনে পড়ে আমরা তাঁদের সাথে এসেছি হুজুর। তাঁদেরই শেখানো কথায় সায় দিয়েছি।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ জমিদারেরা এ জন্যে আমাদের এক বছরের খাজনা মওকুফ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। অন্যথা করলে শাস্তিরও হুমকি দিয়েছেন হুজুর। আমরা নিরুপায়। আমাদের কোন দোষ নেই।

ঃ বটে!

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ আপনাদের ভয় নেই। এখন থেকে আপনারা আর ওদের প্রজা নন; সরাসরি আমার প্রজা।

হযরত-ই-আলা অতঃপর রাজস্ব উজিরকে ডেকে এনে ঐ জমিদারদের জমিদারী বিলুপ্ত করে ওদের তামাম জমি খাস খতিয়ানে নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং জনতাকে ঘরে ফেরার নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। রেজা খান ঐভাবে তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর উপর নজর পড়তেই হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী খোশদীলে হেসে বললেন-সাব্বাস্ কালাপাহাড়, সাব্বাস্!

সেদিনটা কেটে গেল। পরের দিন দুপুরতক্ সহকারী সালার রেজা খান তার নয়া দপ্তর ও অবস্থান গুছিয়ে নেয়ার মধ্যেই আটকে রইলেন। জোহরের নামায আদায় করতে এসে দেখলেন, তাঁর কালাপাহাড় নামটা ইতিমধ্যেই অনেকখানি মজবুত হয়ে গেছে।

বইঘর.কম ও রোকন

জামাতে শামিল হয়ে নামাজ আদায় করার পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণে এসে নামতেই "খোশ আমদেদ কালাপাহাড়, খোশ আমদেদ"—বলে তাঁর খায় খাতিরের সহকর্মীরা অনেকেই উৎফুল্লচিত্তে ঘিরে ধরলেন তাঁকে। তাঁদের একজন বললেন—সাব্বাস ভাই সাহেব! একেই বলে নসীব!

রেজা খান বললেন—কি রকম?

জবাবে ঐ সহকর্মীটি বললেন—আপনার খোশ কিস্‌মতির জোরে রাতারাতি আপনি এখন এক মশহুর আদমী। একটা বাচ্চার কাছেও আপনি এখন এক পরিচিত ব্যক্তি।

রেজা খান ফের হাসিমুখে বললেন—কিসে? আমার এই নয়া পদবীর বরকতে? মানে সহকারী সালারের পদ পাওয়ার জন্যে?

ঃ আরে দূর-দূর! ওটা আবার একটা পরিচয় নাকি? অমন সহকারী সালার দেশে হাজারটা আছে। কারণটা আপনার ঐ পদ নয়, আপনার নয়া ঐ নামটা।

ঃ কেমন?

ঃ আচ্ছা একটা সালারকে চেনাতেও অনেক হদিস তথ্য দিতে হয়। কিন্তু আপনাকে চিনতে এখন কারো কোন তকলিফ নেই। কালাপাহাড় বললেই ব্যস্‌! এক ডাকে আপনাকে এখন চিনে ফেলছে সবাই।

ঃ তাহলে আর খোশনসীব বলছেন কেন? ওটা তো আমার বদনসীব।

অন্য একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—কভ্‌ভি নেহি। আপনার তারিফে গোটা শহরটাই এখন গরম। সবাই বলছে, খান সাহেবকে যে নামটা দেয়ার জন্যে ঐ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এত বিগ্রহ কোরবান করতে উদ্যোগী হলেন, সে নামটা কি উড়িয়ে দিলে হচ্ছে? আমরা ঐ খান সাহেবকে এখন থেকে কালাপাহাড়ই বলবো। একটা স্মৃতি থাক ওদের ঐ ভণ্ডামির পেছনে।

ঃ কি রকম?

ঃ স্বার্থ হাসিলের খাতিরে ওরা যখন ওদের বিগ্রহ্ নিয়ে এমন খেলাও খেলতে উদ্যত হয়, তখন আসলেই যে ওসব খেলার পুতুল, এটা ওরাই প্রমাণ করেছে। তাই সবাই বলছে, ওদের ঐ খেলার একটা দলিল থাক খান সাহেবের ঐ নামের মধ্যে। কালাপাহাড় বললেই সবার দীলে উঁকি দেবে খান সাহেবের ঐ নামকরণের নেপথ্য কাহিনীটা।

ঃ আচ্ছা।

ঃ শুনেছি, ইসলাম কবুলের আগে ভাই সাহেব অনেক বিগ্রহই ভেঙেছেন। তখন তিনি এ নামটি কিন্তু পাননি। ইসলাম কবুলের পর আজ না ভেঙেও ছাপ্‌পড় ফেড়ে

পেয়ে গেলেন নামটা। মুসলমানদের প্রতি আপনার পূর্বেকার স্বজাতিদের কি মুহাব্বত দেখুন!

ঃ তা বটে—তা বটে!

ঃ নামটার মধ্যে একটা বাহাদুর বাহাদুর খোশ্‌বু আছে। তাই, আমরাও ভাই সাহেবকে এখন থেকে এই নামেই ডাকতে চাই। আপত্তি আছে কি কিছু?

ঃ মোটেই না, মোটেই না। কত নামই তো কতজন আমাকে দিলেন। কালাচাঁদ, রাজা, রাজু, চাঁদ খান, রেজা খান—আরো কত কি! আর একটা যোগ হলে ক্ষতি কি?

রেজা খান হাসতে লাগলেন। সকলেই আওয়াজ দিলেন—বহুৎ আচ্ছা- বহুৎ আচ্ছা।

অতঃপর রেজা খানকে আর একদফা মোবারকবাদ জানিয়ে তাঁরা সবাই নিজ নিজ দপ্তরের দিকে রওনা হলেন। সহকর্মীরা বিদায় হতেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন শাহজাদা দাউদ খান। রেজা খানকে সামনে পেয়েই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন—এই যে চাচা, আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার সাথে সেই থেকে পাত্তাই লাগাতে পারছিনে। লড়াই থেকে এলেন তো লড়াইটাকে সাথে করে বেঁধে নিয়েই এলেন। নিরিবিলিতে পাওয়াই যাচ্ছেনা আপনাকে।

রেজা খান সালামের জনাব সাথে সাথেই দিয়েছিলেন। এবার তিনি খোশদীলে বললেন-তা ঠিক—তা ঠিক। ফিরে এসে আপনার সাথে যোগাযোগ করার কোন মওকাই আমি পাচ্ছিনে।

ঃ তা পাবেন কি করে? একটা গরম খবর দীলে নিয়ে আপনার এন্তেজারে দাপাদাপি করছি আমি, আর আপনি আপনার খেতাব বদল করার মধ্যেই মত্ত হয়ে আছেন।

রেজা খান হেসে বললেন-খেতাব বদল!

ঃ বিলকুল। ছিলেন ফৌজদার। লড়াইয়ে গেলেন সহকারী সালার হয়ে। ফিরে এলেন কালাপাহাড় খেতাব নিয়ে। কি যে সব কাণ্ড!

ঃ শাহজাদা কি নাখোশ হয়েছেন তাতে?

ঃ জরুর নেহি-জরুর নেহি। যো আপ্‌ছে আপ্‌ আতা হ্যায়, উয়ো হালাল হ্যায়।

ঃ কেয়া মতলব?

ঃ ঐ কালাপাহাড়। আগের ঐসব ফালতু নাম-ইসম্‌ নর্দমায় ফিঁকে দিন চাচা। এই মর্দানা মাফিক কালাপাহাড় নামটাই জব্বর মানায় আপনাকে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ শাহজাদা!

ঃ কালাই হোক আর ধলাই হোক, আসলেই তো আপনি একটা পাহাড়। আপনাকে টলায় সাধ্যি কার।

ঃ আচ্ছা। তা গরম না কি একটা খবরের কথা শাহজাদা বললেন–

ঃ হ্যাঁ। খবরটা এতদিন গরমই ছিল। কিন্তু আপনাদের এইসব যারপর নেই গরম খবরের পাশে ওটা এখন ঠাণ্ডা একটা খবর।

ঃ খবরটা কি রাজধানীর?

ঃ জি না চাচা। বিলকুল আলাদা খবর। আলাদা এক ঘটনা।

ঃ আলাদা এক ঘটনা! কোথায় ঘটলো সে ঘটনা?

ঃ ঐ দরিয়া কা পাস্।

ঃ দরিয়া কা পাস্।

ঃ বস্তির ঐ বজরাঘাটে।

ঃ কেয়া গজব! দুস্‌রা কুয়ী তুফান?

ঃ জি চাচা, খুব্-সুরাতের তুফান।

ঃ কেয়াবাত!

রেজা খান পুলকিত হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন মুরুব্বি সহ শাহজাদা বায়াজিদ খান রেজা খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, শাহজাদা দাউদ খান অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—বাকিটুকু পরে চাচা। আল্লাহ হাফেজ —

দৌলতজাহান আর ফিরোজাবানুদের মকান দু'টি পাশাপাশি মকান। একটি বাহির আঙ্গিনার এ মাথায় আর ও মাথায়। ওয়ালেদের মকান থেকে ফিরে এসেই ফিরোজাবানু দৌলতজাহানের ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন । বললেন-নাও, এবার ঠ্যালা সামলাও । নিঁদ্-ঘুম তো গেছে সব!

দৌলতজাহান সবিস্ময়ে বললেন -নিঁদ্-ঘুম গেল মানে? কার নিঁদ্-ঘুম গেল?

ঃ কার আবার ? তোমার। যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকুও খোলাসা করে দিয়েছি। এখন খোয়াব দেখো বসে বসে।

ঃ এসেই ফের হেঁয়ালী শুরু করলে? কিসের নিঁদ্-ঘুম, কিসের খোয়াব?

ঃ আহা! যেন দুধের বাচ্চা! ভাজা মাছটি উল্টিয়ে খেতে শেখেনি। ভাই তোমার মিথ্যা কথা বলেননি দেখছি। ঐ শাহজাদার সত্যিই তো বোরখা পরে বাইরে বেরোনো

বইঘর.কম ও রোকন

উচিত। হায় সর্বনাশ! একি চেহারা লো! আউরতদের মাথাগুলোতো সত্যিই ঠিক থাকার কথা নয়?

দৌলতজাহান প্রসঙ্গটা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে কপট গাম্ভীর্য নিয়ে ক্ষণকাল নীরব হয়ে রইলেন। এরপর বললেন–হুঁ! ভাইজানের নসীবটা তাহলে পুড়লো।

ঃ পুড়লো মানে?

ঃ শাহাজাদার রূপ দেখে ভাবী যে রকম দিউয়ানা হয়ে উঠেছেন, তাতে তো ভাইজানের এখন আয়ান ঘোষের অবস্থা। ভাবীকে ঠেকানোর জন্যে তাঁকে তো এখন বাঁশ হাতে হরওয়াক্ত কদমলায় ছুটতে হবে।

ঃ বটে! মশ্‌করা করছো?

ঃ মশ্‌করা করবো কেন? এসেই তুমি শাহজাদার রূপ-সুরাত নিয়ে যে রকম লাফালাফি শুরু করেছো, তাতে তো দেখছি, ঐ বিয়ে বাড়িতে গিয়ে তুমি বিয়ে-শাদি কিছুই দেখোনি। বসে বসে ঐ শাহাজাদারই ধ্যান করেছ কেবল।

ঃ বটে!

ঃ গলায় দড়ি দাও গে ভাবী। জোয়ান তাজা খসম ঘরে থাকতে পর পুরুষের রূপ দেখে যার মন টলে, তার গলায় দড়ি দেয়াই উচিত।

কপট রোষে ফুঁসে উঠে ফিরোজাবানু বললেন–তবে রে হতচ্ছাড়ী! আমি কি তোমার মতো লা-ওয়ারিশ আউরত, না একা ঘরে শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণে রাত কাটাই? আমার মন টলতে যাবে কোন দুঃখে?

ঃ তাহলে আর শাহাজাদার রূপ নিয়ে এত ছটফট করছো কেন?

ঃ তোমার জন্যে। গুণের পরিচয় আগেই দিয়ে রেখেছো, এবার রূপখানাও দেখিয়ে দিলে। এরপরও কাজ না হলে, গলায় গড়ি দেয়ার গরজ তো তোমারই!

ঃ ভাবী।

ঃ মাথাটা যে তোমার আগেই বিগ্‌ড়ে গেছে, সে তো আমি দেখেই গেছি। ঐ সুরাত দেখার পর কতবার যে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেছো তুমি, ঘুম যে হয়নি কত রাত, তা আর কসরত করে বুঝতে হবে না আমাকে। তুমি তো মরেছোই, শাহজাহাদাটাকেও মেরে দিলে তার উপর। ব্যাপারটা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, ভেবে দেখো?

ঃ তো আর কি! এখন তাহলে আমাকে তুমি সাজিয়ে পরিয়ে দাও। পঙক্ষীরাজ ঘোড়া নিয়ে টগ্‌বগ্‌-টগ্‌বগ্ করে শাহাজাদা যে কোনো সময় এসে পড়তে পারেন।

ঃ তা পারেনই তো।

মুখঝাম্‌টা মেরে দৌলতজাহান বললেন–এলে তোমার জন্যেই আসবেন, আমার জন্যে নয়। তোমার মতো এত পাগল তাঁর জন্যে আমি হইনি।

বইঘর.কম ও রোকন

ফিরোজাবানুও তেরিয়া হয়ে উঠে বললেন– আমার জন্যে? আমার জন্যেই বুঝি উনি ঐ বিরাণঘাটে সারাবেলা বসেছিলেন? প্রাসাদ কানন-রংমহল, তামাম কিছু ফেলে বস্তির ঐ বজরা ঘাটে এসে আমার ধ্যানেই মগ্ন ছিলেন বুঝি উনি?

ঃ তোমার নয়তো কার ধ্যানে?

ঃ তোমার ধ্যানে। বজরা ভেড়ানো নিয়ে ঐ ঘাটে পহেলী পেয়ার আমার সাথে হয়নি তাঁর,হয়েছে তোমার সাথেই।

ঃ পেয়ার হয়েছে আমার সাথে?

ঃ নইলে কি উনি হাওয়া খেতে ঐ ঘাটে এসে বসেছিলেন একা একা?

ঃ তা হাওয়া খেতে আসাটা কি নিষেধ আছে কারো, না নদীর তীরে আসেনা কেউ হাওয়া খেতে?

ঃ নদীর তীর বলতে কি কেবল ঐ বস্তির আধ্-নোংরা ঘাটখানা? এতবড় নদীর তীরে এর চেয়ে কি আর কোন মনোরম স্থান নেই? কিসের টানে এই স্থানটাই বেছে নিলেন উনি?

ঃ কিসের টানে?

ঃ তোমার টানে। আমি হলপ করে বলতে পারি, ঐ শাহজাদা তোমার টানেই এসেছিলেন। সেই টান তাঁর হাজারগুণে বাড়িয়ে দিলে আবার। আর রক্ষে আছে?

ঃ আহারে খোয়াব! আমাকে উনি চেনেন না, জানেন না, অথচ মুখ দেখলেন আর অমনি বুঝে নিলেন, আমিই সেই ঝগড়া করা মেয়েটি। তোমার মতো বাতিকগ্রস্তা আউরত না হলে এমনটি কখনো ভাবা যায় না।

ঃ যায়—যায়। দীলে দীল পাতা থাকলে তামামই বোঝা যায়। উনি ঠিকই বুঝেছেন।

ঃ সর্বনাশ! এটাতো বিলকুলই বিগড়ে গেছে! একে তো আর সামলানো যাবে না!

ঃ আমাকে সামলাবে কি? নিজেকে আগে সামলাও। মশা হয়ে হাতির মন কাড়তে গেছো। গরীবের ঘরে হাতির পাঁড়া পড়ার যে ঠ্যালাটা কি, দুদিন অপেক্ষা করো, হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

ঃ ভাবী!

ঃ তুমি মরেছো।

দৌলতজাহান এবার কৌতুক করে বললেন–তাই যদি বলো ভাবী, মরলে তাহলে হাতির পায়ের তলে পড়েই মরা ভাল। তোমাদের মতো আজ্ঞাবাহী নিরীহ প্রাণীর পায়ের তলে জান দিয়ে সুখ নেই।

দুই চোখ কপালে তুলে ফিরোজাবানু বললেন–ওম্মা! তলে তলে পুলকটাও জিয়াদাই আছে দেখছি!

ঃ থাকবেই তো। আমি তো লা-ওয়ারিশ। কড়িকাঠ গুণে রাত কাটাই। আমার পুলক থাকাটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার এত পুলক কিসের শুনি? তুমি কি লা-ওয়ারিশ?

ঃ লা-ওয়ারিশ!

ঃ পুলকটা অধিক হলে, লা-ওয়ারিশ হও আগে। খামাখা অরণ্যে কেঁদে লাভ নেই।

ঃ তাই?

ঃ লা-ওয়ারিশ হওয়ার আরজটা আগে খসমের কাছে পেশ করো। তিনি তা মঞ্জুর করলে–

ফিরোজাবানু কপট খেদে বললেন–থাক বোন, ও পুলক সবটুকু একাই তোমার থাক। আমার নসীব কি এতটা শানদার যে, আরজ আমার মঞ্জুর হবে কখনো?

–"মঞ্জুর–মঞ্জুর, এক কথায় মঞ্জুর। আমাকে তুমি কি ঠাওরাও? মানুষের মন-মেজাজ বুঝে চলতে শিখিনি আমি?"–

বলতে বলতে ফিরোজাবানুর খসম সামানরক্ষী মাসুম গজনবী এসে দৌলতজাহানদের এক ঘরের পাশে বাহির আঙ্গিনায় দাঁড়ালেন। দৌলতেরা এই ঘরের মধ্যেই আলাপ-ঠাট্রা করছিলেন। গজনবী সাহেবের কথা শুনে প্রথম ধাক্কায় উভয়েই ভড়কে গেলেন। ফিরোজাবানু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি বলছেন আপনি!

গজনবী সাহেব বললেন—আরজ তোমার মঞ্জুর। যে খাহেশ দীলে নিয়ে উতলা হয়ে আছো তুমি, সেটা কি আর মঞ্জুর না হয়ে পারে? আর তোমাকে বস্তির এই ভাঙা মকানে পড়ে থাকতে হবে না। ঠাঁই এবার প্রাসাদে।

দৌলতেরা হতবাক। গজনবীর গলা শুনে দৌলতের আম্মা দিনারবানু অন্দর থেকে দেউরিতে এসে দাঁড়ালেন এবং মাথার কাপড় টেনে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—কার কথা বলছো বাপজান? কার ঠাঁই প্রাসাদে?

জবাবে গজনবী সাহেব বললেন—আপনার ঐ ফিরোজাবানুর খালা আম্মা। শাহী মহলে যাওয়ার তার জব্বর আশা। আল্লাহতায়ালা তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন।

ঃ কথাটা আর একটু খোলাসা করে বলো।

ঃ খোলাসা আর কি করবো খালা আম্মা! মনে প্রাণে যে যা কামনা করে, সে নাকি তা পায়ই। আপনার বোনঝিও তাই পেয়ে গেল। বস্তি ছেড়ে প্রাসাদে গিয়ে উঠবে এবার। বিলকুল শাহী মহলের জেনানা বনে যাচ্ছে।

ঃ কি মুশ্‌কিল! তুমি কি সরকারী মকান পেয়েছো? মানে সরকারী মকান বরাদ্দ হয়েছে তোমার নামে?

বইঘর.কম ও রোকন

গজনবী সাহেব উল্লাসভরে বললেন—জি—জি। উমদা এক মকান। বিলকুল খোলামেলা জায়গায়। ওদিকে শাহী প্রাসাদের একদম লাগলাগি। আরজটা অনেক আগেই পেশ করা ছিল। হুজুরের মনমর্জি বুঝে কথাটা তুলতেই সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর।

ঃ তাই নাকি?

ঘরের মধ্যে বসে দৌলত ও ফিরোজাবানু তাজ্জব হয়ে মাসুম গজনবীর প্রলাপগুলি শুনছিলেন। তাঁর কথার ভাবেই কিছুটা তাঁরা অনুমান করতে পেরেছিলেন। ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই দৌলতজাহান চাপাকণ্ঠে আফসোস করে বললেন-ইস্‌রে! একদম কানের পাশ দিয়ে ফস্‌কে গেল ভাবী! বরাতটা তোমার খুলতে খুলতে খুললো না।

চাপাকণ্ঠে ধমক দিয়ে ফিরোজাবানু বললেন—আহ্‌ থামো তো! পাগলের কথাগুলো শুনতে দাও।

ঃ বাড়া ভাতে ছাই পড়ে গেল। এরপর আর শুনবে কি? একেই বলে আসমানে তুলে দিয়ে আছাড় মেরে নামানো।

ঃ মানে!

ঃ কোথায় লা-ওয়ারিশ হওয়ার আরজ মঞ্জুর হওয়া, আর কোথায় মকান মঞ্জুর হওয়া! দূর—দূর!

দৌলতজাহান হাসতে লাগলেন। মাসুম গজনবী সাহেব নিজের বাহাদুরিসহ মঞ্জুরীকৃত মকানের এন্তার তারিফ তখনও গেয়ে চলেছেন। বলেছেন—যেমনই চাঁদ সুরুজের আলো, তেমনই মন মাতানো হাওয়া। কামরাও পর পর কয়েকটি আর এক একটা ইয়াব্বড়ো-বড়ো। ওহ! নেহায়েতই মেজাজ বুঝে বায়না ধরেছিলাম বলে ঐ মকানটিই মঞ্জুর হয়ে গেল। মেজাজ মর্জি বুঝে চলার মাজেজাইতো এখানে।

মাসুম গজনবী খুশিতে দুলতে লাগলেন। দিনারবানু বললেন—তাহলে তো খুবই খোশ খবর বাপজান। এতদূর থেকে ভিজে তেতে তোমাকে আর দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। ঘরের কাছেই কর্মস্থল, আবার থাকবেও আরামে।

ঃ সেই কথাই তো বলছি। সবুরে মেওয়া ফলে, আপনার ঐ বোনঝিটা বুঝতেই চায়না সেটা। তাড়াহুড়ো করলে কি এমন মকান মিলতো?

ঃ তা ঠিক।

ঃ এত বলি, হবে-হবে তবু বলে, কবে-কবে? হলো তো শেষ পর্যন্ত?

ঘরের ভেতর থেকে দৌলতজাহান এবার উচুঁ কণ্ঠে বললেন—সে কি ভাইজান! আমাদের তাহলে ছেড়ে যাচ্ছেন আপনারা?

গজনবী সাহেব বললেন—ছেড়ে যাচ্ছি মানে?

ঃ মানে এই বস্তিতে আমাদের একা ফেলে আপনারা শাহী এলাকায় চলে যাচ্ছেন?

ঃ আরো না-না। দুদিন আগে হোক, পরে হোক, তোমরাও তো যাচ্ছো সেখানে।

ঃ কি রকম?

ঃ দাদু সাহেবও তো মকানের আরজ দাখিল করে রেখেছেন। তাঁরটাই আগে মঞ্জুর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কি করে যে আমারটা আগে মঞ্জুর হয়ে গেল—মানে আমার মনে হয়, তাঁরটাও মঞ্জুর হয়েই আছে। খোঁজ নেননি বলেই হয়তো জানতে পারেননি।

ঃ তাই নাকি?

ঃ আজকেই সব জানা যাবে। হয়ে থাকলে আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে জরুর।

ঃ সত্যি?

ঃ আমারটা মঞ্জুর হওয়ার খবর শুনেই দাদু সাহেবও দপ্তরের দিকে দৌড় দিয়েছেন। ওখানে শাহজাদা দাউদ খান সাহেব ছিলেন। উনি দাদু সাহেবকে বললেন, গিয়ে আগে খোঁজ নিয়ে দেখুন। না হয়ে থাকলে আজকালের মধ্যেই আমি ওটা মঞ্জুর করে দেবো। মকান ছাড়া জরুর আপনার চলবে না।

দৌলতজাহান খোশদীলে বলে উঠলেন—আলহামদুলিল্লাহ! তাই বলেছেন উনি? উঃ! কি আনন্দ! আমরাও তাহলে শাহী চত্বরে যাবো?

দৌলতজাহানের এই উৎসাহে বাধা এলো দুই দিক থেকে। পাশে বসা ফিরোজাবানু চিমটি কেটে বললেন—ইস্! খুশি কত! শাহজাদা দাউদ খান কথা দিয়েছেন! এ খবর তো খবর নয়, যেন মিঠাইয়ের সুরা!

কন্যার এই উৎসাহে দিনারবানু নাখোশ হলেন। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন—তুই থাম। এ নিয়ে এত আহলাদ করার কি আছে? মঞ্জুর হলেও আমি আমার নিজের ভিটে ফেলে কোথাও যাবো না। এ আমার নিজের মাটি, নিজের ঘর। নগদ মুদ্রায় কেনা মাটি আর নিজের হাতে গড়া ঘর।

গজনবী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—সে কি খালা আম্মা!

দিনারবানু বললেন—তোমরা ছেলেমানুষ। সামনে তোমাদের অনন্ত ভবিষ্যৎ। তোমাদের বড় হতে হবে। উপরে উঠতে হবে। তোমাদের তো যেতেই হবে বাপজান। তোমরা যাও। চোখের সামনে না থাকলে কারো নজরে কেউ পড়ে না। এই বস্তিতে হারিয়ে থেকে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ খোয়াবে কেন?

ঃ আমাদের কথা নয় খালা আম্মা, আমি আপনাদের কথা বলছি।

ঃ আমাদের এখন শেষ সময়। তোমার দাদুটাই বা আর কয়দিন নকরী করতে পারবেন? দুদিনের জন্যে আমরা কেন খামাখা পরের আশ্রয়ে যাবো?

ঃ কিন্তু যে দুইদিনই নকরী করতে পারুন উনি, অন্ততঃ উনার তকলিফের দিকে চেয়েই তো যাওয়া উচিত আপনাদের। মকানটা তো থাকবেই। পরে ফের ফিরে আসবেন মকানে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে। তবু—

ঃ-না-না খালা আম্মা, এতে আপনি আপত্তি করবেন না।

একটু চিন্তা করে দিনারবানু বললেন—তা মানে মঞ্জুর তো এখনও হয়নি। আগে হোক, পরে ভেবে দেখবো।

পরে ভেবে দেখার আর অবকাশ রইলো না। নকরী থেকে মুরাদ খানের ফিরে আসার ওয়াক্তটা ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। "কৈ, আম্মিজান কৈ? আম্মিজান—"বলে বিপুল জোশে আওয়াজ দিতে দিতে এই মুহূর্তে ফিরে এলেন মুরাদ খান। সামনে গজনবীকে দেখেই তিনি ফের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—আরে এই যে গজনবী মিয়া! কালকের পুঁচকে ছোকরা! আমার উপর টেক্কা মারবে তুমি? হুঁ-হুঁ বাবা, অনেক পানি মাপা আছে এই মুরাদ খানের। আমারটা মঞ্জুর না করে তোমারটা মঞ্জুর করবে, এটা ভাবলে কি করে?

মাসুম গজনবী উৎসাহ ভরে বললেন—তাই নাকি? আপনারটাও হয়েছে দাদু?

ঃ আলবত—আলবত। এই দেখ মঞ্জুরীর কাগজ আমার হাতেই—

বলেই তিনি কাগজখানা মেলে ধরতে গেলেন। মাসুম গজনবী বাধা দিয়ে এবার ভগ্নোৎসাহে বললেন—তা মঞ্জুর হয়েই বা লাভ কি দাদু? খালা আম্মা তো যেতেই চাচ্ছেন না সেখানে।

মুরাদ খান থমকে গিয়ে বললেন—কি বললে?

ঃ খালা আম্মা সরকারী মকানে যাবেন না।

বিগড়ে গেলেন মুরাদ খান। তিনি চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন—গেল-গেল, নকরী আমার গেল! এরা নকরীটা আমার না খেয়ে ছাড়বে না। হায়-হায়-হায়! আমি তাহলে কি করি এখন?

মুরাদ খান ছটফট করতে লাগলেন। মাসুম গজনবী বললেন, দাদু—

মুরাদ খান এবার তেরিয়া হয়ে উঠলেন এবং ক্রোধভরে বললেন—বললেই হলো? যাবেনা বললেই হলো? খোদ শাহজাদার কথা বলে কথা! খোদ ছোট শাহজাদার হুকুম, আমাকে ঐ শাহী চত্বরেই থাকতে হবে আর সকাল-সন্ধ্যা হরওয়াক্ত্ বাগানে হাজির থাকতে হবে। নইলে নকরী নেই। এখন মজা বোঝ।

ঃ সেকি দাদু, হরওয়াক্ত্?

ঃ হরওয়াক্ত্-হরওয়াক্ত্। সবেরা শাম হরওয়াক্ত্। মকান দেয়ার ওয়াদাটা তো ছিলই, সে কারণে মাহিনেটাও বাড়িয়ে দিয়েছেন দুইগুণ। খোদ শাহজাদা দাউদ খানের মর্জি। এর উপর আর কথা আছে?

ঘরের ভেতর থেকে এবার ফিরোজা বানু বললেন—তাই নাকি দাদু? আপনার উপর এত মর্জি ঐ শাহজাদার?

ঃ মর্জি মানে? মর্জি কি বলছো? উনি আমার দোস্ত্—দোস্ত্! আমিই উনার নিত্যদিনের সাথী। আমার উপর শাহজাদার যে কত টান, সে খবর তোমরা কি জানো?

ঃ ফিরোজাবানু সকৌতুকে বললেন—এ্যাঁ! বলেন কি দাদু? আপনার উপর জ়ব্বর টান উনার? মানে, গাছে না উঠতেই এক ধামা? পরে তো তাহলে–

বলেই তিনি চমকে গিয়ে জিব কাটলেন এবং দৌলতজাহানের দিকে আড় চোখে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। জবাবে মুরাদ খান আপন জোশে বললেন—জরুর। এই টান-খাতির ইনকার করলে পরে তো মাথা যেতেই পারে আমার।

অতঃপর শুরু হল দৌলতের আম্মা দিনারবানুকে সমঝানো। গজনবী ও মুরাদ খান উভয়েই তাঁকে সমঝাতে শুরু করলেন। তবুও দিনারবানু আরও কিছুক্ষণ ওজর-আপত্তি তুললেন। কিন্তু শেষ'পর্যন্ত মুরাদ খানের তকলিফটাই প্রাধান্য লাভ করলো। হরওয়াক্ত হাজির থাকতে না পারলে নকরী ছেড়ে দিতে হবে। হঠাৎ করে এই সময় নকরী ছেড়ে দেয়াটা দিনারবানু সমীচীন মনে করলেন না, ফলে এই বৃদ্ধ লোকটার আহার-বিরাম এবং হরওয়াক্ত সেখানে তাঁর অবস্থান-এসব দিক দিনারবানু উপেক্ষা করতে পারলেন না। সাব্যস্ত হলো, গজনবীরা আগে যাবেন, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করার পর তাঁরাও যথাসত্বর চলে যাবেন ওখানে এবং মুরাদ খানের নকরী করার কয়েকটা দিন ওখানেই কাটাবেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার প্রাক্কালে ফিরোজাবানু দৌলত জাহানকে কটাক্ষ করে বললেন–এবার হাতির ঘরে গরীবের পাঁড়া। দেখা যাক, ফলাফলটা কি দাঁড়ায়?

ফিরোজাবানু মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। দৌলতজাহান নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন–কি আর দাঁড়াবে? পাহারা দেয়ার স্থানটা বদলে গেল, এই আর কি।

ঃ কি রকম?

ঃ কদমতলার বদলে ভাইজানকে এখন শাহী ফটকেই বাঁশ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ঃ বাঁশ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

ঃ হবে না? এত দূরে থাকতেই যাকে সামলানো যাচ্ছে না, শাহজাদার নাম উঠতেই পুলকে যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, কাছে গেলে আর তাকে ধরে রাখা যাবে? শাহজাদার তালাশে কখন যে সে শাহী মহলে ছুটবে, তার ঠিক ঠিকানা কি?

ফিরোজাবানু তিরিক্কে হয়ে বললেন–বটে! নিজের খোয়াব পরকে দেখাও? বুকে একবার হাত দিয়ে দেখতো, এ খবরে সেখানে কি তোলপাড় শুরু হয়েছে? তার উপর আবার দাদুর সাথে শাহজাদার দোস্তী। এরপর আর ঝড় উঠতে বাকী আছে ওখানে?

ঃ ও বাবা, ফের আমার দরদে পুড়তে শুরু করলে?

ঃ না পুড়ে উপায় আছে? তোমার নির্ঘাত মউতটা যে আমি খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছি।

ঃ মউত!

ঃ হুঁশিয়ার হয়ে যাও হতভাগী। এখন থেকেই সামলিয়ে নাও নিজেকে। আসমান আসমানই, জমিন জমিনই। এ দুইয়ের পিরীত কখনো সাজে না আর সমান সমান না হলে, সে পিরীত কখনো সুখের হয় না। সময় থাকতে হুঁশিয়ার হয়ে না গেলে আখেরে পস্তিয়েও কুল পাবে না।

ঃ সাব্বাস্!

ঃ মানে?

ঃ আমাকে আবার বলতে হয় ভাবী, কাব্য একখান করতে পারো বটে তুমি! হাঁড়ি ঠেলা ছেড়ে দিয়ে তুমি যদি বসে বসে কাব্য রচনা করতে, তাহলে এই দুনিয়াটাকে মাত্ করে দিতে পারতে।

ফিরোজাবানু কুপিত কণ্ঠে বললেন–বটে!

দৌলতজাহান বললেন–এক বিন্দু মিছে নয়। শূন্যের উপর প্রাসাদ রচনা করায় সত্যিই তোমার জুড়ি নেই।

ফিরোজাবানু বললেন–ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাঙ্গালের কথা নগদ নগদ ফলেনা, বাসি হলে ফলে। এর জবাবটা তখনই আমি দেবো।

হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ফিরোজাবানু এবং খসমের সাথে নিজ মকানে চলে গেলেন।

তিন

তানপুরার মূর্ছনা ঝুরে ঝুরে পড়ছে। ভেসে ভেসে আসছে সুললিত কণ্ঠের সুরেলা বিলাপঃ "বাজু বন্‌ধ্‌ খুলু খুলু যায়–"

সভাসদ জানকীবল্লভ ওরফে বসন্তরায়ের বাগানঘেরা দহলিজে সান্ধ্য আসর বসেছে। এমন আসর এখানে মাঝে মধ্যেই বসে। ঘরোয়া আসর হলেও কিছু বিশেষ বিশেষ অতিথি হাজির থাকেন এখানে। এঁদের মধ্যে সভাসদ কতলু খান লোহানী আর সালার গুজার খানই প্রধান। তাঁদের অভাবে এ আসর জমেই না বড় একটা। খড়্গপুররাজ সংগ্রাম সিংহ ও গিধৌররাজ পূরণমলও স্বাদ পেয়েছেন এ আসরের। হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানীর অধীনস্থ এই সামন্ত রাজন্যদ্বয় দূরকে নিকট করে সময় সময় তাণ্ডা শহরে আসেন আর রায় সাহেবদের আতিথ্য গ্রহণ করে এ আসরে শরিক হন। হযরত-ই-আলার ভাই ইমাদ খানের আওলাদ জুনায়েদ খান কাররানীও এ আসরের অন্যতম কদরদাতা।

এ আসরের মূল উদ্যোক্তা বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সভাসদ ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ শ্রীহরি বা শ্রীধর রায়। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একত্রে বসা আর আলাপ পরামর্শ করাই শ্রীহরির লক্ষ্য। এই সঙ্গীতের আসরটি তার মাধ্যম। সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরে চলে ব্যক্তি অনুযায়ী খানাপিনা এবং তৎপরে গল্পগুজব ও ইষ্ট আলাপ।

আসরটিকে ধরে রাখার প্রয়োজনে কিছু বাইরের শিল্পীর উপস্থিতি থাকলেও, এ আসরের মূল আকর্ষণ লাস্যময়ী শিপ্রাদেবী। কোকিলকণ্ঠী গায়িকা শিপ্রা। শিপ্রাদেবীর পরিচয়টা অস্পষ্ট। রায় ভ্রাতৃদ্বয় বলেন, তাঁদেরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া এই শিপ্রা। সম্পর্কে ভাগিনেয়ী। আড়ালে আবডালে ঝি-চাকরদের দুই একজন বলাবলি করে, শিপ্রাদেবী রায় সাহেবদের আপন ভাগিনেয়ী। আপন বোনের মেয়ে। আসরের টোপ হিসাবে নিজের ভাগিনেয়ীকেই ব্যবহার করছেন এঁরা।

কোন কথায় কান না দিয়ে যেটুকু জানা যায়, তা হল, শিপ্রাদেবী বালবিধবা। স্বামীর ঘর হারিয়ে প্রথমে তিনি পিত্রালয়ে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি এঁদের এখানে এসেছেন। সঙ্গীত চর্চার ঝোঁক তাঁর বাল্যকালের। বিধবা হওয়ার পরও রেওয়াজ

তিনি ছাড়েননি। বরং পিত্রালয়ে থাকতে এক উস্তাদের সংস্পর্শে এসে সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি আরও পারদর্শিনী হয়েছেন।

শিপ্রাদেবীর যৌবনটা অনেক আগেই এসেছে। অনেক সময় ইতিমধ্যে অতিবাহিত হলেও, এখনও তা কুল ছাপিয়ে ছুটছে। তার ললিত লাস্যের চমক ও ছটা আগের মতো তীব্রতরই আছে। রূপের সাথে কণ্ঠও তার অপরূপ। ফলে, এ আসরের তিনিই মধ্যমণি। শুধু সঙ্গীত পরিবেশনই তার একমাত্র কাজ নয়, বিশেষ বিশেষ অতিথিদের আহার-আপ্যায়নের কাজটিও তাঁর উপরই ন্যস্ত। এতে করে অতিথিদের অনেকের কাছেই তিনি সবিশেষ পরিচিতা। সম্পর্কও অনেকের সাথে অনেকখানি অন্তরঙ্গ। এ আসরের আকর্ষণ তাই অনেকের কাছে দুর্বার।

বরাবরের মত আজও জমে উঠেছে আসর। দু একজন ক্ষুদে শিল্পীর পরেই হাজির হয়েছেন শিপ্রাদেবী। পর পর খান দুয়েক হালকা গানের পর শিপ্রাদেবী গান ধরেছেন "রাজুবন্ধ খুলু যায়-"

ঢুলু ঢুলু আবেশে তন্ময় হয়ে সবাই তা শুনছেন আর আবেগের আতিশয্যে হাত ও মাথা নেড়ে এন্তার তাল দিচ্ছেন গানের সাথে। গান শেষ হতেই "ওয়া-ওয়া" রবে জ্যামুক্ত ধনুকের বেগে সকলেই সোজা হয়ে বসলেন আর গায়িকার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

শিপ্রার গানের সাথেই শেষ হল আজকের আসর। আসর ভাঙার সাথে সাথেই অন্যান্য শ্রোতা-শিল্পীরা বিদায় নিলেন। রয়ে গেলেন সভাসদ কতলু খান লোহানী ও সালার গুজার খান। আজকের আসরে এই দুইজনই ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি। সকলের দেখাদেখি তাঁরাও উঠে পড়ার ভান করলেন। কিন্তু গৃহস্বামীর অনুরোধে ওঠা আর হলনা। নাস্তাপানির আনযামে ওখানেই তাঁরা শরিক হলেন। ঝি-চাকরের সাহায্যে শিপ্রাদেবীই সহাস্যে ও সকৌতুকে নাস্তাপানি পরিবেশন করলেন। চটুল রসিকতার মধ্য দিয়ে এ পর্বও শেষ হল।

শেষে এলেন গৃহস্বামীরা দুই ভাই। আহার পানির পর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এসে শ্রীহরি রায় অতিথিদের সাথে আলাপ জুড়ে দিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানকীবল্লভ ওরফে বসন্ত রায়ও ধীরে ধীরে এসে তাঁদের পাশে বসে পড়লেন। জমে উঠল গল্পালাপ। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়ে কিছু আলাপের পর তাঁরা চলে এলেন নিজেদের রাজনীতি আর নিজেদের অবস্থানের প্রসঙ্গে। কথায় কথায় রায় সাহেবেরাই তাঁদের সুকৌশলে এ প্রসঙ্গে আনলেন। এ নিয়ে কথা চলার মাঝখানে একসময় শ্রীহরি রায় বললেন-তা যা-ই বলুন লোহানী সাহেব, একটা দিক কিন্তু আপনারা দেখেও দেখছেন·

না। সভাসদ বলতে আপনি আর সালার বলতে জনাব গুজার খান সাহেব। এই আপনারা দুজনই আমাদের এই প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। অথচ ক্রমেই আপনারা কতখানি পেছনে সরে যাচ্ছেন, তা কিন্তু মোটেই খেয়াল করছেন না।

কতলু খান লোহানী সজাগ হয়ে বললেন–কি রকম–কি রকম? একটু খোলাসা করে বলুন তো–

শ্রীহরি রায় বললেন–খোলাসা করার তেমন তো অপেক্ষা কিছু দেখিনে। আপনি একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। সেপাইদের বিরাট এক গোত্রের আপনি নেতা। কিন্তু রাজনীতিতে আপনার কদর কতখানি ঝিমিয়ে পড়েছে, এটা খেয়াল করছেন না।

ঃ তার মানে–

ঃ আমি ঐ উজিরে আজম সাহেবের কথা বলছি। লোদী খান সাহেবের কথা। অবশ্য উনি মুরুব্বি মানুষ, বয়োবৃদ্ধ লোক, প্রধান উজিরের পদটা তাঁকে দেয়া নিয়ে আমার অভিযোগ কিছু নেই বা তাঁর প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধাও নেই। কিন্তু আপনাদের দিকটাও তো সেই সাথে উপেক্ষা করতে পারিনে আমি? যোগ্যতা আর সামর্থ্যের অবমূল্যায়ন হোক এটা কে চায় বলুন?

জবাবে গুজার খান বললেন–তা বটে–তা বটে। তবে লোদী খান সাহেব আমাদের সবারই মুরুব্বি। উনি একটা সম্মানের আসনে আছেন, এতে আমরাও কেউ অখুশি নই। যোগ্যজনকেই যোগ্য স্থান দেয়া হয়েছে। উনি না হয়ে অন্য কাউকে এ আসনে বসানো হলে অবশ্যই আমরা উদাসীন থাকতাম না।

বসন্ত রায় কথা ধরে বললেন–তা আপনারা থাকতেন না বা থাকা আপনাদের উচিত নয়, এটা আমরা বুঝি। কিন্তু উজিরে আলা হয়েছেন বলে একমাত্র উনাকেই কদর দেয়া হবে, আর দরবারের জ্ঞানীগুণী শক্তিমান ও বীর্যবান ব্যক্তিবর্গ সকলেই ফালতু হয়ে যাবেন, এটাও তো এক কথায় মেনে নেয়া যায় না।

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে গুজার খান বললেন–কথাটা মন্দ বলেননি আপনি। এটা আমারও কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

উৎসাহিত হয়ে উঠে শ্রীহরি রায় বললেন–দেখুন না, ছোটবড় তামাম ব্যাপারে হযরত-ই-আলা একমাত্র তাঁর সাথেই পরামর্শ করছেন আর তাঁর মতামত অনুযায়ীর দেশ চালনা করছেন। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, এমনকি বৈদেশিক ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো একমাত্র লোদী খানের মতানুযায়ীই নির্ধারিত হচ্ছে। এসব ব্যাপারে হযরত-আলা আর কারো কোন মতামত গ্রহণ করা বা আর কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধই করছেন না

বইঘর.কম ও রোকন

গুজার খানের মতো কতলু খানও ভারিক্কি কণ্ঠে বললেন–হ্যাঁ, কথাটা সত্যিই ভেবে দেখার মতো।

শ্রীহরি বললেন–এই যে দিল্লীর বাদশাহর সাথে আমাদের এত বড় একটা চুক্তি হয়ে গেল, এত সব শক্ত শক্ত শর্ত আর ওয়াদা, তামামই তো ঐ লোদী খান সাহেব একাই করে এলেন। উনি যা করে এলেন, হযরত-ই-আলা তা বিনাবাক্যে গ্রহণ করলেন আর আমাদেরও তাই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হল। ব্যাপারটা কি দাঁড়াল তাহলে? উনার একার মতই যদি চূড়ান্ত মত হয়, হযরত-ই-আলা যদি একমাত্র তাঁর কথাতেই চলেন, তাহলে আমাদের ভূমিকাটা কি রইল? স্রেফ হাত তুলে "জি হুজুর" বলার অধিক তো আর নয়?

গুজার খান বললেন–রায় সাহেবের ধীশক্তির সত্যিই তারিফ করতে হয়। এতটা কিন্তু তলিয়ে দেখিনি আমরা।

বসন্ত রায় বললেন–তা না দেখলে তো চলবে না খান সাহেব? নিজের স্থান নিজে করে না নিলে, অন্য কেউ কাউকে স্থান করে দেবেনা। প্রথম থেকেই চোখ কানগুলো সজাগ-খোলাসা থাকা ভাল। তা না হলে আখেরে পস্তাতে হয়।

কতলু খান সায় দিয়ে বললেন–ঠিক-ঠিক, বিলকুল ঠিক কথা।

শ্রীহরি রায় বললেন–লোদী খান সাহেব এখন তুঙ্গে আছেন, থাকুন। কিন্তু তাঁর পরে তো সেসব স্থানে আপনাদের আসতে হবে। এই যে আপনারা এত বিজ্ঞ আর দক্ষজন আছেন, এই যে আমার দাদার মত একজন বয়স্ক আর বিচক্ষণজন আছেন, আপনাদের সবার জন্যেই যোগ্য আসন, যোগ্য মর্যাদা থাকতেই হবে প্রশাসনে।

ঃ আলবত—আলবত।

ঃ যার যেটা প্রাপ্য, সেটা তো আর হেলায় হারালে চলবে না। হাত-পা নেড়ে নিজেরা সামনে এগিয়ে না গেলে, ভবিষ্যতে মুসিবত আছে লোহানী সাহেব। আপনারা উদাসীন বা নীরব থাকলে পেছন থেকে কে যে কখন আপনাদের টপকে সামনে চলে আসবে, তার দিশে করতে পারবেন না।

গুজার খান বললেন–তা বটে—তা বটে।

বসন্ত রায় বললেন–ওদিকে আবার দেখুন, ঐ রাজুটা। মানে কালাচাঁদ থেকে কালাপাহাড় ঐ নও মুসলিমটা। বামুনের ঘরের মোষ। ব্যাটা তুই মন্দির মূর্তি ভাঙার দায়ে হযরত-ই-আলার আশ্রয়ে এসে ঢুকলি, প্রাণের টানে তো নয়, ঠ্যালার ভয়ে ইসলাম কবুল করলি, ব্যস্, ভাল কথা। ঐ ভাবেই থাক। প্রাণটা যে বাঁচলো, সেইতো তোর সাত পুরুষের ভাগ্য! তা নয়, বাহাদুর হতে চায়। বাহাদুরি জাহির করার খাহেশ কত তার! ও

বইঘর.কম ও রোকন
ব্যাটা যেভাবে এগুচ্ছে, আর হযরত-ই-আলাও যেভাবে ওকে কদর দিতে শুরু করেছেন, তাতে সালার গুজার খান সাহেবের মতো এই অদ্বিতীয় রণবিদের ভবিষ্যতটাও নিরাপদ নয়।

গুজার খান মাথা তুলে বললেন—মানে?

ঃ মানে আপনার মতো দুর্দ্ধর্ষ আর মশহুর যোদ্ধাকে টপকে ঐ কুখ্যাত কালাপাহাড়টাই যে সিপাহ্সালার বনে যাবে না একদিন, এটাই বা হলপ করে বলা যায় কি করে?

গুজার খান নিরুদ্বেগের সাথে বললেন–ঠিক ঠিক। তবে বাহাদুর বলতে হয় ঐ জোয়ানটাকে। সে যোগ্যতা ওর আছে।

বসন্ত রায় অলক্ষ্যে দাঁত কামড়ালেন। এরপর বললেন–যোগ্যতা তার যা-ই থাক, গুজার খান সাহেবের কাছে সে তো একটা শিশু। ঐ শিশুটাই যদি লাফ দিয়ে প্রবীণ খান সাহেবের ঘাড়ের উপর চড়ে, তাহলে আর মানীর মান থাকে কোথায়?

ঃ অসম্ভব। তা চড়তেই সে পারে না।

ঃ সে চড়বে কেন? তোয়াজ পেলে হযরত-ই-আলাই তাকে তুলে দেবেন।

ঃ যোগ্যতার বিচার না করেই? তাহলে ছেড়ে কথা বলবো?

ঃ হ্যাঁ, সে তো জানিই। কোন অন্যায় অবিচার খান সাহেব বরদাস্ত করার লোক নন। তবু আপদ যখন আছেই একটা লুকিয়ে, আগে থেকেই সে বিষয়ে সজাগ থাকা কি উচিত নয়?

ঃ তা ঠিক—তা ঠিক!

আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে বসন্ত রায় মনমরা হয়ে গেলেন। কতলু খান এ প্রেক্ষিতে বললেন–রায় সাহেবের কথাটা হালকা ভাবে নেয়ার কোন অবকাশ নেই খান সাহেব। এমন একটা সম্ভাবনা সত্যিই কিন্তু আছে।

গুজার খান ভাবতে লাগলেন। তা দেখে শ্রীহরি রায় বললেন–জি –জি, দাদা ঐ কথাটাই বলছেন। আমাদের কথাটা ঐ সাবধান সতর্ক থাকাটা নিয়েই শুধু। নইলে, চরম কিছু করার বা এক্ষণেই কোন পদক্ষেপ নেয়ার কোন কথা আমরা বলবো না আর অসৎ কোন পরামর্শও আমরা দেবো না। হীনমন্যতা মোটেই আমরা বরদাস্ত করতে পারিনে। আপনারা আবার উল্টো পাল্টা কিছু ভেবে বসবেন না যেন।

কতলু খান বললেন–আরে না-না, তা ভাববো কেন?

ঃ আমাদের কি বলুন? কোন উঁচু পদে যাওয়ার খাহেশ দীলে আমাদের নেই। আমাদের খায়-খাতিরের লোকদের, আমাদের ইয়ারবন্ধুদের উচ্চ-আসনে দেখলে আমাদের আনন্দ হয়, আমরা তৃপ্তি পাই। আমাদের দীলের কথা এইটেই। আর স্বার্থের

বইঘর.কম ও রোকন

কথা যদি বলেন, তাহলে স্বার্থ আমাদের ঐটুকুই যে, ইয়ারবন্ধুরা হোম্‌রাচোম্‌রা হলে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দটা নিশ্চিত হয়। গোনা মাহিনায় এই এমন দীনভাবে ইয়ারবন্ধুদের আদর আপ্যায়ন করতে হয়না, এই আর কি!

শ্রীহরি রায় হাসতে রাগলেন। গুজার খান এবার সোচ্চার কণ্ঠে বললেন–আরে না-না, দীন কোথায়? যথেষ্টই তো আমাদের জন্যে করেন আপনারা সব সময়। তবে হ্যাঁ, এ কথাটা ঠিক যে, আপনাদের যা খরচের হাত, সে তুলনায় সামর্থ আপনাদের সীমিত। এ দিকটা হযরত-ই-আলার দেখা উচিত।

www.boighar.com

কতলু খান জোশের সাথে বললেন–হযরত-ই-আলা না দেখুন, আমরা দেখবো। নসীবগুণে দেখার মত দিন যদি পাই কখনো আমরা, রায় সাহেবদের এ অবস্থায় কিছুতেই আমরা রাখবো না।

গুজার খান বললেন–জরুর– জরুর।

শ্রীহরি হেসে বললেন–খান সাহেবেরা চিরকালই দরাজদীল!

কথা ক্রমেই খাটো হয়ে এলো। গুজার খান বললেন–আজ তাহলে ওঠা যাক। অনেক রাত হয়ে গেল।

শ্রীহরি রায় সমর্থন দিয়ে বললেন– জি-জি। কাল সকালে আবার আমারও একটু তাড়া আছে। শাহজাদা দাউদ খানের নির্দেশ পালন করতে হবে।

কতলু খান বললেন–তাঁর আবার কি নির্দেশ?

ঃ ঐ যে উনি নয়া বাগানটা করেছেন, মানে শাহী প্রাসাদের বাইরের ঐ ফুল বাগানটা অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়েছেন একপাশে, ওখানে কিছু নতুন নতুন ফুলের চারা লাগাবেন। আমাদের বাগানে কিছু নূতন জাতের ফুল আছে শুনে, তার কিছু চারা নিয়ে আগামীকাল সকালে তাঁর বাগানে আমাকে হাজির হওয়ার অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন। বোঝেন তো, শাহজাদাদের অনুরোধ মানেই নির্দেশ।

গুজার খান বললেন–অবশ্যই অবশ্যই। তাহলে চলি আমরা–

শুভেচ্ছা বিনিময় করে কতলু খান ও গুজার খান বিদায় নিলেন। তাঁদের কিছুদুর এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বসন্ত রায় বিকৃত মুখে মন্তব্য করলেন–একদম ষাঁড়ের গোবর! মগজটা স্রেফ সোজা করে চালানো ছাড়া একটু এদিক ওদিক বাঁকা করার কোন জ্ঞানই এদের নেই। নিজের ভালাইটাও এই বেয়াকুফেরা এক কথায় বুঝতে চায় না।

শ্রীহরি রায় আফসোস করে বললেন–তবু তো উপায় নেই দাদা। এদের হাতে না রাখলে ভবিষ্যৎ বলে আমাদের তো বড় একটা কিছু থাকে না।

বসন্ত রায় সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন–না-না, এদের হাতে রাখতেই হবে। নিজেদের ভবিষ্যৎ লাফালাফি করে নিজেরাই গড়তে না গিয়ে পরের মাধ্যমে গড়ে নেয়াটা যেমনই নিরাপদ তেমনই ফলটাও তার বড়। তবে আমি বলছিলাম, এইসব "জো-হুজুর"দের সাথে দু একটা বাঘ সিংহকে দলে ভিড়িয়ে নিতে পারলে, সুবিধে অনেক বেশি হতো।

ঃ দাদা।

ঃ শাহজাদাদের কথা বলছি। ওদের কাউকে আমাদের হাতের মধ্যে নিতে পারলে, অবস্থানটা আমাদের আরো বেশি মজবুত হয়, ভবিষ্যতটাও খোলা থাকে।

ঃ তা কি আমি ভাবিনি দাদা? কিন্তু শাহজাদারা দুজনই কট্টর মুসলমান। ইসলামের নীতি নির্দেশের বাইরে ওঁরা এক পা-ও চলতে চান না। নইলে আমাদের এই আসরে কবে আমি ভিড়িয়ে নিতাম তাঁদের!

ঃ কেন, সঙ্গীতের কদর ওরাও তো দিয়ে থাকে শুনি। একটু কসরত করে দেখোনা।

ঃ দাদা!

ঃ শাহজাদা বায়াজিদের বয়সটা অনেক বেশি। প্রাণচাঞ্চল্য অনেকটা তার ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু শাহজাদা দাউদটা যেমনই দুরন্ত, তেমনই তরুণ। একদম কাঁচা বয়স, প্রাণচাঞ্চল্য উদ্দাম। ওর পেছনে একটু হাঁটাহাঁটি করো না!

ঃ তার মানে–

ঃ ফুলের চারা নিয়ে যাবে, শিপ্রাকে সাথে করে নিয়ে যাও। ফুল সম্বন্ধে শিপ্রারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে। শাহজাদাকে সাহায্য করতে পারবে।

অগ্রজের এই ইংগিত শ্রীহরি রায় বুঝতে পারলেন। তিনি নত মস্তকে বললেন–আজ্ঞে দাদা, আজ্ঞে।

সূর্যোদয়ের কিছু পরেই শাহজাদা দাউদ খান কাররানী বাগানে এসে ঢুকেছেন। মালী মজুরদের নিয়ে বাগানরক্ষী মুরাদ খান নবরোপিত চারাগুলির পরিচর্যায় লেগেছেন। শাহজাদা দাউদ খান ঘুরে ঘুরে তাদের কাজকর্ম দেখছেন। কিছু সময় অতিবাহিত হতেই বাগানের ফটকে এসে দাঁড়ালেন সহকারী কোষাধ্যক্ষ শ্রীহরি রায়। সঙ্গে তাঁর ফুলের চারার ডালি মাথায় জনৈক চাকর, তার পেছনে সুবেশিনী শিপ্রা।

শ্রীহরি রায় ফটকে এসে দাঁড়ালে, তাঁকে দেখে শাহজাদা দাউদ খান সাগ্রহে কয়েক কদম এগিয়ে এলেন এবং খোশ দীলে বললেন–আরে এই যে রায় সাহেব! আসুন-আসুন। আপনাকে তকলিফ দিলাম সকালে।

শ্রীহরি রায় সালাম দিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললেন–জি না ছোট হুজুর, জি না। তকলিফ আর কি? চারাগুলো সকাল সকাল না পুঁতলে, কড়া রোদে অসুবিধা হবে।

বইঘর.কম ও রোকন

সালাম নিয়ে শাহজাদা বললেন–ঠিক ঠিক। তবে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা কিছু রেখেছি। চারাগুলো বিকেলে পোঁতাই বেহতর ছিল। কিন্তু বিকেলে আমি কখন কোন দিকে যাই তার ঠিক ঠিকানা নেই তো, তাই আপনাকে সকালে আসতে বলা। কৈ চারাগুলো কোথায়? ভেতরে নিয়ে আসুন–

শ্রীহরির নির্দেশে চাকরটি ডালি মাথায় বাগানের ভেতরে চলে এলো। সেই সাথে শ্রীহরিও খানিকটা এগিয়ে এলেন। ফটকে দাঁড়িয়ে রইলেন শিপ্রাদেবী। তাঁর উপর নজর পড়তেই শাহজাদা সবিস্ময়ে বললেন– উনি?

আরো কিছুটা এগিয়ে এসে বিগলিত কণ্ঠে শ্রীহরি রায় বললেন– আর বলেন না ছোট হুজুর! আমার ভাগিনেয়ী শিপ্রা। শিপ্রাদেবী নামেই ও মশহুর। আমাদের বাগানটা তারই হাতে গড়া কিনা! তাই হুজুরের নয়া বাগানের খবর শুনেই ও একদম ক্ষেপে গেল। জিদ্ ধরলো, হুজুরের বাগানটা সে দেখবেই। আমি বলি, হুজুরের অনুমতিটা নিতে দাও আগে। কিন্তু ও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই ছাড়লো না। ওর হাত এড়াতে না পেরে আনতে হলো সাথে করে হুজুর। কসুর কিছু হলে–

ভদ্রতার খাতিরে শাহজাদা বললেন–আরে না-না, কসুর কি? উনাকে আসতে বলুন–

উৎসাহিত কণ্ঠে শ্রীহরি রায় ডাক দিলেন–কৈ রে শিপ্রা, দাঁড়িয়ে কেন? আয়, ভেতরে চলে আয়। হুজুর আমাদের দীলখোলা মানুষ।

কিছুদুর এগিয়ে এসে শিপ্রাদেবী ভণিতা করে ইতস্তত করতে লাগলেন। শ্রীহরি রায় উৎসাহ দিয়ে বললেন–আহা! সংকোচ কিসের? হুজুর আমাদের একান্ত নিজের লোক। তোর একদম দাদার মতো। হুজুরকে সংকোচ করার কিছু নেই। আয়– আয়–

শাহজাদা দাউদ খান সসংকোচে সরে দাঁড়াতে গেলেন। শ্রীহরি রায় সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললেন–সেকি! আপনি আবার ওকে দেখে সংকোচ বোধ করছেন কেন ছোট হুজুর? আমারই ভাগিনেয়ী। হুজুরের বিলকুল ছোট বোনের মতো। হুজুরের সাথে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে নিয়ে ও এখানে এসেছে। অনুমতি পেলে, বাগান নিয়ে হুজুরের সাথে ও দুটি কথা বলতে আগ্রহী।

বাধ্য হয়েই শাহজাদাকে দাঁড়িয়ে যেতে হলো। শিপ্রাদেবী নিকটে এসে হাত তুলে সালাম দিলেন। সালাম নিতে গিয়ে এই প্রথম শাহজাদা শিপ্রাকে সরাসরি দেখলেন।

শিপ্রার রূপ দেখে প্রথম ধাক্কায় শাহজাদা অত্যন্ত চমকিত হলেন। রূপ যেন তার দাউ দাউ করে জ্বলছে। পোশাক-আশাক বেশবাসও অত্যন্ত পরিপাটি। চকিতে তিনি দীলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সেদিনের সেই বজরাঘাটের রূপখানা তুলে আনলেন এবং দুটিকে মিলিয়ে দেখতে গেলেন। দেখতে গিয়েই চমকটা তার ভাঙলো। তিনি বুঝলেন, এ নারীও যথেষ্টই রূপবতী। তবে তাঁর এই রূপের ছটায় প্রসাধনের দান অনেক বেশি।

বইঘর.কম ও রোকন
বেশ বিন্যাসের বাহারই তাঁর এই ঔজ্জ্বল্যের অন্যতম কারণ। নাক-মুখের গড়নটা অসুন্দর না হলেও সেই নিপুণতা এ গড়নে নেই। তার মানসপটের অকৃত্রিম ও অনুপম রূপের কাছে এ রূপ ফিকে হয়ে গেল।

হারিয়ে তবু গেলনা। সব কিছু মিলে শিপ্রাদেবীর রূপটারও শাহজাদা তারিফ করলেন মনে মনে। সব কিছুই এক লহমার ব্যাপার। সালাম নিয়েও শাহজাদা সহাস্যে বললেন–আপনার নাম শিপ্রাদেবী?

কণ্ঠের সুর মিষ্টি করে শিপ্রাদেবী জবাব দিলেন–জি আলীজা, জি।

ঃ বাগান করা খুব ভালবাসেন?

ঃ জি, বাসি।

ঃ রায় সাহেবদের বাগানটা আপনার হাতেই গড়া?

এ প্রশ্নের জবাবটা সরাসরি শিপ্রার মুখে যোগালো না। তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। এই ফাঁকে শ্রীহরি রায় বললেন–আপনারা একটু কথা বলুন হুজুর, আমি চারাগুলো তাড়াতাড়ি পুঁতে দেয়ার ব্যবস্থা করি। রোদ ক্রমেই কড়া হচ্ছে–

রওনা হতে গিয়েই ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি শিপ্রাদেবীকে বললেন– তুই হুজুরের কাছেই থাক। আমি চারাগুলো পুঁতে দিয়ে এসেই তোকে বাগান দেখিয়ে বেড়াবো–

হুজুরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনই তোয়াক্কা না রেখে শ্রীহরি রায় কাজের অছিলায় দৌড় দিয়ে সরে গেলেন। শাহজাদা পড়ে গেলেন বেকায়দায়। যুবতীটির আত্মসম্মানে ঘা লাগবে বোধে তাঁকে একা ফেলে সরে যাওয়াটা শাহজাদা সমীচীন বোধ করলেন না। বাধ্য হয়েই তাঁর সাথে তিনি কথা বলতে লাগলেন। সেই সাথে শাহজাদা খেয়াল করলেন, ইনি কোন পর্দানশীল রমণী নন। এঁর পর্দারক্ষার খাতিরে শাহজাদার সরে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। ফলে, তিনি অনেকটা সহজ হয়েই তরুণীটির সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

দু'চার কথার পরই শিপ্রাদেবী নিজ ভূমিকায় নামলেন। সংকোচটা ঝেড়ে ফেলে চটুল হয়ে উঠলেন তিনি এবং ঘাড়-দেহ বাঁকিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলেন। শাহজাদা তা দেখেও না দেখার ভান করে শিপ্রার পারিবারিক বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলার পর পুনরায় প্রশ্ন করলেন– কৈ আমার ও কথার জবাবটাতো দিলেন না? আপনার ঐ মাতুলদের বাগানটা আপনার হাতে গড়া?

শিপ্রাদেবী উচ্ছলকণ্ঠে বললেন–হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার হাতে গড়া বৈকি। আমি সুন্দরের পূজারী। যা কিছু সুন্দর, আমি তারই খেদমত করি।

ঃ তাই?

ঃ শুধু বাগান করাই নয়, দীলের তৃপ্তিদানে যে জিনিসটা সর্বাধিক সহায়ক, আমি তারই চর্চা নিয়ে থাকে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ যেমন?

ঃ সঙ্গীত। সঙ্গীতের সুরের মধ্যেই বিভোর হয়ে থাকি আমি। বললামই তো, আমি একজন বালবিধবা। স্বামী তো সেই শিশুকালে মরে গেছে। মানে, কিছু বুঝতে শেখার আগেই। এখন এই সঙ্গীতই আমার স্বামী। এই সঙ্গীতের যিনি কদর দেন, তিনিও আমার একান্ত প্রিয়জন।

বাঁকা নয়নে চেয়ে শিপ্রাদেবী হাসতে লাগলেন। শাহজাদা বললেন–দাঁড়ান-দাঁড়ান। রায় সাহেবদের মকানে মাঝে মাঝে সঙ্গীতের আসর বসে, এ কথা শুনেছি। সেখানে নাকি একজন মশহুর গায়িকা আছেন। তাঁর কণ্ঠের আর রূপের অনেক সুখ্যাতিই মাঝে মাঝে কানে এসে পড়ে। তিনি কি আপনিই–মানে, তাঁকে কি জানেন?

আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সারা দেহ দুলিয়ে শিপ্রাদেবী কলকণ্ঠে বলে উঠলেন–আমিই-আমিই। আমিই সেই সুরদাসী যে সুরের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে নিজেকে আর সুর দিয়ে ভিজিয়ে অপরের শ্রান্তি বিমোচন করে। আসুন না আসরে আমার একদিন?

উদগ্রীব হয়ে শিপ্রাদেবী চেয়ে রইলেন। শাহজাদা তা লক্ষ্য করে বিব্রত হলেন। মুখে ভদ্রতা এনে বললেন–যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ও রসে আমি বঞ্চিত।

ঃ থাকবে না থাকবে না। এ বঞ্চনা আলীজার একবিন্দুও থাকবে না। কষ্ট করে একদিন আসুন, একদিনেই এর স্বাদ আপনি পুরোপুরি পেয়ে যাবেন।

ঃ সত্যি?

ঃ বিলকুল বিলকুল। একদিনেই দেখবেন, আপনার নেশা ধরে গেছে। আসলেই সঙ্গীত তো একটা পরম বস্তু। আপনি আসুন, আপনার খেদমতে আমি জান প্রাণ ঢেলে দেবো।

রমণীটির বেপরোয়া আগ্রহ আর বলগাহীন আচরণ দেখে শাহজাদা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একে বাজিয়ে দেখার খাহেশ জাগলো শাহজাদার অন্তরে। তিনি প্রশ্ন করলেন–কি হয় আপনাদের ঐ আসরে!

ঃ গান বাজনা হয়, মন মাতানো গান।

ঃ নাচের ব্যবস্থা নেই?

ফিক্ করে হেসে শিপ্রাদেবী বললেন–তা আলীজা চাইলে, ওটিও অপুরণ রাখা হবে না। আলীজার জন্যে না হয় নিজেই আমি নাচবো।

ঃ শরাব? আউরত?

সলজ্জভাব এনে নব বধূটির মতো শিপ্রাদেবী এবার আঁচল দাঁতে দিলেন। বঙ্কিম নয়নে চেয়ে দাঁতে আঁচল কেটে শিপ্রাদেবী ঈষৎ হাস্যে বললেন– আলীজার কোন আশাই অপূরণ রাখা হবে না।

ঃ বটে!

ঃ আপনি আসুন। আপনার জন্যে একেবারেই একক আর নিরিবিলি এক আসর সাজিয়ে রাখবো আমি।

শাহজাদা গম্ভীর হলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–হুঁউঁ!

ঃ জি?

ঃ হয়তো বা যেতাম। কিন্তু আর আমি যাবো না।

ঃ কেন কেন?

ঃ আপনার আসরের যে কুৎসিত চেহারা আপনি আমাকে দেখালেন, তাতে আমার অত্যন্ত ঘেন্না ধরে গেছে। ছিঃ!

শাহজাদার নাকমুখ কুঞ্চিত হল। শিপ্রাদেবী প্রচণ্ড এক হোঁচট খেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন- জি না আলীজা, আমাকে ভুল বুঝবেন না। ওসব কিছুই ওখানে থাকে না বা কারো জন্যেই সে ব্যবস্থা করা হয় না। কেবল আলীজার খাতিরেই ওসবের ব্যবস্থা করতে চেয়েছি আমি। ভুল না বুঝে, মেহেরবানী করে স্রেফ আমার গান শুনতেই আসুন আপনি।

ঃ গান?

ঃ জী-জি। স্রেফ গান দিয়েই আলীজাকে আপ্যায়ন করবো আমি। গান শুনতেই আসুন–

শাহজাদা আরো অধিক গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– আপনি একজন সম্মানী লোকের ভাগিনেয়ী। তাই অন্য কিছু বলবো না। আপনি আমাকে মাফ করবেন। ওটাও আমার না-পছন্দ!

শাহজাদা সরে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। শিপ্রাদেবী মরিয়া হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং আফসোস্ করে বললেন—সঙ্গীতও আলীজার না-পছন্দ? সঙ্গীতকেও ঘৃণা করেন আলীজা?

শাহজাদা থমকে গিয়ে বললেন–মানে?

ঃ সঙ্গীত পরম বস্তু। এর উপরও অশ্রদ্ধা আপনার?

শাহজাদা পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-সঙ্গীতের মতো সঙ্গীত হলে, তা আমার অশ্রদ্ধার বস্তু নয়। সেটাকে আমি ভক্তি ভরে শ্রদ্ধা করি।

ঃ তবে?

শাহজাদা এবার শাণিতকণ্ঠে বললেন—তবে গায়ক যখন নিজের স্বতঃস্ফূর্ত খেয়ালে বা শ্রোতার সবিশেষ অনুরোধে গান গায়, তখনই সঙ্গীতটা মহিমান্বিত হয়ে

বইঘর.কম ও রোকন
উঠে, পরমবস্তু হয়। কিন্তু গায়ক যখন উপযাচক হয়ে গান শোনানোর জন্যে ধেয়ে আসে, তখন আর সেটা পরম বস্তু থাকে না। তখন সেটা পণ্য। বাজারের নিছক ফেরী করা পণ্য। সঙ্গীতের এ দীনতা আমি বরদাস্ত করতে পারিনে।

তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে শাহজাদা আওয়াজ দিলেন–মুরাদ খান সাহেব, এই মহিলাকে তাঁর মামার কাছে নিয়ে যান–

বলেই তিনি বিদ্যুৎবেগে সেখান থেকে সরে গেলেন।

বিদ্যুৎপিষ্টবৎ শিপ্রাদেবী সেখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। টোপ হিসাবে কাজ করতে নেমে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝেছিলেন, রূপের পসরা আর সম্ভোগের উপাচার তুলে ধরে এ দুনিয়ার সব পুরুষকে নিয়েই অনায়াসে খেলিয়ে বেড়ানো যায়। এই আজকেই তিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন, এ দুনিয়ায় এমন পুরুষও আছেন, খেলিয়ে বেড়ানো দূরের কথা, তাঁর কিঞ্চিৎ অনুকম্পা লাভ করতে হলেও ঢের সুকৃতি আর অনেক পুণ্যফলের প্রয়োজন।

শাহজাদার ফুল বাগিচার সাথেই বাগান রক্ষক মুরাদ খানের দপ্তর। এখান থেকেই মুরাদ খান ফুলবাগিচার মালী-মজুর ও পাহারাদারদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। দুদিকে দুই খোলা বারান্দাবিশিষ্ট এই দপ্তর কক্ষের অর্ধেকটা প্রাচীর কেটে বাগানের ভেতরে গেছে, আর অর্ধেকটা প্রাচীরের এপারে বাগানের বাইরে আছে। কক্ষটির ভেতর দিয়ে বাগানের ভেতরে বাইরে যাওয়া আসা করা যায়। কক্ষটির পুব দিকে খোলা বারান্দার নীচেই উন্মুক্ত ময়দান। কক্ষের সাথে সংলগ্ন এই ময়দানের অংশটুকু আঙ্গিনার আকারে পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ। এই আঙ্গিনার দুধারে সুদৃশ্য দুটি ঝাউ গাছ।

পড়ন্ত বিকেলে শাহজাদা দাউদ খান ঝাউগাছের ছায়ায় এই খোলা আঙ্গিনায় বসেছেন। উদ্যানের মাঝখানে যদিও সুন্দর এক বিশ্রামাগার আছে, তবু কাজ কামের তদারকে এসে শাহজাদা আর শাহী পুরুষদের কেউ কেউ মুরাদ খানের দপ্তরের এই পুব আঙ্গিনায় মাঝে মধ্যে বসেন। সে কারণে প্রাসাদ থেকে কয়েকখানা কুরসী এনে মুরাদ খানের দপ্তর কক্ষে রাখা হয়েছে। তারই একটা কুরসী এনে মুরাদ খান বসতে দিয়েছেন শাহজাদাকে।

কুরসীতে বসে শাহজাদা মুরাদ খানের সাথেই কথাবার্তা বলছেন। দু'চারটি কাজের কথার পর তিনি মুরাদ খানের সাথে রসিকতা শুরু করলেন। বললেন–আচ্ছা খান সাহেব, আপনাদের বস্তির ওদিকে কি জীন-পরী আছে?

মুরাদ খান এ প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে গেলেন। পরে হাসি মুখে বললেন–তা কি করে জানবো হুজুর? আমি তো কখনও দেখিনি।

ঃ অন্যে কেউ দেখেছে?

ঃ দেখেছে বলে কিছু হুজুগে লোকেরা মাঝে সাঁঝে দাবি তোলে। কিন্তু ওরা এতই ফাল্‌তু কথার লোক যে, ওদের কথা বিশ্বাস করাও যায় না। আবার জীন-পরী দেখেছে, এ কথাও বলে না।

শাহজাদা হেসে বললেন–তাহলে কি দেখেছে বলে?

ঃ ভূত। ভূতপ্রেত নাকি সব কুকুর-বেড়াল, হাতি-ঘোড়ার রূপ ধরে ওদের রাস্তা আগ্‌লে দাঁড়ায়, এসব কথা বলে।

ঃ আপনি ওসবে বিশ্বাস করেন?

ঃ জি না হুজুর। ভূতপ্রেত বলে কিছু আছে, এসব আমি বিশ্বাস করিনে। তবে জীন-পরীর কথা কিছু কিতাব পুঁথিতে আছে শুনি। কিন্তু আমি কখনও দেখিওনি, আমি ওসব বুঝিও না।

শাহজাদা রসিকতার মাত্রা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন–আমি দেখেছি খান সাহেব। সুন্দরী মেয়ে মানুষের রূপ ধরে দু'একটা পরীকে ঘোরাফেরা করতে আমি দেখেছি।

মুরাদ খান তাজ্জব হয়ে বললেন–সেকি হুজুর! কোথায় দেখলেন আপনি?

ঃ আপনাদেরই ওদিকে। ডানাকাটা পরী খান সাহেব। স্রেফ ডানাটাই সাথে ছিল না। সে কি রূপ!

ঃ বলেন কি হুজুর!

ঃ এমনি নিখুঁত গড়ন যে, আমি তাজ্জব বনে গেছি। আপনি এক দিনও দেখেন নি?

ঃ জি না হুজুর।

ঃ দেখেছেন' দেখেছেন। খেয়াল করেননি, তাই।

ঃ না হুজুর। কখখনো আমি দেখিনি।

ঃ বলেন কি! দেখেন নি?

ঃ না। কখখনো না।

ঃ তাহলে বোধহয় আমিও দেখিনি খান সাহেব! তাহলে পরী নয়, মানুষই দেখেছি।

ঃ মানুষ?

ঃ তাছাড়া আর কি? ওখানেই আপনার মকান। পরী হলে তো নির্ঘাত দেখতে পেতেন দু'একবার?

ঃ জি হুজুর, তা পেতাম বৈকি।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ মানুষের রূপ পরীর মতোও হয়। হয়না খান সাহেব?

ঃ পরীই দেখলাম না, পরীর মতো হয় কিনা তা বুঝবো কি করে হুজুর?

ঃ তাইতো। আমিও তো পরী দেখিনি। তাহলে পরীর মতো মনে হলো কি করে?

ঃ গল্প শুনে শুনে হুজুর। সুন্দর মুখ দেখলে মানুষ যে ঐ কথাই বলে।

ঃ এই ঠিক বলেছেন। আপনারা সাবেক লোক খান সাহেব। আপনাদের মগজের তেজই আলাদা।

ঃ হুজুর।

ঃ আমরা একেবারেই হাল আমলের মানুষ। অল্পতেই মগজ আমাদের গুলিয়ে যায়। আপনাদের ঐ বজরাঘাটে দু'খানা মুখ দেখলাম। একটাকে মনে হল নির্ঘাত একটা পরী। কি ছেলেমানুষী বলুন? আপনার মত পাকা মগজ হলে এ ভুল কি আমার কখনও হতো?

মুরাদ খান হেসে বললেন–হুজুর যে কি বলেন।

ঃ আপনাদের ঐ দিকের ঘটনা। আপনারাও দেখেছেন। কিন্তু পাকা নজরতো। তাই মানুষকে আপনারা মানুষ বলেই ভাবেন। আমাদের মতো পরী বলে ভুল করেন না।

মুরাদ খান ফের হেসে বললেন–হুজুর আমাদের বড়ই রসিক।

এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন সহকারী সালার রেজা খান। হাজির হয়েই রেজা খান সাহেব বললেন–এই যে শাহজাদা, আপনি এখানে? চলুন–চলুন, এখন আমার পুরোপুরি অবসর। অনেকদিন পর বেরিয়ে পড়া যাক আবার–

শাহজাদা কুরসী থেকে উঠে এসে উষ্ণদীলে রেজা খানকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং মুরাদ খানকে আর একখানা কুরসী আনার নির্দেশ দিলেন। রেজা খান সাহেব আপত্তি তুলে বললেন– আর বসাবসি কি? বেলাতো আর বেশি নেই। বেরিয়ে পড়ি চলুন–

শাহজাদা হেসে বললেন–আরে চাচা, অনেকদিন যাবত কোন কথাই হয়নি আপনার সাথে। বসুনতো আগে একটু। এরপর যেদিক হয় বেরুবো।

মুরাদ খান কুরসী এনে শাহজাদার একপাশে পেতে দিয়ে চলে গেলেন। কুরসীতে এসে বসতে বসতে রেজা খান বললেন–কথাবার্তা বলার জন্যেই তো বেরিয়ে পড়তে বলছি। শহরের বাইরে কোন ফাঁকা জায়গায় বসি গিয়ে চলুন।

ঃ হ্যাঁ যাই। তা কোনদিকে যাবেন বলে ভাবছেন?

একটু চিন্তা করে রেজা খান উৎসাহ ভরে বললেন–ঐ নদিয়া কা পাস্! বস্তির ঐ বজরাঘাটে।

ঃ চাচা!

ঃ শাহজাদা যেখানে খুবসুরাতের তুফান দেখে এসেছেন, সেখানেই যাই চলুন। নসীবগুণে ফের যদি–

হাসতে লাগলেন রেজা খান। শাহজাদা তামাশা করে বললেন–না চাচা, ওদিকে যেতে এখন আমি রীতিমতো ভয় পাই।

ঃ ভয়! কেন–কেন?

রসিকতার রস লেগেই ছিল শাহজাদার দীলে। তিনি বললেন– জীন-পরীর জরুর কিছু আসর আছে ঐ ঘাটের উপর। ওখানে গেলেই, ভাল-মন্দ একটা কিছু নির্ঘাত ঘটে যাবে, এই আমার ধারণা

ঃ কেয়াবাত! জীন-পরী?

ঃ জীন নাহোক, আমার ধারণা ওখানে নির্ঘাত কিছু পরীবিবি বাস করেন। মওকা পেলেই ওঁরা আমাদের নানাভাবে চমকে দেন!

ঃ বলেন কি?

ঃ এই দেখুন না, সেখানে গিয়ে সেবার আচানকভাবে কি একটা লড়াইয়ের মধ্যে পড়তে হলো আমাদের? গেলাম আমরা বেড়াতে, লড়াই করতে নয়। তবু দেখুন, কি এক অবাঞ্ছিত ঘটনা আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে পড়লো!

ঃ আচ্ছা।

ঃ এরপর আবার দেখুন, তখনই যদি ফিরে আসি আমরা, তাহলে আর কিছু ঘটেনা। কিন্তু যেই সেখানে বিশ্রাম নিতে বসলাম, আর অমনি কি এক জঙ্গী পরীর পাল্লায় পড়ে গেলাম! বস্তির মেয়ের রূপ ধরে বজরার উপর দাঁড়িয়ে এই মুলুকের খোদ এক শাহজাদাকে কি নাকানী-চুবানীটাই না খাইয়ে দিলেন পরীবিবি। কি তাঁর বেগম সাহেবী মেজাজ!

রেজা খান আবার হাসলেন। হেসে বলরেন–ওটা পরী? মানুষ নয়?

ঃ আলবত নয়। তখন অবশ্য মানুষই মনে হয়েছিল। কিন্তু ওদের পরবর্তী কাণ্ড দেখে সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

ঃ পরবর্তী কাণ্ড!

ঃ আপনি তো গেলেন লড়াইয়ে। কিসে যে আমাকে টানতে লাগল বুঝতে পারিনি। আমি একা একাই ফের চলে গেলাম সেই বজরাঘাটে। ঘাটে গিয়েই বুঝলাম, এ টান কোন মামুলি টান নয়, বিলকুল মরণটান। ঐ পরীবিবিরই গায়েবী টান। সেই টানে

বইঘর.কম ও রোকন
ঘাটে গিয়ে বসতেই ফের উনি হাজির হলেন। এবার কোন বোরকাঢাকা বেশে নয়, খোলামেলা পরী রাণীর বেশে। কি মারাত্মক সে রূপ চাচা! দেখেই আমার মাথা মুন্ডু বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলো। কতক্ষণ বেহুঁশেই প্রায় ছিলাম। পরে যখন কোনমতে টলতে টলতে ঐ গায়েবী আছরের বাইরে চলে এলাম, তখনই আমার হুঁশ হলো। বুঝলাম, বিলকুল এ সব পরীর কাণ্ড। বজরার ঐ বোরখাঢাকা পল্লীবিবি আর কদমতলার বোরখাখোলা রঙ্গিলা বিবি আসলেই কোন ইনসান নয়, অশরীরী জীব। হয়তো বা ঐ এক পরীরই কাণ্ড! কায়দায় পেয়ে আমাকে নিয়ে মশ্‌করা করে গেলেন।

রেজা খানের চোখে মুখে হাসির জের লেগেই ছিল। ঐ ভাবেই ফের তিনি প্রশ্ন করলেন–তা কি ধরনের মশ্‌করা উনি করলেন?

ঃ আলাদা ধরনের চাচা। এবারের মশ্‌করাটা ছিল একদম অন্য রকমের। সঙ্গে আবার একজন সখীও উনি এনেছিলেন।

বলেই শাহজাদা সেদিনের ঐ কদমতলার ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে গেলেন এবং তৎপরেই কপট বিস্ময়ে বললেন–খানদানী মহলেই যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না, বস্তি-পল্লীর ঝোপঝাড়ে সেই দুর্লভ রূপ কোত্থেকে আসবে?

ঃ আচ্ছা তাহলে ঘটনা এই দাঁড়াচ্ছে যে, ওরা কেউ মানুষ নয়, অশরীরী জীব!

ঃ বিলকুল-বিলকুল। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ঃ তাহলে তো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার! তা ঐ জীবগুলো কি শাহজাদাকে এখনও টানে?

ঃ টানে চাচা, টানে। শয়নে-স্বপনে হরওয়াক্ত ওরা আমাকে টানে, আর আমার দীলের মধ্যে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়।

ঃ তাজ্জব! কোনটা? বোরখাঢাকা বোরখাখোলা বিবি দু'টোর কোনটা?

ঃ দু'টোই-দু'টোই। একটার দীলের টান আর একটার দেহের টান–এই দুই টানেই কমবেশি এখন আমাকে টানে ওরা।

ঃ হুঁউঁ! নির্ঘাত তাহলে ধরেছে।

ঃ ধরেছে মানে?

ঃ বিমারে ধরেছে, বিমার। পরীবিবির আছর। আর দেরি করা ঠিক নয়। জলদি জলদি চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

ঃ চিকিৎসা?

ঃ কোন ইসিম-কালাম তাবিজ-পল্‌তের চিকিৎসা নয়, একদম আখেরী চিকিৎসার প্রয়োজন?

ঃ সেটা আবার কেমন চিকিৎসা?

ঃ যেভাবেই হোক, তালাশ করে ঐ আস্ত পরী দু'টোকে লোহার শেকলে বেঁধে এনে দু'টোকেই একসাথে শাহজাদার পদতলে হাজির করা প্রয়োজন। খোদ শাহজাদার উপর নজর দেয়ার মজাটা বুঝিয়ে দেয়ার দরকার।

ঃ তা চিকিৎসাটা মন্দ নয়। কিন্তু চাচা ওদের তালাশ করে পাবেন কোথায়?

ঃ ঐ বস্তিতে তালাশ করলেই পাওয়া যাবে।

অবিশ্বাসের সুরে শাহজাদা বললেন–ইচ্ছে করলে চাচা তা করে দেখতে পারেন। তবে আমি নিশ্চিত যে, সেটা তাঁর পণ্ডশ্রমই হবে।

ঃ কেন কেন?

ঃ বললামই তো, ওরা ঐ বস্তির বাসিন্দা নয়? নির্ঘাৎ কোন জৌলুশদার মহল থেকে উড়ে আসা জীব। দু'দিনের জন্যে হাওয়া খেতে এসে আমাদের নিয়ে এই মশ্‌করা উনারা করে গেলেন। ইতিমধ্যেই ওরা উড়াল দিয়েছে কবে!

ঃ তা হবে কেন? ঐ যে একজন বললেন, এই বস্তিতেই তার মকান?

ঃ ভাঁওতা ভাঁওতা। এমন ভাঁওতা দিতে ঐ পরী-বিবিরা উস্তাদ। বস্তির ঝোপঝাড়ে ঐ রকম উচ্চমানের হুরী-পরী থাকেনা।

ঃ থাকেনা?

ঃ কখ্‌খনো না। ওখানে যারা থাকে তারা হুরীপরী নয়। ঐ মামদোমিয়াদের কোদালদাঁতি প্রেয়সী। শেওড়াতলার কেওড়াতলার রুক্ষকেশী পেত্‌নি। অমূল্যধন ভাগাড়ে পড়ে থাকে না।

ঃ কিন্তু শাহজাদা, যে মানিক রাজাবাদশাহর ভাণ্ডারেও তালাশ করে পাওয়া যায় না, সে মানিক তো আবার রাস্তায়-পথের ধুলোতেও গড়ায়।

ঃ চাচা!

ঃ এত বিতর্কের দরকার কি? শাহজাদা এযাযত দিন, আমি মাঠে নেমে পড়ি। লোক লাগিয়ে খোঁজ নিলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করে শাহজাদা বললেন–খোঁজ নেবেন?

রেজা খান বিজ্ঞের মতো বললেন–না নিয়ে উপায় কি? শাহজাদাকে তো আর বিমারের মধ্যে ফেলে রাখা যাবে না? খোঁজ নিয়ে আগে ওদের হদিস ঠিকানা বের করি। ওদের অবস্থান আর পরিবেশ জানার পরও বিমার যদি না ছুটে, তাহলে ওদের বেঁধে আনাই হবে এ বিমারের শেষ চিকিৎসা।

শাহজাদা স্মিতহাস্যে বললেন–চাচা বিজ্ঞজন। তিনি যা ভাল বোঝেন তার উপর আর কথা কি?

ঃ বেশ-বেশ। তাহলে এবার বলো, কোনটার খোঁজ করবো আগে? ঐ বোরখাঢাকা পরীটারই আগে খোঁজ করবো কি? ওটা বড় গুণবতী।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কিন্তু চেহারা? চেহারা যদি কিম্ভূতকিমাকার হয়? মানে উনি যদি খ্যাঁদামুখী হন?

ঃ তাও হতে পারেন।

ঃ তাহলে?

ঃ তাহলে ঐ খোলা পরীরই খোঁজটা আগে চালাই। চেহারা তো দেখাই আছে শাহজাদার!

ঃ কিন্তু যদি মাকালফল হয় ওটা? ঐ রং বর্ণের তলে যদি কাকের খাদ্যই থাকে স্রেফ?

ঃ তাও থাকতে পারে।

ঃ তাহলে?

ঃ তাহলে আর কি? পথ তাহলে একটাই। দু'টোকেই একসাথে ধরে এনে দু'টোরই মাথা কেটে নামিয়ে দেয়া। এরপর রূপবতীর মাথাটা গুণবতীর দেহের উপর চাপিয়ে দিলেই ব্যস্! মুসিবত সাফ। রূপ গুণ একসাথে একটার মধ্যেই হাসিল।

পুনরায় ঈষৎ হেসে শাহজাদা বললেন–তাহলে তো দুজনই মরে যাবে চাচা। মাথা কাটলে কেউ কখনো বাঁচে?

এবার রেজা খান সত্যি সত্যিই গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–বাঁচতে কি আসলেই ওদের শাহজাদা দেবেন? আগুণ যদি পতঙ্গকে টানতে শুরু করে, পতঙ্গ আর বাঁচে?

ঃ চাচা!

ঃ ওরা কাঙ্গালের দুহিতা কাঙ্গালীনী। কাঙ্গালিনীর দিকে যদি বাদশাহর ছেলে হাত বাড়ায়, কাঙ্গালিনীর ভরাডুবি তখনই শেষ হয়ে যায় শাহজাদা। ওদের কিস্তি রাজা বাদশাহর ঘাটতক্ পৌঁছে না।

ঃ চাচা!

ঃ শাহজাদা দানেশমন্দ। এর বেশী কিছু বলার নেই।

এবার শাহজাদাও গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনিও গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–কথাটা মূল্যবান। তবে চিরসত্য নয়।

ঃ শাহজাদা!

ঃ হাত বাড়ানোর মতো বিপুল কোন খাহেশ শাহজাদার দীলে এখনও পয়দা হয়নি। তবে পয়দা যদি হয়েই যায় কখনও, তাহলে ওদের ভরাডুবির প্রশ্নই কিছু থাকবে না। জেদী বলে শাহজাদার মস্ত একটা বদনাম আছে। কিস্তি ওদের কূলে তিনি ভেড়াবেনই ইনশাআল্লাহ।

ঃ শাহজাদা!

ঃ রাজার ঘাটের বদলে কাঙ্গালের ঘাটে নামতে যদি হয় শাহজাদাকে, তা নামতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত বোধ করবেন না।

এমন সময় মুরাদখান এসে শাহজাদার মুখের সামনে দাঁড়ালেন এবং ইতস্তত করে বললেন–হুজুর–

শাহজাদার চিন্তাসূত্র কেটে গেল। কিছুটা অপ্রসন্ন কণ্ঠে তিনি মুরাদ খানকে প্রশ্ন করলেন–কিছু বলবেন?

ঃ একটা আরজ ছিল হুজুর।

ঃ আরজ! কি আরজ?

ঃ বেলা তো প্রায় ডুবে এলো, এখন একটু ছুটি পেলে আমার বড়ই উপকার হতো।

ঃ উপকার?

ঃ জি হুজুর। আজ দুপুরে এসে হুজুরদের দেয়া মকানে আমি সপরিবারে উঠেছি। ছুটিটাতো একবেলার নিয়েছিলাম হুজুর, তাই পুরোপুরি সামাল দিতে পারিনি। মালমাত্তা কিছু কিছু বাইরেই ফেলে রেখে এসে নকরীতে সামিল হয়েছি। ওগুলো দিনের আলোতেই ঘরে তুলে নেয়ার জন্যে–

শাহজাদা বিস্মিত হলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন–এ্যাঁ! সেকি! সে কথা তো আগে বলবেন আপনি? আগে বললে এ বেলাও আর কাজে আসতে হতো না! যান-যান। এহ্! বেলাটা শেষই হয়ে গেছে প্রায়!

কৃতজ্ঞচিত্তে মুরাদ খান বিদায় নিলেন। রেজা খান সখেদে বললেন– ব্যাস্! হয়ে গেল বাইরে যাওয়া! শাহজাদা স্রেফ খোয়াব দেখেই গোটা বেলাটা কাটিয়ে দিলেন।

শাহজাদা বললেন–জি? খোয়াব দেখে?

রেজা খান বললেন–বিলকুল খোয়াব। যাঁদের নিয়ে শাহজাদা এই সব চিন্তাভাবনা করছেন, কাঙাল হলেও, দীল বলে একটা কিছু তাদেরও আছে। সেই দীল যদি তাদের ইতিমধ্যেই অন্য কোথাও খরচ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আর শাহজাদার এসব ভেবে লাভ কি? স্রেফ মনোকষ্ট বাড়ানো বৈ তো নয়?

শাহজাদা হুঁশে এলেন। হুঁশে এসেই আওয়াজ দিলেন–কেয়া গজব! তাইতো? খোয়াব–খোয়াব, বিলকুল খোয়াব চাচা। ঠিক বলেছেন আপনি।

ঃ শাহজাদা!

ঃ ইস্। খামাখা কি আজগুবি খোয়াব দেখছি বসে বসে। ওদিকটা চিন্তাই করে দেখিনি। দূর-দূর নিন, উঠুন। আর না হোক একটু হাঁটাহাঁটি করি খানিক।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাদা দাউদ খান।

বাহির মহলের এই ফুল বাগিচার দক্ষিণ পাশে খোলামেলা জায়গায় পর পর কাতারবন্দি বেশ কয়েকটি একতলা বিশিষ্ট সরকারী বাসভবন। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের

বইঘর.কম ও রোকন
বাসভবন হলেও, বাড়িগুলোতে আভিজাত্যের পরশ আছে। শাহী প্রাসাদের কাছাকাছি অবস্থিত বলে প্রাসাদের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে এগুলোও সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মকানই বড়সড়ো, আর একাধিক কক্ষ-প্রাঙ্গণ বিশিষ্ট। এরই একটা মকানে মুরাদ খান দুপুরে এসে সপরিবারে উঠেছেন। ফিরোজাবানুকে নিয়ে সামানরক্ষী মাসুম গজনবীও এই কাতারবন্দি মকানগুলির একটিতে পার হয়েছেন। তবে তাঁরা কদিন আগে এসেছেন বলে সব কিছুই সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন। মুরাদ খান একেবারেই অসময়ে এসে পড়ায় তাঁর সামানগুলো ঘরে কিছু উঠেছে আর কিছু বাইরেই এখনও পড়ে আছে।

মুরাদ খান এসেই এগুলো নিয়ে টানাটানি করতে লেগেছেন। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে শাহজাদা দাউদ খান আর রেজা খান সাহেব এই দিকেই চলে এলেন। খোলা জায়গায় অবস্থিত হলেও মকানগুলো প্রত্যেকটিই প্রাচীর দিয়ে পর্দা করা। প্রশস্ত উঠোন প্রাঙ্গণ ভেতরে রেখে চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সুতরাং মকানবাসীদের নিয়ে শাহজাদাদের সংকোচের ভয় ছিল না। এই বসতিগুলোর কাছাকাছি এসেই তাঁরা দেখতে পেলেন, প্রাচীরের বাইরে ফেলে রাখা সামানের কিছু বড় বড় বোঝা গাঁঠরি নিয়ে বৃদ্ধ মুরাদ খান একা একাই টানাটানি করছেন। ঘটনাটি লক্ষ্য করে শাহজাদারা এগিয়ে এলেন এবং কাছে এসে প্রশ্ন করলেন–একা কেন?

শাহাজাদাদের দেখে মুরাদ খান বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শাহজাদা আবার ঐ প্রশ্ন করলেন। কপালের ঘাম মুছে মুরাদ খান এর জবাবে বললেন–কি করবো হুজুর! আমার পরিবারের আর কোন পুরুষ মানুষ নেই তো, তাই একা ছাড়া আর–

অত্যন্ত তাজ্জব হয়ে শাহজাদা বললেন–সেকি! আপনার অধীনে একপাল মালী মজুর খাটে, পাহারাদারও বেশ কয়েকজন আছে। আপনিই ওদের উপরওয়ালা। হুকুম করলেই তো ওরা এসে হাতে হাতে সামানগুলো ঘরে আপনার তুলে দিতো!

সংকুচিত হয়ে মুরাদ খান বললেন–তা কি করে হয় হুজুর? এটা আমার নিজের ব্যাপার, ব্যক্তিগত কাজ। ব্যক্তিগত কাজে তো সরকারী লোক নিয়োগ করতে পারিনে।

শাহজাদা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হতবুদ্ধি হয়ে তিনি বললেন– তার মানে?

ঃ সরকারী কাজের জন্যেই সরকার থেকে মাহিনা দিয়ে রাখা হয়েছে ওদের, আমার জন্যে রাখা হয়নি হুজুর। আমার খেদমতে তাদের লাগাবো কি করে? নিজে যদি মাহিনা দিয়ে নওকর রাখতে পারতাম, তাহলে সে খেদমত করতো আমার।

ঃ কিন্তু তাই বলে এই সামান্য কাজটুকুও সরকারী লোক দিয়ে করা যাবে না?

ঃ জরুর যাবে না হুজুর! যেটা আমার হক নয়, সেটা আমি নিতে যাবো কেন?

শাহজাদা অধৈর্য হয়ে বললেন– নিলে তা দেখছে কে আর বারণই বা করছে কে?

মুরাদ খান অবিচল কণ্ঠে বললেন– কেউ না দেখলেও তো একজন তো দেখছেন হুজুর। বারণটাও তিনিই করে রেখেছেন। হারাম-হালালের নির্দেশটা তাঁর অজানা কারো নয়?

বইঘর.কম ও রোকন

অপরিসীম বিস্ময়ে শাহজাদা রেজা খানের মুখের দিকে তাকালেন। রেজা খান অস্ফুট কণ্ঠে বললেন–মানিকটা ধুলোয় কিভাবে লুকিয়ে থাকে, দেখুন!

অভিভূত শাহজাদা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি নির্দেশের সুরে মুরাদ খানকে বললেন–ভেতরে যান। মা বোনেরা যাঁরা আছেন, যে কক্ষে মাল উঠবে সেখান থেকে তাদের অন্য কক্ষে যেতে বলুন। বলুন, অন্দরে বেগানা মানুষ আসছে।

–বলেই শাহজাদা গিয়ে একটা বড় গাঁঠরিতে হাত লাগালেন। রেজা খানও হাত দিলেন আর একটাতে। তা দেখে মুরাদ খান হৈ হৈ করে উঠলেন। তিনি আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন—দোহাই হুজুর, দোহাই আপনাদের! আমাকে গুণাহগার করবেন না হুজুর–

শাহজাদা শক্তকণ্ঠে বললেন–আপনি কি চান, আমরা গুনাহ্গার হই?

ঃ হুজুর–

ঃ মুনিবের যারা অহরহ খেদমত করে, তাদের কষ্টে এগিয়ে আসা মুনিবেরই দায়িত্ব। মুনিব তার দায়িত্ব পালন না করলে সে গুণাহগার হবে না?

ঃ কিন্তু তাই বলে এমন কাজ আপনারা করবেন–মানে আপনাদের মতো খানদানী লোক–

ঃ কেন, খোলাফায়ে রাশেদীন যা করেছেন, আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) নিজ হাতে যা করেছেন' তার চেয়ে কোন হীন কাজ করছি আমরা, না তাঁদের মর্যাদার কাছে আমাদের এই খানদানীর মূল্য আছে কিছু?

ঃ না-না মানে একি কাণ্ড একি কাণ্ড–

মুরাদ খান ছটফট করতে লাগলেন। গাঁঠরিটা কাঁধে তুলতে তুলতে শাহজাদা বললেন–লোক ডেকে এনেও একাজটা করিয়ে নেয়া যেত। কিন্তু আমরা জোয়ান মানুষ–সেপাই আদমী। আর কাজটাও স্রেফ এই কয়টি মাত্র মাল একটু ভেতরে দিয়ে দেয়া। এ নিয়ে খামাখা এত হৈ চৈ করার গরজটা কি?

মুরাদ খান তবুও আপত্তির সাথে বলতে লাগলেন– না-না হুজুর, এ হয় না–এ হয় না।

শাহাজাদা নাখোশ হলেন। ফের তিনি শক্তকণ্ঠে বললেন–খান সাহেব, আমি মুনিব। আমি আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছি, তা পালন না করে আপনি কিন্তু গুনাহ্র মাত্রাই বাড়িয়ে চলেছেন শুধু। আমি চাই, আপনি আমার নির্দেশ পালন করবেন আগে।

বাধ্য হয়েই মুরাদ খান অন্দরে ছুটে গেলেন। একটু পরে জানান দিয়ে শাহজাদা ও রেজা খান মাল নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন এবং দুই তিনটি খেপ দিয়ে তামাম কিছু ভেতরে তুলে দিলেন।

বইঘর.কম ও রোকন
পথেই মহিষাল তার মহিষ নিয়ে যাচ্ছিল। মহিষের উপর নজর পড়তেই ভয়ানকভাবে চমকে গেল অশ্বটি। আতঙ্কে সে বিপুলবেগে লাফিয়ে উঠে রাস্তা ফেলে টাঙ্গা নিয়ে ভাগাড়ের দিকে ছুটতে লাগলো। অশ্বের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে টাঙ্গাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে টাঙ্গা থেকে নামলো। কিন্তু সে অশ্বটির মাথার দিকে না পৌঁছতেই অশ্ব তাকে এমন জোরে লাথি মারলো যে, টাঙ্গাওয়ালা তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হয়ে জমিনের উপর পড়ে গেল এবং তার হাত থেকে অশ্বের লাগাম ছুটে গেল।

রেজা খান থামতেই শাহজাদা সবিস্ময়ে বললেন– তারপর?

ঃ রঙ্গের উপর রঙ্গ। আরোহীরা তো প্রাণের দায়ে সেই থেকে একটানা চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলেনই, তার উপর আবার টাঙ্গাওয়ালার ঐভাবে ভূশয্যা গ্রহণ রাস্তার ধারে জটলারত নেড়িকুকুরের দল সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না। তুমুল প্রতিবাদ তুলে তারা সদলবলে ছুটে এলো টাঙ্গার দিকে। মানুষ আর কুকুরের সমবেত ঐ নিনাদে ভীত-সন্ত্রস্ত অশ্বটি আরো অধিক ভয় পেয়ে আওয়ারা হয়ে গেল। খানা-ডোবা, গর্ত-নালা আর আগাছায় ঢাকা খাদ-ঢিপি, ইট-কাঠ—তামামই অগ্রাহ্য করে অশ্বটি এমনভাবে এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগলো যে, টাঙ্গাটি উল্টো যাওয়ার সম্ভাবনা মুহূর্মুহু মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল। সেই সাথে আর যে বিষয়টি বাস্তব হয়ে উঠতে লাগল তা হল টাঙ্গাটি উল্টে যাওয়ার সাথে সাথেই আজরাইল সাহেব কাজের চাপে হাজির হতে না পারলেও, আরোহীদের হাড়গোড়ের জোড়াগুলো আদৌ অক্ষত থাকবেনা, তামামগুলোই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দম নিতে রেজা খান ফের থামতেই শাহজাদা দমবন্ধ করে বললেন– তারপর?

ঃ কি আর করি! চোখের উপর এ দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে না পেরে দিলাম অশ্ব ছুটিয়ে। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে টাঙ্গার গতিরোধ করে দাঁড়ালাম। আমার তালিমপ্রাপ্ত অশ্বটি লাগামের টান বুঝতে পেরেই সামনের দু'পা উপরে তুলে টাঙ্গার অশ্বের ঘাড়ের উপর এমনভাবে চেপে পড়ল যে, টাঙ্গার বাছাধনটি পেটের তলে মাথা নিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং সমানে ধুঁকতে লাগল।

শাহজাদা দম ছেড়ে বললেন–আচ্ছা!

রেজা খান বললেন–টাঙ্গার গতি থেমে যেতেই আরোহীদ্বয় টাঙ্গা থেকে নামার কোশেশ করলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তখন আতঙ্কে এতটাই মূহ্যমান ছিলেন যে, দাঁড়াতে গিয়ে থপ্ করে আসনের উপরই পুনরায় বসে পড়লেন এবং থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। নামার শক্তি বা হুঁশ-দিশে কিছুই তাঁরা পেলেন না। অবস্থা বুঝে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে অশ্ব থেকে নেমে এসে ক্ষিপ্রগতিতে দুজনকে ধরে ধরে টাঙ্গা থেকে নামালাম এবং ভূলণ্ঠিত লাগামটি তুলে নিয়ে টাঙ্গার অশ্বটাকে ওখানেই এক গাছের সাথে বেঁধে ফেললাম। এরপর নজর ফিরিয়ে দেখি, টাঙ্গাওয়ালা এতক্ষণে জমিন থেকে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে টাঙ্গার দিকে এগিয়ে আসছে।

ঃ তারপর?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আরোহীদ্বয়ের তৎক্ষণাৎ দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না। টাঙ্গা থেকে নামিয়ে দিতেই ওখানেই তাঁরা থপ থপ করে বসে পড়লেন। টাঙ্গার সাথে বেধড়ক বাড়ি খেয়ে তাঁদের কপাল মাথার অনেক স্থানই কেটে-ফুলে গিয়েছিল। ওখানে বসেই কাঁপতে কাঁপতে ভিজে কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে তাঁরা তাঁদের ক্ষতস্থানগুলি মুছতে লাগলেন।

শাহজাদা এবার শান্তকণ্ঠে বললেন–আচ্ছা! আচ্ছা! তা ঐ আরোহী দুইজন কারা ছিলেন, সে খোঁজ কি পেলেন?

ঃ কেন পাবোনা? একজন ঐ প্রৌঢ় জানকীবল্লভ, মানে আমাদেরই সহকর্মী ঐ বসন্ত রায় মহাশয়।

ঃ বলেন কি! আর অন্যজন?

ঃ শিপ্রাদেবী।

চমকে উঠলেন দাউদ খান। বললেন–শিপ্রাদেবী?

ঃ আমাদের রায় সাহেবদের ভাগিনেয়ী, সুন্দরী ও খ্যাতনাম্নী গায়িকা শ্রীমতী শিপ্রাদেবী।

ঃ চাচা!

ঃ উভয়েই বসে বসে কিছুক্ষণ আহাজারি করলেন। আমি সেই ফাঁকে ছুটে গিয়ে আর একখানা বিশ্বস্ত টাঙ্গা ধরে আনলাম এবং পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়ে আমি তাঁদের বাড়ীতে পৌঁছে দিলাম।

ঃ তারপর?

ঃ আমি আমার আস্তানায় ফিরে এলাম।

ঃ ব্যস্?

ঃ ব্যস্!

ঃ তাহলে আর মুহাব্বতে আছাড় খেলেন কোথায়?

ঃ ঐ তো ওখানেই। ঐ যে কাটিগাঙের ধারে পয়লা মোলাকাতেই দীল আমাদের কেটেকুটে দু'ফাঁক হয়ে গেল, ঐ ঘটনার জের ধরেই তো শিপ্রাদেবী এখন আমাকে মুহাব্বতের বাঁধনে বেঁধে ফেলার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছেন।

ঃ কি রকম?

ঃ দাওয়াত একটু ছিলই। তার উপর আহতদের হালতটা দেখার খাহেশে বিকেলে একবার ওদের মকানে গেলাম। রায় সাহেব সহকারে শিপ্রাদেবী বিলকুল তখন সুস্থ। এতবড় একটা উপকারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রায় সাহেবেরা দায়সারা গোছের কিছুটা সৌজন্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু শিপ্রাদেবী একেবারেই আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরলেন আমাকে। তৎক্ষণাৎ আর কিছুতেই উনি উঠতে আমাকে দিলেন না। নিজে নাস্তাপানির আনযাম করে এনে উনি আমাকে বসে থেকে খাওয়ালেন, আমার সাথে গল্প করলেন

বইঘর.কম ও রোকন
এবং তাঁর ঐ হারানো প্রাণ ফিরিয়ে দেয়ার দরুন তাঁর ঐ প্রাণের একমাত্র ঈশ্বর আমি ছাড়া অতঃপর এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই, এ কথা উনি আমাকে বারবার জানালেন।

ঃ আচ্ছা!

ঃ সৌজন্য প্রকাশে তাঁর মাতুলদের কার্পণ্য নিয়ে তিনি যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের ঐ পরিবেশে বসবাস করে তিনি মোটেই তৃপ্ত নন, এ কথাও দুঃখ করে বললেন।

শাহাজাদা দাউদ খান এবার সকৌতুকে বলে উঠলেন–সাব্বাস! তো আর কি চাচা? এবার মওলা বলে তাঁকে নিয়ে ঘর বেঁধে ফেলুন!

ঃ ধীরে ছোট হুজুর ধীরে। এত জল্‌দি জল্‌দি ঘর বেঁধে ফেললে তো মুহাব্বতটা সঙ্গে সঙ্গেই খতম হয়ে গেল। এর সোয়াদ পাবো কি?

ঃ তার মানে?

ঃ জমুক। মুহাব্বতটা দিনে দিনে দানা বাঁধুক। তাঁর আবেগটা ধোপে ধোপে ধোপদুরস্ত হয়ে স্থায়ী হোক-চোখা হোক। তবেই না ঘর বাঁধার বিবেচনা!

ঃ যা-ব্বাবা! চাচা হুজুর তো তাহলে সত্যি সত্যিই ঘায়েল হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যেই দীলে তাঁর এত খোয়াব গজিয়েছে?

ঃ খোয়াব?

ঃ বিলকুল খোয়াব! দুরন্ত দুরাশা।

ঃ কেমন?

ঃ অস্ত্রবিদ চাচা হুজুরের মনস্তত্ব বিদ্যায় কিছু এলেম আছে কিনা, জানিনে। তবে উনি কি বিশ্বাস করেন, শ্রিপ্রাদেবীর গতকালের ঐ আবেগটা এই আজকেই আর অতটা তীব্র আছে? একটুও কমেনি?

ঃ আলবত কমেনি। কমতেই পারে না।

ঃ আচ্ছা। তাহলে চাচা হুজুরের ধারণা, শিপ্রাদেবীর মুহাব্বতের ঐ আবেগটা চিরকাল একই রকম তীব্র থাকবে, তাতে ভাটা কখনও পড়বে না?

ঃ কখখনো পড়বে না। আর হঠাৎ যদি কিছু কিঞ্চিৎ পড়েই, তা নিয়ে চিন্তা নেই। মাঝে মাঝে গিয়ে উস্‌কে দিয়ে এলেই আবার তা জমকে উঠবে।

ঃ উস্‌কে দেয়ার লোক কি চাচা হুজুর একমাত্র নিজেকেই মনে করেন? শিপ্রাদেবীর মুহাব্বতটা উস্‌কে দেয়ার মানুষ কি এ দুনিয়ায় দুস্‌রা আর কেউ নেই?

ঃ থাকুক। যত ইচ্ছে থাকুক। দশজনের সাথে পাল্লা দিয়ে জয়ী হতে পারাতেই না আনন্দ। কে কতটা উস্‌কে দিতে পারে, এবার সেই পাল্লাই চলুক। কে ধান, কে চিটে, প্রমাণ হয়ে যাক।

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে শাহজাদা পুনরায় আওয়াজ দিলেন—মারহাবা—মারহাবা! তাহলে এক তাপেই শেষ পর্যন্ত পাথরও গলতে শুরু করলো?

ঃ পাথর! শাহজাদা পাথর বলছেন কাকে?

ঃ চাচা হুজুরের দীলটাকে। ওখানে যে রসকস কিছু আছে, এ যাবৎ আমার তা আদৌ জানা ছিল না।

রেজা খান সহাস্যে জোর দিয়ে বললেন—তা না থাকলে ছোট হুজুর এখন থেকে জানার কোশেশ করুন। একটু কোশেশ করলেই দেখতে পাবেন, কত রস ঢেউ খেলছে সেখানে।

ঃ তাই নাকি? যাক, শিপ্রাদেবীর তাহলে খদ্দের আর একজন বাড়লো।

ঃ বাড়তেই হবে। স্রেফ শিপ্রাদেবী কেন, আমার এই রস সাগরে একবার যে নাড়া দেবে, খদ্দের তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই হবে আর একজন।

ঃ সেকি কথা! যে নাড়া দেবে, চাচা হুজুর তারই খদ্দের বনে যাবেন?

ঃ জরুর। রস যখন আছে দীলে, তখন দীলদরদী খরিদ করতে দোষ কি?

ঃ তাই বলে একজন দীলওয়ালা জিন্দেগীতে কয়জন দীলদরদী খরিদ করবেন?

ঃ বেশুমার—বেশুমার। পুঁজি যার অনন্ত সে অসংখ্য খরিদ করবে। এ নিয়ে কথা কি?

ঃ সর্বনাশ! তাহলে তো চাচা হুজুরের দিগ্‌দারীর শেষ থাকবে না। বেশুমার দীলদরদী দীলের টানে এসে চাচা হুজুরের ঘরে যখন ভিড় জমাবে, তখন তিনি ঠাঁই দেবেন কোথায়?

ঃ একজনও আসবে না। বুদ্ধির খেল্‌টা তো এখানেই।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ঘর থাকলে তো আসবে? শাহজাদার চাচা হুজুর বেয়াকুফ নন। সে চিন্তা তার আগেহ থেকেই আছ বলে, চালচুলার চিহ্নটিও তিনি কোথাও রাখেননি। এবার আসুক দেখি, কে কোথায় আসবে?

ঃ কেয়া তাজ্জব! প্রেম করবেন ঘর বাঁধবেন না, এ আবার কোন কিসিমের প্রেম চাচা?

ঃ আসমানী—আসমানী। একেই বলে আসমানী মুহাব্বত। শাহজাদাদের মতো ঐসব মামুলি-মুহাব্বত এসব নয়। এর মাহাত্ম্যই আলাদা।

ঃ বহুত আচ্ছা। তাহলে কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, চাচা হুজুর মুহাব্বত করে ঘর কখনও বাঁধবেন না।

ঃ পাগল হয়েছেন ছোট হুজুর। মফুত ফায়দা লুটার মুজেজাই পৃথক। সেধে বিপদ ঘাড়ে নেয় কোন বেয়াকুফ?

বইঘর.কম ও রোকন

রেজা খান হাসতে লাগলেন। শাহজাদা দাউদ খান এ হাসিতে যোগ না দিয়ে নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আর তিনি কোন কথাই বললেন না। তা দেখে রেজা খান ফের হেসে উঠে বললেন—আরে! কি হলো? শাহজাদা যে বিলকুল খামোশ হয়ে গেলেন?

অন্যমনস্কভাবে শাহজাদা বললেন—জি?

ঃ আমার ঐ আসমানী প্রেমের খবরে শাহজাদা ঘাব্ড়ে গেলেন নাকি?

তবুও শাহজাদা নীরব হয়েই রইলেন। আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শাহজাদা স্থিরকণ্ঠে বললেন—চাচা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? মানে নাখোশ যদি না হোন—

হাসি থামিয়ে রেজা খান বললেন—কথা!

ঃ আপনার দীলে সত্যিই কি প্রেম-মুহাব্বত বলে কিছু নেই?

ঃ কিছুই নেই মানে?

ঃ একটা সত্যি কথা বলবেন?

ঃ সত্যি কথা!

ঃ জিন্দেগীতে আপনি কি প্রেমে কখনও পড়েন নি?

এ প্রশ্নের জবাবে রেজা খান শুকনো হাসি হেসে বললেন—পড়িনি মানে? এই তো এখনই এক জলজ্যান্ত প্রেমে পড়ে এলাম—

গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিয়ে শাহজাদা বললেন—ওসব কৌতুকের কথা থাক চাচা। যদি নিতান্তই কোন অসুবিধা না থাকে, তাহলে মেহেরবানী করে আমার প্রশ্নের জবাবটা দিন।

এবার রেজা খানও গম্ভীর হলেন। তিনি অস্ফুটকণ্ঠে বললেন—

শাহজাদা!

ঃ আপনিও একজন রক্তমাংসের মানুষ। অন্তরের একটা নিজস্ব জগৎ মানুষ মাত্রেরই থাকে। আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেও বুঝতে পারিনি, আপনার ভেতরে আসলেই ঐ জগৎটা আছে, কি নেই। যদিও এটা আমার অনধিকার চর্চা, খানিকটা বেয়াদবিও, তবু আমার এই কৌতূহলটা অনেক দিনের। স্রেফ সংকোচের জন্যেই প্রশ্নটা আমি করতে পারিনি।

ঃ ছোট হুজুর!

ঃ আজ যখন প্রসঙ্গটা উঠলোই, তখন প্রশ্নটা না করে মনকে আর প্রবোধ দিতে পারছিনে। আপনার অতীত জিন্দেগী সম্বন্ধে খুব কমই আমি জানি। আপনার দীলের বিশালতার জন্যেই আপনার এত প্রেমে পড়েছি আমি। দীল যাঁর এতবড়, সেই দীলে রস-রং-গন্ধ বলে কোন কিছু থাকবে না, এটা ভাবতে গেলেই আমি পেরেশান হয়ে পড়ি।

আরো অধিক শুষ্ককণ্ঠে রেজা খান বললেন—তার মানে—

ঃ হরওয়াক্ত আপনি কাজের মধ্যেই ডুবিয়ে রাখেন নিজেকে। ব্যক্তিগত জীবনের বহিঃপ্রকাশ পাওয়ার লেশমাত্র অবকাশও আপনি রাখেন না। ওদিকটা কি সত্যিই আপনার নেই, না ইচ্ছে করেই ওটা আপনি চেপে রাখেন? যদি কিছু মনে না করেন, এর সঠিক জবাবটা জানতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

অনেক দূর থেকে কথা বলার মতো রেজা খান বললেন—এসব কথা কেন শাহজাদা?

ঃ ঐ যে বললাম, এটা আমার নিদারুণ এক কৌতূহল? আপনি বিব্রতবোধ না করলে, আমার কৌতূহলটা নিবৃত্ত হয়, এই আর কি!

ঃ শাহজাদা!

ঃ অবশ্য আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি জানতে তা চাইবো না। কথায় কথায় প্রশ্নটা দীলে আমার জাগলো বলেই বললাম।

ঃ কিন্তু—

রেজা খান ইতস্তত করতে লাগলেন। তা দেখে শাহজাদা দাউদ খান ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—থাক চাচা, ওটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ও নিয়ে আমার কৌতূহল থাকা ঠিক নয়। ওসব কথা থাক। আসুন, এবার কাজের কথায় আসি—

সহকারী সালার রেজা খান এবার অকল্পনীয়ভাবে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখমণ্ডলের তামাম রক্ত আস্তে আস্তে উবে গেল। তাঁর চোখে মুখে নেমে এলো মৃত্যুর মতো করুণ এক ছায়া। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ তিনি কথা বলতে পারলেন না। তা লক্ষ্য করে শাহজাদাও হতভম্ব হয়ে গেলেন। করণীয় ঠিক করতে না পেরে তিনিও চুপচাপ বসে রইলেন। অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে রেজা খান বললেন—শাহজাদা, এক মস্তবড় দুর্বল জায়গায় হাত দিয়েছেন আপনি আমার। ভেবেছিলাম, এসব কথা কখনও কারো কাছে বলবো না। অতিকষ্টে যা মাটিচাপা দিয়ে রেখেছি, তা কখনও আর খুঁড়ে তুলতে যাবো না। কিন্তু আপনি এমনই এক ব্যক্তি যাঁর আকিঞ্চন অপূরণ রাখার সাধ্য আমার নেই। কারণ তাতে আমার ব্যথা আরো বাড়বে বই কমবে না।

বিপুল বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে শাহজাদা বললেন—চাচা!

ঃ দীল বলে আমারও একদিন একটা কিছু ছিল শাহজাদা! আর তা মস্তবড়ই ছিল। কিন্তু কতবড় আঘাত যে সে দীলে আমার লাগলো এসে বিনাদোষেই, তা বর্ণনা করে বোঝানোর মতো সাধ্য আমার নেই। লোকে বলে—"অল্প শোকে কাতর আর অধিক

বইঘর.কম ও রোকন

শোকে পাথর"। আপনি ঠিকই ধরেছেন শাহজাদা, আমি এখন বিলকুল সেই পাথরই বনে গেছি।

ঃ সেকি!

ঃ আপনি তো শুনেছেন, আমি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। শুধু ব্রাহ্মণই ছিলাম না শাহজাদা, একেবারেই নৈকষ্য কুলীন এক ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলাম আমি। সেই ব্রাহ্মণ থেকে আজ আমি রেজা খান। মুহম্মদ রেজা খান। কোন্ পরিস্থিতিতে পড়ে যে, সেই ভূয়ো কৌলিন্যবাদের মোহমুক্তি ঘটলো আমার, আর এই মহান সত্যের সন্ধান পেলাম আমি, সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।

বিপুলে আগ্রহে শাহজাদা বললেন—বলেন কি চাচা! সে ইতিহাসটা তাহলে—

ঃ হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি আমি, শুনুন—

নিদারুণ বেদানাভরে রেজা খান যে কাহিনী বর্ণনা করলেন, তার প্রথমাংশের সারমর্ম নিম্নরূপঃ

স্থানের নাম বীরজাওন। (বৃহত্তর রাজশাহী জেলার মান্দা থানায়)। কয়েক পাড়ায় বিভক্ত বৃহৎ এক গাঁ। বীরজাওনে বাস করতেন প্রতাপশালী ভূইয়া শ্রী নয়নচাঁদ রায়। এক কালের "এক টাকিয়া ভাদুড়ী" নামে খ্যাত এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশধর ছিলেন এই নয়নচাঁদ রায়। নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ। জাত্যাভিমানে ভরপুর নয়নচাঁদ রায় স্বীয় ক্ষমতা মজবুত করার ইরাদায় গৌড়ের তৎকালীন সুলতানের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং ফৌজদার পদে বহাল হন। রাজশক্তির সাথে গাঁটছড়া বাঁধার পর নিজ এলাকায় প্রতিপত্তি তাঁর দুর্বার হয়ে উঠে। ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্য আর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সর্ববিধ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এতে করে তাঁর গাঁয়ে ও আশেপাশের ব্যাপক এলাকায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বসতি নিবিড় হয়ে উঠে। নিবিড় হয়ে উঠে অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বসতি। প্রশস্ত এলাকা জুড়ে ব্রাহ্মণকুলের বসতি জমজমাট হয়ে উঠায়, নয়নচাঁদের ভূখণ্ডে বা জমিদারিতে ব্রাহ্মণদের দৌরাত্ম্য আকাশচুম্বি হয় এবং ছুৎমার্গের বিষ বাষ্প তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে, বৈশ্য ও শুদ্রেরা ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে থেকে ফাঁকে ফঁকে বসতি স্থাপন করে সংকুচিভাবে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা একমাত্র ব্রাহ্মণদের এক্তিয়ার-ভুক্ত আগে থেকেই ছিল। এই আমলে সেটা এই ব্রাহ্মণকুলের আরো বেশি কুক্ষিগত হয় এবং শুধু শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মশিক্ষাই নয়, বৈশ্য শুদ্রের জন্যে অন্যান্য শিক্ষাদীক্ষাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ধর্মের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়ে এই ব্রাহ্মণেরা বসে বসে বিধান জারি করতে থাকেন এবং অব্রাহ্মণেরা সকলেই সেই বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করতে থাকেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়া বা তাঁদের নির্দেশের তিল পরিমাণ অবমাননা করাও রৌরব নরকে

বইঘর.কম ও রোকন
যাওয়ার ছাড়পত্ররূপে বিবেচিত হয় এবং পাপিষ্ঠ ও পাষণ্ড নামে ধিকৃত হয়ে অবমাননাকারীকে জীবদ্দশাতেও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়।

ব্রাহ্মণকুলের শিরোমণি এই নয়নচাঁদ রায়ের ঘরে একদিন এক ফুটফুটে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নয়নচাঁদ রায়ের নাম অনুসারে এই পুত্রসন্তানের নাম রাখা হয় কালাচাঁদ রায়। রাজপুত্রের মত চেহারা আর রাজক্ষণে জন্ম বলে অনেকে তাঁকে রাজা বা রাজু নামেও ডাকতে থাকেন। কালাচাঁদ তাঁর আসল নাম হলেও কালক্রমে তাঁর এই ডাক নাম 'রাজু'ই অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শিশুকাল পেরিয়ে বাল্যকালে পদার্পণ করার কালেই কালাচাঁদের পিতা নয়নচাঁদ রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। নয়নচাঁদের মৃত্যুর পরই নয়নচাঁদের জ্ঞাতিবর্গ তাঁর বিষয়বিত্ত হাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং কালচাঁদের প্রতি বৈরী হয়ে উঠেন। তা দেখে কালাচাঁদের মাতামহ কালাচাঁদ বা রাজুকে নিজ আলয়ে নিয়ে আসেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে লালন পালন করতে থাকেন। কট্টর ব্রাহ্মণ হলেও, রাজুর মাতামহ একজন বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। ফলে, রাজুকে আনার পর থেকেই তিনি রাজুর শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা সহ রাজুকে তিনি ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। বাল্যকাল পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করার কালেই রাজু উভয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ধর্মশাস্ত্র আয়ত্ত করে ফেলেন।

রাজসংস্পর্শ ও রাজকর্ম তৎকালে ক্ষমতা ও সম্মানের বিশেষ সনদরূপে বিবেচিত হত। রাজুর পিতা নয়নচাঁদ রায়ও সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। সেই দিকে নজর রেখে রাজুর মাতামহ রাজুকে ফারসী ভাষা শিক্ষার সাথে সাথে যুদ্ধবিদ্যায়, বিশেষ করে ঘোড়সওয়ারীতে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করেন। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে সুলতানের ভরতুকি পুষ্ট অনেক উস্তাদেরাই তৎকালে নিজ গৃহে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের ফারসী ভাষা শেখাতেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরাই এই সকল উস্তাদের কাছে ফারসী ভাষা শিক্ষা করতে আসত। ফারসী ভাষা ছাড়াও এইসব শিক্ষকেরা আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের বাঙ্গালা ভাষাও শেখাতেন।

নিকটবর্তী এমনই এক উস্তাদের কাছে রাজুর মাতামহ কিশোর রাজুকে ফারসী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। পাশাপাশি, আর একজন সামরিক উস্তাদের কাছে রাজুর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন তিনি। একবেলা ফারসী ভাষা শিক্ষা এবং আর একবেলা অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা-এই উভয়বিধ শিক্ষাই রাজু একসাথে হাসিল করতে থাকেন।

মুসলমানের কাছে কোন জাতিভেদ নেই। তাঁদের কাছে সব মানুষই সমান। সুতরাং এই সমস্ত উস্তাদের কাছে জাতিভেদের বালাই বা প্রতিবন্ধকতা ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীর জন্যেই তাঁদের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। অন্য বিষয়ে না হলেও, ফারসী

বইঘর.কম ও রোকন
ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরাই এইসব উস্তাদের কাছে নির্দ্বিধায় আসত।

কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। রাজু যে উস্তাদের কাছে ফারসী ভাষা শিখছিলেন, সেই উস্তাদের কাছে একদিন রজনীকান্ত নামের এক শূদ্র এসে হাজির হলেন। সঙ্গে তার কিশোরী এক কন্যা। ঠিক কন্যা নয়,যেন এক বিকাশ উন্মুখ কুসুম। শুদ্রের ঘরে এতরূপ সচরাচর তো নয়ই, কালেভদ্রেও দেখা যায় না। মেয়েটির যেমনই গড়ন, তেমনই বরণ। রজনীকান্ত নিজেরও সুপুরুষ। প্রথম দর্শনে এই বাপ-বেটিকে ব্রাহ্মণ ছাড়া শুদ্র বলে ধারণা করার সাধ্য কারো ছিল না। জড়িত চরণে ও ভীরু ভীরু চোখে রজনীকান্তের মেয়েটি এসে পিতার পেছনে দাঁড়াল।

উস্তাদ সাহেব এই সময় তালেবে-এলেম রাজুকে ফারসী ভাষার এক নয়াসবক দান করছিলেন। কন্যাসহ রজনীকান্ত এসে আদাব দিয়ে দাঁড়ালে, রাজু ও উস্তাদ উভয়েই চোখ তুলে তাকালেন। মেয়েটির উপর নজর পড়তেই কিশোরকাল-উত্তীর্ণপ্রায় রাজু চমকিত হলেন। এত সুন্দরী মেয়ে তিনি তার নিজস্ব পরিমণ্ডলেও দেখেন নি। মেয়েটির দিকে এক ধেয়ানে পলকখানেক চেয়ে থাকার পরই রাজু তাঁর লজ্জাজড়িত চোখ দুটি নামিয়ে নিলেন। উস্তাদ সাহেব আগন্তুককে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আপনি?

রজনীকান্ত সসম্ভ্রমে বললেন—আজ্ঞে, আমার নাম রজনীকান্ত। রজনীকান্ত দাস। একটা বিশেষ প্রয়োজনে হুজুরের কাছে আমি এসেছি।

উস্তাদ সাহেব বললেন— বিশেষ প্রয়োজন!

ঃ আজ্ঞে হুজুর। আমার এই কন্যাটিকে হুজুরের কাছে দিতে চাই। অনুগ্রহ করে একে কিছু বিদ্যাশিক্ষা দিলে আমি বড়ই বাধিত হই।

ঃ বিদ্যাশিক্ষা মানে? কোন ধরনের বিদ্যা তাকে শিক্ষা দিতে চান আপনি?

ঃ বাঙ্গালা ভাষা হুজুর। বাঙ্গালা ভাষাটা মেয়ে আমার ভাল করে শিক্ষা করুক, এই আমার কামনা।

ঃ আপনার বাড়ি?

ঃ এই তো হুজুর আপনাদের পেছনে ঐ নমঃপাড়ায়।

ঃ তা স্রেফ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে আমার কাছে এনেছেন কেন একে? অন্য কোন শিক্ষকের কাছেও তো এ শিক্ষা একে দিতে পারতেন?

ঃ কে শিক্ষা দেবে হুজুর? আমরা যে জাতিতে ছোট। হুজুরদের কাছে সব মানুষই সমান, মানে কোন জাত বিচার নেই বলেই এসেছি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ বিদ্যাশিক্ষা আমাদের জন্যে নিষেধ হুজুর। শিক্ষা দেয়া তো দূরের কথা, আমার মেয়ে বিদ্যা শিক্ষা করুক, কোন হিন্দুই তা মেনে নিতে চাইবে না।

ঃ বলেন কি!

ঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নীচে আমাদের সমাজে আর কারো বিদ্যাশিক্ষা করার বিধান নেই হুজুর। ইদানিং অবশ্য সরকারের হস্তক্ষেপে কিছু কিছু বিত্তশালী বৈশ্যেরাও একমাত্র ফারসী ভাষা শিক্ষা করার অনুমতিটা আমাদের সমাজ থেকে পাচ্ছে। ঐ ফারসী ভাষাটুকুই। এর বাইরে শাস্ত্রশিক্ষা তো নয়ই, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষারও কোন বিধান আমাদের সমাজ নিচু জাতিকে দেয়না।

ঃ তাহলে আপনি আপনার কন্যাকে এ শিক্ষা দিতে চাইছেন কেন?

ঃ কি করবো হুজুর? কন্যা যে একেবারেই নাছোড়পিণ্ডে। লেখাপড়া সে শিখবেই।

ঃ তাতে আপনার অসুবিধে হবেনা?

ঃ হবে তো অবশ্যই। আর না হোক, এ জন্যে আমাকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু কি করবো হুজুর? এইটিই আমাদের একমাত্র সন্তান। এর আব্দার উপেক্ষা করতে কিছুতেই পারলাম না। ওদিকে আবার এর মা'ও এরই পক্ষে। তাঁরও জিদ্, মেয়ে তার লেখাপড়া শিখুক।

ঃ তাজ্জব!

ঃ তাই বাধ্য হয়েই একে আপনার কাছে এনেছি হুজুর। অদৃষ্টে যা ঘটে, ঘটুক। না হয় দেশান্তরীই হতে হবে শেষ পর্যন্ত। তবু মেয়ে আমার বিদ্যা শিক্ষা করুক।

উস্তাদ সাহেব অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। শিক্ষালাভ মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু একি এক ভূয়ো বিধান! একি এক অযৌক্তিক, অমানবিক ও স্বার্থপর সামাজিক ব্যবস্থা! কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি বললেন—সাব্বাস! আপনার এই মনোবল আর মানসিকতার আমি তারিফ না করে পারছিনে। শিক্ষালাভ আপনার মানবিক অধিকার। সমাজের মিথ্যা আর অসৎ উদ্দেশ্যপ্রবণ বাধা নিষেধ মেনে নিজের অধিকার থেকে নিজেকে আপনি বঞ্চিত করবেন কেন?

ঃ কথা তো আমারও সেইটেই হুজুর। আর সেই জন্যেই সাহস করে করে এগিয়েছি। এখন দেখা যাক, অদৃষ্টে কি ঘ৬৩।

ঃ সবই ঐ একজনের ইচ্ছে। তিনি যেটা চান, তার বাইরে কারো যাওয়ায় উপায় নেই।

ঃ আজ্ঞে—আজ্ঞে।

ঃ তা নাম কি আপনার মেয়ের?

ঃ পুষ্প হুজুর। শ্রীমতী পুষ্পরাণী। পুষ্প বলেই ডাকি আমরা সবাই।

ঃ বাহ্! বেশ মিষ্টি নাম। যোগ্য নাম। আম্মিজানের চেহারাখানও তো বিলকুল পুষ্পের মতোই।

বইঘর.কম ও রোকন

রজনীকান্ত ম্লান হাসি হেসে বললেন—গোবরে পদ্মফুল হুজুর, গরীবের ঘরের আগুন!

উস্তাদ সাহেব বাধা দিয়ে বললেন—আগুন বলছেন কেন? এতো আল্লাহতায়ালার বিশেষ এক রহমত। সাধনা করেও এমন পুষ্প ক'জন লাভ করতে পারে? তা যাক, মেয়ে তো আপনার বেশ বড়সড়ো হয়ে গেছে। অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করতে হলে, আরো কিছু দিন আগে থেকেই শুরু করা উচিত ছিল। এতদিন তা করেননি কেন?

বিপুল উৎসাহ ভরে রজনীকান্ত বললেন—আজ্ঞে না হুজুর, অক্ষর জ্ঞানের উপরেও আরো কিছু লেখাপড়া সে শিখেছে। শুনেছি, হুজুর আমাদের শুধু ফারসী ভাষারই নন, বাঙ্গালা ভাষারও একজন মস্তবড় পণ্ডিত। তাই হুজুরের কাছে এনেছি, বাঙ্গালা ভাষাটা সে কিছু ভাল করে শিখুক।

উস্তাদ সাহেব বিস্মিত হলেন। তিনি বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—বলেন কি! প্রাথমিক শিক্ষা তাহলে ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

রজনীকান্ত হেসে বললেন—আজ্ঞে—আজ্ঞে। কিছু কিছু হয়েছে।

ঃ এ শিক্ষা তাকে দিলেন কে?

রজনীকান্ত নীরব হলেন। পরে একটু ইতস্তত করে বললেন—ওর মা।

উস্তাদ সাহেব আরো অধিক তাজ্জব হলেন। তাজ্জব কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—ওর মা মানে? পুষ্পর মা?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঃ পুষ্পর মা লেখাপড়া জানেন?

ঃ আজ্ঞে। কিছু কিছু জানে।

ঃ আপনি?

রজনীকান্ত লজ্জিতভাবে মাথা নিচু করলেন এবং স্মিতহাস্যে বললেন—আমিও "ক-ব-ঠ" কিছু দায়ে পড়ে শিখেছি হুজুর। চুরি করে শিখেছি। তবে পুষ্পরাণীর জননীর বিদ্যা আমার চেয়ে ঢের বেশি।

ঃ সেকি! সে বিদ্যা তিনি শিখলেন কোথায়?

আবার রজনীকান্ত নীরব হয়ে গেলেন। এরপর তিনি কেবলই ইতস্তত করতে লাগলেন। বুঝতে পেরে উস্তাদ সাহেব রাজুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—ও হ্যাঁ, তুমি একটু ও ঘরে গিয়ে বসো। এই সবকটা একটু পর আবার পয়লা থেকে শুরু করাবো।

পরিস্থিতিটা রাজুও খানিক আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ কথার সাথে সাথেই তিনিও সালাম দিয়ে কিতাবপত্র সহকারে পাশের কক্ষে চলে গেলেন। রাজু গিয়ে পাশের কক্ষে ঢুকলে, রজনীকান্ত প্রশ্ন করলেন—ছেলেটি কে হুজুর?

উস্তাদ বললেন—ওর নাম রাজু। একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। অত্যন্ত সৎ স্বভাবের ছেলে। যেমনই বিনয়ী, তেমনই সরল সহজ। সব রকম সাত-পাঁচের বাইরের ছেলে সে। ওকে নিয়ে কোন চিন্তার কারণ নেই।

ঃ ও, আচ্ছা।

ঃ তা কি ব্যাপার? পুষ্পরাণীর জননী—

ঃ বলছি হুজুর, বলছি—

বলেই তিনি পুষ্পকে উদ্দেশ্য করে বললেন— তুই একটু ঐ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়া। ডাক দিলে আসিস।

পুষ্পরাণী বারান্দায় চলে গেল। রজনীকান্ত উস্তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন— মেয়ে আমার এসব কথা সবই প্রায় জানে। তবু তার সামনে এসব নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয় হুজুর!

ঃ আচ্ছা। তা ব্যাপারটা কি?

ঃ বলবো হুজুর। মেয়েকে যখন আপনার কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে এনেছি, তখন আমাদের কিছু কথা আপনার জানা থাকা ভাল। কারণ এ নিয়ে পরবর্তীতে অনেক প্রশ্নই উঠতে পারে। অবশ্য কথাগুলো খুবই গোপনীয় কথা। আর কেউই জানে না। আপনার ব্যক্তিত্বের অনেক সুখ্যাতি আমি শুনেছি আর সে সমস্ত খোঁজখবর নিয়েই আমি এসেছি। আপনাকে বলতে আমার বাধা নেই।

ঃ তাই?

ঃ এখানকার সবাই জানে, পুষ্পরাণীর জননীও একজন শূদ্রেরই কন্যা। শূদ্রের কন্যাকেই আমি বিয়ে করে এনেছি। কিন্তু ঘটনা তা নয় হুজুর। সে একজন বড় ঘরের মেয়ে। তার বাপ মায়েরা খুব উঁচু জাতের হিন্দু।

ঃ সেকি!

ঃ হুজুর, বিষয় আশয় বলতে আমার পৈতৃক কিছু জমি জিরাত আর একটা দোকান। এখন আমি সংসারী। কিন্তু এককালে আমি মোটেই সংসারী ছিলাম না। অভিনয় করে বেড়াতাম। আমাদের এই ছোট জাতের হিন্দুদের একটা গানের দল ছিল। গানের দলে অভিনয় করতাম আমি। আমরা সংস্কৃত পালা তো জানিনে, বাঙ্গালা পালা গাইতাম। আমার অভিনয়ের তখন খুব সুনাম ছিল হুজুর। আমি বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর করে পাঠ বলতে পারতাম। পাঠ মুখস্থ করার বেলায় অন্য সকলে শুনে শুনে পাঠ মুখস্থ করতো। আমি করতাম পড়ে পড়ে। এই পাঠ মুখস্ত করার জন্যেই আমাকে এর ওর কাছে গোপনে কিছু বাঙ্গালা পড়া শিখতে হয়। দূরদূরান্তে বিভিন্ন জায়গাতেই অভিনয় করার জন্যে আমার স্বগোত্রীয়দের তরফ থেকে ডাক আসতো আমার। এক সময়তো

বইঘর.কম ও রোকন
পাঁচ-ছয় বছর একটানা দেশান্তরীই ছিলাম আমি। এই সময়ের ঘটনা। এক দূর অঞ্চলে আমর অভিনয় দেখে পুষ্পর মা আমার প্রেমে পড়ে হুজুর। বড় জাতের, বড় ঘরের মেয়ে। বিবাহের কোন সম্ভাবনাই ছিলা না। তাই শেষ পর্যন্ত পুষ্পর মাকে চুরি করে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম আমি এবং আমাদের স্বজাতির এক পাড়ায় এসে আমাদের মতে তাকে আমি বিয়ে করলাম। তার পরেই তাকে নিয়ে আমার এই নিজ গাঁয়ে চলে আসি।

ঃ তাজ্জব!

ঃ এরপর তার আর কোন খোঁজখবর কেউ করেনি। সেও প্রায় পনের ষোল বছর আগের কথা। সেই থেকে ভগবানের কৃপায় সুখেই আছি আমরা।

ঃ দাস মহাশয়!

ঃ অত্যন্ত গোপনীয় কথা হুজুর। অনুগ্রহ করে কথাটা গোপন রাখবেন আপনি, এই আমার অনুরোধ।

ঃ আরে না—না। এ নিয়ে কোন দুর্ভাবনা রাখবেন না। আমি একজন মুসলমান আর ঈমানদার মুসলমান বলেই সবাই আমাকে জানে। আমার দ্বারা বেঈমানি কিছু হবে না।

ঃ ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন। তাহলে এখন বুঝুন হুজুর! মাতা-পিতা উভয়েই আমরা কমবেশি কিছু লেখাপড়া জানি। মেয়েকে আমরা নিরক্ষর রাখি কোন প্রাণে!

ঃ ঠিক—ঠিক!

ঃ পুষ্পর মায়ের আশা—লেখাপড়া শিখলে পুষ্পর ভাল পাত্রে বিয়ে হবে। কোথায় কি হবে তা ভগবান জানেন, আমাদের কাজ আমরা করে যাই।

ঃ অবশ্যই—অবশ্যই।

ঃ তাহলে রাজী হলেন তো হুজুর? মানে পুষ্পকে শিক্ষাদানে—উস্তাদ সাহেব এবার নির্মল হাসি হেসে বললেন—আহা এ নিয়ে এত সংকোচবোধ করছেন কেন? শিক্ষাদানেই আমার আনন্দ। আগামিকাল থেকেই পুষ্পকে পাঠিয়ে দিন। আমি আমার সীমিত বিদ্যার যতটা সম্ভব সবটুকুই তাকে শেখাবার চেষ্টা করব।

রজনীকান্ত খুশি হয়ে বললেন—তাহলে দক্ষিণাটা হুজুর—

প্রবল বেগে বাধা দিয়ে উস্তাদ সাহেব বললেন–উঁহুঁ-উঁহুঁ! ওসব কিছু লাগবেনা। লেখাপড়া তার চলতে থাকুক, বিদ্যা অর্জন শেষ হোক, তখন যদি একান্তই কিছু দিতে চান, দেবেন। এখন কোন দক্ষিণার কথা নেই।

ঃ সত্যিই আপনি মহৎ ব্যক্তি হুজুর! তাহলে আগামিকাল কোন সময় পুষ্প এখানে আসবে?

ঃ এই সময়ই—মানে এই বেলাতেই। ও বেলাতে অনেক ভিড়। অনেক ছেলে মেয়ে পড়তে আসে ও বেলায়। এ বেলাটাই নিরিবিলি। একমাত্র ঐ রাজু ছাড়া আর কাউকেই আমি এ বেলায় পড়াইনে। রাজুও খুব ভাল ছেলে। সাতচড়ে 'রা' শব্দ করেনা। দুজনকে দূরে দূরে দুই পাশে বসিয়ে সুন্দর পড়ানো যাবে। কোন অসুবিধে হবে না।

রজনীকান্ত হৃষ্টচিত্রে বললেন—হুজুরের কল্যাণ হোক। তাহলে আমরা এখন আসি হুজুর—

ঃ হ্যাঁ, আসবেন বৈকি। তবে পুষ্পকে ডাক দিন। ওর কাছে দু' চার কথা জেনে নেই।

রজনীকান্তের ডাকে পুষ্প এসে পুনরায় হাজির হলো। উস্তাদ সাহেব পুষ্পকে প্রশ্ন করে তার পাঠের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিলেন। এরপর বিদায়ের অনুমতি জ্ঞাপন করলে পুষ্প ও রজনীকান্ত উভয়েই উস্তাদকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিলেন।

একসাথে ও পাশাপাশি উভয়ের বিদ্যাশিক্ষা চলতে লাগল। উস্তাদের দহলীজের প্রশস্ত মেঝের একপাশে ফরাশের উপর রাজু এবং অন্যপাশে অন্য আর এক ফরাশের উপর পুষ্পরাণী বসে পাঠ গ্রহণ করতে লাগলেন। পুষ্পরাণীকে সবক দিতে বসে উস্তাদ সাহেব দেখলেন, পুষ্পরাণী বাঙ্গালা ভাষায় সত্যি সত্যিই অনেকখানি অগ্রসর হয়ে আছে। এ ছাড়া আরো দেখলেন, পুষ্পরাণী যেমনই মেধাবী, বিদ্যাশিক্ষায় তেমনই সে এক আগ্রহী তালেবে-এলেম। উস্তাদ সাহেব যারপরনাই খুশি হলেন এবং খোশ দীলে পুষ্পরাণীকে এলেম শিক্ষা দিতে লাগলেন। পুষ্পরাণী তর তর করে সবকের পর সবক পার হয়ে যেতে লাগল।

রাজুও ছিলেন একই রকম মেধাবী ও আগ্রহী তালেবে-এলেম। এই দুজনকে শিক্ষা দিতে গিয়ে উস্তাদ সাহেব এতই স্বাচ্ছন্দ্য আর তৃপ্তিবোধ করতে লাগলেন যে, শিক্ষাদানের কাজে এমন তৃপ্তি অন্য কোন তালেবে-এলেমের বেলায় তিনি কখনও পাননি। আদবে ও আচরণে মনোমুগ্ধকর এই দুই ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি তিনি অচিরেই আকৃষ্ট হয়ে গেলেন এবং আপন সন্তানবৎ এই দুইটিকে তিনি স্নেহভরে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন।

একনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর মতো উভয়েই নীরবে পাঠ গ্রহণ করতে লাগলেন। পুথিপত্র হাতে নিয়ে উস্তাদের গৃহে পুষ্পরাণী প্রথম যেদিন পড়তে এল, সেদিনও রাজু তাকে আর একঝলক তন্ময় হয়ে দেখেছিলেন। তার অপরূপ শ্রী আর বিনম্র স্বভাব দেখে সেদিনও তিনি অনেকখানি বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে নিজ পাঠে মনোনিয়োগ করেছিলেন এবং সেই থেকেই পুষ্পর প্রতি আর কোন উৎসাহ প্রকাশ না করে নিজের পাঠ নিয়েই তন্ময় হয়ে রইলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

রাজুর সুদর্শন চেহারার ছোঁয়া কিশোরী পুষ্পরাণীর দীলেও প্রথম দিনেই লেগেছিল। এক অজ্ঞাত শিহরণে তার দীলও কিঞ্চিৎ শিহরিত হয়েছিল। লজ্জাবতী পুষ্প এতে করে আরো অধিক লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। সবক নিতে এসে প্রথমদিন আবার রাজুর উপর নজর পড়ায় পুষ্পরাণী অনেকখানি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শরমে ও শংকায় তার কিশোরী অন্তর ঢিপ-ঢিপ করে উঠেছিল। আঁড়চোখে বারকয়েক রাজুর দিকে চেয়ে সেও তখনই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পাঠ নিতে বসেছিল এবং পাঠ গ্রহণের মধ্যে দিয়েই নিজের জড়তা সে সামলে নিয়েছিল।

অতঃপর রাজুর তরফ থেকে আর কোন ভূমিকা কিছু না থাকায় এবং রাজুকে সুবোধ ও নিরীহ মানুষ মনে হওয়ায়, পুষ্পর দীলের দ্বিধা-সংকাচ আস্তে আস্তে তামামই দূরীভূত হয়ে গেল। সহজ ও নিঃশঙ্কচিত্তে সে তার দৈনন্দিন পাঠ শিক্ষা করতে লাগলো। এক কক্ষে এক উস্তাদের ছাত্রী হয়েও রাজু ও পুষ্প কিছুদিন পরস্পর পরস্পরের কাছে অপরিচিতই রয়ে গেলেন।

দিন কেটে যেতে লাগলো। কিন্তু সময় বড় রহস্যময়ী। দিন যতই অতিবাহিত হতে লাগলো, অপরিচিতের বেড়াও তাঁদের দিনে দিন ততই জীর্ণ হয়ে পড়তে লাগলো। মানুষ সামাজিক জীব। শুরু হলো চোখাচোখী, টুকিটাকি বাতচিৎ, বই পুস্তক নেয়া-দেয়া এবং শেষ পর্যন্ত অবারিত গল্পালাপ ও উচ্ছল হাসাহাসি বেড়ার বালাই একদম উধাও হয়ে গেল। তখন ভাইবোনের মতো উভয়কে নিঃসংকোচ ও দ্বিধামুক্ত দেখে ব্যস্ততার সময় উস্তাদ সাহেব পুষ্পরাণীর সবকের ভার মাঝে মাঝে রাজুর উপর দিতে লাগলেন। দূর এলো কাছে। অন্তর হলো অন্তরঙ্গ। নির্জন ও নিভৃতে একান্ত কাছাকাছি এই দুই কিশোর কিশোরীর হৃদয়ে প্রকৃতির অমোঘ বিধানে অন্তরঙ্গতার উর্বরতায় প্রেমের বীজ অংকুরিত হয়ে গেল।

এগিয়ে চললো সময়। এগিয়ে চললো তালেবে-এলেমদের এলেম। বেড়ে চললো বয়স। গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো প্রেম। আটকে কিছুই রইল না। আটকে রইল শুধু রজনীকান্ত দাসের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। কন্যাকে এলেম শিক্ষা দেয়ার খবর অল্পদিনেই জানাজানি হয়ে গেল। তেড়ে এলেন সমাজপতিরা। www.boighar.com

নয়নচাঁদ রায়ের জীবদ্দশায় নয়নচাঁদ রায় নিজেই ছিলেন ঐ এলাকার সমাজপতি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক জ্ঞাতিভ্রাতা ভুবনচাঁদ রায় সমাজপতির আসন দখল করে বসলেন। ভুবন রায়ের বিদ্যা ছিল অল্প, শাস্ত্রজ্ঞান সীমিত, কিন্তু তাঁর কূটবুদ্ধি ছিল অপরিসীম। নয়নচাঁদ রায়ের বিষয়বিত্তের সিংহভাগ এই ভুবন রায়ই গ্রাস করে নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও অসৎ উপায়ে আরো কিছু বিষয় বিত্ত আগেও তাঁর অর্জন করা ছিল। এই বিষয়বিত্তের কিঞ্চিৎ হাড়-কাঁটা ছড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় ব্রাহ্মণকুল ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি হাত করে ফেললেন এবং একসাথে মোড়ল, সমাজপতি ও শাস্ত্রপতি

হয়ে দুরন্ত দাপটে সমাজ শাসন করতে লাগলেন। শাস্ত্রীয় বিধান-বুদ্ধি বাৎলিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁরই পেটোয়া এক শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ এবং ঐ অঞ্চলের প্রধান পুরোহিত বল্লভ ঠাকুর। বীরজাওনের প্রধান মন্দিরের পূজারী ছিলেন তিনি এবং তাঁরই দেয়া পাঁতি-বিধান ঐ অঞ্চলে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত। তাঁরই পরামর্শক্রমে ভুবন রায় ধর্মীয় অনুশাসনগুলি কার্যকর করতে লাগলেন। সুবিধাভোগের উদ্দেশ্যে আশেপাশের সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও সৌরজগতের মতো ভুবন রায়কে কেন্দ্র করে এক দুর্ভেদ্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে ফেললেন। এই পরিমণ্ডলের ইচ্ছার ও আদেশের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা ব্যাপক ঐ এলাকায় একজনেরও ছিল না।

বাইরে গেলেন রজনীকান্ত দাস। নগণ্য এক শূদ্র। প্রলয় আর পিছিয়ে থাকতে পারে? শাস্ত্রীয় বিধানের মাথায় পদাঘাত করে রজনীকান্ত দাস তার কন্যাকে বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছে, শুদ্র হয়ে জ্ঞান অর্জন করছে, এ খবর সমাজপতিদের কানে গিয়ে পৌঁছামাত্রই ক্রোধে তাঁরা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন। ভুবন রায় গর্জে উঠে বললেন—রজনীকে বোলাও—

রজনীকান্ত হাজির হলে ভুলন রায় সহ সমাজপতিরা একসাথে হুংকার দিয়ে উঠলেন। বিপুল আস্ফালনের সাথে তাঁরা তাঁকে ঘিরে নিয়ে-বসলেন, নরকের ভয় দেখালেন এবং কঠোর শাস্তি ভোগের প্রসঙ্গাদি টানলেন। কিন্তু রজনীকান্ত এসে ঐ যে মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন, ঐ ভাবেই চুপচাপ রইলেন। বিপুল শাসন গর্জন ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও তিনি মাথাও তুললেন না, কথাও বললেন না। কন্যার বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্নে তিনি শুধু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। এতে সমাজপতিরা গোস্বায় ফেটে পড়লেন। তখনই তাঁরা রজনীকে নরকের যাত্রীরূপে চিহ্নিত করলেন, সমাজচ্যুত করলেন এবং 'একঘরে' করে সবার সাথে তাঁর জলচল বন্ধ করে দিলেন।

রজনীকান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। অন্যেরা তো নয়ই, তাঁর প্রতিবেশী নমশূদ্রেরাও সমাজপতিদের ভয়ে রজনীকান্তের সাথে উঠা-বসা, কথাবার্তা ও লেনদেন বন্ধ করে দিলেন এবং সর্বতোভাবে তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এতে করে রজনীকান্তের দোকানের কেনাবেচাও বন্ধ হয়ে গেল। স্থানীয়ভাবে আর কোন খদ্দের না পেয়ে রজনীকান্ত দোকানের পসরা ঘাড়ে তুলে নিয়ে বিভিন্ন হাটে গিয়ে দোকান খুলে বসতে লাগলেন এবং কিছু ভিন্ এলাকার লোকের কাছে আর মুসলমান খদ্দেরের কাছে যা কিছু বেচাকেনা হতে লাগলো, তাই দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে তিনি জীবনযাপন করতে লাগলেন। তবু তিনি কন্যার লেখাপড়া বন্ধ করে দিলেন না।

রজনীকান্ত অনড় রইল দেখে সমাজপতিরা জ্বলেপুড়ে মরতে লাগলেন। আর তাই তাঁরা তাঁকে ঐ একঘরে করেই নীরব হয়ে রইলেন না। ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার

বইঘর.কম ও রোকন

গর্জন ও জানের উপর হুম্‌কি প্রদানসহ তাঁরা তাঁর উপর নানাভাবে অত্যাচার ও জুলুম চালাতে লাগলেন। অসহ্য হয়ে উঠায় রজনীকান্ত স্থানীয় প্রশাসনের শরণাপন্ন হলেন। প্রশাসন থেকে সমাজপতিদের উপর নির্দেশ এলো—তাঁদের ধর্ম ও শাস্ত্রমতে রজনীকান্তকে তাঁরা জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত, একঘরে, আটক-আবদ্ধ বা তাঁদের সমাজ-জামাত থেকে যত প্রকারে বহিষ্কার ও বিচ্যুত করা যায়, তা তাঁরা করতে পারবেন। কিন্তু স্রেফ কন্যাকে বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্যেই তাঁর জানমালের উপর হস্তক্ষেপ করলে তাঁরা রাষ্ট্রের কানুন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হবেন। কারণ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রকার জানমাল হেফাজত করার দায়িত্ব সুলতানের। সহমরণ বা ঐ জাতীয় তাদের নিগুঢ় ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার উপর অবশ্য রাষ্ট্রীয় কানুন কার্যকর হবে না।

এতে করে নিঃসঙ্গ ও বান্ধবহীন হলেও রজনীকান্তের জান-মালের উপর অতিরিক্ত উৎপাত ও জুলুম অনেকখানি প্রশমিত হলো এবং পুষ্পরাণীর পড়াশুনা পূর্ববৎ চলতে লাগল।

০ ০ ০

আসরের নামাযের আজান অনেক আগেই পড়েছিল। এই পর্যন্ত বর্ণনা করতেই রেজা খান ও শাহজাদা দাউদ খান খেয়াল করে দেখলেন, জামাতের নামাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। এটা খেয়াল হতেই তাঁরা তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে মুরাদ খানের দপ্তরকক্ষে আসরের নামায আদায় করলেন এবং তৎপরে তাঁরা পুনরায় এসে পূর্বস্থানে বসলেন। রেজা খানের কাহিনীর শেষাংশ শোনার জন্যে শাহজাদা দাউদ খান উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। ফিরে এসে বসেই তিনি প্রশ্ন করলেন–তারপর চাচা? তারপর কি হল?

পুনরায় শুরু করে রেজা খান বললেন–ব্যাপারটা যদি শুধু পুষ্পর লেখাপড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে হয়তো এর অধিক আর বিশেষ কিছু ঘটত না। অত্যাচার অধিক হলে বা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন অধিককাল সম্ভবপর না হলে, রজনীকান্ত দাস মহাশয় হয়তো এ এলাকা ত্যাগ করে সপরিবারে অন্য কোথাও চলে যেতেন। কিন্তু অতঃপর যে কারণে পরিস্থিতি জটিলতম হয়ে উঠল তা হল, আমার আর পুষ্পরাণীর এই উভয়ের ভালবাসা। রূপগুণ আমার মধ্যে কি দেখে যে পুষ্প এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসল আমাকে তা পুষ্পই জানে। কিন্তু অতুলনীয় রূপসহ যে অপরিসীম গুণাবলী আমি পুষ্পর মধ্যে পেলাম, তার তুলনা নেই। তার বিদ্যা-বুদ্ধি, স্বভাব-আচরণ আর তার কুসুমের মতো কোমল ও সৌরভময় অন্তরের টানে কখন যে তাকে আমি গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছি, তা বুঝতেই পারিনি। সামাজিক এই দুর্বার অন্তরায় সত্ত্বেও নিজেদের অজ্ঞাতেই কখন যে আমরা একজন আর একজনকে হৃদয়ের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে নিয়ে বসে আছি, তা কেউ খেয়াল করিনি। খেয়াল যখন হলো

বইঘর.কম ও রোকন
তখন দেখলাম, আমরা জান ছাড়তে পারি, তবু একে অন্যকে আর কিছুতেই ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়।

বলতে বলতে রেজা খান উদাস হয়ে উঠলেন। শাহজাদা দাউদ খান মুগ্ধকণ্ঠে বললেন–চাচা!

ঃ যৌবন আমাদের অনেক আগেই এসেছিল। বিদ্যাশিক্ষা যখন শেষ হলো আমাদের, তখন আমরা উভয়েই সমঝদার মানুষ। পুষ্পর বাড়ি নিকটেই বলে এবং তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে, অধিক বয়স পর্যন্ত পুষ্পর উস্তাদের গৃহে যাতায়াতের ব্যাপারে বড় বেশি বাধা বিঘ্ন ঘটেনি। শেষের দিকের সময়ে অবশ্য বিদ্যাশিক্ষার অজুহাতে পুষ্পরাণী জোর করেই গুরুগৃহে যাতায়াতটা অব্যাহত রেখেছিল। লেখাপড়া চূড়ান্তভাবে শেষ হলো যখন, তখন পুষ্প গিয়ে রইল তার বাড়ীতে, আমিও এসে রইলাম আমার মাতামহের আলয়ে। কিন্তু উস্তাদের গৃহে যাতায়াত বন্ধ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই আমরা দেখলাম, বিলকুল আমরা মুর্দা। একের অদর্শনে অপরের আর যেন সহজভাবে শ্বাস টানারও সাধ্যটুকু নেই। উস্তাদের গৃহে যখন উভয়েই প্রতিদিন উভয়ের কাছাকাছি হতাম, তখন আদৌ বুঝতে পারিনি, পুরোপুরি বিচ্ছেদের কি ব্যথা! গুরুগৃহ পুরোপুরি ত্যাগ করার পরেই তা বুঝলাম। দুদিনেই দুনিয়াটা আঁধার দেখতে লাগলাম। একবেলা যদিও বা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা নিয়ে কাটতে লাগলো আমার, তবু অন্যবেলা আর কাটেনা।

ঃ তারপর?

ঃ টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একদিন নমঃপাড়ায় গিয়ে পুষ্পর বাড়িতে হাজির হলাম। গিয়ে দেখলাম, মনে আমার যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, তা মিথ্যে নয়। বিচ্ছেদের দুর্বিসহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে, শয্যা নিয়েছে পুষ্পও। তার পুষ্পের মতো চেহারাখানা কয়দিনেই কয়লার মত ম্লান হয়ে গেছে। আমি তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়ার কারণে সেদিন পুষ্পর মধ্যে যে উল্লাস আর প্রাণের প্লাবন দেখেছিলাম, তা আজও আমার স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে। খবর পেয়েই অবুঝ বালিকার মতো পড়িমরি করে ছুটে এসে সে আমার হাত ধরে এমনভাবে টেনে তার মাতাপিতার কাছে এনে দাঁড় করালো, এমন উচ্ছলতার সাথে তাঁদের কাছে আমাকে উপস্থাপিত করল, যেন কঠোর সাধনার দ্বারা মৃত পতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করে নিয়ে পতিকে সে মাতাপিতার কাছে এনে হাজির করেছে। আমাকে পেয়ে এতই সে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল যে, লজ্জা শরম বা এ নিয়ে মাতাপিতাদের ধারণা ও অনুভূতির কোন খেয়ালই সে মুহূর্তে তার ছিল না।

ঃ চাচা!

ঃ আমাদের সম্পর্কের কিছু আভাস পুষ্পর মাতাপিতাও পেয়েছিলেন। কিন্তু তা মামুলিবোধে এ নিয়ে তাঁরা ভাবেন নি। আমার উপস্থিতির ফলে এবং পুষ্পর ঐ অবস্থা দেখে পুষ্পর পিতা অনেকখানি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। আমাদের এই সম্পর্ক তিনি না পারলেন নাকচ করতে, না পারলেন পরম আগ্রহে গ্রহণ করতে। তবে পুষ্পর মা দেখলাম যারপর নাই খুশি হয়েছেন এ জন্যে। আমার প্রতি তাঁর দুর্বার টান দেখে বুঝলাম, তার কন্যার সত্যিসত্যিই আমি একজন কাঙ্খিত বর, এমন বরই তিনি মেয়ের জন্যে মনে প্রাণে কামনা করে এসেছেন।

ঃ আচ্ছা!

ঃ অতঃপর প্রায়ই আমি পুষ্পর মকানে যাওয়া আসা করতে লাগলাম। নৈকষ্য কুলীন এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে একজন শূদ্রের গৃহে এইভাবে ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখে নমঃপাড়ার মানুষের মনে কৌতূহলের অবধি রইল না। কিন্তু পুষ্পরা সমাজচ্যুত আর একঘরে বলে কৌতূহল নিবৃত্ত করার কোন রাহা তারা পেল না। মনের দুঃখে খবরটা তারা বামুন পাড়ায় পৌঁছাল।

ঃ তারপর?

ঃ আমার মাতামহ তখন দীর্ঘদিনের বিমারে শয্যাগত ছিলেন। এ নিয়ে তিনি হৈ চৈ করার মওকা কিছু পেলেন না। কিন্তু জ্বলে উঠল সমাজ। সমাজপতিরা আমাকে জাতিচ্যুত করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। নানাভাবে সমঝিয়েও তাঁদের আমি নিবৃত্ত করতে না পেরে যখন জাতিচ্যুত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম, তখন টনক নড়লো আমার জ্ঞাতিচাচা সমাজপতি ভুবন রায় মহাশয়ের। তাঁর নিজ বংশে এমন ঘটনা ঘটলে তাঁর সমাজপতির আসনটা নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি আমাকে সমঝাতে শুরু করলেন। বিষয়টি যখন একেবারেই জটিল হয়ে উঠল, তখন আমিও শুরু করলাম অনুরোধ করা। ইতিমধ্যে আমার রুগ্ন মাতামহ কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেও তিনি আমাকে ত্যাগ করতে গেলেন না। কিন্তু সমাজপতিদের ভয়ে তাঁর পরিবারের অন্যান্য সকলেই আমার সেখানে অবস্থান মেনে নিতে চাইলেন না। সকলেই বৈরী হয়ে উঠলেন। ফলে, আমি আমার নিজ বাড়িতে ফিরে এলাম এবং সমাজপতি সহকারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদ্‌দের হাতে পায়ে ধরতে লাগলাম। তাঁদের কাছে প্রার্থনা করলাম, পুষ্পকে বিয়ে করার জন্য যে কোন প্রকারের একটুখানি সম্মতি। পুষ্পর জন্মবৃত্তান্ত পুষ্পর মুখে শুনে সবাইকে আমি বললাম, রজনীকান্ত শূদ্র হলেও পুষ্পর মা ব্রাহ্মণকন্যা। জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত যা-ই তাঁরা করুন আমাকে, আমি চাই পুষ্পকে বিয়ে করার একটুকানি মৌন-

বইঘর.কম ও রোকন
সমর্থন। গ্রামের এক কোণে একখানা চালা তুলে তাঁকে নিয়ে বসবাসের একটুখানি অনুমতি। আমার জ্ঞাতি ভুবন রায় সে মর্মে আমাকে বিষয়বিত্ত যা কিছু আমার বিদ্যমান ছিল, তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় দেখালেন। তাতেও রাজী হয়ে গৃহসহ আমার সব কিছু জাতিচ্যুতির আগেই আমি তাঁকে প্রদান করতে চাইলাম। সম্পত্তির লোভে তিনি যদিবা কিছুটা নরম হলেন, হৈ হৈ করে বাধা দিলেন বল্লভ ঠাকুর। তাঁর কুমন্ত্রণায় পড়ে ভুবন রায় ফের পূর্ববৎ বেঁকে বসলেন।

এতখানি একসাথে বলতে গিয়ে রেজা খান হাঁপিয়ে গেলেন। তিনি দম নিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর শাহজাদা বললেন–তারপর চাচা?

রেজা খান ফের বলতে শুরু করলেন–ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রবিদ তামাম মানুষের হাতে পায়ে ধরে কোন ফল না হওয়ায়, আমি শরণ নিলাম দেবতার। মন্দিরে মন্দিরে অর্ঘ্য প্রদান করে প্রতিটি বিগ্রহের পায়ে আমি মাথাকুটে বলতে লাগলাম, "ঠাকুর, একটুখানি অনুগ্রহ তুমি করো। শূদ্র হলেও পুষ্পরা তো তোমাদেরই সৃষ্ট জীব। তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধার মতো একটুখানি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দাও–"! ঐ অঞ্চলে এমন মন্দির রইলো না যেখানে আমি গেলাম না আর এমন বিগ্রহ রইলো না যার পায়ে আমি মাথাকুটে বেড়ালাম না। আমাদের বীরজাওনের প্রধান মন্দিরের বিগ্রহের পায়ে আমি দিনরাত কয়েকদিন একটানা হত্যে দিয়ে পড়ে রইলাম। বিগ্রহের পায়ে মাথাকুটে কপাল দিয়ে রক্ত ঝরালাম। আর্তি ও আবেদনের কসুর কিছু রাখলাম না।

ঃ চাচা!

ঃ তবু সমাধান কিছু হলো না। পরিস্থিতি আরো অধিক সংকটময় হয়ে উঠায়, পুষ্পর মাও শেষে আমাকে নিবৃত্ত হওয়ার অনুরোধ করলেন। কিন্তু পুষ্পর কান্না তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারলেন না। পুষ্পও শেষ পর্যন্ত অর্ঘ্য নিয়ে বেরুলো। গোপনে ও চুরি করে বিভিন্ন মন্দিরে সে দূর থেকে অর্ঘ্য নিবেদন করে দূর থেকে প্রার্থনা ও প্রণাম করে ফিরতে লাগল। এই ক্ষেত্রে অবশ্য এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখা গেল। পুষ্পরা অস্পৃশ্য হলেও, পুষ্পের রূপটা কারো কাছে অস্পৃশ্য রইলো না। তার একটু মিষ্টি হাসি, তার দুটো মিঠে কথার লোভে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরোহিত থেকে তামাম সমাজপতিরাই পুষ্পর পেছনে ঘুর ঘুর করতে শুরু করলেন। এমন কি তাঁকে অনেকে খাতির-আত্তিও করতে লাগলেন।

ঃ বলেন কি!

ঃ অন্যের কথা পড়ে মরুক, খোদ বল্লভ ঠাকুরও এই খাতির-আত্তির এক অনন্য নজীর স্থাপন করলেন। আমাদের প্রধান মন্দিরে পুষ্পকে দূর থেকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে দেখে বল্লভ ঠাকুর তাকে খাতির করে মিষ্টি আহ্বানে মন্দিরের বারান্দায় তুলে নিলেন। সে যে অস্পৃশ্য, ঠাকুর তা আদৌ পরোয়া করলেন না। কিন্তু তাঁর কুপ্রস্তাবে আর

বইঘর.কম ও রোকন

বেলেল্লাপনায় অসম্মতি জানিয়ে যেই মুহূর্তে পুষ্প ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, সেই মুহূর্তেই বল্লভ ঠাকুরের শাস্ত্রজ্ঞান চাঙ্গা হয়ে উঠলো। অস্পৃশ্য শূদ্র এসে মন্দির অপবিত্র করেছে বলে তখন তিনি হৈ চৈ করে লোক জড়ো করলেন এবং পুষ্পকে লাথি মেরে বারান্দার নিচে ফেলে দিলেন। এরপর লোকজন দিয়ে ঘড়া ঘড়া পানি ঢেলে গোটা মন্দির ধুয়ে ফেললেন এবং কিছু মন্ত্র উচ্চারণ সহ গোবরজল ছিটিয়ে তিনি মন্দিরের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনলেন। বল্লভ ঠাকুর সেদিন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন তার ফলশ্রুতিতে এবং একজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে প্রলুব্ধ করার দায়ে পুষ্পসহ রজনীকান্তকে অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করার মতো কঠোর শাস্তি প্রদানের ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠলো।

শাহজাদা চমকে উঠে বললেন–সেকি চাচা! তাজ্জব!

ঃ উপায়ন্তর না দেখে পুষ্পর মা আমাকে পুষ্পকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। পুষ্পর পিতাও তা সাগ্রহে সমর্থন করলেন। আমরা বিদায় হলেই, তাঁরাও এ স্থান ত্যাগ করবেন বলে জানালেন। কিন্তু দুর্মতি হলো আমার। আমি স্থির করলাম, সামাজিক এইসব টানা হেচ্‌ড়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে আমি আমার ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করে শূদ্রত্ব গ্রহণ করবো এবং শূদ্র হয়েই জীবনযাপন করবো। পালাতে হয় শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে তখন একসাথে পালিয়ে যাবো। শূদ্র হয়ে গেলে তো আর পুষ্পকে বিয়ে করায় শাস্ত্রের বাধা কিছু থাকবে না।

ঃ তারপর?

ঃ সেই মোতাবেক চিন্তাভাবনা করতেই একদিন সামান্য অসুখেই পুষ্পর মা মৃত্যুবরণ করলেন। শূন্যঘরে পুষ্প একেবারেই অসহায় হয়ে গেল। দেখেশুনে অতি সত্ত্বর আমার সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করার জন্যে আমি তৈরি হতে যেতেই এখানেও সমাজ থেকে দুর্বার বাধা এলো।

ঃ চাচা!

ঃ আমার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ পেতেই, পুষ্প আর পুষ্পর পিতাকে যে কঠোর শাস্তি প্রদানের চিন্তাভাবনা গোপনে চলছিল, আমার ধর্ম অবমাননার কারণে এবং আমাকে ধর্মচ্যুত করতে উদ্যোগী হওয়ার অপরাধে আমাদের তিনজনকেই একসাথে অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করার বৈঠক প্রকাশ্যে চলতে লাগলো। কিন্তু কাজটি ছিল খুব শক্ত কাজ। এতবড় কাজ তাঁরা কিভাবে কার্যকর করবেন, এ প্রশ্নে এসে ভয়ে ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে সকলেই গড়িমসি করতে লাগলেন। বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার লোকের অভাব দেখা দিলো। বিকল্প কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে কথাও ভাবতে লাগলেন তাঁরা। ফাঁক বলতে এইটুকুই ফাঁক পেলাম আমরা। দেখে শুনে আমি স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নিতে গেলাম। কিন্তু সেখানেও তেমন কোন ভরসা আমি পেলাম না। প্রশাসন জানালো, এটা শুধু একজনের বিদ্যাশিক্ষার মতো সাধারণ ব্যাপার নয়, গোটা হিন্দুজাতির ধর্ম ও শাস্ত্র

সংক্রান্ত জটিল ব্যাপার। তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনের একেবারেই আভ্যন্তরীণ বিষয়। এখানে হস্তক্ষেপ করার মতো তেমন কোন ফাঁক প্রশাসনের নেই, বিশেষ করে প্রশাসন যেখানে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের প্রশাসন।

ঃ তারপর?

ঃ কোথাও কোন আশা ভরসা না পেয়ে পুষ্প ও তার পিতাকে নিয়ে পুনরায় আমি বসলাম। চিন্তাভাবনা করে পুষ্পর মায়ের সিদ্ধান্তই মেনে নিলাম আমরা। স্থির করলাম, অচিরেই তিনজনই আমরা পালিয়ে যাবো। সিদ্ধান্ত স্থির করে তিন তিনটি মানুষ কোথায় গিয়ে উঠবো আমরা, সেই আশ্রয় সন্ধান করার উদ্দেশ্যে পরের দিন প্রত্যুষেই আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং দূর অঞ্চলে চলে গেলাম।

ঃ আচ্ছা! তা স্থান বোধহয় পেলেন না?

ঃ না, পেলাম। কাছে পিঠের চেনাজানা কেউই স্থান দিতে রাজী হলেন না। আশ্রয় পেলাম অনেক দূর অঞ্চলে এক বিচ্ছিন্ন এলাকায়। বিভিন্ন পর্যায়ের শুদ্র ও নিচু জাতির মস্তবড় বস্তিতে। তাঁরা আমাদের নিরাপত্তাসহ জায়গা ঠাঁই সবই দিতে সাগ্রহে রাজী হলেন। তাঁরা বললেন—আমাদের এখানে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্র দেখাতে আসার সাহস করে না। কয়েকবার তাড়া খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ঃ মারহাবা—মারহাবা! তারপর?

ঃ এতে আমার কয়েকটা দিন কেটে গেল। হৃষ্টচিত্তে ফিরে এসে পুষ্পদের ওখানে না গিয়ে প্রথমে আমি সরাসরি আমাদের প্রধান মন্দিরে গেলাম। এবার বিগ্রহের পায়ে মাথা রেখে বললাম, ঠাকুর, কোন ব্যবস্থাই যখন হলো না, তখন আমরা যাতে করে নিরাপদে পলায়ন করতে পারি, এই দয়াটা তুমি আমাদের করো—

ঃ আচ্ছা!

ঃ এরপর দ্রুতপদে পুষ্পদের বাড়ির দিকে ছুটলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, ছোট হুজুর, সেখানে গিয়ে দেখি—সব আমার শেষ!

বলেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন রেজা খান। ভয়ানক চমকে গিয়ে শাহজাদা বললেন—চাচা!

অনেকক্ষণ কান্নার পর কিছুটা শান্ত হয়ে রেজা খান আফসোস্ করে বললেন—আমার মুর্খামিই আমার এই সর্বনাশের কারণ শাহজাদা। আশ্রয়ের চিন্তা না করে সেদিনই যদি বেরিয়ে পড়ি আমরা তাহলে এই সর্বনাশ আর ঘটে না। আমার অনুপস্থিতির সুযোগই দুশমনেরা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলো!

হতবুদ্ধি শাহজাদা বললেন—মানে?

ঃ যতই লম্ফঝম্ফ করুক, আমাকে ভয় করতো সব ব্যাটারাই। ইতিমধ্যে আমি যে অস্ত্রবিদ্যায় বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করেছি সে খবর তারা রাখতো। কাজেই বৈঠক

বইঘর.কম ও রোকন
তারা যতই করুক, আমাকে নিয়ে ভয় ছিল সকলেরই। কিন্তু আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই—

আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন রেজা খান। দিশেহারা শাহজাদা উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—বলুন চাচা, সুযোগ নিয়ে কি করলো তারা? সেখানে গিয়ে কি দেখলেন আপনি?

কান্নাজড়িত কণ্ঠে রেজা খান বললেন—পুষ্পর বাড়িতে হাজির হয়েই দেখি, পুষ্পদের ঘরদোর তামামই ছাই হয়ে গেছে আর ঐ ছাইয়ের মধ্যে পড়ে আছে পুষ্প ও তার পিতার অগ্নিদগ্ধ লাশ!

শাহজাদা এবার আর্তনাদ করে উঠলেন—চাচা—

এরপরই স্তব্ধতা নেমে এলো। বাক হারিয়ে উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ অন্তর অশ্রুসিক্ত নয়নে শাহজাদা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—এতবড় নিষ্ঠুর কাজ করল তারা?

রেজা খানও এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ। ঐ সমাজপতি আর শাস্ত্রবিদ্‌রা তাই করলো। তাদের শাস্ত্রের মাহাত্ম্য জাহির করার জন্যে পুষ্প আর তার পিতাকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখে ঘরে আগুন দিয়ে তারা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করলো আর ঐ অগ্নিকুণ্ডে বাপ বেটিকে পুড়িয়ে মেরে তারা জাতির কলংক বিদূরিত করলো।

ঃ ওহ্! কি জঘন্য বিধান! কি মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা—

শাহজাদার চোখ থেকে এবার কয়েক ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু টপ টপ করে মাটিতে ঝরে পড়লো। কিন্তু রেজা খানের চোখের পানি শুকিয়ে গেল আস্তে আস্তে। এক্‌টু দম নিয়ে শাহজাদা রুদ্ধকণ্ঠে বললেন— এরপর কি করলেন আপনি?

ঃ কি আর করবো? জাতিচ্যুত বলে ঐ লাশের সৎকারে কেউ এগিয়ে এলো না। জনা কয়েক বাইরের লোক যোগাড় করে এনে আমি নিজেই লাশ দুটিকে বয়ে শ্মশান ঘাটে নিয়ে গেলাম এবং অগ্নিদগ্ধ শব দুটি এবার একেবারেই দগ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। আমার পরিচিত পুষ্প বিলীন হয়ে গেল।

ঃ চাচা!

ঃ এরপর ফিরে এলাম আমাদের ঐ প্রধান মন্দিরে।

শাহজাদা সবিস্ময়ে বললেন—কেন চাচা, এরপর আর মন্দিরে কেন?

ঃ প্রার্থনা নিয়ে নয়, এবার এলাম দেবতার কাছে কৈফিয়ত তলব করতে। মন্দিরে এসে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত কৈফিয়তই আদায় করার মওকা মিলে গেল আমার।

ঃ মানে?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ মন্দিরটা বসতি থেকে অনেকখানি দূরে হলেও, যে সময় আমি মন্দিরে এসে পৌঁছলাম সে সময়ে মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকার কথা নয়। কিন্তু আমি এসে দেখলাম,আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, অথচ মন্দিরের দ্বার ভেতর থেকে বন্ধ। মনে আমার খটকা লাগল। কপাট ঈষৎ ঠেলে দেখে ঘটনা কি ভাবতে লাগলাম। এমন সময় মন্দিরের এক কোণে মানুষের ধুপধাপ পদশব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম! দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার শরীরের তামাম রক্ত একলাফে মাথায় এসে জড়ো হলো।

ঃ চাচা!

ঃ প্রতিদিন এই সময় ডোমপাড়ার ফুলকি নামক এক ডাগর ডোম্‌নী কখনো একা কখনো দু একজন সঙ্গীসাথী নিয়ে এসে মন্দিরের আশেপাশের আবর্জনা ও ময়লাদি বয়ে ফেলতো এবং মন্দিরের পার্শ্ববর্তী এলাকা ঝাড়ু দিয়ে সাফ করতো। দেখলাম, সেই ডোম্‌নীকে মন্দিরের মধ্যে তুলে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে প্রধান পুরোহিত খোদ বল্লভ ঠাকুর তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে ধস্তাধস্তি করছে আর হতবুদ্ধি ফুল্‌কি রা-শব্দ হারিয়ে ছাড়া পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ঃ বলেন কি চাচা!

ঃ শূদ্র হলেও পুষ্পদের জাতগোত্র ফুল্‌কিদের চেয়ে অনেক বেশি উপরে। সেই পুষ্প এসে মন্দিরের বারান্দায় উঠায় মন্দির অপবিত্র হলো বলে যে ঠাকুর ঘড়া ঘড়া পানি ঢাললো মন্দিরে, স্বয়ং সেই বল্লভ ঠাকুর ময়লাটানা এক ডোমনীকে মন্দিরের মধ্যে তুলে মন্দিরের মধ্যেই তাকে সম্ভোগ করার চেষ্টা করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। এরপর আর আত্মসম্বরণ করা সম্ভব কারো পক্ষে?

রেজা খানের দু'চোখ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। শাহজাদা চোখ তুলে চাইতেই রেজা খান কঠিন কণ্ঠে বললেন—মাথায় আমার খুন চেপে গেল ছোট হুজুর! লাথি মেরে তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দ্বার ভেঙে ফেললাম। এরপর বল্লভ ঠাকুরকে ধরে মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত ঘন্টা পেটার বিশাল এক কাঠের হাতুড়ি দিয়ে তাকে উন্মত্তের মতো ঘায়ের পর ঘা মারতে লাগলাম। সে যখন মৃতবৎ নিস্তেজ হয়ে গেল তখন লাথির পর লাথি মেরে তাকে গড়িয়ে গড়িয়ে এনে বারান্দার নিচে ফেলে দিলাম। ছাড়া পেয়ে ফুল্‌কি ইতিমধ্যেই দৌড় দিয়েছিল। আমি এবার ঘুরে দাঁড়ালাম বিগ্রহের দিকে। এত অর্ঘ্য দেয়ার পরও যে বিগ্রহের কোন অনুগ্রহ পেলাম না,এতবড় অনাচার চোখের সামনে হতে দেখেও যে বিগ্রহ নীরব, সেই বিগ্রহের দিকে তাকিয়েই আমি বুঝলাম, সব মিথ্যা, সব ভড়ং! এটা একটি মাটির ঢেলা শুধু, শুধুই মাটির গড়া খেলার পুতুল! এটা দেবতা নয়, এটা ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব এর মধ্যে নেই। এটা বুঝতে পারা মাত্রই হাতুড়ি

বইঘর.কম ও রোকন
তুলে ঘা মারলাম বিগ্রহে। ঘায়ের পর ঘা মেরে প্রধান বিগ্রহসহ আশেপাশে অবস্থিত তামাম পুতুল ভেঙে চুরমার করে মেঝের সাথে মিশিয়ে দিলাম।

শাহজাদা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন–চাচা!

ঃ সেই যে মাথায় আমার রক্ত উঠে গেল, সে রক্ত আর নামলো না! বিলকুল আমি দস্যু বনে গেলাম। ঘরে আর না ফিরে লুটতরাজ করে আমি আমার ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করতে লাগলাম। আর দিনরাত ঘুরে ঘুরে ও এলাকার তামাম বিগ্রহ ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করতে লাগলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সমাজপতি ঐ মুহূর্তে যাকে আমি হাতের কাছে পেলাম, তাকেও আমি দস্তুরমতো প্রহার করতে লাগলাম।

ঃ চাচা!

ঃ তবে আমার প্রধান আক্রোশ রইল গিয়ে ঐ মাটির ঢেলার উপর। স্রেফ ঐ এলাকারই নয়, ওর আশেপাশের তামাম এলাকার বিগ্রহও আমি ঐ একইভাবে ধ্বংস করে ফেললাম। আমার গোচরীভূত কোন স্থানের কোন বিগ্রহই আমি অক্ষত রাখলাম না। তামামগুলো গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলাম। গোটা এলাকায় এ নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। পূজা পার্বণ পুথি পাঁজি চাঙ্গে উঠলো সব ব্যাটার। মহাতঙ্ক সৃষ্টি হলো চারদিকে। জাতি ধর্ম সব কিছু লোপ পায় দেখে এ এলাকার লোকজন আমাকে ধরার জন্যে দলে দলে বেরিয়ে পড়লো এবং আমাকে তালাশ করে ফিরতে লাগলো।

শংকিত হয়ে উঠে শাহজাদা বললেন–তারপর?

ঃ তারপরও আমি নানা অঞ্চল ঘুরে ঘুরে বিগ্রহ ভেঙেই চললাম। কিন্তু যখন দেখলাম, মুসিবত ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসছে, সর্বত্রই আর সব অঞ্চলেই লোকজন আমাকে ধরার জন্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তখন আমি ও এলাকা ত্যাগ করে একটানা পাণ্ডুয়ায় চলে এলাম। শ্রান্তক্লান্ত আর অসুস্থ শরীর নিয়ে এসে সামনেই এক মুসলমান দরবেশের আস্তানা পেলাম এবং সরাসরি সেখানেই উঠে পড়লাম। আমার অবশ্য ভয় ছিল, না জানি বিজাতি আর জঞ্জালবোধে আমাকে তিনি তাড়িয়েই দেবেন। কিন্তু না, মেহমান হিসেবে তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। আমাকে পরিশ্রান্ত আর রুগ্ন দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ লোকজন সহকারে আমার সেবা শুশ্রূষায় লেগে গেলেন। আমার আহার পানীয় যোগালেন, দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করলেন এবং আমার কি জাত, কি গোত্র, এ সবের কোন হদিশই না নিয়ে দরবেশ সাহেব আমাকে তাঁর নিজের পাশে বিছানা পেতে আরাম করে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন ও রাতের প্রহরে প্রহরে উঠে আমার তবিয়তের খোঁজখবর নিলেন। আমি মোহিত হয়ে গেলাম!

ঃ চাচা!

ঃ ওখানেই আমি কয়েকদিন রয়ে গেলাম। দরবেশ সাহেবই পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার আগে আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না। আমার ফারসী ভাষার উস্তাদ সাহেবকে আমি

আগেই দেখেছিলাম। এখানে এই কয়েকদিন থাকার কালে মুসলমানদের এমন মহৎ আচরণ ও নির্মল চরিত্র দেখে এবং ইসলামের এমন অভূতপূর্ব সাম্যবাদের পরিচয় পেয়ে আমি বিগলিত হয়ে গেলাম। আরো অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের ধর্ম-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো এই আস্তানার কেউ পরগাছা বা পরভোগী নন। খোদ দরবেশ সাহেব সহকারে সবাই এঁরা মেহানতী মানুষ। নির্দিষ্ট সময়ে জেকের আজ্‌কার করার পর একদণ্ডও বসে কেউ থাকেন না। আস্তানা সংলগ্ন জমিতে ও বিভিন্ন উপায়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এঁরা অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই অর্থে দুঃস্থ আতুর ও আর্তজনের সেবা করেন। কারো কোন ভেট্‌-অনুদান বা উপহার গ্রহণ করেন না। সংসার যাদের সচ্ছল ও স্বয়ং-সম্পন্ন, একমাত্র তাঁরাই এসে শ্রম দেন এই আস্তানায়। ইসলামের এই অতুলনীয় আদর্শ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এতদিনে আসল পথের সন্ধান পেলাম আমি, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়মূল হলো। আমি ইসলাম কবুলের সিদ্ধান্ত নিলাম।

একটু থেমে রেজা খান ফের বললেন আমার এই অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করলে, দরবেশ সাহেব আমাকে আরো অধিক ভেবে দেখতে বললেন। ভেবেচিন্তে দেখে ইচ্ছে হলে আবার আমাকে আস্তানায় ফিরে আসতে বললেন। কিন্তু আমি নড়লাম না। আরোও কয়েকদিন থাকার পরও আমি যখন আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম, তখন তিনি বিধিমতে আমাকে ইসলাম কবুল করালেন।

শাহজাদা বললেন–আলহাম্‌দুলিল্লাহ! তারপর?

ঃ তারপর আমি তাণ্ডায় চলে এলাম। তাণ্ডায় এসে আমাদের এই হযরত-ই-আলার সাথে সাক্ষাৎ করে আমার পিতৃপরিচয়সহ রেখে ঢেকে আমার জিন্দেগীর মোটামুটি কথাগুলো তাঁকে আমি বললাম। আমি ইসলাম কবুল করেছি, এ কথাও জানালাম। পরিশেষে আমার পিতা একজন বাঙ্গালার সুলতানের ফৌজদার ছিলেন জানিয়ে, আমি কর্ম প্রার্থনা করলাম। আমার যোগ্যতার খবর নিয়ে তিনি আমাকে সেনাবিভাগে নিয়োগ করলেন। আমার নিয়োগ প্রাপ্তির সাথে সাথেই এখানের অনেকেই আমার অনেক খবর জেনে গেলেন। বিশেষ করে, আমি যে অনেক মন্দির ভেঙে এসেছি, এ খবরটা অল্পদিনেই জারি হয়ে গেল।

ঃ চাচা!

ঃ নিয়োগ প্রাপ্তির কিছুদিনের মধ্যেই আমার রণদক্ষতায় তুষ্ট হয়ে হযরত-ই-আলা আমাকে ফৌজদার পদে উন্নীত করলেন। ফৌজদার হওয়ার পর থেকেই তো শাহজাদার সাথে আমার পরিচয়। এর পরবর্তী সব কিছুই শাহজাদা জানেন।

অতঃপর উভয়েই নীরব হয়ে গেলেন। বেদনার ভারে মুহ্যমান হয়ে উভয়েই উদাসনেত্রে শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন।

পাঁচ

রেজা খানের জিন্দেগীর করুণ কাহিনী শোনার পর শাহজাদা দাউদ খান পরবর্তী কয়েকদিন রেজা খানের সামনে আর সহজ হতে পারলেন না। তাঁর সাথে দেখা হলেই আর আগের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠার বা কোন প্রকার হাল্‌কা আলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেললেন। ভারাক্রান্ত চিত্তে তিনি ম্রিয়মান হয়ে রইলেন। রেজা খানের মুখের দিকে চাইতেই অন্তর তাঁর ব্যথায় টনটন করে উঠতে লাগল।

কিন্তু রেজা খান নিজে ছিলেন শক্ত দীলের মানুষ। অতীতকে অতীতেই চাপা দিয়ে রেখে বর্তমানকে সত্য বলে গ্রহণ করা মানুষ। বর্তমান জীবনযাত্রায় জীবন খুঁজে নিয়ে চলন্ত রঙ্গরসে মিশে যাওয়া মানুষ। পরের দিনই তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলেন এবং প্রাণবন্তভাবে দৈনন্দিন প্রবাহের সাথে পূর্বের মতোই মিশে গেলেন। অতীতের ব্যথা বেদনার লেশমাত্র ছায়াও তাঁর জীবনাযাত্রায় আর পরিলক্ষিত হলো না। শাহজাদা দাউদ খানের আড়ষ্টতা লক্ষ্য করে নিজেই তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং সরস উচ্ছলতার মধ্যে দিয়ে নিজেই তাঁকে সহজ করে তুললেন।

একদিন এক অবসর মুহূর্তে রেজা খানকে হো হো করে হাসতে দেখে শাহজাদা বললেন–সত্যি চাচা, আপনি বড় আজব মানুষ! অতবড় ঐ মর্মান্তিক স্মৃতি বুকে নিয়েও আপনি এমন দীল খুলে হাসতে পারেন?

রেজা খান এর জবাবে হাসতে হাসতেই বললেন–আরে ছোট হুজুর, মানুষ যদি তার অতীতের ব্যথার মধ্যেই সর্বক্ষণ মজবুর হয়ে থাকে, তাহলে সে তো মুর্দা। তার আর বেঁচে থেকে লাভ কি? মুর্দা হয়ে বেঁচে থাকায় সার্থকতা আছে কিছু? তার চেয়ে বরং যে কয়দিন বাঁচি আমরা, হাসিখুশির মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকাটাই তো লাভ।

সংশয়াকুল চিত্তে শাহজাদা বললেন–কিন্তু অতবড় ব্যথাটা কি ইচ্ছে করলেই অতি সহজে ভোলা যায়?

রেজা খান ঐ একইভাবে বললেন–যেতেই হবে। অতীতের ব্যথা দিয়ে বর্তমানকে ব্যথিত করে তোলায় কোনই ফায়দা নেই। বরং আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে হেসে খেলে নিজ নিজ কর্মসাধন করে যাওয়াই অতীতের হামলা থেকে আত্মরক্ষার উত্তম পথ।

ঃ চাচা!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আনন্দ করুন, ফুর্তি করুন, আনন্দ ফুর্তির মধ্যে দিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করুন, দেখবেন দীলে যত ব্যথা বেদনা আছে, তামাম বালাই সাফ।

ঃ সাফ?

ঃ জরুর। ঐ যে-"ক্ষুধার রুটি খরিদ করো, একটি মুদ্রা মিলে যদি,
দুই মুদ্রা হাতে ফুল কিনে নাও দীল দরদী।"

-এর অর্থটা কি ছোট হুজুর? এর কি কোন অর্থ নেই?

ঃ কি অর্থ?

ঃ ফুর্তি-ফুর্তি, বেকসুর ফুর্তি। জিন্দেগীটা জৌলুশদার করে তোলার তাগ্ড়া-তাজা ইশারা।

ঃ চাচা!

ঃ আর জ্ঞানীর জন্যে ইশারাই যথেষ্ট!

-বলেই তিনি পুনরায় উচ্ছল কণ্ঠে হেসে উঠলেন। সেই হাসির রেশ ধরে শাহজাদাও হেসে বললেন-সাব্বাস্ চাচা! আপনার তুলনা একমাত্র আপনিই।

রেজা খান এবার ভারিক্কিচালে বললেন-তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু শাহজাদার তুলনা এখন কার সাথে করি আমি? তাঁর তুলনা তিনিই, এটা তো বলতে পারছিনে।

ঃ কি রকম?

ঃ কথা দিয়ে যিনি কথা রক্ষে করেন না, তাঁর তুলনা কার সাথে করা যায়?

ঃ তার অর্থটা কি চাচা? কোথায় আমি কথা দিয়ে কথা রক্ষে করলাম না?

ঃ ঐ মুরাদ খান সাহেবের অন্দরে। সেদিন যে শাহজাদা বড় মুখখান করে ওঁদের দাওয়াত গ্রহণ করলেন, কারো দীলে কোন দুঃখ রাখবেন না বলে উঁচু গলায় ওয়াদাটা দিলেন, তা কি সেরেফ ওঁদের উপহাস করার জন্যে? সে ওয়াদা পালন করার কোন গরজই মনে করেন না তিনি?

খেয়াল হতেই শাহজাদা শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন-তওবা-তওবা! তাইতো চাচা! প্রথম দিকে খেয়াল কিছুটা ছিল। কিন্তু পরে তো তা বিলকুলই ভুলে বসে আছি। ঠিক-ঠিক, দাওয়াতটা ওঁদের জরুর রক্ষে করার দরকার।

ঃ সেই দরকারটা কবে? দু' একদিন পরেই যেখানে দাওয়াতে যাওয়ার অনুরোধটা করলেন তাঁরা, সেখানে আজ কতদিন গত হয়ে চললো, সে খেয়ালটা কি শাহজাদার আছে?

ঃ এ্যাঁ! হ্যাঁ-মানে-

ঃ এরপর যদি গরীব বলে ইনকার করার ধারণাটাই দীলে তাঁদের পয়দা হয়, তাহলে কি তাঁদের দোষ দেয়ার আছে কিছু?

বইঘর.কম ও রোকন

অপরাধীর মতো সংকুচিত চিত্তে শাহজাদা বললেন—না চাচা, কিছু নেই—কিছু নেই। এহ্! মস্তবড় কসুর হয়ে গেছে!

ঃ তাহলে আর কসুরের জের না বাড়িয়ে জলদি জলদি শাহজাদা যাত্রা করুন সেখানে। বলা যায় না, ওখানে পেলেও তো পেতে পারেন অমূল্য রতন!

আঁড়চোখে চেয়ে রেজা খান হাসতে লাগলেন। জিজ্ঞাসু কণ্ঠে শাহজাদা বললেন—অমূল্য রতন!

ঃ বলছি, ছাইয়ের গাদা বলেই কোন কিছুকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। ছাইটা উড়ালেও নাকি তার মধ্যে থেকে অমূল্য রতন বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঃ তাহলে আর কি? সব কিছু ফেলে ছেড়ে তামাম লোক এখন ছাই উড়িয়েই বেড়াক, না কি বলেন?

ঃ তামাম লোক না বেড়ালেও, অমূল্য রতন যিনি খুঁজে পেতে চান, তাঁকে তো উড়িয়ে দেখতেই হবে ছাই-ধুলো সব কিছু?

ঃ চাচা হুজুরকে একথা কে বললে যে, অমূল্য রতন আমি খোঁজ করে ফিরছি?

ঃ শাহজাদার চাচা হুজুর যে ঘরপোড়া গরু। একথা তাকে মুখ ফুটে বলতে হবে কেন?

ঃ ব্যস্! আজগুবি শুরু হলো হেঁয়ালি—

ঃ আজগুবি কেন? দাওয়াত-দাত্রীকে নিয়ে শাহজাদার উৎসাহটা তো কম কিছু ছিল না? তিনি বজরার ঐ জঙ্গীপরীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তাঁর কণ্ঠে। তাই বলছি, শাহজাদা গিয়ে একবার যাচাই করে দেখুন না? বলা যায় না, সবচেয়ে সেরা পরীর সন্ধানটাই তিনি পেয়ে যেতে পারেন তো সেখানে?

ঃ তার মানে? চাচা হুজুর কি তাহলে বলতে চান, দাওয়াত রক্ষে করাটা আসলেই মামুলি? ওখানে যাওয়ার মূল লক্ষ্য ঐ পরীর সন্ধান করা?

ঃ আহা! রথ দেখা কলা বেচা এক সাথে হয়ই যদি, দোষটা কি তাহলে?

ঃ বটে? ঠিক আছে। দোষ কিছু না থাকলে, ঐ কলাবেচার তেজারতিটা তাহলে চাচা হুজুরই করবেন। আমি কিন্তু গিয়ে ঐ রথটাই দেখবো শুধু। এবার বলুন, কবে আপনার ফুরসৎ হবে?

ঃ আমার ফুরসতের দরকার কি? শাহজাদা একা গেলেই তো ঢের।

শাহজাদা কপট রোষে বললেন—কি রকম? দাওয়াতটা কি তাঁরা স্রেফ শাহজাদাকেই দিয়েছেন, না চাচাজানকেও দিয়েছেন? মোটগুলো শাহজাদা একাই টেনেছেন বুঝি? দাওয়াত যেখানে দুজনের, সেখানে আমার একা যাওয়ার প্রশ্ন উঠে কি করে?

বইঘর.কম ও রোকন

আমতা আমতা করে রেজা খান বললেন–তা কথা হলো–

ঃ ওসব ফালতু বাহানা ছাড়ুন তো চাচা। আগামিকাল বিকেলে সময় করতে পারবেন কি না, সেই কথাটা বলুন।

ঃ তা বিকেলে আর কাজ কি আমার। বাইরে যাওয়া নেই, শাহজাদা না ছাড়লে, দপ্তরের কাজ এক বেলাতেই সামলে নেয়া যাবে।

ঃ ব্যস্‌-ব্যস্‌! তাহলে নিন, এখন ফুলবাগিচায় যাই চলুন। বেড়ানোও হবে আর সেই সাথে মুরাদ খান সাহেবকেও খবরটা জানিয়ে দেয়া হবে। বিনে খবরে যাওয়াটা তো ঠিক হবে না আদৌ?

ঃ না-না, তা অবশ্যই ঠিক হবে না।

ঃ তাহলে চলুন। দাওয়াত রক্ষায় এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি করাটা কিছুতেই ঠিক নয়, চলুন–

দেরি তবুও করতে হলো। তাঁরা বাগানের দিকে রওনা হতে যেতেই এক হুকুমবরদার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে জানালো, হযরত-ই- আলা এক্ষুণি স্মরণ করেছেন তাঁদের। হযরত-ই-আলা তাঁর মন্ত্রণাকক্ষে তাঁদের অপেক্ষায় বসে আছেন। এক্ষুণি তাঁদের যেতে হবে সেখানে।

খোদ হযরত-ই-আলা অপেক্ষায় আছেন তাঁদের। এর পরে আর কথা নেই। সুতরাং বাগানের পথ পরিহার করে তখনই তাঁরা প্রাসাদের পথ ধরলেন।

মন্ত্রণাকক্ষে হাজির হয়ে শাহজাদা দাউদ খান আর সহকারী সালার রেজা খান দেখলেন, ইতিমধ্যেই অনেকে এসে হাজির হয়েছেন সেখানে। যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে বড় শাহজাদা বায়াজিদ খান, উজিরে আজম লোদী খান, সালার সিকান্দার উযবেক, সালার গুজার খান ও সালার ইসমাইল খানই প্রধান। হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। দাউদ খান আর রেজা খান এসে হাজির হলে, মুখ খুললেন তিনি। সকলের উপর চকিতে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে শাহজাদা বায়াজিদ খানের উপর তিনি দৃষ্টি স্থির করলেন এবং গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– সেপাই-সালার আর শাহজাদাদের দীলে একটা বড় আফসোস ছিল যে, আমি কেবলই নরম-নীতির পক্ষপাতী, চরমনীতি অনুসরণ করতে আমি ভয় পাই। এ প্রেক্ষিতে তাঁদের আমি এ আশ্বাস সেদিন দিয়েছিলাম যে, প্রয়োজনে সকল নীতিই আমি অবলম্বন করতে আগ্রহী। তার কিছুটা নমুনা আজ রাখতে চাই।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে শাহজাদা বায়াজিদ খান বললেন—জাঁহাপনা!

বইঘর.কম ও রোকন

হযরত-ই-আলা বললেন—শাহজাদা বায়াজিদ খানের তারিফ সেদিন প্রকাশ্যে আমি করিনি ঠিকই, তবে তাঁর উপলব্ধি আমার কাছে দুর্বোধ্যও ছিল না বা আচানক কিছুও ছিল না। আমার কথা ছিল, দিল্লীর বাদশাহকে মিত্রভাবে যতদিন সংঘর্ষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, তা রাখা ভাল। তাই বলে আকবর শাহ যে বাঙ্গালার অধিপতির একজন অন্ধহিতৈষী, প্রাণান্তেও তিনি বাঙ্গালা মুলুকের অনিষ্ট সাধন করবেন না, এমন উদ্ভট ধারণা পোষণ করার মতো কোন নিরেট নির্বোধ আমি নই, আর সে ধারণা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসও সেদিন আমি পাইনি। www.boighar.com

বায়াজিদ খান বললেন—এ কথা কেন জনাব? আকবর শাহ কি মিত্রতা ভঙ্গ করেছেন?

ঃ ভঙ্গ এখনও করেন নি। তবে স্বার্থান্বেষী মিথ্যুকদের উদ্দেশ্যপ্রবণ উসকানী যিনি সহজেই কানে তুলে কানভারি করেন, তাঁর মিত্রতা নিয়ে আর আগের মতো অতটা নিশ্চিত থাকার যুক্তি নেই। শাহজাদা বায়াজিদ খানের পরামর্শ অনুযায়ী বাজু আর অবস্থান আমাদের এখন থেকেই মজবুত করে নিতে হয়।

হযরত-ই-আলা গম্ভীর হলেন। সেই ফাঁকে শাহজাদা দাউদ খান প্রধান উজির লোদী খানকে প্রশ্ন করলেন—তাজ্জব! আকবর শাহকে উস্কানী দেয়া হয়েছে?

লোদী খান এর জবাবে বললেন–জি শাহজাদা। জঘন্য উসকানী আর চরম মিথ্যাচার। বঙ্গালা মুলুকে আফগান শক্তি দুর্জেয় হয়ে উঠেছে। হযরত-ই-আলার নেতৃত্বে দিল্লীর তখ্‌তে আফগান অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে, এই সর্বৈব মিথ্যা খবর আকবর শাহকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

শাহাজাদা দাউদ খান অক্রোশভরে বললেন—কে বা কারা সেই বেইমান যারা এতবড় মিথ্যাচার করতে পারলে?

জবাব দিলেন হযরত-ই-আলা। তিনিও সক্রোধে বললেন—বেইমানী করাই যাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র, তারা। বেইমানী আর মিথ্যাচার করাতে যারা শরমিন্দাবোধ করে না, বরং ছল-কৌশল-আর মিথ্যাচার করাকেই যারা সার্থক কূটনীতি বলে গর্ববোধ করে, তারা। যে উড়িষ্যারাজ উপযাচক হয়ে বাঙ্গালার অধিপতির কাছে এসে মিত্রতা স্থাপন করলেন, বাঙ্গালার সাথে আজীবন সুসম্পর্ক বজায় রাখার ঢালাও ওয়াদা দিয়ে নিজেকে ধন্য করে গেলেন, সেই উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব। তিনি আকবর শাহকে বাঙ্গালার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছেন।

সেনাপতি সিকান্দার উযবেক আত্মপ্রত্যয়ে বললেন—আচ্ছা! মুকুন্দদেব যে বেইমানী করবেন, এটা আমরা আগেই বুঝতে পেরেছি জনাব। আমাদের জাত দুশমন ইব্রাহিম খান শূরকে যেদিন তিনি আশ্রয় দিলেন, সেইদিনই তাঁর বেইমানী চরিত্র ধরা পড়ে গেছে।

বইঘর.কম ও রোকন

হযরত-ই-আলা বললেন—সেই ইব্রাহিম খান শূরকে এখন বাঙ্গালার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে তিনি তৎপর হয়ে উঠেছেন। বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণ করার জন্যে ইব্রাহিম খান শূরকে উৎসাহিত করার কাজে তিনি এখন মহাব্যস্ত। বেয়াকুফ ইব্রাহিম খানও ধারণা করে নিয়েছেন যে, তাঁকে সাহায্য করে বাঙ্গালা মুলুক জয় করার পর মুকুন্দদেব তাঁকেই সোহাগ করে বাঙ্গালার তখ্‌তে বসাবেন। নির্বোধ আর বলে কাকে! এই বিষফোঁড়াটা বরাবরই আমাদের চরম অশান্তির কারণ হয়ে রয়েছে। নিজেও বাঁচবে না, কাউকে বাঁচতে ও দেবে না। এরও ফয়সালা করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

সিকান্দার উযবেক আগ্রহী কণ্ঠে বলেন—জাঁহাপনা!

হযরত-ই-আলা ফের বললেন—স্রেফ এইটুকুই নয়। বেইমান মুকুন্দদেব দিল্লীর বাদশাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং হৃষ্টচিত্তে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে দিল্লীর বাদশাহর এখন এন্তার তোয়াজ শুরু করেছেন। বাঙ্গালার বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর পরিবেশন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, আকবর শাহকে আচিরেই বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণ করার জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন এবং বাঙ্গালা বিজয়ে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে দিল্লীর বাহিনীকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সেনাপতি গুজার খান শশব্যস্তে বললেন—আকবর শাহর তাহলে এখন মতলব কি জাঁহাপনা?

ঃ তাঁর কি মতলব তা তিনিই জানেন। তবে তিনি উষ্ণ হয়ে উঠেছেন আর পরিস্থিতিকে এই পর্যন্ত গড়িয়ে দিতে সমর্থনও যোগাচ্ছেন।

এতক্ষণে কথা বললেন সহকারী সালার রেজা খান। তিনি বললেন—গোস্তাকি মাফ হয় জাঁহাপনা। মাথায় আমার কিছুই খেলছে না। মুকুন্দদেব বললেন আর আকবর শাহ অমনি তাঁর কথা কানে তুললেন কি করে? তাঁর এই পুব এলাকার প্রতিনিধি খান-ই জামান সাহেব বা খান-ই-খানান মুনিম খান সাহেবদের মাধ্যমে ঘটনাটা যাচাই করে দেখবেন না?

জবাবে হযরত-ই-আলা বললেন—সে প্রয়োজন খুব বেশি তো নেই আর। যাচাই করে দেখার ইতিমধ্যেই যে আর এক নয়া মাধ্যম পয়দা হয়ে গেছে। আকবর শাহর নয়া নয়া হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সালার আর হিন্দু অমাত্যদের পদধূলি এখন দিল্লী সাম্রাজ্যের এই পুব অঞ্চলেও পড়তে শুরু করেছে। মুনিম খান সাহেবরা শাসনকর্তা। তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের প্রশাসন নিয়েই পড়ে আছেন। বাদশাহর সাথে যোগাযোগ তাঁদের ক্ষীণ। কিন্তু পরিদর্শন আর দৌত্যকাজে রত এইসব মন্ত্রী অমাত্য মহোদয়েরা তো বাদশাহর একদম কাছের লোক। মামুলি কোন দূতের মুখের খবরে গুরুত্ব তেমন না দিলেও, মুকন্দদেবের সুপারিশটা যদি মন্ত্রী মহাশয়েরা করেন, তাহলে আকবর শাহ আর তা বিলকুল ফেলে দেন কি করে?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আলমপনা!

ঃ এই স্বজাতীয় মন্ত্রীদের এবং তাঁদের গোত্রভুক্ত দূতদের সংস্পর্শে এসেই মুকুন্দদেব বুঝে গেছেন, দিল্লীর বাদশাহর অধীনতা মেনে নিয়ে দিল্লীর বাদশাহর তোয়াজ করে চলাই তাঁর জন্য বেহতর। কারণ, হিন্দুদের প্রভুত্বের দিন শেষ হয়ে গেছে। হিন্দু মন্ত্রী অমাত্যদের সহানুভূতি থাকলে, এ অঞ্চলে তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্যভোগ করতে পারবেন। পাশে এই বাঙ্গালা মুলুকের মতো একটি প্রতাপশালী মুলুক বিদ্যমান থাকলে, তাঁর সেই সুখভোগ নিরঙ্কুশ হয় না। সুতরাং বাঙ্গালা মুলুকের প্রতাপ খর্ব হোক, বাঙ্গালা মুলুক দিল্লীর মামুলি ভূখণ্ডে পরিণত হোক, এটা তো তিনি চাইবেনই।

ঃ কিন্তু জনাব, মুনিম খান সাহেবরা যেখানে আমাদের সাথে মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, আমাদের সাথে সখ্যতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন, মানে দিল্লীর বাদশাহর সাথে আমাদের যেখানে একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো, সেখানে দিল্লীর বাদশাহরই ঐসব মন্ত্রী অমাত্যেরা তা বানচাল করার জন্যে এমন ঘোলাটে পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন কেন?

রেজা খানের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিঃক্ষেপ করে হযরত-ই-আলা বললেন—এটা কি আমার বিচক্ষণ বীর সেনানী কালাপাহাড়ের কথা হলো? তাঁর মতো বিদ্বান্ আর বুদ্ধিমান মানুষের কাছে এর কি ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা আছে?

মাথাটা নিচের দিকে নিয়ে রেজা খান স্মিতহাস্যে বললেন—তবু জনাবের পর্যবেক্ষণটা—

ঃ জনাবের পর্যবেক্ষণ আপনাদের বা শাহজাদাদের পর্যবেক্ষণের সম্ভবত বাইরের কিছু নয়। অন্তত আমার তাই ধারণা।

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ মুনিম খান সাহেবরা আকবর শাহর কর্মচারী হলেও, তাঁরা মুসলমান ও বিজ্ঞজন। হিন্দুস্তানে মুসলমানদের আবাসভূমি কায়েম করার সংগ্রামের অনেক তিক্ত ইতিহাস তাঁদের জানা আছে। তাঁরা চান না, এ অঞ্চলে মুসলমানে মুসলমানে চরম কিছু সংঘাত অবিরাম লেগে থাকুক। বরং মুসলমান শাসকদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাক, সৌহার্দ্য বজায় থাক, হিন্দুস্তানে মুসলমানদের অবস্থান মজবুত হোক, মুসলমানদের অস্তিত্ব অক্ষয় হোক—এইটাই তাঁরা চাইবেন। একজনের অধীনস্থ কর্মচারী হলেও, এদিকটা যতখানি হেফাজত করা যায়, সে কোশেশ তাঁরা করবেনই। কিন্তু ওঁরা? ওঁদের লক্ষ্য ওঁদের স্বজাতির ইষ্ট। শক্তিতে কুলোয়নি বলেই আজ ওঁরা আকবর শাহর অধীনতা মেনে নিয়ে আছেন। কন্যা-ভগ্নি দিয়ে আকবর শাহর সাথে কুটুম্বিতা করছেন আর তার সাম্রাজ্যের স্বপক্ষে তলোয়ার খুলে ঘুরছেন। কিন্তু ওঁদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে দেখুন, সেখানে কি ঝড় বইছে গোপনে। এ মুলুকে মুসলমানদের শাসন সুশৃঙ্খল হোক,

বইঘর.কম ও রোকন
মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য মজবুত হোক, তথা হিন্দুস্তানে মুসলমান শাসন চিরস্থায়ী হোক, এটা কি কখনো ওঁরা অন্তর থেকে কামনা করতে পারেন? বরং অশান্তি যতটা বৃদ্ধি পায়, মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য যতটা বিনষ্ট হয়, মুসলমানে মুসলমানে সংঘাত যত তীব্র হয়, ততই তো লাভ ওঁদের। কোথাও কোন ঘোলাটে পরিবেশ সৃষ্টি হলে ওদের কি ক্ষতি আছে কিছু?

রেজা খান পুনরায় মাথা নিচু করলেন এবং মৃদু হেসে বললেন—জাঁহাপনার এই পর্যবেক্ষণের সাথে আমি একমত।

হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী এবার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—অতএব, উড়িষ্যা রাজ্য জয় করাই নিজের অবস্থান মজবুত করে নেয়ার পথে প্রথম কাজ আমাদের। আকবর শাহর মুখোমুখি দাঁড়াতে যদি হয়ই, ঘরের পাশে এতবড় দুশমন রেখে সে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়। চারপশের প্রতিবন্ধকতা সাফ করে নিয়েই আমাদের তৈরি হতে হবে আকবর শাহর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য লড়াইয়ের জন্য।

উপস্থিত সকলেই উষ্ণ সমর্থন দিয়ে জানালেন, এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, এর কোন বিকল্প নেই। অতঃপর হযরত-ই-আলা বললেন—আমি চাই, আগামীকাল প্রস্তুতি নিয়ে আগামী পরশু প্রত্যুষেই বাঙ্গালার বাহিনী উড়িষ্যার পথে রওনা হোক! এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে কে কে আপনারা আগ্রহী, তাই এখন বলুন—

উভয় শাহজাদা ও রেজা খান সহকারে উপস্থিত সালারেরা সকলেই হাত তুলে দাঁড়ালেন। তা দেখে হযরত-ই-আলা পরম খোশে বললেন-সাব্বাস! কিন্তু সবাইকে তো একসাথে একযুদ্ধে প্রেরণ করা যায় না। সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত—উড়িষ্যার রাজধানী তাজপুর অভিমুখে সৈন্য চালনা করবেন শাহজাদা বায়াজিদ খান আর সালার সিকান্দার উযবেক সাহেব। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে বা সুযোগ থাকলে আমিও তাঁদের সাহায্যে অগ্রসর হবো।

শাহজাদা বায়াজিদ খান ও সিকান্দার উযবেক সাহেব খোশদীলে হযরত-ই-আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এতদৃশ্যে সহকারী সালার রেজা খান হযরত-ই-আলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু বলার চেষ্টা করতেই হযরত-ই-আলা হো হো করে হেসে উঠে বললেন—ভাত খেতে প্রথম প্রয়োজন নিমক, লড়াইয়ের পয়লা লোক কালাপাহাড়। ভুলিনি, আদৌ আমি ভুলিনি। বাহাদুর কালাপাহাড়ের কথা আমি আগেই ভেবে রেখেছি। আপনি যাবেন উত্তর উড়িষ্যায়। উত্তর উড়িষ্যা দখল করার দায়িত্ব আপনার উপর অর্পণ করলাম।

রেজা খান ইতস্ততঃ করে বললেন—জাঁহাপনা—

হযরত-ই-আলা বললেন—সংশয়ের কোন কারণ নেই। সে প্রয়োজনে আজ থেকে আপনাকে পরিপূর্ণ সালার পদে উন্নীত করা হলো। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাহিনী নিয়ে উত্তর উড়িষ্যায় যাত্রা করার জন্যে আপনি তৈরি হয়ে যান।

বইঘর.কম ও রোকন

রেজাখান তাজিমের সাথে কুর্ণিশ কলে বললেন—জাঁহাপনা দরাজদীল।

সেনাপতি গুজার খান সহ অন্যান্য সেনাপতিদের হতোদ্যম দেখে হযরত-ই-আলা বললেন আপনারাও আপনাদের নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সজাগ হয়ে থাকবেন। আপনাদের দায়িত্ব আরো বড়। এ দায়িত্ব আমি আপনাদের মতো অভিজ্ঞ সালারদের উপরই রাখতে চাই।

গুজার খান বললেন—জনাব!

ঃ উড়িষ্যা আক্রমণের খবর পাওয়ার সাথে সাথে মুঘল বাদশাহর বাহিনী যে বাঙ্গালা মুলুকে চড়াও হবে না, এটা কি নিশ্চিত করে বলার উপায় আছে?

সজাগ হয়ে উঠে সকলেই সমর্থন দিয়ে বললেন—জরুর-জরুর। সে আশংকা অত্যন্ত অধিক জনাব।

হযরত-ই-আলা বললেন—তখন দেশ সামলাবে কে? সেনাপতি গুজার খান সহ আপনাদের মতো অভিজ্ঞ সালারদের আমি কিছুতেই রাজধানীর বাইরে রাখতে পারিনে। এ দুর্যোগ সামাল দেয়ার ভার আপনাদের উপর রইলো।

এ দায়িত্ব বড় দায়িত্ব। সেনাপতি গুজার খান সহ অবশিষ্ট সেনাপতিরাও এতে তৃপ্ত হয়ে খোশ প্রকাশ করলেন।

বাকি রইলেন শাহজাদা দাউদ খান। তাঁর দিকে চেয়ে হযরত-ই-আলা সাহাস্যে বললেন—শাহজাদা দাউদ খানকে এখানে আহ্বান করার কারণ, শেরের মত বাঁচবার চিন্তা আমারও যে আছে কিছু, সব ক্ষেত্রেই শেয়াল হয়ে বাঁচতে যে আমি চাইনে, সে সম্বন্ধে শাহজাদাকে অবহিত করা। আল্লাহ না করুন, এতে যদি বিপর্যয় কিছু আসেই, বিনা আহ্বানে তিনি তাঁর নিজ দায়িত্ব পালন করবেন, এইটুকুই আমার প্রত্যাশা।

পরেরদিন প্রস্তুতি নিয়ে তারপর দিন প্রত্যুষেই বাঙ্গালার বাহিনী উড়িষ্যার পথে রওনা হলো।

o o o

উড়িষ্যার সাথে বাঙ্গালার লড়াই শুরু হওয়ার কিছুদিনতক্ শাহজাদা দাউদ খান আকবর শাহর প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করার জন্যে সক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে রইলেন এবং ঐ অপেক্ষায় সজাগ হয়ে কাল কাটাতে লাগলেন। বিশ্বস্ত চর মারফত তাণ্ডায় যখন এই বার্তা এলো যে, মেবার বিজয়ে ব্যস্ত থাকায় আকবর শাহর এখন অন্যদিকে নজর দেয়ার আদৌ ফুরসৎ নেই এবং লোদী খান যখন মুনিম খানের সাথে মোলাকাত করে জেনে এলেন, বাঙ্গালার এই নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে তাঁদেরও কোন মাথাব্যাথা নেই, একমাত্র তখনই শাহজাদা দাউদ খান রণ চিন্তা ক্ষান্ত করলেন এবং সতর্কতা পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর শাহজাদা দাউদ খানের সর্ব প্রথম যে কথাটি স্মরণ হলো, তা ঐ মুরাদ খানের দাওয়াত রক্ষার কথা। তিনি দেখলেন, ওয়াদাটা পালন করা হলোই না তাঁদের। সালার রেজা খান এখন লড়াইয়ে। কবে তিনি সহিসালামতে ফিরে আসবেন, একমাত্র আল্লাহতায়ালাই তা জানেন। ফলে, তিনি বুঝতে পারলেন, ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় যে কসুরটা হয়ে গেছে, রেজা খান সাহেব ফিরে আসার আগে তা নিয়ে ভেবে আর ফায়দা নেই। আল্লাহতায়ালা যদি তৌফিক দেন, রেজা খান সাহেব ফিরে এলে সে ওয়াদা অবশ্যই তারা পালন করবেন, এই সংকল্প নিয়ে তিনি এ ব্যাপারে খামোশ হয়ে গেলেন।

আবার সেই নিঃসঙ্গ জীবন। শাহীমহলে ও রাজধানীতে আরো অনেক সঙ্গী-সাথী ইয়ার-বন্ধু থাকলেও, রেজা খানের সাথে শাহজাদা দাউদ খান এমনভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন যে, ঐ একটি লোকের অভাবে শাহজাদার প্রাণের স্ফূরণ স্বাভাবিক গতি ফিরে পায় না। রেজা খান তাঁর কিছুটা অস্ত্রগুরু, অধিকটা বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী, ততোধিকটা রেজা খান তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই, শতজনের মাঝে শত কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাকে ছাড়া নিজেকে তিনি কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করেন। আয়োজনে উৎসবে হো হো করে হাসলেও, সে হাসির মধ্যে কেমন যেন একাকিত্বের রেশ থাকে একটা।

এইভাবে কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন রাত্রিকালে বাইরের কাজ শেষ করে শাহজাদা দাউদ খান শয়নকক্ষে এসে দেখলেন, তাঁর শিয়রের ফলদানিতে অদ্ভুত এক ফুলের তোড়া। তোড়াটির নির্মাণ যেমন নিপুণ, সৌন্দর্যও তেমনই চিত্তহারী। ঐ ফুলদানিতে প্রতিদিনই একটা করে নতুন নতুন ফুলের তোড়া রাখা হয়। কিন্তু এমন সুনিপুণ ও সুদৃশ্য ফুলের তোড়া শাহজাদা এর আগে কখনও ঐ ফুলদানীতে দেখেন নি। তোড়াটিতে এমন সব ফুলের সমাবেশ করা হয়েছে যে, খোশবুতে সারা ঘর মোহিত হয়ে গেছে। আকৃষ্ট হয়ে শাহজাদা তোড়াটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়চাড়া করে দেখলেন। শুঁকে শুঁকে কিছুক্ষণ তার সুবাস গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তাঁর খাসাবন্দা কোরবান আলীকে তলব দিলেন। বান্দা এসে হাজির হলে তাকে প্রশ্ন করলে—কোরবান আলী, এ তোড়াটা কোথা থেকে এলো?

কোরবান আলী বুঝতে না পেরে বললো—হুজুর!

ঃ এখানে কে রেখেছে এ তোড়া?

কোন কসুর হয়েছে বোধে কোরবান আলী ভয়ে ভয়ে বলল–আমি রেখেছি হুজুর!

ঃ তুমি এটা কোথায় পেলে?

ঃ একজন মালী এনে দিয়ে গেছে।

ঃ মালী? কোন বাগিচার মালী? শাহীমহলের ভেতরের?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জি না হুজুর। শাহীমহলের বাইরের ঐ বড় ফুল বাগানের। হুজুর নিজে যেখানে ফুলের চারা গেড়েছেন, ঐ ফুল বাগানের।

ঃ প্রতিদিন ঐ বাগানের মালীরাই কি ফুলের তোড়া দিয়ে যায়?

ঃ না হুজুর। ওরাও দেয়, মহলের ভেতরের মালীরাও দিয়ে যায়। সবাইকে বলা আছে কিনা।

ঃ এ তোড়াটা যে মালী দিয়ে গেছে, তাকে চেনো?

ঃ জি, না। সে এসে বললো, বাগিচারক্ষক মুরাদ খান সাহেব এই তোড়াটা হুজুরের জন্যে পাঠিয়েছেন। ঐ মালীকে মুরাদ খান সাহেব চেনেন, আমি চিনি না হুজুর।

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ কোন কসুর হয়েছে হুজুর?

ঃ না, কসুর নয়। তোড়াটা বহুত উমদা। নিপুণ হাতের তৈরি। এ মালীকে চেনা থাকলে, তাকেই প্রতিদিন তোড়া দিতে বলতে পারতে।

কোরবান আলীর দুশ্চিন্তা কেটে গেল। সে এবার উৎসাহভরে বলল–চিনে নেবো হুজুর, চিনে নেবো। মুরাদ খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই সে তাকে চিনিয়ে দেবে। কোন অসুবিধা হবে না।

ঃ মুরাদ খান সাহেবকে বললেও তো তিনি নিজেই সে ব্যবস্থা করতে পারবেন। পারবেন না?

ঃ জি-জি। জরুর তা পারবেন হুজুর। আগামীকাল সবেরেই গিয়ে তাকে আমি বলে আসবো।

ঃ থাক। তোমাকে এ নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। যা বলার আমিই তাঁকে বলবো।

ঃ হুজুর–

ঃ তুমি এখন যাও–

পরের দিন অপরাহ্নে ফুলবাগিচায় বেড়াতে এসে ঐ তোড়াটার কথা শাহজাদার খেয়াল হলো। বাগিচায় বেড়ানো শেষ হলে তিনি হাঁটতে হাঁটতে এসে মুরাদ খানের দপ্তর কক্ষে ঢুকলেন এবং কথায় কথায় মুরাদ খানকে প্রশ্ন করলেন–আচ্ছা খান সাহেব, গতকাল কি আমার জন্যে একটা ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন?

মুরাদ খান আগ্রহভরে বললেন–জি হুজুর, জি।

শাহজাদা হৃষ্টচিত্তে বললেন–সাব্বাস! বড় সুন্দর আপনার তোড়াটা। একেবারেই অপূর্ব! এমন তোড়া আগে পাঠাননি কেন?

ঃ জি? হুজুরের পছন্দ হয়েছে তাহলে?

ঃ জিয়াদা–জিয়াদা। আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

ঃ বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

ঃ এমন তোড়াই চাই আমি প্রতিদিন।

ঃ হুজুর।

ঃ ঐ মালীটাকে ডাকুন দেখি। আমি নিজে তাকে এ ফরমায়েশ করে যেতে চাই।

মুরাদ খান ঘাবড়ে গিয়ে বললেন–কোন মালীকে হুজুর?

ঃ যে মালী ঐ তোড়াটা বানিয়েছে তাকে একবার ডাকুন। ওকে কিছু বকশিশও আমি দিতে চাই।

মুরাদ খানের চোখ মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি কেবলই ইতস্তত করতে লাগলেন। তা দেখে শাহজাদা ফের বললেন–কি হলো? ডাকুন তাকে।

মুরাদ খান ঘাড় চুলকিয়ে বললেন–হুজুর, না জেনে কসুর করে ফেলেছি। এমনটি আর হবে না হুজুর।

শাহজাদা বিস্মিতকণ্ঠে বললেন–কসুর মানে?

ঃ ঐ তোড়াটা পাঠানোর আগে হুজুরের এযাযৎ নেয়া উচিত ছিল। তা না নিয়েই পাঠিয়ে দিয়ে আমি কসুর করে ফেলেছি।

ঃ এ কি বলছেন আপনি?

ঃ ঐ তোড়াটা কোন মালী তৈরি করেনি হুজুর।

ঃ তবে?

ঃ গোস্তাকি মাফ হয় হুজুর! ওটা আমার নাতনী তৈরি করেছে।

শাহজাদা চমকে উঠে বললেন–আপনার নাতনী!

ঃ জি হুজুর। আমি তাকে বারণ করলাম। বললাম, তুমি একটা নওকরের নাতনী। সব কিছুতেই একটা আদবের প্রশ্ন আছে, একটা রেওয়াজ-রীতি আছে। তুমি তৈরি করলে আর অমনি সেটা খোদ শাহজাদা হুজুরকে পাঠিয়ে দেবো আমি, তা কি করে হয়? হুজুরের এযাযৎ নেয়া দরকার। কিন্তু সে শুনলো না হুজুর। বললে, আমি তৈরি করেছি শুনলে, উনি ওটা নাও নিতে পারেন। না বলেই তুমি পাঠিয়ে দাও না একবার। কে তৈরি করেছে সে খোঁজ দেয়ার দরকার কি? তোমার ছোট হুজুরের পছন্দ হয় কিনা, সেইটে আগে দেখো না? তাই ঝোঁকের মাথায় পাঠিয়ে দিয়েছি হুজুর। মেহেরবানী করে গোস্তাকিটা এবারের মত মাফ করে দিন।

মুরাদ খানের এত কথা শাহজাদা দাউদ খানের কানে তামামটা গেল না। তিনি ফের সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন–আপনার নাতনী মানে? কোন্ নাতনী?

ঃ নাতনী তো আমার ঐ একটাই হুজুর। আদব-কায়দা জ্ঞানগম্মি তার খুবই উঁচু দরের। কিন্তু তবুও সে মাঝে মাঝে এমন সব বেয়াড়া কাজ করে বসে, যা সামাল দিতে আমার গলদ্‌ঘর্ম অবস্থা হয়। ওর জন্যে আমি হয়তো ফেঁসেই যাবো একদিন।

বইঘর.কম ও রোকন

মুরাদ খানের কণ্ঠে আফসোসের সুর ধ্বনিত হলো। শাহজাদা বললেন–ঐ একটা নাতনী মানে? ঐ যে আপনার মকানে সেদিন–

ঃ জি-জি। হুজুর ঠিকই ধরেছেন। ঐ যে সেদিন আমাদের মকানে হুজুরদের দাওয়াত করতে আমাকে যে মেয়েটি বললে, ঐ পাগলীটাই। কসুর তার আরো কিছু আছে হুজুর। তবু আমি হলফ করে বলতে পারি, আসলেই সে সাদা দীলের মেয়ে। আদৌ সে বেয়াদব বা খান্নাস্ আউরত নয়। কিন্তু ঐ যে বললাম, মাঝে মাঝে সে এমন কাজ–

শাহজাদা কিছুই শুনছেন না দেখে মুরাদ খান থেমে গেলেন। শাহজাদা স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন। তাজ্জব হলেন যারপরনাই। মুরাদ খানের ঐ নাতনীটাই তৈরি করেছেন ঐ ফুলের তোড়া! এমন যার দক্ষতা, এমন যার রুচি, তিনি তো কোনক্রমেই মামুলি আউরত নন! খানদানি ঘরের না হলেও, খানদানি পরিবেশের সাথে অবশ্যই তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিতা। তাঁর সেদিনের ভাষা আর সৌজন্যবোধও এই ইঙ্গিতই বহন করে। সেই সঙ্গে শাহজাদার স্মরণ হলো বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ রেজা খানের কথাগুলো–"বলা যায় না, ওখানে পেলেও তো পেতে পারেন অমূল্য রতন?" তবে কি এটাও একটা রতন নাকি? ঐ বস্তিটা কি আসলেই রত্নগর্ভা?

অনেকক্ষণ পরও যখন শাহজাদা আর কোন কথাই বললেন না, তখন মুরাদ খান ফের শংকিত চিত্তে বললেন–কসুর নিলেন হুজুর?

সম্বিত ফিরে পেয়ে শাহজাদা বললেন–এ্যাঁ? না-না, মানে, ঐ যে, সেদিন আমাদের যিনি দাওয়াত দিতে বললেন, তিনি?

ঃ জি হুজুর, জি। কসুর হয়ে থাকলে–

ঃ কসুর! এ কি বলছেন আপনি? কসুর নেবো কেন? এটা তো একটা মস্ত বড় কৃতিত্বের কাজ। তারিফের কাজ। তাঁকে গিয়ে জানাবেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। সময় সুযোগ মিললে, এর জন্যে উনাকে আমি উমদা ইনাম দেবো।

ঃ হুজুর!

ঃ ফুলের কাজের একজন সুদক্ষ কারিগরও যে ফুলের কাজ জানে না, সে কাজটা জানা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। জরুর তাকে পুরস্কৃত করবো আমি। উপযুক্ত ইনাম দেবো।

মুরাদ খান আশ্বস্ত হয়ে বললেন–আলহামদুল্লিাহ! হুজুর তাহলে কসুর নেননি?

শাহজাদা হেসে বললেন–পাগল! কসুর নিলে কেউ ইনাম দিতে চায়?

ঃ এ্যাঁ? না, তা তো চায় না। তবে ইনামের কি দরকার হুজুর! একটু দোয়া করবেন ওর জন্যে। ও বড় অভাগী!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, দোয়া তো অবশ্যই করবো। কিন্তু সেরেফ দোয়াই নয়, এবার গেলে, মানে আপনাদের মকানে আবার গেলে–

কথার মাঝেই মুরাদ খান নতমস্তকে বললেন–কৈ আর তা গেলেন হুজুর–

শাহজাদা সজাগ হয়ে উঠলেন। তিনি শরমজড়িত হাসিমুখে বললেন–তা খান সাহেব, আপনাদের দাওয়াতটা নানা কারণেই রক্ষে করতে পারিনি আমরা। আপনাকেও বলি আর আপনার নাতনীকেও জানাবেন, কোন ইনকার বা অবহেলা করে নয়, অনিবার্য কারণেই দাওয়াত রক্ষে করতে বিলম্ব হচ্ছে আমাদের। তবে বিলম্ব হলেও একদিন গিয়ে আপনাদের দাওয়াত আমরা অবশ্যই রক্ষে করে আসবো ইনশাআল্লাহ।

ঃ জি হুজুর, তাহলে আমরা বড়ই বাধিত হবো।

ঃ আচ্ছা, তাহলে এবার চলি খান সাহেব–

ঃ তা–ঐ তোড়া সম্বন্ধে হুজুর যেন কি বললেন? মানে প্রতিদিন একটা করে–

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়ে শাহজাদা বললেন–আরে না-না। এ বড় তকলিফের কাজ। সময়ের কাজ। প্রতিদিন এমন তোড়া তৈরি করা মানেই চরম মেহনতে পড়ে যাওয়া। এক কাজ সার্বক্ষণিক মজুরের কাজ। উনি আমার মালী মজুর নন। প্রতিদিন একাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়, তাঁকে সে কষ্টও আমি দিতে চাইনে।

ঃ হুজুর।

ঃ তাঁর তোড়া পেয়ে আমি খুশি হয়েছি, এইটেই তাঁকে জানাবেন। ঐ তকলিফে যাওয়ার জরুরত নেই।

ঃ তা প্রতিদিন না হোক, মাঝে মধ্যে–

ঃ না-না, মাঝে মধ্যেও নয়। তবে কালেভদ্রে অনুষ্ঠানে উৎসবে দু' একবার পাঠালে আমি খুশি হবো। আচ্ছা চলি আল্লাহ হাফেজ–

শাহজাদা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুই হাতে ঠেলে করণীয় কাজ শেষ করার পর মুরাদ খান মহানন্দে মকানে ছুটে এলেন এবং এসেই ঘরদোর মাথায় তুলে নিলেন। দুয়ারে পা দিয়েই তিনি হাঁক শুরু করলেন–কৈরে, দৌলতজাহান কৈ? দৌলত–

মুরাদ খানের হাঁক শুনে দৌলতজাহান ছুটে আসতেই মুরাদ খান হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগলেন–কামাল কিয়া, তুম কামাল কিয়া! ওহ্! কি আনন্দ–কি আনন্দ!

দৌলতজাহান সবিস্ময়ে বললেন–কি হলো দাদু, এত খুশির কি হলো?

মুরাদ খান ঐ একইভাবে বলতে লাগলেন–দিউয়ানা বন্ গিয়া, বিলকুল দিউয়ানা বন্ গিয়া!

ঃ দিউয়ানা! কে দিউয়ানা বনে গেল?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ছোট হুজুর। খোদ শাহজাদা দাউদ খান কাররানী। তোমার ফুলের তোড়া পেয়ে ছোট হুজুর আমাদের একদম আওয়ারা!

ঘটনাটা বুঝতে পেরে দৌলতজাহান সহাস্যে বললেন–বলেন কি দাদু। একটা ফুলের তোড়া পেয়েই তোমার ছোট হুজুর আওয়ারা হয়ে গেলেন?

ঃ আওয়ারা বলে আওয়ারা? খুশিতে দিশেহারা। এমন ফুলের তোড়া তিনি জিন্দেগীতেও দেখেন নি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ তোমার তারিফে তাঁর মুখ দিয়ে কেবলই খৈ ফুটতে লাগলো। খুশিতে জার-জার হয়ে গেলেন। ওহ্! কাজ একখান করেছো বটে তুমি!

ঃ তাই? তা কি বললেন তিনি?

ঃ এমন সুন্দর তোড়া নাকি কোন মালী কারিগর আর কারো সাধ্য নেই যে তৈরি করে। এ জন্যে তিনি তোমাকে ইনাম দেবেন বললেন।

ঃ ইনাম?

ঃ উমদা ইনাম। সেরেফ এখন সুযোগটা তাঁর চাই। সুযোগ পেলেই তিনি তোমাকে তোফা একটা ইনাম দেবেন।

ঃ বলেন কি!

ঃ তোড়াটা তাঁর এতই পছন্দ হয়েছে যে, এমন তোড়া দৈনিক তিনি পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

ঃ দৈনিক?

ঃ না-না, তোমাকে উনি কষ্ট দিতে চান না। বললেন, এ কাজ কঠিন কাজ, খুবই মেহনতের কাজ। উনাকে আমি এত কষ্ট দেবো না। তবে কালে ভদ্রে এমন তোড়া দু' একটা পেলে আমি বড়ই খুশি হবো।

দৌলতজাহানের দীল আন্দোলিত হলো। তিনি হাসিমুখে বললেন –আচ্ছা!

ঃ দেখলাম, ঐ তোড়াটা পেয়েই তোমার প্রতি শাহজাদার দীলে দরদ পয়দা হয়ে গেছে। এমন তোড়া পাওয়ার তাঁর জব্বর সখ। কিন্তু তুমি কষ্ট পাবে বলে উনি আর তা চান না।

দৌলতজাহান লজ্জিত হয়ে বললেন–দাদু!

ঃ আসলেই ছোট হুজুরের আমাদের দয়ার শরীর তো! তাই কালেভদ্রে ছাড়া উনি আর তোড়া পেতে চাইলেন না। তোমাকে কষ্ট করতে নিষেধ করলেন। তোমার তোড়া পেয়ে উনি জব্বর খুশি হয়েছেন, এ কথা তোমাকে জানানোর জন্যে উনি আমাকে বারবার করে বলে দিলেন।

দৌলতজাহানের দীলে তৃপ্তির পরশ লাগলো। তিনি এবার মুরাদ খানকে ঠেশ্ দিয়ে বললেন–দেখো তো, তোড়াটা তাঁকে দিতেই তুমি চাচ্ছিলে না। ভয়েই জড়সড় হয়ে যাচ্ছিলে। এখন হলো তো?

মুরাদ খান আপন খেয়ালে বললেন–আমি কি জানি যে, এই তোড়া পেয়ে উনি তোমাকে এত পেয়ার করবেন? আমি তো ভাবলাম, বেয়াদবিই ধরে ফেলবেন আমার।

ঃ দাদু!

ঃ দেখলাম, তোমাকে ইনাম দেয়ার এতই তাঁর আগ্রহ, হাতের কাছে পেলে যে কি উনি দিয়ে বসতেন, তা উনিই জানেন। হয়তো বা হাত থেকে অঙ্গুরীটাই খুলে ফেলতেন নয়তো বা অন্য কোন মণিমুক্তা হাতড়াতেন।

দৌলতজাহান অভিযোগ করে বললেন–তুমি দাদু একেবারেই ছেলে-মানুষ। সব কিছুকেই তুমি এত বড় করে দেখো আর একটুতেই তুমি এত উদ্বেলিত হয়ে উঠো যে, তোমার কথা থেকে কোন কিছুই সঠিকভাবে আঁচ করার উপায় নেই।

মুরাদ খান আহত কণ্ঠে বললেন–কেমন কেমন?

ঃ উনি একটা কথার কথা বললেন আর অমনি তুমি সেটাকে এত বড় করে ধরে নিলে?

ঃ কেন নেব না? হুজুরের যে রকম আগ্রহ দেখলাম–

ঃ আগ্রহ? আগ্রহ তো আগেও দেখিয়ে গেলেন! কই, তাতে গুরুত্ব কিছু দিয়েছেন?

ঃ আগেও দেখিয়ে গেলেন!

ঃ কেন, আমাদের দাওয়াতটা তাঁরা কত আগ্রহভরে কবুল করলেন সেদিন? কিন্তু তাতে কি কোন গুরুত্ব তাঁরা দিয়েছেন? ইজ্জত রেখেছেন সে দাওয়াতের? এসব হলো ঐ বড়লোকদের খেয়ালখুশির ব্যাপার। গরীবদের উপহাস করার ব্যাপার। ওঁদের কথার দাম আছে কিছু? ঝোঁকের মাথায় এঁরা অনেক কিছুই করেন, অনেক কিছু বলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাণ্ডা।

মুরাদ খান চমকে উঠে বললেন–তওবা-তওবা! এমন কথা বলো না। আল্লাহতায়ালা নারাজ হবেন।

ঃ কি রকম?

ঃ শাহজাদাকে চেনো না। তেমন লোকই তিনি নন। ইনকার-উপহাস করে নয়, অনিবার্য কারণেই তিনি আমাদের দাওয়াত রক্ষে করতে আসার সময় পান নি। সে জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সময় পেলে নিশ্চয়ই তাঁরা আসবেন, এ কথা জোর দিয়ে জানিয়েছেন।

ঃ সময়? প্রতিদিনই বাগানে এসে বেলাভর ঘুরে বেড়াতে পারছেন, আর এইটুকু হেঁটে এখানে আসতে পারেন না?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কই, প্রতিদিন আর এলেন কৈ? এখন তো লড়াইয়ের ভাবনা নিয়েই সবাই পেরেশান।

ঃ আজ তো এসেছিলেন।

ঃ হ্যাঁ তা এসেছিলেন।

ঃ তো এটুকু আসতে পারলেন না?

ঃ কি করে? রাজু খান, মানে ঐ কালাপাহাড় সাহেব তো যুদ্ধে আছেন এখন। দুইজনের দাওয়াত। উনি একা আসবেন কি করে? ঐ খান সাহেব লড়াই থেকে ফিরে এলেই উনারা এক সাথে আসবেন, এই আমার ধারণা।

ঃ সে কবে? লড়াইটা শেষ হতে তো বছরটা পার হয়েও যেতে পারে। এর মধ্যে কি একবার উনি একাই আসতে পারেন না? কালাপাহাড় সাহেব ফিরে এলে তাঁকে নিয়ে পরে আবার এক সাথে আসতে পারতেন?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ আসলে আসারই তাঁর ইচ্ছে নেই। নইলে উনি একা এসেও আমাদের দাওয়াতের ইজ্জতটা দিতে পারতেন।

কথাটা মনে ধরলো মুরাদ খানের। কিঞ্চিৎ চিন্তা করেই তিনিও বলে উঠলেন–তাই তো! তা তো উনি জরুর আসতে পারেন। ঠিক– ঠিক। এ কথা শাহজাদাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। ইশ্! আমিই ভুলে গেছি। এ কথাটা তাঁকে খেয়াল করিয়ে দিলেই–

ঃ তাজ্জব! তোমাকে খেয়াল করিয়ে দিতে হবে?

ঃ হবে না? যে আত্মভোলা মানুষ! উনি হয়তো এতটা ভেবেই দেখেন নি।

ঃ তার মানে? উনি কি পাগল?

ঃ ঠিক পাগল না হলেও ভাবুক তো বটেই। আলাভোলা আর খেয়ালি মানুষ। আমি একজন তুচ্ছ নওকর। অথচ আমার সাথে দোস্তের মতো বসে যে আলাপঠাট্টা করেন আর আজগুবি কথা বলেন, তাতে কে বলবে উনি একজন শাহজাদা!

ঃ মানে?

ঃ মাঝে মাঝে একদম ছেলেমানুষের মতো উনি যে সব কথা বলেন, তা শুনলে যে কেউ বলবে, উনি একজন ভাবুক বা পাগল।

মুরাদ খান হেসে ফেললেন। দৌলতজাহান সবিস্ময়ে বললেন– দাদু!

ঃ অথচ যখন কাজ নিয়ে থাকেন বা তলোয়ার হাতে তোলেন, তখন একদম পাথর। কে বলবে তাঁর মধ্যে রসকষ কিছু আছে! কিন্তু যেই অবসর হলেন আর মনের মতো লোক পেলেন, তখন তিনি বদ্ধ পাগল।

ঃ তাজ্জব!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমাকে বলেন কি জানো? বলেন–খান সাহেব, আপনি ভূত্ দেখেছেন?

ঃ ভূত!

ঃ মানে জীন-পরী দেখেছেন? আপনাদের এলাকায় কত জীন-পরী আছে আপনি তা দেখেছেন?

ঃ জীন-পরী!

ঃ হ্যাঁ। ঐ শাহজাদা নাকি দেখেছেন। এমন এক সুন্দর পরী তিনি দেখেছেন, যার রূপে তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

ঃ সে কি! কোথায় উনি পরী দেখলেন?

ঃ আমাদের ঐ বজরাঘাটে। দুটি পরী নাকি উনি ওখানে দেখেছেন। তার মধ্যে একটা পরীর রূপ নাকি তাঁর এতই ভাল লেগেছে যে, উনি একদম মুগ্ধ হয়ে গেছেন।

দৌলতজাহান চমকে উঠলেন। বজরাঘাটে তাঁদের ঐ বোরখা বদলের ঘটনাটা তাঁর মনের কোণে ভেসে উঠলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—বলেন কি দাদু! সত্যিই উনি পরী দেখেছেন? মানে পাখা ছিল?

মুরাদ খান ফের হেসে বললেন—আরে না-না, পরী নয়—পরী নয়। মানুষই উনি দেখেছেন। জিয়াদা রূপের জন্যে মানুকেই তাঁর পরীর মতো মনে হয়েছে। একথা নিজেই তিনি স্বীকার করলেন। বললেন, বিলকুল পরীর মতো খান সাহেব! মানে ডানাকাটা পরী! সে কি রূপ!

ঃ দাদু!

ঃ পাগল আর বলে কাকে দেখো?

দৌলতের আর দেখার অবকাশ ছিল না। এক অনবদ্য শিহরণে তখন তাঁর সারা শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। মুরাদ খান ফের বললেন—এই পাগলকে স্মরণ করিয়ে না দিলে, সব কথা তাঁর খেয়াল থাকে?

ইতিমধ্যেই রান্নাঘর থেকে দৌলতজাহানের আম্মা দিনারবানু দৌলতজাহানকে পুনঃপুনঃ ডাকতে শুরু করলেন। তা দেখে দৌলতজাহান ঝটপট করে বললেন–তাহলে এবার গিয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়েই দিন। দেখি, কেমন উনি পাগল আর কেমন খেয়াল করেননি বলেই একা উনি আসেন নি?

দৌলতজাহান অতঃপর রান্নাঘরে দৌড় দিলেন।

পরের দিন ঐ ফুলবাগানে শাহজাদা দাউদ খানের সাথে ফের মুরাদ খানের সাক্ষাৎ হল। শাহাজাদা তাঁকে ডেকে নিয়ে মালীদের কাজ কর্ম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। বাগান সম্পর্কিত কথার মধ্যে ফাঁক পেয়ে মুরাদ খান ইতস্তত করে বললেন–হুজুর, গোস্তাকি না নিলে একটা কথা বলতাম।

বইঘর.কম ও রোকন

শাহাজাদা সাগ্রহে বললেন–কি কথা? বলুন বলুন–

ঃ বলছিলাম কি হুজুর, ঐ সেনাপতি হুজুর কবে লড়াই থেকে ফিরে আসবেন তার তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই, তাই আমাদের দাওয়াতটা–

আরো অধিক মনোযোগ দিয়ে শাহাজাদা তৎক্ষণাৎ বললেন– আপনাদের দাওয়াতটা!

ঃ মেহেরবানী করে হুজুর একা গিয়েই তা রক্ষা করে এলে বড় ভাল হয়। ঐ হুজুর ফিরে এলে তাঁকে নিয়ে আবার এক সাথে যাবেন?

ঃ বলেন কি? একা যাবো?

ঃ তা গেলে খুব ভাল হয় হুজুর। আমার একটু সুবিধে হয়।

ঃ আপনার সুবিধে!

ঃ জি হুজুর। হুজুরকে আমি যতটা জানি, আমার পরিবারের জেনানারা তো ততটা জানে না। তাদের ধারণা, গরীব বলে হেলা করেই হুজুর আমাদের ওখানে গেলেন না।

ঃ বলেন কি! এমন ধারণা হয়েছে তাঁদের?

ঃ হওয়াই তো স্বাভাবিক হুজুর। অনেকদিনই তো হয়ে গেল। আমার আম্মাজানও, মানে আমার ঐ নাতনীটার আম্মাও একদিন আমাকে এই কথাই বললেন। হুজুরদের অসুবিধার কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলায় তিনি অবশ্য থেমেছেন। কিন্তু আমার ঐ নাতনীটাকে আর কিছুতেই বুঝাতে আমি পারছিনে।

শাহজাদা উদগ্রীব হয়ে বললেন–তাই নাকি? আপনার নাতনীটা কি বলেন?

ঃ ও বলে, হতে পারেন তোমার ছোট হুজুর ভাল মানুষ আর ভাল মানুষ উনি ঠিকই, কিন্তু যতটা তুমি বুঝাতে চাচ্ছো, ততটা আমি মেনে নিতে পারছিনে। কারণ, নির্জলা ভাল মানুষ জান গেলেও কথার বরখেলাপ করবেন না।

সজাগ হয়ে উঠে শাহজাদা বললেন–এই কথাই বললেন তিনি?

মুরাদ খান ভীতকণ্ঠে বললেন–কসুর নেবেন না হুজুর। হুজুরের প্রতি শ্রদ্ধা তার অগাধ। হুজুর নিজের হাতে মাল বয়ে আমাদের ঘরে উঠিয়ে দিলেন। এটা দেখার পর থেকেই হুজুরকে যে সে কত মহৎ মনে করে, তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সে যা বলেছে তা অভিমান করে বলেছে হুজুর। হুজুরদের মতো লোক কথার খেলাপ করলেন দেখে সে বড় দুঃখ পেয়েছে।

শাহজাদা খুশি হলেন, বিচলিতও হলেন। তিনি অভিযোগের সুরে বললেন–তা মকানে আপনার এমন ধারণা পয়দা হল, আর আপনি সে কথাটা এতদিন বলেননি কেন?

ঃ হুজুর।

ঃ একটু ইংগিতও যদি দিতেন কোনদিন, তাহলে তো আর এ অবস্থা হয়না। একা হোক, দুজন এক সাথে হোক, জরুর আমি এর মধ্যে দিয়েই দাওয়াত রক্ষে করে আসতাম!

মুরাদ খান নতমস্তকে বললেন–শেষের দিকে এই লড়াই ফ্যাসাদ দেখে আর বলিনি হুজুর তবে প্রথম দিকে–

মুরাদ খান থেমে গেলেন। শাহজাদা বললেন–প্রথম দিকে?

ঃ একটা ভয় ছিল আমার হুজুর। সেই ভয়ের জন্যেই দাওয়াতের কথা হুজুরদের স্মরণ করিয়ে দিতে আমি উৎসাহ পাইনি।

ঃ ভয়!

ঃ জি হুজুর। সে ভয়টা যে এখনও নেই তা নয়। সেজন্যে এখনও আমি ভীত আছি। ভাবছি–কি জানি, হিতে যদি বিপরীত হয়।

ঃ তাজ্জব! এ আবার আপনি কি বলছেন? কিসের ভয়?

ঃ হুজুরের গোস্বার ভয়। হুজুরের কাছে যে একটা মস্তবড় গোস্তাকি আছে আমাদের।

ঃ গোস্তাকি!

ঃ জি। সেটা জানার পর হুজুর যদি নাখোশ বা নারাজ হন আমাদের উপর, সেই ভয়।

ঃ কি আপনাদের গোস্তাকি? কে আপনারা গোস্তাকি করলেন আমার কাছে?

মুরাদ খান অনুতাপের সুরে বললেন-কে আবার হুজুর? আমার ঐ বেয়াড়া নাতনীটাই তো সব অনিষ্টের মূল। ওকে যে আর ক'দিক দিয়ে সামলাই আমি? আমার ধারণা, তার সেই গোস্তাকির কথা হুজুরেরা দাওয়াত রক্ষে করতে এলেই সে নিজেই তুলে বসবে। যে মুখরা মেয়ে!

ঃ খান সাহেব।

ঃ সেই ঘটনা তখন ফাঁস হলে হুজুরেরা তা কি ভাবে গ্রহণ করবেন কি অবস্থা ঘটবে তখন, এসব ভেবে আমি হুজুরদের ডেকে নিতে জোর পাইনি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বরাবরই আমি সে কথাটা চেপে গেছি। কিন্তু এখন আবার ঐ বেয়াড়াটার চাপে পড়েই সেই দাওয়াতের কথা তুলতে হচ্ছে। তাই ভাবছি, যা হয় তা হয়ে যাক। ঘটনাটা আর চাপা না থেকে ফাঁস হয়েই যাওয়াই ভাল। প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাই।

শাহজাদা দাউদ খান তালগোল পাকিয়ে ফেললেন। কি বলতে চান শিশুর মতো সরল এই বৃদ্ধটা, তা তিনি কিছু আন্দাজ করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি অধৈর্য

বইঘর.কম ও রোকন

কণ্ঠে বললেন–তা হলে তা বলুন না জলদি জলদি? আগে শুনি দেখি, কি গোস্তাকি করেছেন আপনার নাতনী?

মুরাদ খান ফের আফসোসের সাথে বললেন–বেয়াদপটা হুজুরকে যারপরনাই অপমান করেছে। চরম বেইজ্জতি করেছে। সেকথা তখন ভয়েই আমি তুলতে পারিনি। এরপর যখন দেখলাম, তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে হুজুর তার কোন খোঁজই করছেন না, তখন ভাবলাম, যা থেমে গেছে থেমেই থাক। আর কেঁচো খুঁড়তে যাওয়া ঠিক হবে না।

শাহজাদা আরো অধিক বিস্মিত হয়ে বললেন–বেইজ্জত করেছেন! কোথায় তিনি বেইজ্জত করলেন আমাকে।

ঃ আমাদের ঐ বজরাঘাটে। বজরা ভেড়ানো নিয়ে সেপাইয়ের মতো বজরার উপর দাঁড়িয়ে কোন আউরত হুজুরের সাথে বেত্তমিজী করেছিল? ঐ বেয়াদবটা নয়?

শাহজাদার সর্বাঙ্গে তড়িৎ বেগে একটা শিহরণ খেলে গেল। আনন্দে আর বিস্ময়ে তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন–এই মেয়েই সেই মেয়ে!

বলেই চললেন মুরাদ খান–খোদ হুজুর যেখানে বজরা ভেড়াতে নিষেধ করলেন, তুই আউরত হয়ে গেলি সেখানে হুজুরের সাথে বহাস্ করতে? বেয়াড়া আর বেত্তমিজের মতো তাঁর মুখে মুখে তর্ক করলি? বলে কিনা, আমি অন্যায় কিছু বলিনি। হুজুর যে তোকে সেদিন ওখানেই কোতোল করেননি, এই তো তোর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।

মুরাদ খানের হুজুর নিজেই এ খবরে কোতল হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তরাত্মা তখন রেজা খানের উদ্দেশ্যে নীরব চিৎকারে বলতে লাগলো–চাচা হুজুর, বোধ হয় পেয়েই আমি গেলাম এক অমূল্য রতন।

শাহজাদাকে নীরব দেখে মুরাদ খান ঘাবড়ে গেলেন। থতমত করে ফের ভয়ে ভয়ে বললেন–হুজুর দরাজদীল। এতদিন যখন বরদাস্ত করে গেছেন, তখন তার ঐ গোস্তাকিটা নিয়ে নারাজ হবেন না হুজুর! মেহেরবানী করে ওকে একেবারেই মাফ সাফ করে দিন। আমি সত্যিই বলছি হুজুর ঐ পাগলামিটুকুর বাইরে সে বড়ই ভাল মেয়ে। বড়ই আকেলমন্দ।

সম্বিত ফিরে পেয়েই শাহজাদা বললেন–বজরা ভেড়ানো নিয়ে যে মহিলার সাথে আমার কথা হল, তিনি আপনারই ঐ নাতনী?

মুরাদ খান বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন–জি হুজুর। বদনসীব আমারই।

অভিভূত হয়ে শাহজাদা বললেন–খান সাহেব, আগামিকাল বিকেলেই আমি আপনাদের দাওয়াত রক্ষেয় আসছি। আর শুনুন, আপনার নাতনীর ঐ আচরণের জন্যে নাখোশ হওয়াতো দূরের কথা, সেদিন এতই আমি খুশি হয়েছিলাম যে, আনন্দে আর অধিক কোন কথাই বলতে পারিনে। তাঁর আচরণ দেখে বুক আমার স্ফীত হয়ে উঠেছিল।

ঃ হুজুর।

ঃ বীরাঙ্গনার স্পষ্ট স্বাক্ষর তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম আমি। এই তো চাই। এত যাঁর এলেম আর সৎসাহস, দীল যার এত তেজী, সে মহিলা বাঙালা মুলুকের গর্ব। শাহাজাদা দাউদ খান তাঁকে কখনো অশ্রদ্ধা করতে পারেন না বা তাঁর উপর নাখোশ হতে পারেন না।

আবেগের আধিক্য সামলে নেয়ার জন্যে তখনই তিনি মুরাদ খানের সামনে থেকে সরে গেলেন।

০ ০

শাহাজাদা দাউদ খান দাওয়াত রক্ষেয় আসছেন শুনে দৌলতজাহান ও তাঁর আম্মা দিনারবানু বেগম তৎপর হয়ে উঠলেন। নিতান্তই গরীব মানুষ তাঁরা। অথচ তাঁরা দাওয়াত করছেন এ মুলুকের খোদ এক শাহাজাদাকে। খোদ শাহাজাদা আসছেন দাওয়াত রক্ষা করতে। এতদিন তিনি না আসায় তাঁরা মান-অভিমান করেছেন। আজ যখন সত্যি সত্যিই তিনি আসছেন বলে জানালেন, তখন তাঁরা যথার্থই দমে গেলেন। শাহজাদাকে মর্যাদানুযায়ী আপ্যায়ন করার সামর্থ্য তাঁদের নেই। উপযুক্ত আয়োজন করার সঙ্গতি তাঁদের নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু মনোবল ও আগ্রহ। তাই নিয়েই তাঁরা শাহজাদার মেহমানদারী করার জন্যে তৈরি হয়ে গেলেন।

যথাসময়ে হাজির হলেন শাহজাদা। তসলিম ও খোশ্-আমদেদ জানিয়ে মুরাদ খান তাঁকে সমাদরে এনে দহলিজে বসালেন। দৌলতজাহানের আম্মা দিনারবানু এসে দহলিজের অন্দরমুখি দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে শাহজাদার আগমনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন ও শাহজাদার ভালাই কামনা করলেন।

এরপর কিছুক্ষণ কুশলাকুশল সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা হল। তারপরেই শুরু হল খানাপিনার পালা। দিনারবানু বেগম পর্দার আড়াল থেকে সব কিছু যোগান দিতে লাগলেন। বাড়িতে আর অন্যলোক নেই। মকানে না থাকায় গজনবীদেরও ডাকা যায়নি। এ ছাড়া, নিজের বাড়িতে মেহমানকে নিজের হাতে আপ্যায়ন করাই ভদ্রতা। বিশেষ করে শাহজাদার মতো মেহমান। দীলের টানতো ছিলই তদুপরি এই সমস্ত বিবেচনায় আহার্যাদি হাতে নিয়ে মুরাদ খানের সাথে বোরখা-ঢাকা দৌলতজাহানও শাহজাদা দাউদ খানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যে পোশাক পরিধান করে দৌলতজাহান সেদিন বজরার উপর দাঁড়িয়ে শাহজাদার সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন, ইচ্ছে করেই তিনি আজ সেই পোশাক ও সেই বোরখা পরিধান করে শাহজাদার সামনে এসে হাজির হলেন।

চোখ তুলেই শাহজাদা শিহরিত হলেন। বুঝতে তাঁর আদৌ তকলিফ হল না যে, এই তরুণীই সেই তরুণী। ইনিই এই মুরাদ খানের নাতনী। দৌলতজাহান এসেই

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদাকে তাজিমের সাথে সালাম দিলেন। অতঃপর আহার্যাদি তাঁর সামনে রাখতে লাগলেন। সালাম নিয়ে শাহজাদা স্মিতহাস্যে মুরাদ খানকে প্রশ্ন করলেন– খান সাহেব, ইনিই কি তাহলে আপনার সেই–

পরম উৎসাহে মুরাদ খান বললেন–জি হুজুর, জি। এই আমার সেই নাতনী। এই সেই আসামী।

–বলেই মুরাদ খান সহাস্যে জিব কাটলেন। দৌলতজাহান এ কথায় চকিতে একবার তাঁর দিকে বোরখা ঢাকা চোখ ফেরালেন। শাহজাদার নজর তা এড়ালো না। তিনি হাসিমুখে বললেন–ও, আচ্ছা-আচ্ছা। তা নাম কি আপনার নাতনীর?

মুরাদ খান বললেন–দৌলত হুজুর। দৌলতজাহান।

ঃ বাহ্! বেশ চমৎকার নাম তো! সুন্দর নাম।

দৌলতজাহান সংকুচিত হলেন। মুরাদ খান বললেন–হুজুর–

ঃ নাম, কাজ, আচরণ—সবই দেখছি নাতনীর আপনার তারিফ পাওয়ার যোগ্য।

ঃ জি হুজুর, তা কিছুটা তাই।

ঃ ভাল–ভাল। ঐ যে দোআ করতে বলেছিলেন না? আমি দোআ করছি, আল্লাহতায়ালা তাঁর ভালাই করুন, অশেষ কল্যাণ করুন।

ঃ বড় আকেলমন্দ্ লেড়কী হুজুর। রূপগুণ তার উমদা। কিন্তু সে তুলনায় নসীব তার কমজোর।

ঃ খান সাহেব!

ঃ রাজার ঘরেই মানায় হুজুর, এই গরীব পরিবেশে এতটা বেমানান। কিন্তু নসীবের উপর তো কারো হাত নেই।

ঃ তা ঠিক–তা ঠিক। সবই ঐ একজনের হাত।

www.boighar.com

ঃ হুজুর।

ঃ নাখোশ হচ্ছেন কেন? এটা তো আল্লাহতায়ালার নিয়ামত!

ঃ তা যা বলেছেন হুজুর। তবে–

আহারাদি শাহজাদার সামনে দিয়ে দৌলতজাহান নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁদের কথায় তিনি সংকুচিত হতে লাগলেন। কিন্তু, আহারে মনোনিবেশ না করে শাহজাদা মুরাদ খানের সাথে তত্ত্ব আলোচনায় লিপ্ত হলেন এবং মুরাদ খান এ বিষয়ে উদাসীন হয়ে রইলেন দেখে দৌলতজাহানকে কথা বলতে হল। তিনি একটু ইতস্তত করে বিনম্র কণ্ঠে বললেন–গোস্তাকি মাফ হয় জনাব। কেন আমি আসামী হলেম জানিনে, তবে মুখ না খুলে পারছিনে।

শাহজাদা উৎসাহ দিয়ে বললেন–বলুন-বলুন–

দৌলতজাহান বললেন–আমার এই দাদুর কথায় কান দিলে, সারাদিনেও তার কথার তুফান থামবে না। মেহেরবানী করে গরীবদের এই আনযামটুকু কবুল করুন–

দৌলতজাহান আহার্যের প্রতি শাহজাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। হুঁশ হতেই মুরাদ খানও ঐ একই অনুরোধ করতে গিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন–তাইতো! হুজুর তো কিছুই মুখে দিচ্ছেন না! আর কথা নয় হুজুর। মেহেরবানী করে এবার এগুলো একটু মুখে দিন।

স্মিতহাস্যে শাহজাদা আহারে প্রবৃত্ত হলেন। কিছুক্ষণ নীরবে আহার করে শাহজাদা ফের মুখ তুলে সহাস্যে বললেন–তা ব্যাপার কি খান সাহেব? নাতনীকে আপনার আসামী বললেন কেন?

মুরাদ খান এবার সরবে বললেন–বলবো না? হুজুরের কাছে সে একটার পর একটা অপরাধ করে বসবে আর অপরাধীকে আসামী বলবো না?

শাহজাদা বললেন–অপরাধ! অপরাধ কি দেখলেন?

মুরাদ খান বললেন–অপরাধ তো পয়লা থেকেই। হুজুর গোস্বা হননি সেকথা আলাদা। তা না হলে হুজুরের সাথে বহাস্ করা, হুজুরের অনুমতি ছাড়াই একটা মামুলি ঘরের মেয়ে হয়ে হুজুরের খাস কামরায় ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দেয়া–এসব অপরাধ নয়?

মৃদু প্রতিবাদ করে দৌলতজাহান বললেন–আমি আবার পাঠালাম কখন দাদু? ওটা তো আপনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঃ কেন তৈরি কে করেছিল? হুজুরকে দেবে বলেই তো? হুজুর যদি গোস্বা হতেন?

শাহজাদা মধ্যস্থা করতে বাধ্য হলেন। তিনি ফের হেসে বললেন– আহা গোস্বা হবো কেন আমি? বলেছিই তো আপনাকে, ওটা পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি–খুশি হয়েছি। কারো কোন ভাল কাজ দেখলে আর কোন ভাল জিনিস পেলে মানুষ কখনও নাখোশ হয়?

ঃ হুজুর!

ঃ এজন্যে তাঁকে একটা মনের মতো ইনাম দেবো, এ কথাও আপনাকে আমি বলেছি। কিন্তু কি দেবো স্থির করতে না পেরে ওটা এখনও স্থগিত রেখেছি। মামুলি কিছু অর্থ কড়ি দিয়ে তো ওঁর ঐ শিল্পী মনকে আমি অপমান করতে পারিনে?

বিগলিত হয়ে মুরাদ খান বললেন–হুজুরের দীলের, হুজুরের দয়ার মানে হুজুরের মহানুভবতার কোন তুলনা নেই।

অপ্রতিভ হয়ে শাহজাদা বললেন–আহ্ খান সাহেব! এতবেশি কেন? আপনাকে আমি ইজ্জত করি।

শাহজাদা আহারে মন দিলেন। শরম পেয়ে মুরাদ খান থেমে গেলেন। আহার করার মধ্যেই আবার শাহজাদা মুখ তুলে দৌলতজাহানকে বললেন–তারিফ করে

বইঘর.কম ও রোকন
আপনাকে আমি খাটো করতে চাইনে। কিন্তু এত সুন্দর তোড়াটা আপনি কি করে বানালেন, ভাবতে আমার বিস্ময় লাগে। এমন বাছাই বাছাই ফুলের সমাবেশ দক্ষ শিল্পী ছাড়া মামুলি কেউ কল্পনা করতে পারে না।

দৌলতজাহান কিঞ্চিৎ দুঃখ করে বললেন–কি আর ফুলের সমাবেশ জনাব। নিজে তো আর পছন্দ করে ফুল সংগ্রহ করতে পাইনি। অন্যেরা যা পোঁটলা করে এনে দিয়েছে, তাই থেকে বেছে নিয়ে তৈরি করেছি। পছন্দমতো ফুল নিজে সংগ্রহ করা হলে তোড়াটা আরো সুন্দর করা যেতো।

শাহজাদা উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন–তাই নাকি? তাহলে এরপর যদি আর কখনো তোড়া তৈরি করার আগ্রহ আর উৎসাহ জাগে দীলে আপনার, সরাসরি নিজেই গিয়ে পছন্দ করে ফুল সংগ্রহ করবেন আপনি। ফুলবাগিচা একদম আপনার দোরের কাছেই। আপনার দাদুই তার রক্ষক বা পক্ষান্তরে মালিক। আপনি আপনার দাদুর সাথে নিজেই ফুলবাগানে যাবেন আর নিজেই পছন্দ করে ফুল তুলে আনবেন।

দৌলতজাহান ইতস্তত করে বললেন–তা মানে সেটা কি ঠিক হবে? জনাবদের ফুলবাগিচায় আমার ফুল তুলতে যাওয়াটা–

শাহজাদা সোচ্চার কণ্ঠে বললেন–আরে এতে সংকোচের কি আছে? আপনার তৈরি তোড়ার দু'একটা তো নসীবগুণে আমিও পেতে পারি? আমিও যেখানে পাবো, আমার জন্যেও যেখানে ফুলের তোড়া তৈরি হবে, সেখানে গোটা বাগিচাটা উজাড় করে ফুল তুললেও কার কি বলার আছে? বাগিচাটা করেছি আমি কি জন্যে? জরুর আপনি যাবেন আর ফুল তুলে আনবেন।

সলজ্জ হাসি হেসে দৌলতজাহান বললেন——জনাব মেহেরবান!

মুরাদ খানকে লক্ষ্য করে শাহজাদা বললেন——খান সাহেব, এরপর আপনার নাতনীর যখনই ফুলের দরকার পড়বে, তখনই তাঁকে আপনি বাগানে নিয়ে যাবেন আর ওঁকে ওঁর ইচ্ছেমতো ফুল সংগ্রহ করতে দেবেন। এটা আমার নির্দেশ। মেহেরবানী করে এর অন্যথা করবেন না।

মুরাদ খান হাসিমুখে বললেন——জিনা হুজুর, জরুর এর অন্যথা হবে না।

শাহজাদা পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করলেন এবং একটানা আহার করে আহার সমাপ্ত করলেন। আনযাম স্বল্প হলেও, তা এতই সুস্বাদু ও সুনির্বাচিত ছিল এবং এমনই সুন্দরভাবে পরিবেশিত হলো যে, শাহজাদা তৃপ্তির সাথে পরিমাণের অনেক বেশি আহার কর ফেললেন। আহারকালে শাহজাদা বুঝলেন, গরীব হলেও রুচি এঁদের বুনিয়াদি।

খানাপিনা শেষ হলে শাহজাদা আবার কিছুক্ষণ এঁদের সাথে গল্প-গুজব করলেন। এরপর সবাইকে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করে বিদায় নেয়ার কালে শাহজাদা যখন দিনারবানুর কাছে দোআ চাইতে গেলেন, তখন পর্দার আড়াল থেকে দিনারবানু

বললেন——বাপজান, আপনি আমাদের হুজুর হলেও আপনি আমার পুত্র তুল্য। হুজুর বলতে গলায় আমার বাধছে——

তাঁর কথার মাঝেই শাহজাদা ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন——দোহাই আম্মাজান, আপনি আমাকে আপনার পুত্র তুল্যই জানবেন। মুরাদ খান সাহেব সরাসরি আমাদের নকরী করেন বলে বাধ্য হয়েই রেওয়াজ মাফিক আর পাঁচজনের মতো তাঁর হুজুর বলাতে আপত্তি কেউ তুলেনি। কিন্তু আপনি আমার মায়ের মতো। আপনি আমাকে হুজুর বলে সম্বোধন করলে, সেটা আমাকে অপমান করা হবে, আমি দুঃখ পাব।

দিনারবানু খুশি হয়ে বললেন——বেঁচে থাকুন বাপজান! আল্লাহ আপনাকে সহিসালামতে রাখুন! আপনার ভবিষ্যত উজালা হোক! আমি যা বলতে চাই তাহলো, আমরা গরীব মানুষ। বাপজানের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই দাওয়াত করার নামে বাপজানকে যে তকলিফ দিলাম আমরা, তার জন্যে তিনি যেন কসুর কিছু না নেন আমাদের।

শাহজাদা আপ্লুত কণ্ঠে বললেন——কসুর কি বলছেন আম্মাজান? আপনাদের মেহমানদারীর মধ্যে আমি দীলের যে স্পর্শ পেলাম, আপনাদের খানাপিনা যে পরিমাণ মিঠা লাগলো আমার, এতে সৌজন্যের জন্যে নয় আমি সাফ দীলে বলছি, আপনাদের মেহমান হওয়ার জন্যে আমার রীতিমতো লোভ ধরে গেছে।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ!

এরপর দাওয়াত ছাড়াই আপনাদের মেহমান হতে চলে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রইল কিন্তু আমার।

শাহজাদা হাসতে লাগলেন। দিনারবানু তৃপ্ত কণ্ঠে বললেন——তাহলে তো যারপরনাই খুশি হই বাপজান! মায়ের কাছে ছেলে বিনে দাওয়াতে আসবে, এর আর বাড়া আছে?

অতঃপর সবাইকে আর এক দফা শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করে শাহজাদা দাউদ খান হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন।

ছয়

দশচক্রে ভগবান ভূত হয় কিনা ভগবানওয়ালারাই জানেন তবে রেজা খান সে চক্রে আপাদমস্তক কালাপাহাড় হয়ে গেলেন। আর প্রাসঙ্গিক বা সৌখিন নাম নয়, কালাপাহাড় নাম তাঁর পাকাপোক্ত ও মৌলিক নাম হয়ে গেল। পূর্ববর্তী হুজুগের পর খাদ গর্ত যা কিছু বাকি ছিল, এবারের কর্ষণে তা চরমভাবে পূরণ হয়ে গেল। সখটাই হয়ে গেল স্বাভাবিক, মুখ থেকে সেটা আস্তে আস্তে নেমে এলো কাগজে। কালাচাঁদ রায় এরপর আর রাজু খান বা রেজা খানও রইলেন না, কালাপাহাড়ে এসে তিনি অক্ষয়ভাবে স্থিতি লাভ করলেন। অন্য কথায় নিজের নীরব সমর্থনে তিনি নিরঙ্কুশভাবে কালাপাহাড় বনে গেলেন। তামাম নাম ছাপিয়ে অতঃপর তাঁর নাম হলো সেনাপতি কালাপাহাড়।

এবারের উপলক্ষ্য পুরী। উড়িষ্যার মন্দির শহর পুরী। দেশের ভেতরে ও বাইরে তথা বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার তাবত হিন্দুকুল কপালে করাঘাত করে একসাথে বিলাপ জুড়ে দিলেন—কোন মায়ের দুধ তুই খেয়েছিলিরে কালাপাহাড়, এত বড় কাজ করতে বুকখানা তোর একটুও কাঁপলো না? পাগল ঐ মিয়া মুহাম্মদ ফারমুলীটা ছাড়া এ দেশীয় মুসলমান তো নয়ই, খোদ আরব-তুর্কী-আফগান-মুগল কেউ যে কাজটি করেনি, ওরে কালাপাহাড়, তুই হিন্দুর বাচ্চা হয়ে সেই কাজটি করে বসলি?

এর মাঝে ফের যদি কেউ জানতে চাইলে, কে করেছে—কে করেছে? মুখে মুখে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো—ঐ কালাপাহাড়-কালাপাহাড়। সকলেই সখেদে জবাব দিলে—ঐ কুলাঙ্গার কালাপাহাড় ছাড়া, এমন কাজ এই ভুমণ্ডলে আর কে করতে পারে?

অভিযোগ ঐ পূর্ববৎ। পুরীতে মন্দির বিগ্রহ বলে আর কালাপাহাড় কিছুই রেখে আসেনি। মন্দিরের সেরা মন্দির জগন্নাথ মন্দিরসহ সকল মন্দির সকল বিগ্রহ সে ভেঙ্গে চুরে গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে এসেছে।

হযরত-ই-আলার নিদের্শে সেনাপতি রেজা খান সসৈন্যে রওনা হলেন উত্তর উড়িষ্যার রাজধানী জাজনগরের দিকে। শাহজাদা বায়াজিদ খান ও সালার সিকান্দার উযবেক সসৈন্যে যাত্রা করলেন উড়িষ্যার কেন্দ্রস্থল ও রাজধানী তাজপুর অভিমুখে। উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব শাহজাদাদের এই বাহিনীর বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে নিজে এগুনোর সাহস পেলেন না। মুসলিম অভিযান প্রতিরোধ করতে ছোট রায় ও রঘুভঞ্জ নামক দুই

বইঘর.কম ও রোকন
ব্যক্তির অধীনে তিনি বিশাল এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু বাঙ্গালার ফৌজের সামনে উড়িষ্যার এই বিশাল ফৌজ টিকে থাকতে পারলো না। বাঙ্গালার বাহিনী এসেছিল এক লক্ষ্য, এক ইরাদা নিয়ে। হয় শহীদ, নয় গাজী এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এর বিরুদ্ধে উড়িষ্যার ফৌজ ছিল ভগ্নোৎসাহ, সুবিধেবাদী ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোদুল্যমান।

উপযুক্ত কারণও ছিল উড়িষ্যার ফৌজের এই অবস্থার পেছনে। উড়িষ্যার রাজশক্তি দীর্ঘকাল ব্যাপী চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব আর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় জর্জরিত ছিল। বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি এরা এই সময় নিজেদের উপর প্রয়োগ করায় ব্যস্ত ছিল। উড়িষ্যার মূলরাজা চক্রপ্রতাপ দেবকে বিষ দিয়ে হত্যা করলেন তাঁর নিজ পুত্র নরসিংহ। নরসিংহকে আবার গুপ্ত হত্যা করলেন তদীয় মন্ত্রী এই হরিচন্দন মুকুন্দদেব। চক্রপ্রতাপ দেবের কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর অঙ্গিকারে এই গুপ্তহত্যা করলেন তিনি। কিন্তু নরসিংহকে হত্যা করার কিছুদিন পরেই এই মন্ত্রী সেই কনিষ্ঠ রাজপুত্রকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই মসনদে উঠে বসলেন। এতে করে পাত্র মিত্র সেনা সৈন্যের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ পয়দা হলো। মুকুন্দদেবের জন্যে প্রাণপাত করতে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

এই দ্বিধাগ্রস্ত বাহিনী বাঙ্গলার বাহিনীর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে মুকুন্দদেব নিজে এবার এগিয়ে এলেন এবং বিশৃঙ্খল বাহিনীকে সুসংহত করে ছোট রায়কে সঙ্গে নিয়ে নিজেই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এ লড়াইয়ে মুকুন্দদেব ও ছোট রায় উভয়েই নিহত হলেন। উড়িষ্যার অন্য এক সেনাপতি রামচন্দ্রভঞ্জ বা দুর্গাভঞ্জ ইতিমধ্যেই উড়িষ্যার সিংহাসনে উঠে বসলেন এবং মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে এগিয়ে এলেন। শাহজাদা বায়াজিদ খান ও সেনাপতি সিকান্দার উযবেক নিজেরাই তাদের বাহিনী নিয়ে অপ্রতিহত গতিতে তাজপুরের দিকে এগুচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে খোদ হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী সসৈন্যে এসে তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। অতঃপর যে লড়াই হলো, সে লড়াইয়ে দুর্গাভঞ্জ ও বিদ্রোহী ইব্রাহিম খান শূর নিহত হলেন এবং রাজধানী তাজপুর বাঙ্গালার হযরত-ই-আলার অধিকারে চলে এলো।

ওদিকে সেনাপতি রেজা খান জাজনগরসহ উত্তর উড়িষ্যা দখল করে নিয়ে হযরত-ই-আলার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। মধ্য উড়িষ্যা হযরত-ই-আলার হস্তগত হলো। বাকী রইলো পুরী শহর। হযরত-ই-আলা এবার রেজা খানকে পুরী জয়ের নির্দেশ দিলেন এবং উড়িষ্যা শাসনের জন্যে একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করে সেনা সৈন্য সহকারে বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে এলেন।

হযরত-ই-আলার নির্দেশ পেয়ে সেনাপতি রেজা খান তাঁর বাহিনী নিয়ে দ্রুত গতিতে এসে পুরীতে হানা দিলেন। পুরী শহরে জগন্নাথ মন্দির ছিল পৌত্তলিকদের এক

বইঘর.কম ও রোকন
শক্তিশালী দুর্গ। ইতিপূর্বে মুসলমানদের পদচিহ্ন এখানে কখনও পড়েনি। এর চতুর্দিকে ছিলো অসংখ্য মন্দিরের বেড়া এবং এই বেড়ার পর মন্দিরটিকে ঘিরে ছিল সুগভীর এক পরিখার আবেষ্টনী। পুরী শহরের চারপাশের এলাকাগুলো দখল করার পর রেজা খান পুরী শহরের প্রাণকেন্দ্র জগন্নাথ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। পরিখার এপারে ঐ অগণিত মন্দিরের বেড়ার এক অংশের সামনে এসে হাজির হলে মন্দিরগুলির ভেতর থেকে অসংখ্য প্রতিরক্ষা ফৌজ বেরিয়ে এসে রেজা খানের অগ্রগতি রোধ করে দাঁড়ালো। ফলে, মন্দিরগুলির সামনে ও ভেতরে লড়াই শুরু হয়ে গেল। চার পাশের মন্দির থেকেই প্রতিরক্ষা শক্তি এসে রেজা খানকে ঘিরে ফেললো। তবু রেজা খানের প্রচণ্ড হামলার সামনে বিপক্ষ শক্তি অধিকক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপক্ষ শক্তি প্রচণ্ড মার খেয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। এর ফলে, এই লড়াই স্থলের কিছু মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হলো ও কিছু বিগ্রহ তছনছ হয়ে গেল।

রেজা খান এবার হাতির দ্বারা পুল তৈরি করলেন এবং পরিখা অতিক্রম করে সসৈন্যে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে এগুতে গেলেন। জগন্নাথ মন্দির বা এই দুর্গ থেকে তৎক্ষণাৎ দলে দলে প্রতিরক্ষা ফৌজ বেরিয়ে এসে রেজা খানের বাহিনীর উপর চড়াও হলো। বিপুল বিক্রমে তামাম বাধা অতিক্রম করে রেজা খান সসৈন্যে পরিখা পার হলেন। আবার শুরু হলো লড়াই। এখানেও বিপক্ষ শক্তি অল্পক্ষণেই পর্যুদস্ত হয়ে ফের জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে অবস্থান নিলো। ফলে, এখানেও মন্দিরের সামনে ও ভেতরে আর এক দফা খণ্ড লড়াই হয়ে গেল এবং এ লড়াইয়ে পুরীর প্রতিরক্ষা শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জগন্নাথ মন্দির সহ গোটা পুরী শহর রেজা খান দখল করে নিলেন। এই যুদ্ধের ফলে জগন্নাথ মন্দিরের পারিপার্শ্বিক কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং কিছু বিগ্রহ কিছু মূর্তি ভেঙেচুরে গেল। মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হওয়ার পর ভিন্নজাতির ধর্মস্থান হেফাজত করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপরই ন্যস্ত হলো। এ কারণে মন্দির বিগ্রহের আর কোন ক্ষতিসাধন তো নয়ই, রেজা খান এ গুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অতঃপর পুরীর শাসনভার হযরত-ই-আলা কর্তৃক নিয়োজিত শাসন কর্তার উপর অর্পণ করে রেজা খান সসৈন্যে বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে এলেন। উড়িষ্যা এই সর্বপ্রথম নিরঙ্কুশ ভাবে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হলো।

বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে এসেই রেজা খান আর লেশমাত্র রেজা খান থাকলেন না। বিলকুল কালাপাহাড় বনে গেলেন। বাঙ্গালার ভেতরে ও বাইরে তারস্বরে রব বা ধূয়া উঠলো, পুরীতে আর একটাও মন্দির বিগ্রহ নেই। জগন্নাথ মন্দিরসহ কালাপাহাড় ঐ অগণিত মন্দির বিগ্রহ সমস্তই নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসেছেন। দেশের ও বিদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রব এত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়লো যে, ধ্বংসলীলার কল্পিত এক কাহিনীতে দেশ বিদেশ ছয়লাপ হয়ে গেল। রেজা খান বা তাঁর অন্য কোন নামের সাথে কারোই আর কোন পরিচয় রইলো না। কালাপাহাড় নামে তিনি দেশে বিদেশে এক ডাকে পরিচিত হয়ে গেলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

প্রকৃত ঘটনাটা হযরত-ই-আলা সহ বাঙ্গালার সমুদয় মুসলমান কর্মকর্তা কর্মচারীরা অচিরেই অবহিত হলেন। দুদিন আগে ও পরে অবহিত হলেন দেশের ও বিদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঐ অমুসলমানদের নামকরণের প্লাবনে তাঁরাও টিকে থাকতে পারলেন না। ওদের সাথে ঐ প্লাবনে তাঁরাও ভেসে গেলেন। কেউবা এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে, কেউবা একে বাহাদুরি মনে করে তুষ্ট হয়ে আর কেউ বা আর পাঁচজনের দেখাদেখি নিজের অজ্ঞাতেই রেজা খানকে কালাপাহাড় নামে গ্রহণ করে নিলেন।

আফিমখোর নাকি সাপের কামড়ে মরে না। বিষে বিষ নির্বিষ হয়ে যায়। মিথ্যা অভিযোগের বিষে বিষে জর্জরিত হয়ে রেজা খানও নির্বিষ হয়ে গেলেন। কালাপাহাড় নামকেই তিনি গলার মালা বানালেন। হযরত-ই-আলা বললেন–আমিও চাই, তার কালাপাহাড় নামই বহাল থাকুক। চুন পড়ুক গুজবকারীদের মুখে।

লড়াই থেকে ফিরে এসে সেনাপতি কালাপাহাড় তাঁর রণবিধ্বস্ত বাহিনী নিয়ে সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে রইলেন। সৌজন্য সাক্ষাৎটুকু করা ছাড়া শাহজাদা দাউদ খানের সাথে নিরিবিলিতে মিলিত হওয়ার মওকাই কিছু পেলেন না। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যেই শাহজাদা দাউদ খান একদিন ব্যস্তভাবে এসে সেনাপতি কালাপাহাড়ের সামরিক দপ্তরকক্ষে ঢুকে পড়লেন। কালাপাহাড় সাহেব কাজের মধ্যে মগ্ন ছিলেন। শাহজাদাকে দেখেই তিনি খোশ দীলে ও ব্যস্তভাবে ছুটে এসে শাহজাদার সাথে মোসাফেহা ও সালাম বিনিময় করলেন এবং তাঁকে সমাদরে বসার আসন দিতে দিতে বললেন–কেয়া খোশনসীব! খোদ ছোট হুজুর আমার এখানে?

দাউদ খান হেসে বললেন–এই একটু এলাম চাচা।

কালাপাহাড় সাহেব বললেন–বহুত মেহেরবানী। আর দু' একটা দিন ছোট হুজুর। এর পরেই ইনশাআল্লাহ অনেক আমার অবসর আপনার সাথে বসে নিরিবিলিতে দুটো কথা বলার জন্যে দীল আমার উন্মুখ হয়ে আছে আর তাই কেবলই দু হাতে কাজ ঠেলছি।

কালাপাহাড় সাহেব হাসলেন। শাহজাদা দাউদ খানও হেসে বললেন– আমারও ঐ একই অবস্থা চাচাজান। কবে থেকে সাক্ষাৎ নেই আপনার সাথে। তাই প্রবল আগ্রহভরে আমিও আপনার ফুরসতের এন্তেজারে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে আবার আমার ফুরসত্টাও সাময়িকভাবে খতম হয়ে গেল। এ কারণে বাধ্য হয়েই এখানে ছুটে এলাম।

সেনাপতি কালাপাহাড় বিস্মিতকণ্ঠে বললেন–আপনারা ফুরসত্টাও খতম হয়ে গেল মানে?

ঃ হঠাৎ আব্বাজান আজকেই আমাকে জরুরী এক কাজে বিহারে রওনা হওয়ার আদেশ দিলেন। আজকেই বিকেলে রওনা হতে হবে। হপ্তা খানেকের কমে আমার ফিরে আসা সম্ভব নয়।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তাই নাকি?

ঃ মন আর মানলো না। তাই যাবার আগে ছুটে এলাম জঙ্গীচাচার দপ্তরে। ভাবলাম, তাঁর জঙ্গঘটিত কাজ কামের মধ্যেই তাঁর সাথে একটু মোলাকাত করে আসি।

ঃ বহুত মেহেরবানী। এ অবস্থায় মোলাকাতটা না হলে আমি দুঃখ পেতাম। তা এদিকের খবর তো কিছু জানিনে। ছোট হুজুরের দিনকাল কেমন কাটছে?

শাহজাদা ব্যস্তকণ্ঠে বললেন–আমার কথা পরে বলছি। তার আগে আমি চাচাহুজুরের কথাটাই শুনতে চাই। তাঁর ব্যাপারটা আমাকে তাজ্জব করে দিয়েছে। আসল ঘটনাটা তাঁর নিজের মুখে শোনার বড় খাহেশ আমার।

ঃ কোন ঘটনা শাহজাদা?

ঃ ঐ যে, মন্দির-বিগ্রহ সব শেষ?

ক্লিষ্ট হাসি হেসে কালাপাহাড় সাহেব বললেন–লাঠি ছান্দা সহজ ছোট হুজুর! কিন্তু মানুষের মুখে ছান্দবেন কি করে

ঃ তা ঠিক–তা ঠিক। আমিও শুনেছি, ওদের ঐ অভিযোগটা অনেকখানি ভিত্তিহীন।

ঃ অনেকখানি নয়, বিপুল অংশে ভিত্তিহীন। আমার অপরাধটা হলো মন্দির বিগ্রহের মধ্যে লড়াই করতে অনেকে সংকুচিত হয়, আমি তা হইনে।

ঃ আচ্ছা।

সেনাপতি কালাপাহাড় এবার পুরীর ঐ মন্দির-বিগ্রহ সম্পর্কিত ঘটনাগুলির এবং মন্দির-বিগ্রহ হেফাজত করার যাবতীয় পদক্ষেপগুলির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে শাহজাদাকে শুনালেন। শাহজাদা শুনে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন–তাজ্জব। সেরেফ এইটুকু ক্ষতি ছাড়া সব কিছুই ঠিকঠাক আছে? মায় ঐ জগন্নাথ মন্দিরটিও?

ঃ মুখে আর আমি কি বলবো শাহজাদা? যে কেউ যাক না এখন ওখানে? কিছু কিছু মন্দির বিগ্রহ বিনষ্ট হওয়া ছাড়া, ঐ জগন্নাথ মন্দির সহ অন্যান্য মন্দির বিগ্রহ পুরীতে পূর্ববৎ বিদ্যমান আছে কিনা, দেখে আসুক?

ঃ চাচা!

ঃ এই যে জগন্নাথ মন্দির ভেঙে চুরমার করে দিয়ে এসেছি বলে এত চীৎকার করছে ওরা, মন্দিরের বাইরের দেয়ালের কিছু অংশ আর দেউটিটুকু ছাড়া ঐ মন্দিরটার আর কিছু ক্ষতি হয়েছে কিনা, জগন্নাথ মন্দির যথাস্থানে পূর্ববৎ আছে কিনা, তা একটা পাগল যেয়ে দেখলেও ওদের ঐ মিথ্যাচারের পরিধিটা উপলব্ধি করতে ঐ পাগলও পারবে। আর দেউটি দেয়াল ভাঙ্গা পড়েছে লড়াইয়ের জন্যে স্বইচ্ছায় বা স্বগরজে নয়। মন্দিরকে ওরা দুর্গ বানাবে, লড়াইকালে মন্দিরকে ব্যবহার করবে, আর তাতে মন্দিরের কিছু ক্ষতি হবে না, ওটা ওরা আশা করে কি করে?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কি আশ্চর্য! এরই জন্যে এত বড় মিথ্যাচার?

ঃ না দেখে তাৎক্ষণিকভাবে চমকে উঠা আলাদা কথা। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জগন্নাথ মন্দিরসহ অন্যান্য মন্দির-বিগ্রহ ওখানে বিদ্যমান থাকলেও, আর তা সকলের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পরও, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐ বদনামই যদি গায় তারা, তাহলে আমার কি করার আছে বলুন?

ঃ তাজ্জব!

ঃ আগে যে আমি মন্দির বিগ্রহ ভেঙ্গেছি, তা অন্য ব্যাপার। কিন্তু পরধর্মে অকারণে এবং ইসলামের নীতির বিরুদ্ধে আঘাত করার মতো কমজোর ঈমান নিয়ে মুসলমান আমি হইনি।

ঃ ঠিক চাচা, ঠিক-ঠিক। এরপর আর কিছু বলারই অবকাশ নেই।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। এরপর কালপাহাড় সাহেব হেসে বললেন—ওসব কথা থাক। এবার ছোট হুজুরের কথা শুনি। তাঁকে তো আবার মাঝে মধ্যেই জীন-পরীতে ধরে। ওসব জীন-পরীর আছর-আকর্ষণ কেটেছে কি?

নিজের প্রসঙ্গে এসে শাহজাদা উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং সরবে বললেন—আরে চাচা, কাটেনি-কাটেনি। আরো জোরদারভাবে জাপ্টে শাপটে ধরার মহড়া শুরু হয়েছে।

কালাপাহাড় সাহেব উদগ্রীব হয়ে বললেন—বলেন কি? জোরদারভাবে জাপ্টে শাপ্টে ধরার মহড়া! কোথায়?

ঐ মুরাদ খান সাহেবের অন্দরে।

কালাপাহাড় লাফিয়ে উঠে বললেন—কেয়াবাত্—কেয়াবাত। ওখানে আপনি গিয়েছিলেন?

ঃ না গিয়ে কি করি? চাচাজান সেই যে গেলেন আর ফিরে এলেন না। এদিকে দাওয়াত রক্ষে না করাতে আমার মান-ইজ্জত রসাতলে যেতে বসলো। তাই চাচাজানকে নিয়ে আর একবার যাওয়ার ইরাদা রেখে, হুট করে গেলাম একদিন সেখানে।

ঃ তোফা—তোফা। তা ওখানে গিয়েও পরীর খপ্পড়ে পড়ে গেলেন।

ঃ একদম চাচা। একদম সেই বোরখাঢাকা জঙ্গী পরীর।

ঃ এ্যাঁ? সেকি?

ঃ পেয়েই বুঝি গেলাম চাচা এক অমূল্য রতন!

ঃ সোবহান আল্লাহ—সোবহান আল্লাহ! তা কাঙ্গালের কথা ফললো?

ঃ পুরোপুরি না ফললেও, ফলবো ফলবো করছে চাচা। আর অল্প একটু বাকী।

ঃ অর্থাৎ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ঐ পয়লা পরীকে পেয়ে গেছি। এখন সুরাতটা যদি বিলকুল মাম্‌দোমাসী না হয়, তাহলে ফলেই যাবে পুরোপুরি।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ্—আলহামদুলিল্লাহ।

ঃ আর ফলেই যদি যায়, তাহলে চাচা জান কবুল আর মান কবুল, জরুর ছোড়েগা নেহি

ঃ আল্লাহু আকবর—আল্লাহু আকবর! তা ঘটনাটা খুলে বলুন তো।

ঃ সে দস্তান মস্তবড় চাচা। এক বেঠকে শেষ হবে না

ঃ তাই নাকি?

ঃ ইতিমধ্যে শাহজাদার খাসবান্দা কোরবান আলী এসে কুর্ণিশ করে জানালো, বেলা প্রায় দুপুর, বিকেলেই রওনা হতে হবে, হুজুরের গোছল খাওয়ার সময়টা খুবই সীমিত হয়ে এসেছে।

খেয়াল হতেই শাহজাদা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং কালাপাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বললেন—বিস্তারিত বিবরণটা পরে চাচা, বিহার থেকে আসার পর। আল্লাহ্ হাফেজ–

বান্দার সাথে শাহজাদা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

o o o

বিহার থেকে ফিরে আসতে হপ্তার অধিক সময় লাগলো। ফিরে এসে শাহজাদা দাউদ খান দেখলেন, তার জঙ্গী চাচা রাজধানীতে নেই। ফের তিনি জঙ্গে চলে গেছেন।

এবার জঙ্গ কুচবিহারের রাজার সাথে। বাঙ্গালার হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী উড়িষ্যা জয়ে ব্যস্ত আছেন দেখে কুচবিহারের কোচ রাজা নরনারায়ণ এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করার প্রয়াসে বাঙ্গালা মুলুকের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা দখল করতে উদ্যোগী হলেন। নরনারায়ণের আদেশে নর-নারায়ণের ভাই ও কোচরাজ্যের প্রধান সেনাপতি শুক্লধ্বজ ওরফে চিলারায় বিপুল বিক্রমে বাঙ্গালার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে হানা দিলেন এবং সীমান্ত এলাকা অতিক্রম করে বাঙ্গালা মুলুকের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। বাঙ্গালার হযরত-ই-আলা ইতিমধ্যেই উড়িষ্যা বিজয় সমাপ্ত করে রাজধানীতে ফিরেছেন। শুক্লধ্বজ বা চিলারায় যখন বাঙ্গালার সীমান্ত অতিক্রম করলেন, তখন সেনাপতি কালাপাহাড়ও পুরী বিজয় সমাপ্ত করে রাজধানীতে হাজির। চিলারায়ের এই ঔদ্ধত্যের খবর পাওয়া মাত্র হযরত-ই-আলা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং সেনাপতি কালাপাহাড়কে ডেকে বললেন–সৈন্য সাজান–

কোচবাহিনী বহুলাংশে জংলী বাহিনী। এদের সাথে লড়াই করার অভিজ্ঞতা সেনাপতি কালাপাহাড় ইতিপূর্বেই কিছুটা অর্জন করেছিলেন। এ কারণসহ অন্যান্য অনেক কারণের জন্যে হযরত-ই-আলা তাঁকেই বেছে নিলেন! শাহজাদা দাউদ খান

বইঘর.কম ও রোকন
বিহারে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই কালাপাহাড়কে সঙ্গে নিয়ে খোদ হযরত-ই-আলা কুচবিহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

বিপুল আগ্রহ নিয়ে বিহার থেকে ফিরে এসে শাহজাদা দাউদ খান কালাপাহাড়কে না পেয়ে মনমরা হয়ে গেলেন। হপ্তার অধিক কাল ধরে লালিত তাঁর সেই পুঞ্জিভূত আবেগ আছাড় খেয়ে দীলের মধ্যেই মিস্‌মার হয়ে গেল।

শাহজাদা পুনরায় নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো ফুলবাগানে গিয়েও তিনি খবর পেলেন, জরুরি এক প্রয়োজনে দৌলতজাহান তাঁর মায়ের সাথে কিছুদিনের জন্যে কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেছেন। হতাশ হয়ে ফিরে এসে শাহজাদা এবার তাঁর নির্দিষ্ট দাপ্তরিক কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে এবং কাজের মধ্যে দিয়েই কাল কাটাতে লাগলেন।

দপ্তরের কাজ শেষ করে একদিন বিকেলে শাহজাদা দাউদ খান হাঁটতে হাঁটতে শাহী চত্বরের বাইরে চলে এলেন। সঙ্গে রইলো খাসবান্দা কোরবান আলী। ফুলবাগানে তিনি আর ইতিমধ্যে মাত্র বারদুয়েক গিয়েছেন। মুরাদ খানের সাথে আলতুফালতু গল্প করে কিছু সময় কাটিয়েছেন। দৌলতজাহানদের অনুপস্থিতির কারণে ওদিকের আকর্ষণ শাহজাদার কাছে অনেকটা ফিঁকে হয়ে গেছে। আজ তিনি বেরুলেন ঘোড়দৌড়ের ময়দানের দিকে। ঘোড়দৌড় সংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠানাদি ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য, ফাঁকা ময়দানে কিছুক্ষণ হেঁটে হেঁটে বেড়ানো। ময়দানে এসে দেখলেন, ময়দান প্রায় ফাঁকা। দু'চারজন অতি উৎসাহী সওয়ারী ফাঁকা ময়দানে নিজ নিজ কসরত জাহির করছেন।

সরকারী অনুষ্ঠান বা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার দিনে ঘোড়ায় আর সওয়ারীতে গোটা ময়দান ভরে যায়। প্রশস্ত ময়দানের দুই পার্শ্বে দর্শকেরা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। সে উদ্দেশ্যে শাহীপুরুষদের বসার জন্যে ময়দানের দুই ধারে ছাউনীর মতো পরপর কতকগুলি পাকা কুঠরি নির্মাণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের দিনে শাহীমহলের নারী-পুরুষ এসে এসব কুঠরিতে বসেন। কুঠরিগুলোর ভেতরে হেলান দিয়ে কয়েকজন একসাথে বসার মতো লম্বা লম্বা পাকা আসন আছে। শাহজাদা এসে দেখলেন, এতিম ময়দানের মতো কুঠরিগুলোও এতিম হয়ে পড়ে আছে। কোন মেহমান তাদের নেই।

ময়দানের ধার দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পর শাহজাদার ইচ্ছে হলো, নিকটবর্তী কুঠরিতে একটু বসেন এবং অতি উৎসাহী আর আনাড়ী সওয়ারীদের ঘোড়সওয়ার কিছুক্ষণ বসে বসে দেখেন। এই উদ্দেশ্যে গাছ-গাছড়ায় আড়াল করা একটা কুঠরির কাছে আসতেই বান্দাসহ শাহজাদা দাউদ খান চমকিত হয়ে উঠলেন নারীকণ্ঠের সুমধুর এক বিলাপে– "কেয়া তেরী পেয়ার আউর কেয়া এন্তেজার, ও বেদীল মেহ্‌বুবা "

সুর আসছে কুঠরিটার ভেতর থেকে। শাহজাদা থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সুরসুধা পান করলেন। উচ্চকণ্ঠে না হলেও খোলা কণ্ঠেই গান গাইছেন গায়িকা। কণ্ঠস্বর যথার্থই প্রশংসার হকদার। শাহী পুরুষদের বসার কক্ষে এমন পেয়ারকা খেল্ কারা এসে খেলছেন, শাহজাদার তা দেখার খাহেশ হলো। বান্দাকে অপেক্ষা করার ইংগিত দিয়ে তিনি সরাসরি কুঠরিটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে যা দেখলেন, তাতে নিজেই তিনি কিছুটা শরম পেয়ে গেলেন। দেখলেন, তাঁর চাচাতো ভাই, অর্থাৎ তাঁর চাচা ইমাদ খান কাররানীর পুত্র জুনায়েদ খান কাররানী আসনের উপর বসে আছেন। তাঁর একান্ত কোল ঘেঁষে বসে হেলনার সাথে গা এলিয়ে দিয়ে আবেগের সাথে গান গাইছেন মশহুর গায়িকা শিপ্রাদেবী। একই আসনে একটু ফাঁকে খড়গ্পুর রাজ সংগ্রাম সিং বসে বসে তাল ঠুকছেন গানের সাথে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চারপাশে নজর দিয়ে দেখলেন, কুঠরির একপাশে একটু দূরে এক গাছের তলে বসে ময়দানের এক মজুরের সাথে গল্প করছে রায় সাহেবদের দারোয়ান তেওয়ারী ভানু সিং।

জুনায়েদ খান শাহজাদা দাউদ খানের বয়সে কিছু বড় হলেও, সম্পর্ক তাদের সমবয়সীর। শাহজাদাকে দেখেই জুনায়েদ খান সোল্লাসে বললেন–আরে এই যে শাহজাদা, আসুন–আসুন। তোফা কণ্ঠ শিপ্রাদেবীর। দু'দণ্ড শুনলে দীল জুড়িয়ে যায়।

শাহজাদা দাউদ খানের উপর চোখ পড়তেই বাঘ দেখারও অধিক চমকে উঠে শিপ্রাদেবী গান বন্ধ করলেন এবং জড়োসড়ো হয়ে চুপচাপ নত মস্তকে বসে রইলেন। তা দেখে জুনায়েদ খান সশব্দে হেসে উঠে বললেন–আরে ঘাবড়াইয়ে মাৎ দেবী জী। জব্বর এক সমঝদার পাওয়া গেছে। জিয়াদা এলেমদার আদমী এই শাহজাদা। আপনার গানের সঠিক কদর আমাদের চেয়ে ইনিই বেশী দিতে পারবেন।

খড়গ্পুর রাজ সংগ্রাম সিং নেহায়েতই বলার খাতিরে বললেন–আসুন না জনাব, এক সাথে একটু বসি!

শাহজাদা দাউদ খান আপত্তি করে বললেন–মাফ করবেন রাজা সাহেব! আমি একজন বেরসিক লোক। এসব রসের স্বাদ গ্রহণে একান্তই অক্ষম।

জুনায়েদ খান প্রতিবাদ করে বললেন–আরে-আরে, সেকি! অনুষ্ঠানাদি অন্তে শাহজাদাকে কতদিন আমি দেখেছি, উস্তাদকে নিজ কক্ষে ডেকে নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বিভোর হয়ে তানপুরার সুর শুনতে! বেরসিক বললেই কী আমি তা মঞ্জুর করে নেব?

শাহজাদা মৃদু হেসে বললেন–না ভাইসাহেব, সে জিনিস আর এ জিনিস আলাদা।

জুনায়েদ খান পুনরায় প্রতিবাদ করে বললেন–আলাদা আবার কি হলো? একটা যন্ত্রের গান আর একটা কণ্ঠের গান। ফারাকটা কোথায়?

ঃ ফারাকটা কখনো কখনো বড় একটা থাকে না। আবার পরিবেশ-পরিস্থিতি আর বস্তু বিশেষে কখনো কখনো থাকে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ যেমন ফুলের সুবাস আর আতরের সুবাস? এই ফারাক। কিছু কিছু আতরের গন্ধ বড় বেশি উৎকট হয়তো? উৎকট গন্ধ আমি সহ্য করতে পারিনে।

জুনায়েদ খান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন–আরে দূর! দিলেন তো সব মাটি করে? শিপ্রাদেবীর যে হালত্ দেখছি, তাতে আর কি জমে কিছু?

বেলা বেশি ছিল না। তাতে আবার গান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তেওয়ারী ভানু সিং ব্যস্তভাবে ছুটে এলো এবং শিপ্রাদেবীকে লক্ষ্য করে বললো–মাকানে আভি ওয়াপস্ যায়েগী মাইজী?

শিপ্রাদেবী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। জড়োসড়ো হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন– চলো–

শিপ্রাদেবী নত মস্তকে ছাউনী থেকে বেরিয়ে এলেন। হঠাৎ তাঁর কি হলো, তিনি এমন বিমনা হলেন কেন, কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে জুনায়েদ খান কাররানী থতমত খেয়ে গেলেন। বাধা দিতে গিয়েও তিনি বাধা দিতে পারলেন না। সংগ্রাম সিংকে ইতস্তত করতে দেখে ভানু সিং বললো–আইয়ে মহারাজ–

অগত্যা সংগ্রাম সিংও জুনায়েদ খানকে মৃদু একটা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে শিপ্রাদেবীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কুঠরিটা ফাঁকা হয়ে গেল। জুনায়েদ খানের যত অভিযোগ এবার সব এসে শাহজাদা দাউদ খানের ঘাড়ের উপর পড়লো। জুনায়েদ খান ফের ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন–ব্যাস্ খেল্ খতম! শাহজাদার কাজগুলোই এইরকম! নিজেও খাবেন না, কাউকে খেতেও দেবেন না।

দাউদ খান হেসে বললেন–কি রকম?

ঃ রকমটা তো নিজের চোখেই দেখলেন? আমার আর ব্যাখ্যা করার দরকার আছে কিছু? পরিবেশটা এমন সুন্দর জমে উঠেছিল! হঠাৎ এক বাউড়ি বাতাস এসে দিলেন সব বানচাল করে!

শাহজাদা খানিকটা অনুতাপের সুরে বললেন–আমি দুঃখিত ভাই সাহেব!

ঃ দুঃখিত?

ঃ জি-জি। আমি কি আর জানি, মৌজের মৌতাতে 'তা' চলছে এখানে?

শাহজাদা ফের হেসে ফেললেন। জুনায়েদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–বটে? তা শাহজাদার এই ফাঁকা ময়দানে আগমনের হেতু? বেড়াতে?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জি ভাই সাহেব, সেই ইরাদাই ছিল।

ঃ তো আসুন। সব যখন ভণ্ডুল করে দিলেন, আসুন। সন্ধ্যার এখনও দেরী আছে, নিজেরাই একটু বসি-

অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার ফলে শাহজাদারও বসার তাকিদ ছিল। তিনি আপত্তি না করে বললেন-হ্যাঁ, একটু বসা যায়।

কোরবান আলীকে আশেপাশেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে শাহজাদা ছাউনীতে এসে বসলেন। এরপর সহাস্যে বললেন-তা ভাই সাহেব, এখানে হঠাৎ এই ত্রিরত্নের যোগাযোগটা কিভাবে ঘটলো?

জুনায়েদ খান এবার সরবে বললেন-আরে ঐ রাজা সাহেবকে দেখেও কিছুই বুঝতে পারছেন না? জমজমাট আসর চলছে ঐ রায় সাহেবদের মাকানে। লাগাতার আসর। পর পর কয়েক সন্ধ্যা। যোগাযোগটা ওখানেই।

ঃ ও-আচ্ছা। তা বলছিলাম কি ভাইসাহেব, আসরটা ঐ মাকানে বসলেই ভাল হয়। এমন এই ফাঁকা ময়দানে আসরটা ভাল দেখায় না!

ঃ মানে-মানে?

ঃ কোন আউরত এমন খোলামেলা পরিবেশে এসে গান ধরলে খারাপ দেখায়। একটু রাখা-ঢাকা প্রয়োজন।

জুনায়েদ খান এবার সশব্দে হেসে উঠে বললেন-আরে না-না। এঁদের নিয়ে ওসব ভাবনা নেই। এঁরা খোলামেলা পরিবেশে খোলামেলাভাবেই চলাফেরা করা লোক। এঁদের বেপর্দা দেখে কেউ প্রশ্ন তোলে না।

ঃ কিন্তু ভাইসাহেবকে নিয়ে তো লোকে প্রশ্ন তুলতে পারে? তিনি শুধু মুসলমানই নন, একজন শাহী পুরুষ। খোদ হযরত-ই-আলার আপন ভাতিজা। একজন বেপর্দা আউরতের সাথে তাঁর এতটা মাখা-মাখি কিছুতেই শোভা পায় না।

ঃ আহা, বেপর্দা হলে কি হবে? তিনি একজন শিল্পী। বড় মধুর তাঁর কণ্ঠ। এদিকে আবার ব্যবহারও অমায়িক। তাঁর সাথে মেলামেশা খারাপ দেখাবে কেন?

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ উঁচু ঘরের একজন সুন্দরী ও নিঃসঙ্কোচ আউরত। কত তাবোড় তাবোড় লোক তাঁর পেছনে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন। আমি তো আর ওঁদের মতো শিপ্রাদেবীর রূপের পেছনে ঘুরছিনে, আমি সুরের পেছনে ঘুরি। উনিও তাই আমাকে অত্যধিক কদর দেন।

ঃ তাই? কিন্তু ভাইসাহেব, আমার যতটা জানা আছে, এমন কদর উনি আরো অনেককেই দিয়ে থাকেন। এসব আউরতের সংশ্রব আপনি ছেড়ে দিন। এতে আমাদের বংশের বদনাম হয়।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কি আশ্চর্য! শাহজাদা কিছুই বুঝতে চাচ্ছেন না? শিল্পীর ব্যক্তিগত চরিত্র কি, তা দেখতে যাবো কেন আমি? আমি দেখছি শিল্পীকে, মূল্য দিচ্ছি তাঁর শিল্পকে। যে লতা ফল দেয়, তার মূলে কি আছে তা দেখতে যাবো কেন আমি?

ঃ আরে ভাইসাহেব, সেই লতার মূলটা যদি মানুষের মলের স্তুপে থাকে তাহলে সে ফল খেতে যে কোন রুচিবানেরই তো ঘেন্না হওয়া উচিত।

ঃ ওসব তত্ত্ব কথা থাক শাহজাদা। শিপ্রার গান আমার ভাল লাগে, তাই আমি তার গান শুনি। মাঠে বসে গান শুনাটা না হয় দোষের হলো বুঝলাম, কিন্তু ঘরে গিয়ে তো গান শুনায় আর দোষ নেই?

ঃ এ ক্ষেত্রে তাও আছে। যে নারী গান গেয়ে আর রূপ দেখিয়ে এক সঙ্গে দশজনের সাথে পেয়ার করে বেড়ায়, তার আসরে শরিক হতে যাওয়াটা সবার পক্ষে মানায় না। ওটা দৃষ্টিকটুও বটে, বিপজ্জনকও বটে।

জুনায়েদ খান রুষ্টকণ্ঠে বললেন– এই আপনাদের বড় দোষ। শিল্পীকে কিছুতেই আপনারা শিল্পী হিসাবে দেখতে চান না। কেবলই তাঁর খুঁত খুঁজে বেড়ান। শিপ্রাদেবী আসলেই একটা অমূল্য রত্ন।

শাহজাদাও এতে উষ্ণকণ্ঠে বললেন–শিপ্রাদেবী এতই যদি অমূল্য রত্ন হয় তাকে শাদি করে ঘরে নিয়ে আসুন। এক রত্ন নিয়ে বারো জাতের বারো জনে ছিনিমিনি করবেন কেন?

ঃ এ্যাঁ! শাদি?

জুনায়েদ খান হো হো করে হেসে উঠলেন! এরপর ফের বললেন– আরে শাহজাদা, শাদি করলে তো শিল্পীর মৃত্যু হয়ে গেল। ঐ সুর কি আর তখন বেরুবে?

ঃ তাজ্জব! তাই বলে তাকে নিয়ে এইভাবে মাতামাতি করবেন?

ঃ শাহজাদা!

ঃ বিলকুল ভ্রান্ত পথে আছেন আপনি ভাইসাহেব। আপনার এই মানসিকতার মূল্যও কেউ দেবে না আর এ ধরনের খেয়ালের পরিণামও ভাল হয় না। আপনি হুঁশিয়ার হয়ে যান।

এসব কথা জুনায়েদ খান কিছুই কানে তুললেন না। বরং আরো উপহাস করে বললেন-এই মূল্যবান নসিহতের জন্যে আমি শাহজাদাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে বলছি, যার ভাবনা তার উপরই ছেড়ে দেয়া ভাল। শাহজাদা দানেশমান্দ্, কি আর বলবো।

শাহজাদা দাউদ খান অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হলেন। এরপরেও তিনি ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন——তবু আমি বলবো, ভাইসাহেবের এটা স্রেফ একটা মোহ। তিনি একজন বিস্ময়কর যোদ্ধা। এ মোহ তাঁর সাজে না। যত শিগ্র সম্ভব, এ মোহ তিনি ঝেড়ে ফেলার

বইঘর.কম ও রোকন
চেষ্টা করবেন, এই আমি আশা করি। শুনতে যত খারাপই লাগুক, এর পরিণাম বিষময়ও হতে পারে।

শাহজাদা উঠে পড়লেন এবং কোরবান আলীকে ডেকে নিয়ে প্রাসাদে চলে এলেন।

O O O

শাহজাদা দাউদ খানের দপ্তরের কাজ হালকা কাজ। প্রশাসনে অভিজ্ঞতা অর্জনের কাজ। তাঁর দপ্তরে তাঁর অধীনে কয়েকজন উজির আছেন, নাজির আছেন, কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন। আসল কাজ তাঁদের। শাহজাদার কাজ তদারক করা আর উজির নাজির কর্মচারীদের আদেশ নির্দেশ দেয়া। এ করে নিজেকে অধিকক্ষণ ব্যস্ত রাখা যায় না। আদেশ নির্দেশ দেওয়ার পর দিনমান দপ্তরে বসে করার বেশি কিছু থাকে না। কয়েকদিন একটানা উজির নাজির হাঁকানোর পর কাজ তাঁর ক্রমেই স্বল্প হয়ে এলো। অল্পক্ষণ পরেই এখন দপ্তরের কাজ ফুরিয়ে যায়। বসে বসে খাতা, দলীল দেখার কাজ শাহজাদার নয়। কাজেই, ঘোড়দৌড়ের মাঠ বেড়িয়ে আসার পরের দিনও অল্পক্ষণ কাজ করেই শাহজাদা অবসর হয়ে গেলেন। অপরাহ্নে আর কোথাও যাওয়ার কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকায়, তিনি আবার ফুলবাগানে চলে এলেন। দৌলতজাহানদের ফিরে আসার খোঁজখবর নেয়াটাই ছিল তাঁর এক মামুলি উদ্দেশ্য।

বাগানে এসে কিছুক্ষণ পায়চারী করার পর মুরাদ খানের খোঁজে তিনি মুরাদ খানের দপ্তর কক্ষে ঢুকে পড়লেন। তিনি আনমনেই ঢুকে পড়লেন এবং ঢুকে পড়েই চমকে উঠলেন। ছোট একটা ডালাভর্তি সদ্য তোলা ফুল নিয়ে কক্ষের মধ্যে বসে আছেন এক বোরখা ঢাকা আউরত। মহলের না বাইরের তা আন্দাজ করতে পারলেন না। আউরতের উপর নজর পড়তেই শাহজাদা চমকে উঠে বললেন–এ্যাঁ! সেকি! আমি দুঃখিত।

শাহজাদা ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন। শাহজাদাও যে হুড়মুড় করে এসে কক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়বেন, আউরতটি সেজন্যে আদৌ তৈরি ছিলেন না। ফলে, তিনিও চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং থতমত করে হাত তুলে সালাম দিলেন।

কণ্ঠ শুনেই আর এক দফা চমকে উঠলেন শাহজাদা। সালামের জবাব দিয়েই তিনি সবিস্ময়ে বললেন–তার মানে? আপনি কি–

সপ্রতিভ কণ্ঠে মহিলাটি বললেন–আমি দৌলতজাহান।

চকিতে একবার এ ধারণা শাহজাদার হয়েছিল। এবার তিনি উল্লাসভরে বললেন–আরে সে কি! আপনারা ফিরে এসেছেন? মারহাবা–মারহাবা! বসুন–বসুন, আপনি বসুন। আমি যাচ্ছি–

মুরাদ খান কক্ষটির একপাশে একটা হেলে পড়া ফুলের ঝাড় সোজা করার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। শাহজাদার কণ্ঠ তিনি স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন। শুনতে পেয়ে

বইঘর.কম ও রোকন
ওখান থেকেই সালাম দিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন–যাবেন কি হুজুর, বসুন–মেহেরবানী করে বসুন। এই আমি আসছি।

সালাম নিয়ে শাহজাদা ইতস্তত করতে লাগলেন। নিজেকে সহজ করে নিয়ে দৌলতজাহান বললেন–আমার জন্যে জনাবকে ফিরে যেতে হবে, তা কি করে হয়? মেহেরবানী করে বসুন। দাদু এলেই আমাকে মাকানে পৌঁছে দেবেন।

শাহজাদা তবুও দ্বিধার সাথে বললেন–না মানে, আমি থাকলে আপনার যদি–

দৌলতজাহান ঈষৎ হেসে বললেন–কোন অসুবিধে হবে না। জনাবকে তো এই নতুন দেখছিনে?

শাহজাদা খুশি হয়ে বললেন–বহুত আচ্ছা–বহুত আচ্ছা।

অদূরে এক কুরসীর উপর বসতে বসতে শাহজাদা ফের হেসে বললেন–ফুলের ডালা দেখেই আমার কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু কে-না-কে তা নিশ্চিত হবো কি করে? আরে আরে, আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন? বসুন–

অগত্যা দৌলতজাহানও বসে পড়লেন। এরপর ইতস্তত করে বললেন–জনাব বোধ হয় জরুরি কোন কাজে এসেছিলেন–

ঃ না-না, কিছু না–কিছু না। হাতে কাজ নেই তো, তাই একটু সেরেফ বেড়াতে।

দৌলতজাহান আশ্বস্ত হয়ে বললেন–ও আচ্ছা।

ঃ কবে এলেন আপনারা?

ঃ এই গতকাল সন্ধ্যার দিকে।

ঃ সন্ধ্যার দিকে?

ঃ জি।

এরপর দৌলতজাহান সলজ্জ হাসি মুখে বললেন– আজ সকালেই একবার ভাবলাম, জনাব আমার ফুলের তোড়ার এত তারিফ করলেন, অথচ এতদিন হয়ে গেল আর একটা তোড়াও পাঠিয়ে দিতে পারলাম না। যাই না হয় এখনই ফুল তুলে আনি।

ঃ আচ্ছা।

ঃ কিন্তু দেখলাম, এ বেলা ফুল তুললে সাঁঝের আগেই সেই ফুল শুকিয়ে নুয়ে পড়বে। জনাবের হাতে তো তোড়া পড়বে সেই রাতের বেলা। তাই এই বিকেল বেলায় এলাম।

ঃ ঠিক করেছেন–ঠিক করেছেন।

ঃ ফুল তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবো, এর মধ্যে দাদু হঠাৎ বললেন–ঘরে একটু বস্ গিয়ে, আমি ঐ হেলেপড়া ঝাড়টা একটু সোজা করে দিয়ে আসি। তাই এসে বসলাম।

বইঘর.কম ও রোকন

মৃদু হেসে দৌলতজাহান মাথা নিচু করলেন। শাহজাদা উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন–বহুত খুব–বহুত খুব! না বসলে তো এই খোশ কিস্‌মতি হতো না আমার!

দৌলতজাহান মাথা তুলে বললেন–খোশ্ কিস্‌মতি!

ঃ জরুর—জরুর। আপনার সাথে আমার মোলাকাত হতো কি করে?

দৌলতজাহান সলজ্জ কণ্ঠে বললেন—আমার সাথে মোলাকাত হওয়াটা জনাবের খোশ্ কিশ্‌মতি?

ঃ আরে! বলেন কি? আপনার মতো এমন মেয়ে কটা আছে তাণ্ডায়? প্রথমদিনই আপনার মূল্য ধরে ফেলেছি আমি। দু'বেলাই তো যত সব খন্নাস আর বেহুদা নারী-পুরুষ নিয়ে দরবার আমার। আপনার মতো মেয়ের সাথে মোলাকাত হওয়া, আপনার সাথে দু'টো কথা বলার মওকা হওয়া, খোশ্ কিস্‌মতি নয়? এটাতো একটা রীতি মতো দুর্লভ ব্যাপার।

শাহজাদা হাসতে লাগলেন। নির্মল হাসি। দৌলতজাহান মুগ্ধ হলেন। সেই সাথে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাসও চেপে গেলেন তিনি। এরপর ধীর কণ্ঠে বললেন–জনাবের মেহেরবানী অশেষ। তবু এটা একটু আধিক্যের মতো শুনায়।

ঃ কেমন–কেমন?

ঃ আমি একজন কাঙাল ঘরের মেয়ে। কোন রাজাবাদশার মেয়ে নই। হুকুম করলে দশবার আমাকে দৌড়াতে হবে জনাবের কাছে। আমার মোলাকাত এতই কি দুর্লভ কিছু?

শাহজাদা গম্ভীর হলেন। লহমা খানের পরে তিনি ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন–দেখুন, এই যে বাগানে এত ফুল দেখছেন, হুকুম করলেই সবগুলো ফুল তুলে এনে এখানে গাদা করা হবে। কিন্তু তাতে কি হবে? ফুলের আসল সৌন্দর্য কি থাকবে তাতে, না প্রাণের সম্ভার থাকবে ফুলের? হুকুম করলে ফুল পাবো, কিন্তু সেই প্রাণবন্ত সৌন্দর্য আর দেখতে পাবো না। ফুলের সৌন্দর্য দেখতে হলে ফুলের কাছে গিয়েই তা দেখতে হয়।

দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে দৌলতজাহান স্মিতহাস্যে বললেন–বাব্বা! জনাব আমাকে এত উপরে তুলে দিলেন?

শাহজাদা পূর্ববৎ ভারী কণ্ঠে বললেন–না, আপনাকে একদম দুর্লভ কিছু ভাবার মতো যথেষ্ট কারণ আমার ঘটেনি। তবে যে কারণেই হোক, আর পাঁচটা আউরতের মতো আপনাকে যে হুকুম করে হাজির করানো চলে না, এটুকু আমি বুঝি।

ইতিমধ্যে মুরাদ খান ব্যস্তভাবে ছুটে এলেন এবং বারান্দার নিচে থেকেই বললেন–হুজুরের কি জরুরি কোন হুকুম আছে? তা না থাকলে আমি হাত-পাগুলো ধুয়ে আসতাম। ভিজে মাটির ঝাড়টা সোজা করতে গিয়ে হাত-পা কাদায় মেখে গেল।

চিন্তার মধ্যে থেকেই শাহজাদা বললেন–এ্যাঁ?

মুরাদ খান বললেন—ভাবলাম, অল্প কাজ। কিন্তু হাত দিয়েই বেয়াকুফ! কাদা সরিয়ে শুকনো মাটি দিয়ে গিয়ে এই অবস্থা–

মুরাদ খান তার কর্দমাক্ত হস্তদ্বয় প্রসারিত করে শাহজাদাকে দেখালেন এবং আপন মনে ফের বললেন–কাছে পিঠে পানিও নেই–

শাহজাদা তা দেখেই ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– সে কি! না-না, আমার কোন হুকুম নেই। যান, সাফা করে আসুন–

মুরাদ খান খুশি হয়ে চলে গেলেন। শাহজাদা তাঁর পূর্ব কথার জের টেনে দৌলতজাহানকে বললেন–নিজের মূল্য অনেকেই নিজে বুঝতে পারেন না। কেউ বা আবার বুঝেও তা বুঝতে চান না। কিন্তু কারো মূল্য বুঝতে পেরেও আমি বিপরীত আচরণ করি কি করে বলুন?

শাহজাদার মানসিকতার পরশে দৌলতজাহান সেই থেকেই আচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি এবার থতমত করে বললেন–তা মানে–

শাহজাদা বলেই চললেন–অসাধারণ কোন কিছু হয়তো আপনি নন। তবে একেবারে সাধারণও যে নন আপনি, এটা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি আর এজন্যেই আপনার সাথে মোলাকাত হওয়ায় খুশি হয়েছি আমি।

দৌলতাজাহান কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললেন– জনাবের এ করুণা আমার জন্যে অমূল্য সম্পদ। এ করুণার কথা আমার চিরকাল স্মরণ থাকবে।

ঃ করুণা! আমি করুণা করলাম আপনাকে?

ঃ জনাব যে আমার প্রতি সদয়, তা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি আমি। জনাবের মতো লোকের কাছে এত কদর পাওয়ার এমন কিছু হকদার আমি নই। তবু যদি জনাব এতটা কদরই দেন আমাকে, এটা তাঁর মেহেরবানী বৈকি?

শাহজাদা ক্ষুণ্ন হলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–আমি জনাব হওয়ার ফলেই এই হয়েছে সমস্যা। আমি সোনাকে সোনা বললেও সবাই ভাবে, আমি সোনাকে করুণা করলাম। কেউ আমাকে বিশ্বাস করতেও চায় না, সহজভাবে গ্রহণ করতেও পারে না। সকলের নিকট থেকে আমি দূরেই পড়ে রইলাম।

ঃ জনাব।

www.boighar.com

ঃ আমি যে একজন মানুষ, করুণা না করে আর পাঁচজনের মতোই আমিও যে সাদাকে সাদাই বলি, এটা কেউ মেনে নিতে চায় না। ফলাফল ঐ এক। জনাব হয়ে দূরে থাকা ছাড়া, মানুষ হয়ে কোন মানুষের কাছে আসার বা তার সাথে স্বাভাবিকভাবে মত বিনিময় করার কোন মওকা আমার নেই।

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদার মুখমণ্ডল মলিন হলো। তা লক্ষ্য করে দৌলতজাহান আপ্লুত কণ্ঠে বললেন–দোহাই, আমাকে ভুল বুঝবেন না জনাব! জনাবকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। দীল যে তাঁর সফেদ, অকারণ আতিশয্য সেখানে যে নেই, তা বুঝতে আমার আদৌ দেরি হয়নি। তবু এরপরেও তো কথা আছে জনাব!

ঃ কথা?

ঃ জনাব দানেশমান্দ! তাঁর দীল আছে, সারল্য আছে, সৎ সাহস আছে। আর তাই তিনি সরাসরি এ মূল্যায়ন করলেন আমার। কিন্তু আমার জগৎ নিয়ে তো চিন্তা করবো আমি? কোন অক্রেতা জহুরী যদি কোন পাথর দেখে বলে এটা হীরে, আর তার জগতের ক্রেতারা যদি সবাই বলে এটা পাথর, তাহলে বেচারা ঐ পাথরের জহুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার অধিক আর কি করার আছে জনাব? তার জগতে সে তো ঐ পাথর ছাড়া কিছুই নয়? হীরে হলেও তা নিয়ে তার উৎফুল্ল হবার কি আছে?

শাহজাদা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দৌলতজাহানের কথার মর্ম বুঝতে পেরে তিনি অপলক নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। এর আর তিনি জবাব খুঁজে পেলেন না। কিছুক্ষণ ঐ ভাবেই চেয়ে থাকার পর তিনি বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললেন–আমি হীরে মানিক বুঝিনে। তবে আবার আমি বলবো–আপনাকে চিনতে আমি ভুল করিনি।

দৌলতজাহান উদগ্রীব হয়ে বললেন–জনাব!

ঃ আপনি আমাকে দিন দিন ভাবিয়ে তুলছেন কেবলই।

দৌলতজাহানের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। পরিবেশটা হালকা করার উদ্দেশ্যে তিনি এবার কিছুটা শব্দ করেই হেসে বললেন–তাহলে আমিও আবার বলবো, জনাবের এই মহৎ দীলের কথা আমরণ স্মরণ থাকবে আমার।

শাহজাদাও অতঃপর সহজ হলেন। তিনিও সহজ কণ্ঠে হেসে বললেন–বহুত আচ্ছা–বহুত আচ্ছা। তা এসব কথা থাক। এবার আপনার খবর বলুন।

ঃ জি! আমার খবর?

ঃ হ্যাঁ। হুট্ করে বিলকুল লাপাত্তা হয়ে গেলেন! এমন হঠাৎ করে কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?

দৌলতজাহান আবার খানিক মনমরা হয়ে গেলেন। তিনি নিষ্প্রভ কণ্ঠে বললেন–এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি।

ঃ দূর সম্পর্কের আত্মীয়?

ঃ জি–জি।

ঃ তা দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে এমন কি জরুরি কাজ বাধলো যে হঠাৎ করেই যেতে হলো আপনাদের? কোন দুঃসংবাদ ছিল নাকি?

ঃ জি না।

ঃ তবে?

ঃ তা মানে–

ঃ থাক, কোন অসুবিধা থাকলে তা বলার দরকার নেই।

আরো অধিক নিষ্প্রভ কণ্ঠে দৌলতজাহান বললেন–অসুবিধে আর কি জনাব? মেয়ের বয়স হলে মাতাপিতার যে দুশ্চিন্তা হয়, সেই দুশ্চিন্তাই আম্মাজানকে ওখানে টেনে নিয়ে গেল আর আম্মার হুকুমে আমাকেও যেতে হলো তাঁর সাথে।

দু চোখ বিস্ফারিত করে শাহজাদা ঝোঁকের মাথায় হেসে উঠে বললেন– আচ্ছা! এয়সা কারবার? তা কতদূর এগুলো?

নতমস্তক আরো কিছু নত করে দৌলতজাহান বললেন–ওসব আমি জানিনে। না বুঝেই যেতে হলো বলে গিয়েছিলাম।

ঃ কেন–কেন? আপনার কি এতে মত নেই?

মাথা একটু তুলেই ফের মাথা নিচু করে দৌলতজাহান ম্লানকণ্ঠে বললেন–আমার মতামতের কি আছে জনাব? মামুলি নসীব নিয়ে অধিক খোয়াব দেখেই বা করবো কি?

দৌলতজাহানের কণ্ঠস্বর ভারী হলো। সম্বিত ফিরে আসতেই শাহজাদারও দীলটা টনটন করে উঠলো। এতে করে উভয়েই নীরব হয়ে গেলেন। খানিক পরে শাহজাদা নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন–তা অধিক খোয়াব না দেখলেও, একেবারে চুপ থাকাটাই কি ভাল?

দৌলতজাহান এর কোন জবাব না দিয়ে উদাসনেত্রে শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন।

এই সময় হন্তদন্ত হয়ে মুরাদ খান চলে এলেন এবং এসেই বললেন–এবার বলুন হুজুর, কি খেদমত করবো আমি হুজুরের?

শাহজাদা চিন্তামগ্ন ছিলেন। তিনি মুখ তুলে বললেন–এ্যাঁ? না, কোন খেদমত নয়। আমি খান সাহেবের সাথে দুটো কথা বলবো

মুরাদ খান খুশি হয়ে বললেন– জি আচ্ছা হুজুর। তাহলে এই দৌলতকে একটু মাকানে পৌঁছে দিয়ে আসি? এক দৌড়ে যাব, এক দৌড়ে আসবো। ও গিয়ে ফুলের কাজ করুক?

খেয়াল হতেই শাহজাদা বললেন–হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো! ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। যান-যান, পৌঁছে দিয়ে আসুন–

ফুলের ডালা হাতে নিয়ে দৌলতজাহান উঠে দাঁড়ালেন এবং শাহজাদাকে মৃদুকণ্ঠে সালাম জানিয়ে মুরাদ খানের সাথে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। শাহজাদাও মৃদুকণ্ঠে সালাম নিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

কিছুক্ষণ পরেই মুরাদ খান ফিরে এলেন। শাহজাদা গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলেন। মুরাদ খান এসে দাঁড়ালে তিনি মাথা তুলে বললেন– বসুন, আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করবো।

অদূরে মামুলি এক আসনের উপর বসে মুরাদ খান বললেন–হুজুর–

কোন ভূমিকা না করে শাহজাদা প্রশ্ন করলেন–দৌলতজাহানের আপনারা শাদির ব্যবস্থা করছেন?

আচমকা এই প্রশ্নে মুরাদ খান থতমত করে ফের বললেন–হুজুর–

ঃ দৌলতজাহানের আম্মা দৌলতজাহানের শাদির ব্যাপারে দৌলতজাহানকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন?

ঃ জি হুজুর, জি।

ঃ তা সে ব্যাপারে কতদূর কি হলো?

মুখ কাঁচুমাচু করে মুরাদ খান বললেন–কোন কিছুই হয়নি হুজুর। ঘরটাও পছন্দমতো নয়, আর দৌলতজাহানও শাদি করতে বিলকুল নারাজ। তাই গিয়ে কোন কাজ হয়নি।

ঃ কাজ হয়নি?

ঃ দৌলতজাহান আগে জানতো না যে, তাকে শাদির ব্যাপারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখানে গিয়ে জানতে পেরেই সে বেঁকে বসলো। ফলে, যে সব জেনানাদের দৌলতকে দেখতে আসার কথা ছিল, দুলহীনের খবর শুনে তাঁরা আর কেউ এলেন না। দৌলতেরা ঐ আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অমনি অমনি ফিরে এলো।

ঃ ও আচ্ছা। তা ঘর বর ভাল নয়?

ঃ মামুলিই বলা চলে হুজুর। দৌলতের ঠিক উপযুক্ত নয়। কিন্তু সবই তো নসীবের ব্যাপার! রাজার ঘরে যাওয়ার যোগ্যতা থাকলেও সে মূল্য তাকে দিচ্ছে কে?

ঃ রাজার ঘরে যাওয়ার যোগ্যতা মানে?

মুরাদ খান নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–তাই বৈকি হুজুর? কোন রাজকন্যার চেয়ে সেকি কম? এত রূপ আর এত গুণ কজন রাজকন্যারই বা আছে? হুজুর তো নিজের চোখেই দেখছেন সব?

বরণটা যে দৌলতজাহানের অতিশয় উজ্জ্বল, হাত-পায়ের তাঁর গড়নটাও যে আকর্ষণীয়, শাহজাদা এটুকু লক্ষ্য করেছিলেন। এ কথায় তিনি উদগ্রীব হয়ে বললেন–বলেন কি খান সাহেব? দৌলতজাহানের রূপটাও তাহলে উমদা? মানে আমি তো তাঁর মুখ কখনো দেখিনি?

ঃ উমদা হুজুর, খুবই উমদা। এমন নাক-মুখ-চোখ আর গড়ন-বরণ——এক কথায় এরকম খুব সুরাত, কই, আমার চোখে তো আর পড়ে না?

ঃ খান সাহেব!

ঃ আমার না হয় বৃদ্ধের চোখ। কিন্তু তাহলেও আমি হলফ করে বলবো হুজুর, দৌলতের সুরাত নিয়ে কারো বদনাম করার তাকত নেই।

শাহজাদা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি বিমনাভাবে বললেন–সেকি!

মুরাদ খান আফসোস্ করে বললেন– রূপে গুণে এতটা যে উজালা, তাকে কেবল রাজার ঘরেই মানায়। কিন্তু সে ভাগ্য নিয়ে তো সে আসেনি হুজুর? নসীব তাকে ঠেলে কাঙালিনী বানিয়েছে। কাঙালের আর রূপগুণের দাম কি?

ঃ এ্যাঁ? তা–মানে–

ঃ দৌলত বলে, তার পছন্দমতো বর না হলে সে শাদিই কোনদিন করবে না। কিন্তু তা কি কখনও হয়? সে যা চায়, তা সে পাবে কোনদিন?

ঃ কেমন–কেমন?

ঃ তার জন্যে কবে কোন রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়া হাঁকিয়ে আসবে হুজুর? তাই আমি বলি, আপাতত জিদ্ ধরেছে, জিদ্ ধরেই থাকুক। চোখের সুরমা খসে পড়লে আপছে আপ্ সে বাস্তব জগতে ফিরে আসবে। কিন্তু তার মা তা মানতে চায় না।

শাহিজাদা দাউদ খানের ভাবান্তর গভীরতর হলো। তোলপাড় শুরু হলো তাঁর অন্তরে। দৌলতজাহান শুধু গুণবতীই নন, রূপবতীও। রূপও আছে দৌলতের! তাহলে? এইটুকুই তো কাম্য ছিল তাঁর? ষোলকলায় না হলেও, অর্থাৎ তাঁর দীলের কোণে লুক্কায়িত কদমতলার সেই অপরূপ রূপরাশি দৌলতজাহানের না থাকলেও, তাঁর মোটামুটি চাহিদা তো পূরণ করেছেন দৌলতজাহান! অতঃপর?

ভেবেই চললেন শাহজাদা। অবিরাম–অনুক্ষণ। মোহাবিষ্টের মতো তিনি কুরসীর উপর বসে রইলেন চুপচাপ। শাহজাদাকে একেবারেই নীরব দেখে মুরাদ খান নড়ে চড়ে বললেন–মানে–হুজুর কি আর কিছু বলবেন?

সম্বিতে এসেই শাহজাদা সামলে নিলেন নিজেকে। অতঃপর কুরসী থেকে উঠতে উঠতে বললেন–দৌলতজাহানের শাদির ব্যাপার নিয়ে আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। এ ব্যাপারে আমাকে একটু ভাবতে দিন।

ঃ হুজুর!

ঃ তাঁর মতো মেয়ে যেখানে সেখানে পড়ুক, আমি সেটা চাইনে। আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন। দেখি, তাঁর কোন সুব্যবস্থা আমি করতে পারি কিনা?

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে মুরাদ খান বললেন–হুজুর মেহেরবান! হুজুর দরাজদীল! তাহলে তো হুজুর আকণ্ঠ ঋণী হয়ে থাকবো আমরা হুজুরের জানাশুনা অনেক সুপাত্র আছেন। হুজুর একটু হাত দিলেই, অভাগীর জিন্দেগীটা রোশনাই হয়ে যায়!

ঃ হ্যাঁ, সেই চিন্তাই করছি আমি।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ করুন হুজুর, করুন–করুন। আর না হোক, হুজুরের এতে অশেষ সওয়াব হবে। আল্লাহতায়ালার অসীম করুণার তিনি হকদার হয়ে যাবেন!

ঃ আপনি দোআ করবেন।

শাহজাদা চলে গেলেন। পড়িমরি ঘরে ফিরে মুরাদ খান দৌলতজাহানের আম্মা দিনারবানুকে বিপুল উৎসাহে জানালেন, তাঁর ছোট হুজুর দানাদার লোক–ঈমানদার লোক–সহি লোক। দৌলতের জন্যে নওশা খুঁজে দেয়ার দায়িত্ব সাগ্রহে তিনি নিয়েছেন। অতএব, আর বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই ইনশাআল্লাহ।

সারারাত চিন্তা করলেন শাহজাদা। ঘুম এলো না দুই চোখে। কি সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি, এই ভেবে সারা হতে লাগলেন। তাঁর একমাত্র নির্ভরযোগ্য লোক কালাপাহাড় কাছে নেই। তিনি থাকলে তাঁকে নিয়ে আজই তিনি বসতে পারতেন। সঠিক একটা সিদ্ধান্তে আজই তাঁরা পৌঁছতে পারতেন। দৌলতজাহান তাঁর দীলের এখন বিপুলাংশই দখল করে ফেলেছেন। আর তাঁকে এক ধাক্কায় উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সুচিন্তিত ও ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্ত ছাড়া, বিপরীত চিন্তা ভাবনার অবকাশ নেই। দৌলতজাহান তাঁর চাহিদা সবই পূরণ করেছেন। কিঞ্চিৎ যা ফাঁক, তা বজরাঘাটের কদমতলায় দেখা ঐ মুখচ্ছবি। ঐ মুখ যদি দৌলতজাহানের হতো, তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে একাই তিনি একশো ছিলেন। তাঁর কাছে যা তথ্য এখন পৌঁছলো, তাতে দৌলতজাহানও সুন্দরী। সেই বিচারে তাঁকে এখন নাকচ করার উপায় নেই।

সবই ঠিক আছে। শুধু সূচাগ্রের মতো তাঁর একটিমাত্র চিন্তা, একটিমাত্র ভয়, দৌলতজাহানকে পাওয়ার পরও ঐ মুখখানা দীলে তাঁর উঁকি দিতে থাকে যদি? দৌলতজাহানের না-দেখা ঐ রূপ সে ফাঁকটা পূরণ করতে একান্তই ব্যর্থ হয় যদি? কিংবা, ঐ মুখখানা কোন কারণে সেই রূপের সাথে দৌলতের সমপরিমাণ গুণাবলী নিয়ে এসে তার চলার পথ আগলে দাঁড়ায় যদি? তিনি নিছকই একজন মানুষ। জিতেন্দ্রীয় নন। দীর্ঘদিন ধরে হৃদয়ের গহিনে যে মুখ তিনি লালন করে এসেছেন, দৌলতজাহানকে সেখানে স্থাপন করে, পারবেন তো দৌলতের মর্যাদা শেষতক রক্ষা করতে?

পুনশ্চ চিন্তা——ঝোঁকের মাথায় দৌলতজাহানের ব্যাপারে এক তরফাভাবে মুন্সিয়ানা করার কাজে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। গিয়েছেনও অনেকটা। কিন্তু দৌলতজাহান ইতরপ্রাণী বা জড়পদার্থ নন। মন আর পছন্দ বলে তাঁরও একটা দিক আছে! পছন্দমতো বর ছাড়া দৌলতজাহান শাদি করতে নারাজ–এ দিকটা নিশ্চিত। কিন্তু শাহজাদা দাউদ খানই যে তাঁর সেই পছন্দ করা বর বা তাঁর মনের মতো মানুষ, কিছু আভাস ইংগিত ছাড়া, এ নিশ্চয়তাই বা শাহজাদা পেলেন কোথায়?

পরের দিন আর শাহজাদা দপ্তরের কাজে গেলেন না। দপ্তরের কাজে মন দেয়ার মন তাঁর ছিল না। প্রাসাদেই সারাবেলা উঠ্‌বোস করে কাটালেন। বিকেলেই ফের যথা সময়ে

বইঘর.কম ও রোকন

ফুলবাগানে চলে এলেন। এখানে এলেই তাঁর সমস্যার তিনি সমাধান পেয়ে যাবেন, সে আকাঙ্খায় নয়, নিজের অনেকটা অজ্ঞাতেই আর অবচেতন মনের টানেই তিনি এলেন।

মুরাদ খানের সামনে পড়তে এখন ভয় পাচ্ছেন শাহজাদা। জিজ্ঞাসা তাঁর নির্ঘাত কিছু থাকবেই। আর থাকলে তাঁর প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাবটা এই মুহূর্তে কি দেবেন? দেরি আছে, ভেবে দেখি, এই বৈ তো নয়?

মুরাদ খানের কক্ষ এড়িয়ে ফুলের সম্ভার অধিক যেদিকে, বাগানের সেইদিকে তিনি চললেন। ফুলের সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি অস্থির দীলের প্রলেপ খুঁজে পেতে চাইলেন। ফুলের অরণ্যের নিকটবর্তী হতেই তিনি দেখলেন, মুরাদ খান অল্প দূরে মালীদের সাথে কাজ নিয়ে মগ্ন আছেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ফুলের বনে প্রবেশ করতে গিয়েই যা দেখলেন, তাতে তিনি যারপরনাই চমকেই শুধু উঠলেন না, তাঁর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। সেই বাঘটাই তাঁর সামনে। সূচাগ্রের মতো যে চিন্তায় তিনি এখন দোদুল্যমান, সেই চিন্তাই এখন তাঁর সামনে মূর্তিমান! তিনি দেখলেন, মুখের ঢাকনা মাথার উপর তুলে দিয়ে বজরাঘাটের কদমতলায় দেখা সেই অপরিসীম সুন্দরী মেয়েটি, তাঁর সেই স্বপ্নরাজ্যের রাজকুমারী, এই বাগিচায় এসে নিবিষ্ট চিত্তে ফুল তুলছেন। তার একদম চোখের সামনে আজ আবার সেই মুখ। দূরত্ব হাত দশেকের মতো।

ক্ষণিকের তরে শ্বাস প্রশ্বাসও বন্ধ হলো শাহজাদার। তিনি ভেবে আকুল হতে লাগলেন, ঐ মেয়ে এই ফুল বাগানে হঠাৎ এলেন কোত্থেকে? তবে কি তিনি তাঁদেরই এই পরিমণ্ডলের কেউ? কোন রাজপুরুষ বা পদস্থ কোন কর্মকর্তারই কন্যা-ভগ্নি? নাকি আসলেই তিনি পরী? সীমাহীন ফুলসম্ভার দেখে তিনি এই বাগানে ফুল তুলতে এসেছেন?

শাহজাদার মাথাটা বনবন করে [illegible]লো। এক্ষণে কি করবেন তিনি ভাবতে লাগলেন। এগুবেন, না পিছুবেন, স্থির করতে পারলেন না। ইতিমধ্যেই দেখলেন, ফুল তোলা শেষ করে অপরূপ সেই সুন্দরীটি মুখের ঢাকনা নামিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে আসছেন। মাঝে একটি বড়ো সড়ো ফুলের ঝাড়। শাহজাদার উপস্থিতি সুন্দরীটির অজ্ঞাত। শাহজাদা দেখছেন তাঁকে অপলক নেত্রে।

শাহজাদা দাউদ খান যেস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইটিই এই ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসার পথ। মাঝখানে অবস্থিত ফুলের ঝাড়টির এক ধার ঘুরে শাহজাদা সরবো সরবো করতেই, সুন্দরীটি এসে একদম শাহজাদার মুখোমুখী হয়ে গেলেন। এতে করে চমকে উঠলেন উভয়েই। শাহজাদার দৃষ্টি তখন আচ্ছন্ন। জ্ঞান তখন নিষ্ক্রিয়। মুখ তখন ভাষাহীন

বইঘর.কম ও রোকন
কথা বললেন–সুন্দরীটি। তিনি চমকে উঠেই সালাম দিয়ে বললেন–একি! জনাব এখানে?

কণ্ঠস্বরে ক্ষণিকের জন্য চমক ভাঙ্গলো শাহ্জাদার। অপরিসীম বিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দৌলতজাহান।

চমকের উপর চমক। সালামের জবাবটা কোনমতে দিয়েই শাহ্জাদা ফের বোবা বনে গেলেন। বিস্ময়পিষ্ট হয়ে তিনি দৌলতজাহানের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে রইলেন। অন্তরে তাঁর তখন একটাই কেবল প্রশ্ন–এই দৌলতজাহানই সেই অপরূপ সুন্দরী? সেই চিত্তহারী মুখখানা এই দৌলতেরই মুখ? এই এক রমণীর মাঝেই ঐ তামাম মহিমার সমাবেশ?

শাহ্জাদাকে নীরব দেখে দৌলতজাহান বললেন–জনাব কি কিছু ভাবছেন?

চমকে উঠে শাহ্জাদা আকুল কণ্ঠে বললেন–হ্যাঁ–হ্যাঁ, ভাবছি। কেবলই ভাবছি। আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো, ঐ যে ঐ আপনাদের বজরাঘাটের কদমতলায় আপনিই সেদিন গিয়েছিলেন? ঐ যে ঐ বোরখা বদল করলেন যেন কার সাথে?

দৌলতজাহান ঘটনাটি বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর বোরখা খোলা মুখটা আজ আবার শাহ্জাদার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। লজ্জা জড়িত কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন–জি জনাব, জি।

ঃ ঐ যে ওখানে ঐ বাবলাগাছের আড়ালে আমাকে বসে থাকতে যিনি প্রথম দেখতে পেলেন, তিনিই আপনি?

দৌলতজাহান মৃদু হেসে বললেন–জি জনাব। আমারই তো নজর সর্বপ্রথম জনাবের উপর পড়লো? জনাবকে তো আমিই আমার ভাবীকে দেখিয়ে দিলাম?

শাহ্জাদা ঝোঁকের মাথায় বলে বসলেন—তাজ্জব! এত সুন্দর দেখতে আপনি?

শরমে দৌলতজাহান সংকুচিত হয়ে গেলেন। অন্তরে তাঁর আনন্দ ও আবেগের হিল্লোল বয়ে গেল। ফুলের ডালা সহকারে তিনিও ঈষৎ কেঁপে উঠলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বললেন—জনাব!

তাঁর চাচাহুজুরের উদ্দেশ্যে নীরব এক আহ্বান জানাতে গিয়েই হুঁশে এলেন শাহাজাদা। হুঁশে এসেই সবলে নিজেকে সামলে নিতে লাগলেন। পুরোপুরি সামলে নিতে শাহ্জাদার সময় লাগলো। কিছু সময় কসরত করে তিনি একেবারেই স্বাভাবিক হয়ে গেলেন এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—আপনি এখানে কখন এলেন? মানে আপনাকে এখানে সামনে পাবো, এটা ভাবতেই তো পারিনি?

পুরোপুরি ঘটনাটা দৌলতজাহান চকিতেই বুঝে নিলেন। দীলের এক জটিল আবর্ত পেরিয়ে যে শাহ্জাদা এই শান্ত অবস্থায় ফিরে এলেন, এটা বুঝতে দৌলতজাহানের

বইঘর.কম ও রোকন
আদৌ বিলম্ব হলো না। ফলে, তিনিও নিজেকে সাথে সাথেই সামলে নিয়ে সহাস্যে জবাব দিলেন——সেই কথাই তো আমিও বলছি জনাব? জনাবকে আমিও এখানে কল্পনা করতে পারিনি!

শাহজাদাও হেসে বললে——তাই নাকি? তাহলে আচানকই আবার এই মোলাকাত, না কি বলেন?

ঃ জি জনাব, তাইতো হলো।

ঃ সবই আল্লাহর মেহেরবানী। তা ফুল তুলে আনলেন?

দৌলতজাহান মাথা নিচু করলেন এবং নতমস্তকে বললেন——জি জনাব। আমি বড় গোস্তাকি করে ফেলেছি। মেহেরবানী করে গোস্তাকি আমার মাফ করে দেবেন।

ঃ কেন——কেন, গোস্তাকি কেন? ফুল তোলার হুকুম তো আমিই আপনাকে দিয়েছি।

ঃ সে কথা নয় জনাব। ফুল তুলে নিয়ে গিয়েও গতকাল জনাবকে আমি ফুলের তোড়া দিতে পারিনি। তাই,যাতে করে আর গোস্তাকি না হয়, সেইজন্যে আজ একটু সকাল সকাল এসেছি। গতকালের গোস্তাখিটা মাফ হয় জনাব।

শাহজাদা হেসে বললেন-ও, এই কথা?

ঃ জি-জি। গতকাল এখান থেকে গিয়ে কি যে আমার হলো, জনাবের সাথে আলাপ করে যাওয়ার পর কি যে সব এলোমেলো আর অসম্ভব চিন্তাভাবনা পেয়ে বসলো আমাকে, তোড়া তৈরি তো নয়ই, আহার-নিদ্রাও বরবাদ হয়ে গেল আমার। কোন শক্তি-উৎসাহ না পেয়ে আমি কেবল বিছানাতেই পড়ে পড়ে কাটালাম। কিছুটা ইচ্ছাকৃত হলেও, কসুর আমার বিলকুলই ইচ্ছাকৃত নয় জনাব।

জনাবের চিন্তা আর কসুরের মধ্যে রইলো না। আবার তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, দৌলতজাহানের মধ্যেও তাহলে ভাবান্তর এসেছে? ঘুম আসেনি তারও চোখে? একই ভাবনাই ভাবছেন তাঁরা উভয়েই? শাহজাদার অনুভূতির তন্ত্রীগুলো চকিতেই একবার মধুর সুরে বেজে উঠলো। এত কথার প্রেক্ষিতে তিনি শুধু বললেন——

——তাই?

ঃ জি জনাব। হঠাৎ আজ আবার এই দেখা হয়ে ভালই হলো। কসুরটার জন্যে আমি সামনাসামনি মাফ চাওয়ার মওকা পেলাম। কসুরটা আমার মাফ হয় জনাব।

ঃ এ্যাঁ!-না- না কসুর কি? সব সময় তো মনের অবস্থা সমান থাকে না সবার? এত কসুরের কি আছে?

দৌলতজাহান ঈষৎ হেসে বললেন——মাফ তাহলে পেলাম?

ঃ অবশ্যই——অবশ্যই। কসুরই নেই যেখানে, সেখানে মাফ করতে বিলম্ব কি?

ঃ জনাব যথার্থই হৃদয়বান। তাহলে আসি জনাব——

বইঘর.কম ও রোকন

দৌলতজাহান পা বাড়াতে গেলেন। শাহজাদা ইতস্তত করে বললেন—দেখুন, যদি অস্বস্তি বোধ না করেন, তাহলে আপনার সাথে দু' একটি অন্য কথা বলার ছিল আমার?

একটু চিন্তা করেই দৌলতজাহান বললেন—তাহলে জনাব,এখানে নয়। চলুন, দাদুর ঐ দপ্তর কক্ষে গিয়ে বসি। মালী-মজুর চারদিকে ঘোরাফেরা করছে। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা খারাপ দেখায়।

ঃ ঠিক—ঠিক, ঠিক বলেছেন।

দৌলতজাহান পুনরায় মৃদু হেসে বললেন,—কথার প্রসঙ্গ জনাব যখন তুললেনই, তখন দুটো কথা আমারও বলার আছে জনাবকে।

ঃ তাই নাকি? মারহাবা-মারহাবা। চলুন—চলুন,তাহলে ওখানে গিয়েই বসি—

মুরাদ খানের কক্ষে এসেই উভয়েই মুখোমুখী বসলেন। মুরাদ খান দেখতে পেয়েই ছুটে এলেন। কাজের ফরমায়েশ দিয়ে শাহজাদা তাঁকে সেখানে থেকে সরিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয়েই নীরব হয়ে রইলেন। কে আগে কথা বলবেন স্থির না হওয়ায় উভয়েই মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলেন। অবশেষে শাহজাদাই মুখ খুললেন আগে এবং বললেন—দেখুন, আমার যা বলার কথা, তা সব এলোমেলো কথা। কিছুটা আজগুবিও বটে। তার চেয়ে বরং আপনার যা বলার আছে সেইটেই আগে বলুন—

লহমা খাকে নীরব থেকে দৌলতজাহান বললেন—তা জনাব হুকুম করলে বলতেই হবে আমাকে।

ঃ হুকুম নয়—হুকুম নয়। বলছি, আপনিই আগে বলুন। দেখি,ইতিমধ্যে আমার আবার কোন কসুর হয়ে গেছে নাকি?

শাহজাদা হাসলেন। দৌলতজাহান কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জনাবের কসুর ধরার অবকাশ এখানে নেই। তবে তাঁর হৃদ্যতাই আমার জন্যে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ঃ কি রকম—কি রকম?

ঃ এমনিতেই আমি আমার আম্মাজানের জ্বালাতে পেরেশান, তার উপর জনাব আবার এতে হাত দিয়ে যে অবস্থা পয়দা করলেন,তাতে আমার এখন প্রাণান্ত অবস্থা।

ঃ ঠিক বুঝতে পাললাম না তো?

ঃ আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে, আমার শাদির ব্যাপার নিয়ে জনাব এতো উদগ্রীব হতে গেলেন কেন? কেন স্বগরজে আমার জন্যে নওশা খুঁজতে যাচ্ছেন? মানে আমাকে বিদায় করার জন্যে আপনি কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? আমি কি আপনারও দায় হয়ে পড়েছি?

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা চমকে উঠে বললেন—সেকি! এসব কি বলছেন আপনি?

ঃ কথায় আমার গোস্তাকি থেকে যাচ্ছে জনাব। মেহেরবানী করে মাফ করবেন। জনাব আমার প্রতি সদয় বলেই আমার ভালই করতে চান—তা বুঝি। কিন্তু যার তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যে আমার সেই ভালাইটা করা হবে আর আমি তাতে খুশি হবো, এটা জনাব ভাবলেন কি করে?

জিজ্ঞাসু নেত্রে দৌলতজাহান শাহজাদা দাউদ খানের মুখের দিকে তাকালেন। শাহজাদা বললেন—কথাটা আপনি আপনার দাদুর কাছেই শুনেছেন, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু যার তার ঘাড়ে চাপানোর কথা ভাবছেন কেন?

ঃ জি?

মনের ভাব গোপন করে শাহজাদা বললেন—কারো ঘাড়ে দেই-ই যদি আপনাকে, তিনি তো একজন আমির উমরাহও হতে পারেন?

দৌলতজাহান ম্লান হাসি হেসে বললেন—আমির উমরাহ?

ঃ চাই কি একজন উদীয়মান উজিরও তিনি হতে পারেন।

দৌলতজাহান এবার শক্ত কণ্ঠে বললেন—কিন্তু আমার খোয়াব তো তার চেয়েও বড় হতে পারে জনাব? আমারও যখন অন্তর বলে একটা কিছু আছে, তখন তো সেখানে তার চেয়েও অনেক বড় আকিঞ্চন থাকতে পারে আমার?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ আমির-উমরাহ, উজির-সালার কেন, কোন রাজপুত্রের আশাও তো থাকতে পারে দীলে আমার? জনাব যদি আমার ভালাই করতে এতই আগ্রহী, তাহলে করুন তো দেখি আমার সেই বড় আশাটা পূরণ ?

শাহজাদা হকচকিয়ে গিয়ে বললেন—জি? বড় আশা ?

ঃ জনাব কি পারবেন তা পূরণ করতে ? বলুন, পারবেন কি ?

দিশেহারা হয়ে শাহজাদা বললে—তা মানে—

সঙ্গে সঙ্গে দৌলতজাহান হেসে উঠে বললেন—ভয় নেই জনাব! সত্যি সত্যিই জনাবকে আমি আমার সে আশা পূরণ করতে বলবো না, বা সে আবেদনও রাখবো না। জনাব আমার ভালাই করতে চান বলেই বললাম।

ঃ সেকি! তা মানে—

ঃ আমার মকসুদ খোদ আল্লাহতায়ালা পূরণ না করলে, অন্যে করতে পারবে না। জনাবকে আমি সে কথা বলে পেরেশান করবো কেন?

ঃ দৌলতজাহান!

শাহজাদার মুখে এই প্রথম তাঁর নিজের নাম শুনে দৌলতজাহানের দীল শিহরিত হয়ে উঠলো। বিহ্বল হয়ে গেলেন তিনি। মুহূর্তকালের জন্যে জবান হারিয়ে ফেললেন। অতঃপরে নিজেকে সামলে নিয়ে দৌলতজাহান ধীর কণ্ঠে বললেন— কুঁড়েঘরে বাস করে

লক্ষ্য মুদ্রার খোয়াব দেখার মতো আমার যে একটা খোয়াব আছে, জনাব তা নিশ্চয়ই দাদুর কাছে শুনেছেন। সে খোয়াব পূরণ কখনো হবে না,তা জানি। আর তাই শাদির কথা কখনোও আমি ভাবিনে।

ঃ না-না,তা হবে কেন?

ঃ আমি আমার ঐ খোয়াব নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই জনাব। মেহেরবানী করে আমার একটা হিল্লে করার চিন্তা ভাবনা জনাব আর না করুন, এইটুকুই আমার আরজ।

দৌলতজাহান মাথা নিচু করলেন। শাহজাদা বিহ্বল কণ্ঠে বললেন— দৌলত!

পুনরায় মাথা তুলে দৌলতজাহান বললেন—আমার নসীবকে চিনতে আমার ভুল হয়নি জনাব। খোদ জনাবও যদি বা আমাকে নিয়ে কিছুটা ভাবতে গেলেন, তাও ঐ আমাকে যেখানে হোক গছিয়ে দেয়ার ভাবনাটাই ভাবতে গেলেন, এর অধিক কিছু ভাবতে পারলেন না! হায়রে আমার নসীব! আর হায়রে আমার খোয়াব!

দৌলতজাহানের অভিব্যক্তিতে বেদনা ঝরে পড়লো। ক্লিষ্ট হাসির রেশ টেনে তিনি তাঁর দিকে চাইলেন। শাহজাদা দাউদ খান কাররানী দৌলতজাহানের দীলের একদম দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর চোখের সামনে সেখানে আর আঁধার কিছুই রইলো না।

যা তিনি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে চেয়েছিলেন, তা তিনি বিনা জিজ্ঞাসায় পেয়ে গেলেন।

সাত

কুচবিহারের লড়াই থেকে ফিরে এলেন সেনাপতি কালাপাহাড়। ফিরে এলেন কালাপাহাড় খেতাবটা আরো পোক্ত করে নিয়ে। দেশের ভেতরে ও বাইরে নানাস্থানে পুনরায় গুজব ছড়িয়ে পড়লো, কুচবিহারে গিয়ে কামাখ্যা, হাজো ও অন্যান্য স্থানের যাবতীয় মন্দির-বিগ্রহ কালাপাহাড় ধ্বংস করে এসেছেন।

হযরত-ই-আলার সাথে যুদ্ধ যাত্রা করে তাঁরা গিয়ে সরাসরি বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণকারী কোচ্ সেনাপতি শুক্লধ্বজের বাহিনীর গতি রোধ করে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো। এ লড়াইয়ে কোচবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং কোচ সেনাপতি শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় বন্দী হলেন। কুচবিহার রাজ নরনারায়ণের এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি প্রদান কল্পে কালাপাহাড়কে সঙ্গে নিয়ে হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী কুচবিহার রাজ্যের অভ্যন্তরে ধাবিত হলেন এবং কোচ রাজ্যের রাজধানী কুচবিহার অবরোধ করলেন। দীর্ঘ সময় ধরে কোচরাজা নরনারায়ণ এ অবরোধ মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হয়ে নরনারায়ণ অবশেষে হযরত-ই-আলার কাছে সন্ধির অনুরোধ পাঠিয়ে হযরত-ই-আলার বন্ধুত্ব কামনা করলেন। তিনি যুক্তি স্বরূপ দেখালেন, দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা ও কোচরাজ্যসহ এই পূর্ব অঞ্চলটা গোটাই দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। দিল্লীর আগ্রাসন প্রতিহত করা এখন উভয়ের জন্যেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে তাঁদের আর নিজেদের মধ্যে কলহ বিদ্যমান থাকা সমীচীন নয়। পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হয়ে এই মহাদুর্যোগ এক সাথে ঠেকানোর আর বিকল্প নেই।

হযরত-ই-আলা সেলায়মান খান কাররানীরও এ আশংকা ছিল। দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহর কার্যক্রম থেকে প্রকৃতপক্ষেই এমন এক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আকবর শাহ ইদানিং হিন্দুস্তানের এ অঞ্চলে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ শুরু করেছেন। নয়া নয়া সেনাপতি ও সেনাবাহিনী তাঁর এ অঞ্চলের শাসনকর্তাদের অধীনে তিনি প্রেরণ করছেন। তাই, জিদ ধরে থেকে পাশেই কাউকে শত্রু বানিয়ে রাখা ঠিক নয় বোধে তিনিও নরনারায়ণের সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। উজির লোদী খানের জোরদার পরামর্শ ক্রমেই তিনি এ পদক্ষেপ নিলেন। উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপন হয়ে

বইঘর.কম ও রোকন
গেলে হযরত-ই-আলা চিলা রায়কে মুক্তি দিলেন এবং কোচ রাজ্যের রাজধানীর অবরোধ তুলে নিয়ে কালাপাহাড় সহকারে বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে এলেন।

সেনাপতি কালাপাহাড়ের বীরত্বেই কোচবাহিনীকে পরাজিত করা এবং রাজধানী কুচবিহার অবরোধ করা সম্ভবপর হয়েছিল। এই অবরোধ অপ্রতিহত রাখায় কালাপাহাড়ই ছিলেন হযরত-ই-আলার প্রধান শক্তি। কালাপাহাড়কে দূরে রাখার অবকাশই তাঁর ছিল না। সন্ধি স্থাপন হয়ে গেলে কালাপাহাড়কে সঙ্গে নিয়েই হযরত-ই-আলা তাণ্ডায় ফিরে এলেন। ওদিকে আবার কামাখ্যা, হাজো প্রভৃতি স্থানগুলি কুচবিহার থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। ষাট সত্তর ক্রোশের মতো ব্যবধান। বাঙ্গালার বাহিনী কুচবিহারের বিরুদ্ধেই আগ্রাসন ঠেকানো কল্পে যুদ্ধ যাত্রা করেছিল, এসব অঞ্চল জয় করতে যাওয়ার কোন অভিপ্রায়ই বাঙ্গালার বাহিনীর ছিল না। সুতরাং ষাট সত্তর ক্রোশ দূরে কালাপাহাড়ের ঐ সব মন্দির ভাঙতে যাওয়ার প্রশ্নই কিছু ওঠে না। কিন্তু, যেহেতু এসব অঞ্চল কুচবিহারের দিকে অর্থাৎ বাঙ্গালা মুলুকের উত্তর-পূর্বেই অবস্থিত ছিল এবং যেহেতু কামাখ্যা ও হাজোসহ ঐ অঞ্চলে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দেব মন্দির ছিল। সেইহেতু কিছু কিছু বাতিকগ্রস্ত হিন্দুরা গুজব ছড়াতে লাগলেন, কালাপাহাড় গিয়ে ঐ সমস্ত মন্দিরও চুরমার করে এসেছেন। বলাবাহুল্য, অতঃপর কালাপাহাড় কোন যুদ্ধ যাত্রা করলেই মন্দির-বিগ্রহ আর রইলো না বলে ধূয়া তোলা এদের এক মুদ্রাদোষে পরিণত হলো।

গাড়ি যখন চলে তখন ধূলোবালি সহকারে অনেক কিছুই তার পেছনে হৈ হৈ করে ছোটে। কিন্তু তাতে গাড়ির গতি আটকায় না। এমন গুজব, এমন প্রচার সকলেরই গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। ফলে এতে কেউ কর্ণপাতও করলেন না। গায়ের ধূলো ঝাড়ার মতো কালাপাহাড় সাহেবও এটা সঙ্গে সঙ্গেই ঝেড়ে ফেলে দিলেন। এনিয়ে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ন হতে গেলেন না।

লড়াই থেকে ফিরে এসেই সেনাপতি কালাপাহাড় তড়িৎ গতিতে হাতের কাজ শেষ করলেন এবং তৎপরেই তিনি শাহজাদা দাউদ খানের সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন।

শাহজাদা দাউদ খান শাহী ফটকের নিকটবর্তী মেহমান কক্ষে একা একাই বসেছিলেন। কখন কোথায় গেলে তাঁর সদ্য এই লড়াই-ফেরতা জঙ্গী চাচার সাক্ষাৎ পাবেন তিনি, মহল থেকে বেরিয়ে এসে এই মেহমান কক্ষে বসে সেই কথাই ভাবছিলেন। ইতিমধ্যে খুঁজতে খুঁজতে কালাপাহাড় সাহেব যখন সেখানে এসে হাজির হলেন, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা। কালাপাহাড় সাহেবকে দেখেই তিনি আসন থেকে লাফিয়ে উঠে তাঁর দিকে ছুটে এলেন এবং উল্লাস ভরে সালাম মোসাফেহা করতে করতে বললেন—কি তাজ্জব! কি তাজ্জব! আরে চাচা, আমি তো বসে আপনার কথাই ভাবছি; আর কোথায় গেলে পাবো আপনাকে, সেই চিন্তাই করছি।

কালাপাহাড় সাহেবও খুশি হয়ে বললেন—তাই নাকি ছোট হুজুর! আচ্ছা—আচ্ছা!

ঃ বিলকুল চাচা। আসুন—আসুন—

কালাপাহাড়কে টেনে এনে পাশের আসনে বসালেন। লড়াইয়ের খবর শাহজাদা ইতিমধ্যেই শুনেছিলেন। তবু কুশলাকুশলসহ সে সম্পর্কে মামুলি কিছু আলাপ আলোচনা মুহূর্তখানেক করলেন। এরপর তাঁর নিজের কথায় আসতেই শাহজাদা দাউদ খান আবেগ ভরে বলে উঠলেন—কোতল চাচা হুজুর, বিলকুল আমি কোতল হয়ে গেছি।

সেনাপতি কালাপাহাড় সাগ্রহে বললেন—কেয়া বাত?

ঃ মিল্ গিয়া-মিল্ গিয়া, আস্লী সোনা মিল্ গিয়া?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ পেয়ে গেছি চাচা হুজুর, পেয়ে গেছি আমি সেই অমূল্য রতন!

ঃ পেয়ে গেছেন?

ঃ একদম-একদম! ওহ! কি তাজ্জব আপনার আন্দাজ চাচা? ঐ মুরাদ খানের অন্দরেই যে এমন রত্ন পড়ে আছে, এটা আমি কস্মিনকালেও কল্পনা করতে পারি নি।

ঃ বলেন কি! তা কেমন রত্ন শুনি?

ঃ ঐ ঢাকাপরী খোলাপরী এক পরী চাচা, দুস্রা কিছু নয়। আর সে পরী ঐ খান সাহেবের নাতনীই।

কালাপাহাড় সাহেব বিপুল বিস্ময়ে বললেন-সোবহানআল্লাহ্ সেকি! ঐ খান সাহেবের নাতনীই?

ঃ জি-জি-ঐ গুনের রাণী রূপের রাণী সব ঐ একাই উনি।

ঃ শাহজাদা!

ঃ উনিই সেই আউরত, যিনি বজরা থেকে শুরু করে কদমতলা হয়ে মুরাদখানের অন্দর পর্যন্ত সর্বত্রই পুনঃপুনঃ চমকিয়ে দিচ্ছেন আমাদের।

আবেগে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সেনাপতি কালাপাহাড় ফের বললেন-কেয়াতাজ্জব-কেয়াতাজ্জব! এ যে আলেফ লায়লার কেচ্ছাকেও হার মানিয়ে দিলে?

ঃ একদম তাই চাচা।

ঃ তা ব্যাপারটা কি শুনি? শাহজাদা এত তথ্য যোগাড় করলেন কি করে?

শাহজাদা দাউদ খান এবার পূর্বপর তামাম ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। এরপর স্মিতহাস্যে বললেন-মর গিয়া চাচা, ম্যায় বিলকুল মুর্দা বন গিয়া।

তন্ময় হয়ে তামাম ঘটনা শুনার পর কালাপাহাড় সাহেব মুখ তুলে বললেন-মতলব?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ঐ একটাই–জান কবুল আর মান কবুল–

ঃ ঐ অমূল্য রতন শাহজাদার চাই-ই?

ঃ চাচা হুজুর বিজ্ঞজন!

শাহজাদা দাউদ খান হাসলেন। কালাপাহাড় সাহেবও তার সাথে হেসে আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–হুঁউ।

ঃ চাচাজান!

ঃ এই হলো মানব দীলের চিরন্তন দস্তুর! স্বাভাবিক ও শাশ্বত এক স্বীকৃতি!

ঃ চাচা!

কালাপাহাড় সাহেব উদাস হয়ে উঠলেন। উদাসকণ্ঠে বললেন– বাদশাহ নয়, ফকির নয়, ইতর নয়, ভদ্র নয়, কুলীন নয়, অস্পৃশ্য নয়, দীলের চাহিদা সবারই এক। সৃষ্টির আদিম ও অকৃত্রিম চাহিদা। সকলেই এখানে এক, সবাই এখানে সমান। ফারাক এখানে উহ্য, বৈষম্যের বেড়া এখানে মাকড়সার জালের চেয়েও কমজোর।

সেনাপতি কালাপাহাড়ের অনুভূতি আঁচ করে শাহজাদা দাউদ খান সচেতন হয়ে বললেন–একথা কেন বলছেন চাচা?

সম্বিত ফিরে এসে সেনাপতি কালাপাহাড় চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– বোধ হয় কাজটা ভাল হচ্ছে না ছোট হুজুর!

ঃ কোন কাজ?

ঃ এ ব্যাপারে ছোট হুজুরের স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ঃ কেন চাচা!

ঃ আর না হোক, ফারাকটা তো কম নয় ?

ঃ ফারাক! কিসের ফারাক চাচা? উচ্চ-নীচের ?

ঃ শাহজাদা, ইসলামে বাদশাহ ফকিরের মধ্যে কোন ফারাক নেই। সকল মানুষই সমান। হিন্দু সমাজের মতো বিয়ে-শাদির ব্যাপারে উঁচু-নিচু বা জাত-গোত্রের বালাই ইসলামে নেই। শাদি এখানে সে কারণে আদৌ নিষেধ হবে না। কিন্তু–

কালাপাহাড় সাহেব চিন্তামগ্ন হলেন। দাউদ খান বললেন–কিন্তু কি চাচা?

ঃ হেরেমের ভাবমূর্তির ব্যাপারটা একেবারেই উপেক্ষার বিষয় নয় ছোট হুজুর। নাগালের বাইরে অর্থাৎ ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে শাসকের অবস্থানটাও প্রশাসনের কাজে কম সহায়ক নয়। ইসলামে ভেদ কিছু না থাকলেও, বিভিন্ন জাতি-ধর্ম ও মানসিকতার জনগোষ্ঠীকে শাসন করার শাসনদণ্ড বস্তুটাও বড়ই ছোঁয়াচে। এর ভাবমূর্তি রক্ষার জন্যেই কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করেন। এতে করে যাকে তাঁকে হেরেমে তুলে নিতে অনেকেই ভয় পান।

ঃ এ ধরনের বোধ বা বিবেচনা ইসলাম সমর্থন করে বলে কি চাচাজানের ধারণা?

ঃ মোটেই না—মোটেই না। এসব কোন প্রশ্নই সেখানে নেই। যিনি জাগতিক সুবিধের খাতিরে বা "পাছে লোকে কিছু বলে" এ ধরনের শংকায় ভীত হন, তাঁর বেলাতেই এসব প্রশ্ন উঠে। কিন্তু যিনি কোন ভয়েই ইসলামের বিধান থেকে চুল পরিমাণ নড়তেও রাজী নন, তাঁর কাছে এসব বোধের বালাই-ই কিছু নেই। একজন ভিখারিনীকেও তিনি বেগমের মর্যাদা দিয়ে নির্দ্বিধায় হেরেমে তুলতে পারেন।

ঃ তাহলে?

ঃ তাহলে কি শাহজাদা?

ঃ এ ধরনের দুর্বলতা বাঙ্গালার হযরত-ই-আলার মধ্যে কিছু আছে বলে কি চাচাজান মনে করেন?

ঃ বড় জটিল প্রশ্ন ছোট হুজুর। আমাদের হযরত-ই-আলা একজন পাক্কা মুসলমান, ছোট হুজুরের কাছে তা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর মধ্যে এ ধরনের সংকীর্ণতা না থাকারই কথা। কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথাটাও তো ভাবতে হবে? শাসনকার্যে হযরত-ই-আলা একক বস্তু নন। অনেক তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অনন্ত তার শাখা প্রশাখা। এদিকে আবার তাঁর পরিবারের পরিধিও ছোট নয়। বিবেচনার মোড় তাঁরা কে কখন কোন দিক থেকে কোনদিকে ঘুরিয়ে দেয়, তা সঠিক করে বলি কি করে?

ঃ চাচা!

ঃ হয়তো তাঁরা বৈষম্যের প্রসঙ্গে এলেনই না? এমন এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন, যা ইসলামের বিবেচনার ধারে কাছেও গেলো না?

ঃ এটা তাঁরা করতে যাবেন কেন?

ঃ যাবেনই যে, একথা আমি বলছিনে। কিন্তু ব্যাপারটা ব্যতিক্রমধর্মী। সকলেরই এখানে কৌতুকবোধের ফাঁক আছে, এদিকে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ আছে, এজন্যেই বলছি।

ঃ চাচা!

ঃ তাছাড়া, কার কোন স্বার্থ কোথায় লুকিয়ে আছে, তাই বা কে বলতে পারে ছোট হুজুর? ঘটনাটা তো সবাইকে নাচিয়ে তোলার মতই।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করেই শাহজাদা বললেন—তা চাচাহুজুর কি এসব বাড়তি ফ্যাসাদ সামলে নিতে পারবেন না?

সেনাপতি কালাপাহাড় সঙ্গে সঙ্গে মাথা তুলে শাহজাদার মুখের দিকে তাকালেন—শাহজাদা ফের বললন—কোথাও কোন আলগা ফুটো সৃষ্টি হতে দেখলেই তা বুজিয়ে দেয়ার তকলিফটুকু আমার জঙ্গীচাচা আমার জন্যে করবেন, এটা কি আমি আশা করতে পারিনে?

বইঘর.কম ও রোকন

কিঞ্চিৎ নীরব থেকে কালাপাহাড় সাহেব স্থিরকণ্ঠে বললেন–সামলে নিতে সফলকাম হবো কিনা, জানিনে। তবে আমার ছোট হুজুর যদি একান্তই মরণপণ করে বসেন, তাহলে তার জন্যে কোন তকলিফ করতেই তাঁর জঙ্গীচাচা কুণ্ঠাবোধ করবেন না। শাহজাদার সংশয় থাকার কারণ নেই।

শাহজাদা দাউদ খান ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন–মরণপণ চাচাজান! জান মান সবই কবুল। পিছিয়ে আসার ফাঁক নেই।

ঃ তবু বোধহয় আর একটু ভেবে দেখলে হতো শাহজাদা!!

শাহজাদা থমকে গিয়ে বললেন–চাচা, আপনি এ কথা বলছেন?

ঃ শাহজাদা!

ঃ ভেবে দেখতে আপনিও তো কম করেন নি সেদিন চাচা! আপনাদের ঐ অতবড় ব্যবধান নিয়ে কম ভাবনা নিশ্চয়ই আপনি সেদিন ভাবেননি? কিন্তু ভেবে দেখে ফল কি কিছু পেয়েছিলেন? ঘুরে ফিরে আকাঙক্ষা আরো দুর্বার হওয়া ছাড়া ফল কি কিছু হয়েছিল, বলুন?

কালাপাহাড় সাহেব শাহজাদার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। পলক কয়েক একভাবে তাকিয়ে থাকার পর তিনি দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। এরপর স্মিতহাস্যে বললেন–আমি বুঝতে পেরেছি ছোট হুজুর; এ অনুরোধ আর আপনাকে করবো না।

ঃ চাচাজান।

কালাপাহাড় সাহেব এবার উৎসাহ দিয়ে বললেন–মৎ ঘাব্ড়াইয়ে শাহজাদা। আপনার কাজ শেষ। এবার কাজ আমার।

শাহজাদা খুশি হয়ে বললেন–আলহামদুলিল্লাহ! আমার চাচা হুজুরের তুলনা একমাত্র চাচা হুজুরই।

ঃ আম্মাবেগমই এখানে কাজে লাগবেন বেশি। তবে তার আগে দাওয়াতটা খাওয়ার বড়ই খাহেশ আমার।

ঃ দাওয়াত! www.boighar.com

ঃ মুরাদ খান সাহেবের মকানে আমাকে নিয়ে ছোট হুজুর আর একবার দাওয়াত খাওয়ার ইরাদা একটা রেখেছিলেন। সে ইরাদা কি বাতিল করেছেন তিনি?

ঃ আরে না-না, বাতিল করব কেন? চাচাজান কি এখনই সময় দিতে পারবেন? মানে দু' একদিনের মধ্যেই?

ঃ আলবত্ পারবো। আগে দাওয়াত-ফলার খেয়ে কোমরটা মজবুত করে নিই। এ লড়াইয়ে লড়তে হলে তাকত চাই জরুর।

সালার সাহেব হাসতে লাগলেন। শাহজাদা উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন– তাহলে এযাযত দিন চাচা, আজই গিয়ে মুরাদ খানের সাথে যোগাযোগটা করে ফেলি?

ঃ করুন–করুন। খাওয়াটাই তো আসল। আগে খাওয়া, পরে কাজ!

এ কথায় উভয়েই ফের একসাথে হেসে উঠলেন

০ ০ ০

মুরাদ খানের মকানে দুস্‌রাবার আনযাম শুরু হয়েছে। মেহমানদারীর আনযাম। মকানে হাজির না থাকায় পয়লাবার ফিরোজাবানুদের আহ্বান করা হয়নি। এবার শুধু ফিরোজাবানুই নন, মাসুম গজনবীও এসে মুরাদ খানের সহযোগিতায় লেগে গেছেন। সালার সাহেবের পয়লা হলেও, দৌলতদের মকানে খোদ শাহজাদা দাউদ খান দুসরাবার মেহমান হয়ে আসছেন। এর উপর আর কথা আছে? খুশির আধিক্যে ফিরোজাবানু এক হাতে পাঁচ হাতের কাজ করছেন আর ফাঁকে ফাঁকে দৌলতজাহানকে ধোবীর ধোলাই দিচ্ছেন।

নিরালা এক কক্ষে দুইজন একসাথে কাজ করার মওকা পেয়েই ফিরোজাবানু চড়াও হলেন দৌলতজাহানের উপর। দৌলতকে তিনি কটাক্ষ করে বললেন–দু হাত দিয়ে দুম্বা খাও, আর নিরামিষের গাওনা গাও? এবার? এবার গাওনা গেল কৈ?

না বুঝার ভাণ করে দৌলতজাহান বললেন—কিসের গাওনা ভাবী?

ফোঁস করে উঠে ফিরোজাবানু বললেন–কিসের গাওনা? এরপরও শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাও?

ঃ ভাবী!

ঃ ওহ্! ঢং কত! শাহজাদার মহাব্বতে আমিই দিউয়ানা, আমার জন্যেই শাহজাদা পঙ্খীরাজ ঘোড়া নিয়ে টগ্‌বগ্ করে আসবেন! আর উনি? উনি একদম এক ফুলে ওজন হওয়া কন্যা। উনি এসব বোঝেনও না, শাহজাদাকে নিয়ে উনার কোন মাথাব্যথাও নেই! এবার কি হলো ?

ঃ কি হলো ভাবী ?

ঃ কি হলো? শাহজাদা কি টগ্‌বগ্ করে আমার মকানে আসছেন ?

ঃ তা না হয় এখানেই আসছেন। তাতে হয়েছে কি ?

ঃ কেন আসছেন? কিসের টানে শুনি ?

ঃ মানে ?

ঃ কিসের টানে খোদ শাহজাদা এসে তোমাদের মোট বয়ে দেন? কিসের টানে শাহজাদা তর সইতে পারেন না? দুজনের দাওয়াতে কিসের টানে উনি একাই ছুটে আসেন? বলো, শাহজাদার এত আগ্রহ কি জন্যে?

বইঘর.কম ও রোকন

কপটরোষে দৌলতজাহান বললেন–তা আমি কি জানি? কি জন্যে তা উনাকে গিয়েই জিজ্ঞাসা করলে পারো ?

ঃ আর তুমি কিছুই জানো না? ফুলের তোড়াটা বুঝি হাত থেকে ফস্‌কে শাহজাদার কক্ষে গিয়ে পড়লো ?

কিঞ্চিৎ চমকে উঠে দৌলতজাহান মুখ টিপে হাসলেন এবং অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন–ভাবী।

ঃ বলো, এটাও মিথ্যা? কেবলই আমি কাব্য করছি ?

ঃ তা–মানে–

ঃ শাহজাদাকে সামনে বসিয়ে আদর করে খাওয়ানো, তাঁর ফুলবাগানে গিয়ে পাখা মেলে বেড়ানো, এ সবও কি আমার কাব্যেরই কথা? বাস্তব কিছু নয়?

দৌলতজাহান বুঝতে পারলেন, ফিরোজাবানুর জানতে আর বাকী কিছুই নেই। সবই তিনি জেনেছেন, আর সবই বুঝতে পেরেছেন। মনের কথা খুলে বলার এই ফিরোজাবানুই তাঁর একমাত্র মানুষ। সুরাহা কিছু না করতে পারলেও, আফসোস্ করে মনটা হালকা করার ক্ষেত্রেও এই ফিরোজাকেই দরকার হবে তাঁর। আর চেপে না গিয়ে তাঁর কাছে খোলাসা হওয়াই বেহতর বলে দৌলতজাহান মনে করলেন। তাই তিনি এবার মুখের হাসি চাপতে চাপতে নত মস্তকে বললেন–তা সবই মিথ্যা হবে কেন? দু একটা কথা একটু একটু সত্যি।

ঃ দু একটা কথা ? যাওনি তুমি শাহজাদার সামনে ?

ঃ একটু একটু গিয়েছি।

ঃ কথা হয়নি তার সাথে?

ঃ একটু একটু হয়েছে।

ঃ খুশি হননি শাহজাদা?

ঃ একটু একটু হয়েছেন।

ঃ শ্বাস নিঃশ্বাস ফেলেন নি?

ঃ একটু একটু ফেলেছেন।

ঃ ঝড় উঠেনি তোমার দীলে?

ঃ একটু একটু উঠেছে।

ঃ মরণ হয়নি তাতে তোমার?

আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। একবার ফিক্ করে হেসে উঠে দৌলতজাহান বললেন– তা আবার একটু একটু হয় না?

ঝংকার দিয়ে ওঠে ফিরোজাবানু বললেন– তুমি পুরোপুরিই মরেছো।

ঃ তাহলে বোধহয় তাই-ই ভাবী!

দৌলতজাহান হাসতে লাগলেন। ফিরোজাবানু ঠেশ্ দিয়ে বললেন–তাহলে বোধহয় তাই-ই? সেই ঘরেই গেলে, শুধু শুধু তেল পুড়ালে সারারাত!

ঃ মানে?

ঃ এতই খেল্ খেললে! পাত্তাই আমাকে দিতে চাও না! এবার? আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে?

ঃ ভাবী।

ঃ বাপরে তোমার দুঃসাহস। এত হুশিয়ার করে দিলাম, তবুও ঐ মগ্ডালটাই ধরতে গেলে?

দৌলতজাহান গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–গেলাম বোধহয় ঠিকই। কিন্তু যাওয়া আর ধরাতো এক কথা নয়?

ঃ কি রকম?

ঃ মগ্ডালের নাগাল পাওয়া এতটাই কি সহজ ভাবী?

ঃ তাহলে আর মরতে সেই ডালটাই ধরতে চাও কেন?

ঃ ধরার মতো একমাত্র ডাল বলে।

ফিরোজাবানু রুষ্টকণ্ঠে বললেন–দুনিয়ার এত ডাল থাকতে ঐ ডালটাই একমাত্র ধরার মতো ডাল তোমার কাছে?

ঃ এটা তো মানসিকতা আর রুচির প্রশ্ন ভাবী। ডাল থাকলেই কি সব ডাল সবাই ধরতে পারে? যে পানিতে যার রুচি, সে তো সেই পানিই পান করবে?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ সবার রুচি সমান নয়। নদীনালা পুকুর-ডোবায় অঢেল পানি থাকলেও, চাতক কখনো মেঘের বিশুদ্ধ পানি ছাড়া ডোবার পানিতে মুখ লাগাতে পারে না। চাতকের রুচি এর নিচে নামে না।

ঃ তা তুমি হঠাৎ চাতক হলে কি কারণে? উনি শাহজাদা বলে?

ঃ না ভাবী, পানিটা আসলেই বিশুদ্ধ পানি বলে। শাহজাদা ফকিরজাদা মোটেই আমার বিবেচ্য বিষয় নয়।

ঃ কিন্তু জানো তো, চাতককে সে কারণে সারা বছর তৃষ্ণায় ছটফট করতে হয়! চাইলেই সে অমনি মেঘের পানি পায় না?

ঃ জানি ভাবী। আমিও পাবো না তা জানি। তবু ঐ বিশুদ্ধ পানির আশাতেই মেঘের দিকে চেয়ে থাকবো আমি। নজর ডোবার দিকে কোনদিনই নামেনি, নামবেও না কখনো।

ঃ সর্বনাশ! মেঘ যদি আদৌ না বর্ষে?

ঃ তবুও চেয়ে থাকবো আমি। আমার কাজ আমি করবো। মেঘ করবে মেঘের কাজ। ইচ্ছে হয় বর্ষাবে, না হয় না বর্ষাবে। ও নিয়ে কাতর হতে যাবো না।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তাজ্জব! এতই যদি মরার সাধ তোমার, তাহলে আর আমরা করবো কি?

ঃ পারলে ব্যাঙ ডাকাবে।

ঃ মানে?

ঃ মেঘটা যাতে বর্ষে, পারলে সেই চেষ্টা করবে।

ঃ ওম্মা!

ফিরোজাবানু গালে হাত দিলেন। দৌলতজাহান হাসতে হাসতে কক্ষান্তরে চলে গেলেন।

শাহজাদা দাউদ খান ও সেনাপতি কালাপাহাড় মুরাদ খানের মকানে মেহমান হয়ে এলেন। এসে অবধি সালার সাহেব প্রখর দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আলাপ-ঠাট্টা গল্প-গুজব ও খানা-পিনার মাঝেও তিনি তাঁর চোখ-কান সব সময়ই খুলে রাখলেন চারদিকে। সুদক্ষ গোয়েন্দার মতো সব কিছু লক্ষ্য করে যা তিনি পেলেন, তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরা হাজির হওয়ার পর থেকেই দৌলতজাহানের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করলেন তিনি, তার তুলনা খুঁজে পেলেন না। তাঁদের সাথে বসে গল্প গুজব বা সামনে বসে আহার্যাদি পরিবেশন না করলেও, আশে পাশেই ছুটোছুটি করে বোরখাবৃতা দৌলতজাহান এমন আনন্দ ও আবেগভরে তাঁদের খানাপিনার যোগান দিতে লাগলেন, তাঁদের সমাদর, আপ্যায়ন আর যত্ন-আত্তির মধ্যে এমন প্রাণ ঢেলে নিজেকে অনুক্ষণ ব্যাপৃত করে রাখলেন– যা একমাত্র একান্ত প্রিয়জনের বেলাতেই সম্ভব। অন্তরের নিগূঢ় আবেদন ছাড়া, লৌকিকতার খাতিরে বা মেহমানদারীর গরজে এর অর্ধেকটাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সাথে শাহজাদার প্রতি দৌলতজাহানের অনুক্ষণ যে নির্বাক আত্মনিবেদন লক্ষ্য করলেন, তাতে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে, দৌলতজাহানের মনের খবর জানতে শাহজাদা ভুল করেননি তিল পরিমাণ।

এদিকে আবার মেহমানদারী করার মধ্যে যে মার্জিত রুচির পরিচয় কালাপাহাড় সাহেব পেলেন এখানে, তাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। চলনে বলনে আচার আচরণে যে শিষ্টাচার তিনি লক্ষ্য করলেন এ পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে, তা একেবারেই অনন্য। সর্বোপরি, সীমিত সরঞ্জামের পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জা, রুচিকর খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন, রন্ধন ও পরিবেশনের মধ্যে যে আভিজাত্য লক্ষ্য করলেন তিনি, তা বস্তিতে তো নয়ই আচ্ছা আচ্ছা আমির উমরাহর ঘরেও প্রায়শই দুর্লভ। একের পর এক সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে সেনাপতি কালাপাহাড় ভেবেই শুধু সারা হতে লাগলেন, নোংরা-নাদান বস্তির মাঝে অবস্থান যে মানুষগুলোর, তাঁদের মাঝে এমন রুচি সম্ভব হলো কি করে? এত আলো এমন শিক্ষা কোথায় থেকে পেলেন তাঁরা?

বইঘর.কম ও রোকন

কালাপাহাড় সাহেবের যা মস্তবড় ভয় ছিল, তা এই পরিবারটির বাস্তব অবস্থা নিয়ে। শাহজাদা চাইলেন আর অমনি তিনি এক কদর্য পরিবেশের আউরতকে শাহী হেরেমে তুলে নেয়ার সুপারিশ করতে গেলেন এটা হয় কি করে? মানুষ তাঁরা গরীব হোক, কিন্তু হেরেমের সাথে মোটামুটি খাপ খাইয়ে নেয়ার মতো আদব শিক্ষা জরুর এখানে প্রয়োজন। যদিও দৌলতজাহানের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে আর মুরাদ খানের পারিবারিক আদব-আখলাক সম্বন্ধে তিনি অনেকটা আশাবাদী ছিলেন, তবু বিস্ময়করভাবে এতটা বেশি তিনি কখনও আশা করতে পারেন নি। আজ সব দেখে শুনে তিনি একদম নিশ্চিত হলেন যে, সেরেফ হযরত-ই-আলার ঘরেই নয়, আরো অনেক উঁচু ঘরে যাওয়ারও যোগ্যতা আছে দৌলতের। www.boighar.com

উষ্ণ ও আন্তরিক পরিবেশে মেহমানদারী শেষ হলো। বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে সেনাপতি কালাপাহাড় মুরাদ খানকে আড়ালে ডেকে বললেন–খান সাহেব, যদি খুব অসুবিধে না হয়, আমি তাহলে বহিনের সাথে–মানে দৌলতজাহানের আম্মার সাথে গোপনে দুটো কথা বলতে চাই?

মুরাদ খান সাগ্রহে বললেন– মোটেই কোন অসুবিধে নেই হুজুর। এখনই আমি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মুরাদ খান গিয়ে দৌলতজাহানের আম্মা দিনারবানু বেগমকে সে কথা জানালেন। অতঃপর দিনারবানুর পরামর্শ অনুযায়ী কালাপাহাড় সাহেব বাদে মুরাদ খান আর সবাইকে ডেকে তাঁদের পারিবারিক সবজি ক্ষেত দেখাতে নিয়ে গেলেন। কক্ষে রইলেন কালাপাহাড় ও পর্দার ওপারে দিনারবানু বেগম সাহেবা। কালাপাহাড় সাহেব গলা ঝেড়ে বললেন–বহিন, আমি যে কথাটা বলতে আগ্রহী, তা বড় নাজুক কথা। কিভাবে আপনি নেবেন তা, সেইটেই শুধু ভাবছি।

দিনারবানু উৎসাহ দিয়ে বললেন–না ভাইসাহেব, সংকোচ কিছু করবেন না। যা বলতে চান মেহেরবানী করে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

ঃ আমি দৌলতজাহানের শাদির ব্যাপারে কথা বলতে চাই–

ঃ জি–জি, বলুন–

ঃ আপনারা কি শাদিটা তাঁর কোনখানে একান্তই চূড়ান্ত করে ফেলেছেন?

দিনারবানু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–তা আর কৈ পারলাম ভাই সাহেব? দৌলতের যা উম্মিদ তা কখনও পূরণ হবারও নয়, ওর শাদিও তাই দিতে বোধহয় পারলাম না আর সহজে!

ঃ তাঁর সে উম্মিদটা কি, তা কি কিছু আঁচ করতে পেরেছেন?

ঃ সেটাও আর সঠিকভাবে পারলাম কৈ? শুধু শুনি তাঁর উম্মিদ খুব বড়। যাকে তাকে কবুল করতে সে নারাজ। কিন্তু তার সেই বড় উম্মিদ কি, তা সে মুখ ফুটে বলেও না আমি তা বুঝে উঠতেও পারিনে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমি তাঁর সেই আকাঙ্খাটা আঁচ করতে পেরেছি বহিন। আপনার যদি অনুমতি পাই, তাহলে আমি গিয়ে আম্মাবেগমের কাছে মেয়ে দেখার আরজটা পেশ করতে পারি।

দিনারবানু চমকে উঠলেন এবং বিস্ময়ে বললেন-সেকি ভাই-সাহেব! এ কি বলছেন আপনি?

ঃ ঘটনাটা এই রকমই বহিন। এ নিয়ে এখন উভয় পক্ষের অভিভাবকের মধ্যে আলাপ আলোচনা হওয়া উচিত।

ঃ তা-মানে-খোদ ছোট শাহজাদাই কি–

ঃ জি বহিন। খোদ ছোট শাহজাদাই আপনার মেয়ের সেই উম্মিদ আর ছোট শাহজাদারও তাঁকে খুব পছন্দ।

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ সেরেফ পছন্দ বললেই ঠিক বলা হয় না। আপনার মেয়েকে শাদি করার জন্যে উনি যারপরনাই আগ্রহী!

ঃ তাজ্জব! কিন্তু তা কি করে হবে ভাইসাহেব? কোথায় তাঁরা আর কোথায় আমরা? এ সম্পর্ক হবে কি করে? না-না ভাইসাহেব এটা হয় না, আর হওয়াটা পছন্দও করছিনে।

ঃ তা না করলে তো উপায় নেই বহিন? ওঁদের জিন্দেগীতো বরবাদ করে দেয়া যাবে না?

ঃ ভাইসাহেব, জিন্দেগী যার যাই হোক, অনেক বিপত্তি আছে এখানে। আমি সাধ করে অশান্তি কুড়োতে চাইনে।

ঃ বহিন!

ঃ তাছাড়া, কারো কাছে হাতজোড় করায় বা জোড়হাতে থাকায় আমি অভ্যস্ত নই। কেউ আমাকে করুণা করুক, এটা আমি চাইনে। গরীব হলেও মর্যাদাপূর্ণ জিন্দেগী নিয়েই আমি আজীবন থেকেছি।

ঃ অমর্যাদার প্রশ্ন তো নেই বহিন। উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলে তাঁরা করবেন, না পারলে এ সম্পর্ক হবে না।

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ আপনি অনুমতিটা দিন, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি।

ঃ কিন্তু তাতে তো ফলটা আরো খারাপ হতে পারে ভাইসাহেব। এটা জানাজানি হওয়ার পর শাদিটা যদি না হয়, তাহলে তো মেয়েকে অন্যত্র শাদি দেয়া মুশকিল হয়ে পড়বে?

ঃ আপনার মেয়েকে আমার চেয়ে আপনিই বেশি জানেন বহিন। আল্লাহ না করুন, এ শাদি যদি বানচাল হয়ে যায়, মেয়ে যে আপনার আর কাউকে কবুল করতে চাইবেন, এ ধারণা আমার আপাতত নেই। তবু সাবধানের মার নেই। আপনার এযাযতটা পেলে

বইঘর.কম ও রোকন
গোপনেই এ নিয়ে আমি আম্মাবেগমের সাথে কথাবার্তা বলবো। একান্তই অসম্ভব মনে হলে, এ আলোচনা আমি ওখানেই বন্ধ করে দেবো। কিন্তু আলোচনাটা শুরু করার আগে আপনার এযাযত তো প্রয়োজন?

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর দিনারবানু দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন এমনটি হলে তো মেয়ের আমার একটা আশাতীত সুব্যবস্থাই হয় ভাইসাহেব। তা কথাবার্তা বলতে চান, বলুন। কিন্তু শর্ত ঐ একটি-এ ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রাখবেন জরুর। বিশেষ করে খোদ হযরত-ই-আলার সম্মতিদানের আগে এ নিয়ে আদৌ কোন হৈ চৈ হওয়া চলবে না।

ঃ সেদিকে আমার সতর্ক নজর থাকবে বহিন। পারলে আপনিও এটা গোপন রাখার–

ঃ আমাকে তা বলতে হবে না ভাইসাহেব। এই আমিই যা জানলাম, প্রয়োজনের আগে আমার মুখ থেকে দুস্‌রা আর কেউ জানবে না।

কথাবার্তা শেষ করে কালাপাহাড় সাহেবও এসে সব্‌জি ক্ষেতে হাজির হলেন। অতঃপর সবার কাছে বিদায় নিয়ে মুরাদ খানের মকান থেকে উভয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন শাহজাদা দাউদ খান বিন্দুমাত্র জানলেন না, দাওয়াত খাওয়ার অতিরিক্ত সেনাপতি কালাপাহাড়ের আর কোন কাজ ছিল মুরাদ খানের মকানে।

দাওয়াত খেয়ে ফিরে আসার পরের দিনই সেনাপতি কালাপাহাড় বাঙ্গালা মুলুকের আম্মাবেগম অর্থাৎ শাহজাদা দাউদ খানের আম্মার সাথে নিভৃতে কথা বলার মওকা করে নিলেন। আম্মা বেগম পর্দার আড়ালে তশরিফ আনলে কালাপাহাড় সাহেব তাজিমের সাথে বললেন–মহামান্য আম্মা হুজুরকে যে জন্যে আমি তকলিফ দিলাম তা হলো, ছোট হুজুর আলীজা দাউদ খান কাররানী সাহেবকে ঘরমুখো করার ইরাদায় আম্মাহুজুর আমাকে একদিন একটি সুন্দরী ও গুণবতী মেয়ে খুঁজে দেখার জন্যে নির্দেশ দান করেছিলেন। আমি সেই প্রসঙ্গে আজ কিছু বলতে চাই।

আম্মাবেগম ধীর কণ্ঠে বললেন–বলুন, কি বলতে চান?

ঃ কসুর মাফ হয়। কিছু বলার আগে আমার জানা প্রয়োজন, আম্মাহুজুরের সে ইরাদা আজও বলবৎ আছে কি না!

ঃ জরুর আছে। এখনও সে আগের মতোই বেপরোয়া আর দুরন্তই রয়ে গেছে। তার মধ্যে সংযম মোটেই আসছে না। কেউ তাকে বশে আনতে পারছে না বা তার মধ্যে ঘরের আকর্ষণ মোটেই পয়দা হচ্ছে না। যথেষ্ট সুন্দরী ও গুণবতী কোন স্ত্রী ঘরে থাকলে, আমার বিশ্বাস, একমাত্র সে-ই পারবে তাকে সংযত আর ঘরমুখী করতে।

ঃ আম্মাহুজুর–

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ সেই জন্যেই আপনাকে আমি এই কথা বলেছিলাম। আপনার সাথেই শাহজাদার সর্বাধিক মেলামেশা। তার পছন্দ ও মানসিকতা আপনারই বেশি জানার কথা বলেই, আপনাকে এ নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম।

ঃ এমন একটি মেয়ের সন্ধান পেয়োছ আমি আম্মাহুজুর।

আম্মাবেগম খুশী হয়ে বললেন–পেয়েছেন? বহুত খুব-বহুত খুব।

কালাপাহাড় সাহেব সসংকোচে বললেন– পেয়েছি তো ঠিকই তবে–

ঃ তবে?

ঃ মেয়েটি গরীব ঘরের আম্মাহুজুর।

ঃ গরীব ধনীর হদিস তো আমি আপনার কাছে চাইনি। আমি চেয়েছি উপযুক্ত আদব আখলাখ সম্পন্ন একটি সুন্দরী ও বিদূষী পাত্রী। জরুরত আমার রূপের ও গুণের। এক সাথে এই দুই বস্তুর। এমনটি পেয়েছেন কিনা তাই বলুন। ঘর আমি কি করবো?

সেনাপতি কালাপাহাড় উৎসাহ পেয়ে বললেন– পেয়েছি আম্মা হুজুর, পেয়েছি। আমার ভরসা আছে, মেয়েটি আম্মা হুজুরের চাহিদা মাফিকই হবেন।

ঃ তাহলে তো খুব ভাল কথা। কে সে মেয়ে? মকান কোথায়?

ঃ মকানটা এখানেই। এই হুকুমাতের এক নিম্নমান কর্মচারীর নাতনী।

ঃ কে তিনি?

ঃ ঐ বাহির মহলের ফুলবাগিচার রক্ষক মুরাদ খান সাহেব।

ঃ এ্যাঁ। মুরাদ খান সাহেব? মানে তার নাতনী?

ঃ জি আম্মাহুজুর।

ঃ বেশ-বেশ। উনিতো শুনেছি খুব ঈমানদার ইনসান।

ঃ সোবহান আল্লাহ। আম্মা হুজুর এ খবরও জানেন?

ঃ জানি বই কি? অন্দর থেকে বাইরের শুধু খারাপ খবরটাই রাখিনে দু'একটা ভাল খবরও রাখি। তা যাক, এখন তাহলে–

ঃ এখন মেয়েটাকে আম্মাহুজুর নিজের চোখে দেখুন একবার। এরপরে অন্য কথা।

ঃ আমি দেখবো? হযরত-ই-আলাকে রেখে?

ঃ জি আম্মাহুজুর। আমি মনে করি, এ নিয়ে এখনই হৈ চৈ করা ঠিক হবে না। একান্তই হাতের কাছে যখন, তখন ফুলবাগানে বেড়ানোর অছিলায় গিয়ে নিজেই একবার মেহেরবানী করে, মেয়েটাকে দেখে আসুন। আম্মাহুজুরের পছন্দ হলে, তখন কথাটা প্রকাশ করাই বোধহয় ভাল হবে।

একটু চিন্তা করে আম্মাবেগম বললেন,–হ্যাঁ এটাও মন্দ বলেন নি আপনি। নিজে আগে নিশ্চিত হয়ে তবেই হযরত-ই-আলাকে জানানো ভাল।

ঃ জি-জি, আমি সেই কথাই বলছি।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ বেশ। তাহলে একটু যোগাযোগটা করে দিন, আমি বেড়িয়েই আসি একদিন।

সালার সাহেব যোগাযোগ করে দিলেন। বেড়ানোর অছিলায় গিয়ে দৌলতজাহানকে দেখে এসেই আম্মাবেগম আওয়ারা হয়ে উঠলেন। এই মেয়েই তাঁর চাই। সেরেফ ঐ চোখ ঝলসানো খুব-সুরাতই নয় দৌলতজাহানের আদব আখলাকও আম্মাবেগমের মন-প্রাণ হরণ করে নিয়েছে। তিনি সানন্দে চিন্তা করে দেখলেন, রূপেগুণে এত জৌলসদার মেয়ে হেরেমে তাঁর একজনও নেই। এমন মেয়ে হেরেমে এলে শাহী হেরেম রোশনাই হয়ে যাবে।

আম্মাবেগম তর সইতে পারলেন না। মেয়ে দেখে এসেই তিনি তাঁর খসম হযরত-ই-আলার সাথে কথা বলতে ছুটলেন। কিন্তু প্রবল আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে গিয়েও আম্মাবেগম খামোশ হয়ে গেলেন। হযরত-ই-আলার মাথায় তখন আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। তিনি এন্তার হাঁক ছাড়ছেন—পাকাড়কে লাও উও নাদান জুনায়েদ কো—

o o o

হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানীরা চার ভাই। তাজ খান, সোলায়মান খান, ইমাদ খান ও ইলিয়াস খান কাররানী। তাজ খানের মৃত্যুর পরে তার পরবর্তী ভ্রাতা সোলায়মান খান কাররানী মসনদে উঠেন। বাঙ্গালার মসনদ হেফাজত করার মতো তাজ খানের তখন উপযুক্ত সন্তানাদি ছিল না। ফলে, তাজ খানের মৃত্যুর পর তাঁর জেহাদের সঙ্গী এবং পরবর্তী ভ্রাতাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিচক্ষণ ভ্রাতা সোলায়মান খান কাররানী মসনদে বসেন। সোলায়মান খান কাররানীর শুধু পুত্র সন্তানই নেই, দু দুটি রণবিদ ও তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন পুত্র সন্তান আছেন। সোলায়মান খান কাররানীর অপরাপর দুই ভাই রাজ্য চালনার উপযুক্তও ছিলেন না, বা সে আকাঙ্খাও তাঁদের কারো ছিল না। তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'জনের একজন তাঁর জামাতা ও ইলিয়াস খানের পুত্র হাসনু বা হাঁসু খান ও অপরজন ইমাদ খানের পুত্র জুনায়েদ খান। যোগ্যতার বিচারে হাঁসু খান কোন দিক দিয়েই উপযুক্ত ছিলেন না, জুনায়েদ খান দুর্ধর্ষ লড়াইয়া হলেও, শাহজাদাদ্বয়ের বড় একটা অধিক কিছু ছিলেন না। সুতরাং মসনদের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে এঁদের মনে কোন প্রকার আকাঙ্খাও ছিল না এবং বায়াজিদ খান আর দাউদ খানের মতো সুযোগ্য ও বিচক্ষণ শাহজাদাদের বিদ্যমানে এ ধরনের কোন চিন্তাও তাঁরা কেউ কখনো করেন নি।

কিন্তু কথায় বলে, "যার বিয়ে তার খবর নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।" স্বার্থান্ধ গাদ্দার ও মতলববাজ ধুরন্ধরেরা এই নিয়ে অবিরাম অংক কষতে লাগলেন এবং এই চিন্তায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে লাগলেন। এই গাদ্দারদের নেতা ছিলেন, লোহানী গোত্রের আফগান নেতা কতলু খান লোহানী আর এঁদের ব্যবহারকারী ছিলেন শাহী

বইঘর.কম ও রোকন
কর্মচারী ও সভাসদ রায় ভ্রাতৃদ্বয়, বিশেষ করে শ্রীহরি রায়। কতলু খান চান, প্রধান উজিরের পদ। শ্রীহরিরা চান, এই গাদ্দারদের কাঁধে ঠ্যাং রেখে পদোন্নতির সাথে দুই হাতে অর্থনৈতিক ফায়দা লুটার মওকা যাতে করে ভবিষ্যতে তাঁরা সেই অর্থে নিজেরাই রাজা বাদশা হতে পারেন। সালার গুজার খানের তেমন কোন চরম লক্ষ্য না থাকলেও, পদোন্নতির আশায় "হুঁ-ধরা" সঙ্গী হিসাবে তিনিও এদের দলভুক্ত হয়ে আছেন।

গুজার খানের চেয়ে কতলু খান লোহানীই রায় বাবুদের অধিক শরণাগত ও অধিকতর কবজাগত লোক। কতলু খান প্রধান উজির হলে আর সেই সাথে অযোগ্য কেউ মসনদে আসীন থাকলে, রায়বাবুদের পোয়া বারো। রায় বাবু বা রায় সাহেবদের উম্মিদটা তাহলে নিশ্চিতভাবে পূরণ হয়। গভীর পানির মাছ তাঁরা। ধরা পড়তে রাজী নন। তাই, পর্দার আড়ালে বসে সুকৌশলে তাঁরা মেড়ার কান মুচড়ে দিতে লাগলেন।

শ্রীহরি রায় একদিন কতলু খানকে টুক করে কর্ণ মন্ত্র দিলেন, প্রধান উজিরের পদটা যে কতলু খান জিন্দেগীতেও পাচ্ছেন না, এটা ক্রমেই নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। অতএব, সময় থাকতে কতলু খানের মগজ খরচ করা উচিত।

কর্ণমন্ত্র লাভ করার পর থেকেই কতলু খানের মাথা-মগজ বনবন করে ঘুরতে লাগলো। সঙ্গী-সাথী আর পাঁচটা গাদ্দারদের সাথে নিয়ে হরদম তিনি বৈঠক করতে লাগলেন এবং কর্ণমন্ত্রের তাৎপর্য সহকারে প্রধান উজিরের পদ পাওয়ার ফন্দি-ফিকির খুঁজতে লাগলেন। অবিরাম মাথাকুটে কুলকিনারা না পেয়ে কতলু খান পুনরায় গুরুর চরণ স্মরণ করলেন।

মন্ত্রণার উত্তম স্থান শিপ্রাদেবীর গানের আসর। চিত্ত বিনোদনের অজুহাতে গানের আসরে এসে চক্রান্ত পাকানো ঢের ঢের নিরাপদ। এই আসরেই এসে কতলু খান ফের শরিক হলেন। বিশেষ এই আসরে শিপ্রাদেবী গান ধরলেন–"সামাল সামাল তেরি হিজাব নেকাব–"। নির্বাচিত শ্রোতৃমণ্ডলী গান শোনার ফাঁকে ফাঁকে মন্ত্রণা আঁটতে লাগলেন।

শুরুতেই কতলু খান শ্রীহরিকে বললেন–রায় সাহেবের কথাটার তাৎপর্য মাথায় আমার ঢুকছে না। কিসে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, প্রধান উজিরের পদ আমি জিন্দেগীতেও পাচ্ছিনে?

শ্রীহরি রায় মুচকি হেসে বললেন–এটা তো দুর্বোধ্য কিছু নয়? পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ দেখছেন না, যা কিছু করার এখনও ঐ একমাত্র লোদী খানকে নিয়েই হযরত-ই-আলা করছেন? অন্য কথা থাক, নিশ্চিত বিজয়ের মুখে কুচবিহারের রাজার সাথে ঐ বেরাদরি সন্ধিটাও কার পরামর্শে হযরত-ই-আলা করলেন? আপনাদের কারো কি কোন পরামর্শ চেয়েছেন, না নিয়েছেন তিনি? ঐ লোদী খানই একমাত্র বিশ্বস্ত লোক তাঁর। উনি কি তাঁকে ছাড়তে পারেন জিন্দেগীতে?

বইঘর.কম ও রোকন

কতলু খান মলিন মুখে বললেন–হ্যাঁ, এসব তো সবই লক্ষ্য করছি। বুঝতেও পারছি হযরত-ই-আলার আমলে আশা আর তেমন নেই। কিন্তু–

ঃ হযরত-ই-আলার পরেও আর আশা কিছুই নেই। এটাও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ঃ কি রকম?

ঃ লোদী খানের প্রতি শাহজাদা দুজনই চরমভাবে ঝুঁকে গেছেন। সম্পর্ক তাঁদের ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। হযরত-ই-আলার পরে যে শাহজাদারাই বাঙ্গালার তখতে আসছেন, এটা তো নিশ্চিত? না সন্দেহ আছে আপনার?

ঃ না, তারা ছাড়া আর কে আসবেন?

ঃ যেমনই তাঁরা বিচক্ষণ তেমনই তাঁরা পিতৃভক্ত। নিজেদের আর পিতার এই বিশ্বস্তজন রেখে প্রধান উজিরের পদে তাঁরা আপনাকে বহাল করবেন, এমন ধারণা একটা পাগ্‌লেও রাখে না।

ঃ রায় সাহেব!

ঃ তদুপরি, আপনিও নিজে আঁচ করেছেন, আপনার বিশ্বস্ততার প্রতি এখনই তাঁরা আস্থাহীন। পরে আর কথা আছে?

কতলু খান লোহানী গোড়াকাটা লতার মতো নুয়ে পড়লেন। শিপ্রাদেবী সরবে গাইতে লাগলেন–"সামাল–সামাল তেরি হিজাব নেকাব–"

কতলু খানের হালত্ দেখে শ্রীহরি রায় উৎসাহ দিয়ে বললেন– আহা, তাই বলে এত ঘাবড়ানোর কি আছে? মগজ খরচ করুন। যত বেড়া তত ফাঁক।

আশান্বিত হয়ে উঠে কতলু খান বললেন–ফাঁক!

ঃ হ্যাঁ ফাঁক। মসনদে যদি শাহজাদারা না আসতে পারেন, তাহলে তো বেড়া-বাঁধা তামামই সাফ।

ঃ তারমানে–তাঁরা না এলে কে আসবেন?

ঃ কেন, হযরত-ই-আলার ভ্রাতুষ্পুত্ররা? তাজ খানের পর তাঁর ভাই সোলায়মান খান এলেন। এরপর তো মসনদের হকদার তাজ খানের অন্যান্য ভায়েরা ? তাজ খানের মসনদে আসার পেছনে তাঁদেরও কম অবদান নেই? শাহজাদাদের দাবি এখানে গৌণ।

ঃ কিন্তু তাজ খানের ভায়েরা তো–

ঃ আহ্‌হা, তাঁদের জায়গায় তাঁদের ছেলেরা আসবেন। বাপের স্বত্ব ছেলেরা ভোগ করবেন?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমি হাঁসু খান আর জুনায়েদ খানের কথা বলছি। মসনদে বসার উভয়েই তাঁরা যোগ্য আর মসনদের তাঁরাই ন্যায্য দাবিদার?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কিন্তু তাঁরা তো কেউ তেমন বিচক্ষণ নন ?

ঃ এই তো আপনার গোড়ায় গলদ। অধিক বিচক্ষণ হলে কোন আশা আছে আপনার, না শান্তি আছে আমাদের? যত কম বিচক্ষণ হয় ততই তো সুবিধে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা ঠিক-তা ঠিক।

ঃ যাতে করে তাঁরা কেউ মসনদে আসেন, সেই চিন্তা করুন। তাঁরা কেউ মসনদে এলে, আর আপনার মদদে এলে, আপনিই তখন প্রধান উজির।

ঃ অবশ্যই-অবশ্যই। কিন্তু-

ঃ কিন্তু কি আবার ?

ঃ না, বলছি-মসনদটা ফাঁকা হলে তো এসব প্রসঙ্গ আসে। তার আগে-

পুনরায় মুচকি হাসলেন শ্রীহরি রায়। তির্যক নজরে চেয়ে তিনি বললেন- ফাঁকা নেই তো কি হয়েছে? ফাঁকা করে নিতেই বা কতক্ষণ ? মসনদের উপযুক্ত দাবিদার তৈরি হয়ে গেলে সময় সুযোগ মতো তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আপনারা মোটামুটি লোক দেখানো তাঁর পেছনে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেই তো মসনদটা ফাঁকাও হয় আবার তা পূরণও হয় !

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কতলু খান বললেন- রায় সাহেব !

শ্রীহরি রায় ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন-কাঁটার ভয়ে ভীত হলে তো ফুল তুলতে পারবেন না। মকসুদ হাসিল করতে হলে, ঝুঁকি কিছুটা নিতেই হয়।

কতলু খান তবুও সংশয়ের সাথে বললেন-কিন্তু-

ঃ বুদ্ধি থাকলে ঝুঁকিটা আবার নিজেকেও তেমন নিতে হয় না। ঝুঁকিটা উৎসাহী দাবিদারের কাঁধেও গড়িয়ে দেয়া যায়।

ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু তেমন উৎসাহী দাবিদার কই?

ঃ কেন, ঐ হাঁসু খান বা জুনায়েদ খান ?

ঃ কি করে ? মসনদের খাহেশ তো তাঁদের দুজনের একজনের মধ্যেও দেখিনে। তাঁরাই যদি আগ্রহী না হয়-

ঃ আগ্রহী না হলে আগ্রহ তাঁদের মধ্যে পয়দা করতে হবে। নিজের হক সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করতে হবে। কোন মতে তাঁদের কব্জা করে নিয়ে সঠিকভাবে মগজ ধোলাই করে দেখুন, মসনদের লোভে তাঁরাই লাফিয়ে এগিয়ে যাবেন। ঝুঁকি-ঝাপটা তাঁরাই তখন ঘাড়ে তুলে নেবেন, আপনাকে হয়তো কিছুই করতে হবে না। কাজটা শুধু, তাঁদের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে মগজটা ধোলাই করা।

ঃ হ্যাঁ, এ কথাও ঠিক। কিন্তু আসলেই কি তাঁদের হাতের মধ্যে আনা সম্ভব?

ঃ আলবত সম্ভব! সব কিছুতেই এত কিন্তু কিন্তু করলে কেন চলবে? প্রাথমিক কাজটা আমরাই করে দেবো, বাদবাকিটা আপনি করবেন!

বইঘর.কম ও রোকন

কতলু খান এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি উৎসাহভরে আওয়াজ দিলেন–রায় সাহেব !

ঃ হাঁসু খানের চেয়ে জুনায়েদ খানই অধিক কার্যকরী হবেন। তিনি যোদ্ধা ও সাহসী। সে তুলনায় বুদ্ধি কম। রাজী করাতে পারলে, ঝড়-ঝাপটা নিজেই তিনি সামলে নিতে এগিয়ে যাবেন আর শক্তির দিকটাও সামলে নিতে পারবেন। তাই আমি মনে করি, আগে জুনায়েদ খানের পেছনেই চেষ্টা করে দেখা হোক। ব্যর্থ হলে হাঁসু খান তো রইলেনই। তখন তাঁর কথা চিন্তা করা যাবে।

ঃ ঠিক-ঠিক, ঠিক বলেছেন।

ঃ এদিকে আবার জুনায়েদ খান অনেকখানি এগিয়েও আছেন এপথে। আমাদের শিপ্রার গানের নামে জুনায়েদ খান পাগল। চান তো শিপ্রাকেই আরো বেশি ভিড়িয়ে দেই তাঁর পেছনে। শিপ্রার দিকে যেভাবে উনি ঝুঁকে পড়েছেন, তাতে আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করলে শিপ্রাই তাঁকে কায়দা করে গেঁথে এনে দিতে পারবে। এর পরেরটুকু আপনি বা আপনারা করবেন। নাকি এটুকুও পারবে না?

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে কতলু খান বললেন– আলবত পারবো– আলবত পারবো। একটু নাগাল ধরতে পারলেই সবকিছু আমিই করতে পারবো।

ঃ আমাদের আর কি বলুন? শুধু বন্ধুত্বের খাতিরেই– www.boighar.com

ঃ বলতে হবে না–বলতে হবে না। মেহেরবানি করে এ কাজটা করে দিন, আমি আপনাদের কাছে চির ঋণী হয়ে থাকবো। শিপ্রাদেবীর মারফত তাঁকে একটু দলে ভিড়িয়ে দিন।

শ্রীহরি রায় এবার আখের ছেন্দে বললেন–এর জন্যে হয়তো অনেকখানি মূল্য আমাদের দিতে হবে লোহানী সাহেব! সুদিনে যদি–

কতলু খান ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন–তওবা-তওবা! এমন সংশয় কখনো দীলে রাখবেন না। আমি আপনাদের চিরকাল গোলাম হয়ে থাকবো, এ ওয়াদা আপনাদের আমি ঢালাওভাবে দিচ্ছি। আপনারা মেহেরবানি করে জুনায়েদ খানকে ঘায়েল করে দিন আগে!

o o o

মতলববাজদের মতলব হাসিল না হলেও জুনায়েদ খান কাররানী সত্যি সত্যিই ঘায়েল হয়ে গেলেন আর সে ঘটনা হযরত-ই-আলা অবহিত হওয়ামাত্রই এন্তার হাঁক ছাড়তে লাগলেন–পাকাড়কে লাও উও নাদান জুনায়েদ কো–

মাতুলদের তাড়নায় শিপ্রাদেবী এবার জুনায়েদ খানের পেছনে জান প্রাণ সঁপে দিলেন। আদরে, আত্তিতে, আহ্লাদে, উষ্ণতায়, শিপ্রাদেবী সর্বক্ষণ জুনায়েদ খানের পেছনে নিবেদিতা হয়ে রইলেন। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও জুনায়েদ খানের তরফ থেকে

বইঘর.কম্ ও রোকন
তেমন কোন আশাব্যঞ্জক সাড়া তিনি পেলেন না। কণ্ঠের গান শেষ হলেই, তাঁর সাথে জুনায়েদ খানের সম্পর্কও পূর্বাপর একইভাবে শেষ হয়ে যেতে লাগল। গানের আকর্ষণ ছাড়া জুনায়েদ খানের মধ্যে শিপ্রার প্রতি আলাদা কোন টান-আকর্ষণ আদৌ পয়দা হল না। আসর-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জুনায়েদ খানকে বারকয়েক রায় সাহেবদের সাহচর্যেও এনে দিলেন বটে, কিন্তু তা যেমনই সৌজন্যমূলক, তেমনই অন্তঃসারহীন। রায় সাহেবেরা তাঁর সাথে কোন অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলতে পারলেন না। দিন যত অতিবাহিত হতে লাগলো, রায় সাহেবদের দল ততই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন এবং ব্যর্থতার কারণে শিপ্রাদেবীর প্রতি তাঁর মাতুলেরা ততই কঠোর হয়ে উঠতে লাগলেন।

দেখে শুনে শিপ্রাদেবী মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, জুনায়েদ খানকে নিজে আগে পুরোপুরি গ্রাস করতে না পারলে, তাঁকে অন্যের গ্রাসে তুলে দেয়া সম্ভব নয়। শিপ্রাদেবীর এখানে একটা ক্ষীণ আশাও রইলো যে, তাঁর মাতুলদের চক্রান্তে জুনায়েদ খান যদি সত্যি সত্যিই তখতের নাগাল পান, তাহলে তাঁর পাশে বসার মওকাও একটা শিপ্রাদেবীর থাকা সম্ভব সেখানে।

এই সমস্ত চিন্তাভাবনা স্থির করে নিয়ে শিপ্রাদেবী এবার তাঁর যৌবনকেই একমাত্র মূলধন বানালেন এবং গানের সুরের তালে তালে বেখেয়ালের ভাণ করে তিনি তাঁর প্রমত্ত রূপরাশি জুনায়েদ খানের চোখের সামনে একেবারেই উন্মুক্ত করে দিতে লাগলেন।

এখানেও সাড়াটা তেমন কিছু আশাব্যঞ্জক না হলেও, সলজ্জ হাসি মুখে জুনায়েদ খানকে পুনঃ পুনঃ নজর নামিয়ে নিতে দেখে শিপ্রাদেবী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, জুনায়েদ খানের মতো মানুষের তরফ থেকে এর চেয়ে অতিরিক্ত উদ্যোগ কিছু আশা করা যায় না। এই সুযোগে তাঁর নিজের উদ্যোগ গ্রহন করাই এখন উত্তম পদক্ষেপ। চরম একটা লজ্জা আর নাজুক অবস্থার সাথে তাঁকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে, এ কলাই সিদ্ধ হবার নয়।

মতলব এঁটে নিয়ে গানের আসরের অজুহাতে শিপ্রাদেবী জুনায়েদ খানকে এক আনন্দভবনে ডেকে নিলেন। সরল মনে জুনায়েদ খান সে ভবনে ঢুকে দেখলেন, অপরূপ সাজে সজ্জিতা শিপ্রাদেবী একাই তাঁর জন্যে এন্তেজারে আছেন। জুনায়েদ খান ইতস্তত করতে লাগলেন। "আসুন–আসুন, এক্ষুণি আর সবাই এসে পড়বেন–" বলে ভাঁওতা দিয়ে শিপ্রাদেবী জুনায়েদ খানকে হাত ধরে টেনে এক কক্ষের মধ্যে নিয়ে এলেন এবং তাঁকে পাশে বসিয়ে গান জুড়ে দিলেন। নির্জন কক্ষ। আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। হতভম্ব জুনায়েদ খান আনমনে গান শুনতে লাগলেন, শিপ্রাদেবী আনমনাভাবে দেহের আবরণ ঢিলে করে দিতে লাগলেন। এইভাবে শিপ্রাদেবী অর্ধোলঙ্গ হয়ে এলেন। অতিষ্ঠ জুনায়েদ খান উঠে পড়ার উদ্যোগ করতেই–"লজ্জা কি-লজ্জা কি" বলে শিপ্রাদেবী লাফিয়ে উঠে জুনায়েদ খানের কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ইশকের আকর্ষণে জুনায়েদ খানকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

এতক্ষণে জুনায়েদ খান ঘটনাটি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলেন এবং উপলব্ধি করতে পেরেই শিপ্রাদেবীর বাহুবন্ধন মুক্ত করতে লাগলেন। সবলে বাহুবন্ধন আরো অধিক শক্ত করে তৃষ্ণার্ত হরিণীর মতো শিপ্রাদেবী আকুল কণ্ঠে কেবলই আবেদন ও আর্তি জানাতে লাগলেন।

শিপ্রার এই অশ্লীল আবেদনে জুনায়েদ খানের মাথায় আগুন ধরে গেল। শিল্পী শিপ্রার প্রতি তাঁর সঞ্চিত শ্রদ্ধাভক্তি তামামই উবে গেল। বিষাক্ত নাগিনী বোধে জুনায়েদ খান সজোরে লাথি মেরে শিপ্রাকে মেঝের উপর ছুড়ে দিলেন এবং সীমাহীন ঘৃণা ও উত্তেজনা নিয়ে তিনি কক্ষ থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন।

অপমান ও উপেক্ষার গ্লানিতে ফুঁসে উঠলেন শিপ্রাদেবী। প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে তিনি তৎক্ষণাৎ ভিন্ন মূর্তি ধারণ করলেন। পরণের শাড়ি-জামা টেনে ছিঁড়ে বিবস্ত্রা হয়ে জুনায়েদ খান কাররানী তাঁকে বেহুরমতি করেছে, ফুস্‌লিয়ে এনে সবলে তাঁর ইজ্জত লুটে নিয়েছে বলে তিনি তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলেন এবং চিৎকারে ও আর্তনাদে লোক জুটিয়ে ফেললেন।

খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন রায় ভ্রাতৃদ্বয়। এই এক শুঁয়েমীর জন্যে জুনায়েদ খানকে শায়েস্তা করতে তাঁরাও বদ্ধপরিকর হলেন। বিবস্ত্রা ও বিধ্বস্তা শিপ্রাদেবীকে নিয়ে তাঁরা হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানীর সামনে হাজির হলেন এবং এই জঘন্য জুলুমের বিচার প্রার্থনা করলেন। ঘটনা শুনে হযরত-ই-আলার মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষী প্রমাণ তলব করলেন। শিপ্রাদেবী ও জুনায়েদ খানকে আনন্দভবনে যেতে যারা দেখেছিলেন এবং ব্যস্ত ও অবিন্যস্তভাবে আনন্দভবন থেকে জুনায়েদ খানকে যারা বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন, তাঁরা সাক্ষ্য দিলেন। ঘটনাস্থলে চিৎকার শুনে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ জুটেছিলেন, তাঁরা তাদের দেখা ঘটনা বললেন। শিপ্রাকে ফুস্‌লিয়ে আনন্দভবনে আনার ব্যাপারে রায় সাহেবদের তৈরি করা সাক্ষীরাও নিখুঁতভাবে ঘটনাটি তুলে ধরলেন। শিপ্রাদেবীর হালত দেখে শিপ্রাদেবীর বর্ণনা ও ক্রন্দন শুনে এবং সর্বোপরি সন্দেহাতীত ঐ সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ায় হযরত-ই-আলা ঘটনাটিকে সত্য বলে মনে করলেন। তবু আসামীকে সুযোগ দেয়ার জন্যে তিনি জুনায়েদ খানকে বিচারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু এই নিরতিশয় লজ্জার সম্মুখীন হওয়ার মতো রুচি জুনায়েদ খানের ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার তিনি হয়েছিলেন, তাতে শিপ্রাদেবীর শ্লীলতাহানি তিনি করেননি, এর প্রমাণ একমাত্র উপরওয়ালা ছাড়া তাঁর পক্ষে আর দুস্‌রা কোন সাক্ষী নেই। ঐ পরিবেশ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শিপ্রা যেখানে নিজেই এ অভিযোগ এনেছেন, সেখানে তাঁর আর এ অভিযোগ খণ্ডন করার উপায় নেই।

একাজ তিনি করেন নি, একথা আসামী কেবল নিজে বললে, বিচারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। শিপ্রাদেবীর সাথে তাঁর ঐ নির্জন ঘরে উপস্থিতিই শিপ্রার অভিযোগ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং অনর্থক হাজির হয়ে পাকড়াও হতে যাওয়া আর এই নিদারুণ লজ্জার সম্মুখীন হওয়া তিনি সমীচীন বোধ করলেন না।

জুনায়েদ খানের অনুপস্থিতি ঘটনার সত্যতা আরো প্রকট করে তুললো। অপরাধ সম্বন্ধে হযরত-ই-আলা একেবারেই নিঃসন্দেহ হয়ে হুঁংকার ছেড়ে বললেন–পাকাড়কে লাও উও নাদান জুনায়েদ কো–।

অতঃপর জেনা করার শাস্তি স্বরূপ জুনায়েদ খানের অর্ধেক দেহ মৃত্তিকার মধ্যে পুঁতে পাথর মারার আদেশ দিয়ে হযরত-ই-আলা টলতে টলতে বিচারকক্ষ ত্যাগ করলেন।

শাহজাদা দাউদখানের হুঁশিয়ারীর কথা স্মরণ করে জুনায়েদ খানের এখন আফসোসের সীমা-পরিসীমা রইলো না। বাঙ্গালা মুলুকে থাকলে ধরা পড়তেই হবে এবং ধরা পড়লে মৃত্যু নির্ঘাত জেনে, জুনায়েদ খান তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালামুলুক ত্যাগ করলেন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি সরাসরি দিল্লীতে এসে আকবর শাহর আশ্রয় নিলেন। জুনায়েদ খানের রণনৈপুণ্যের কথা আকবর শাহ জানতেন। বাঙ্গালার এমন একটি শক্তিকে নিজের পক্ষে পেয়ে আকবর শাহ অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং আগ্রা ও জয়পুরের মধ্যবর্তী হিন্দাউন নামক স্থানে তাঁকে জায়গীর প্রদান করলেন।

আট

জুনায়েদ খানের দুষ্কর্মের জন্যে হযরত-ই-আলা কয়েকদিন বিমর্ষ হয়ে রইলেন। তাঁর পরিবারভুক্ত ব্যক্তির এহেন আচরণে হযরত-ই-আলার আত্মসম্মানে মস্তবড় ঘা লাগলো। কয়েকদিন তিনি সবার সামনে সহজ হতে পারলেন না। এর উপর যখন আবার শুনলেন, জুনায়েদ খান গিয়ে আকবর শাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আকবর শাহর সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন, তখন তিনি আরো অধিক অস্থির হয়ে উঠলেন। মর্মদাহে অনুক্ষণ দগ্ধ হতে লাগলেন।

হযরত-ই-আলার প্রতিকূল এই মানসিক অবস্থা দেখে, চরম আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আম্মাবেগম খামোশ হয়ে রইলেন। বলি বলি করেও দৌলতজাহানদের ব্যাপার নিয়ে হযরত-ই-আলার সাথে তিনি কথা বলার সাহস পেলেন না। অধীর আগ্রহ নিয়ে হযরত-ই-আলার মেজাজমর্জি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শাহজাদা দাউদ খান ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। আর চুপ থাকতে না পেরে একদিন তিনি সেনাপতি কালাপাহাড়কে রসিকতা করে বললেন– কি চাচা, এরই নাম বুঝি 'বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো?' এত উৎসাহ-উদ্দীপনা তামামই ফুস্ ?

বুঝতে পেরেও কালাপাহাড় সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন–কিসের উৎসাহ ছোট হুজুর?

ঃ আমি কি অতঃপর আসমানের তারাগুলোই গুণতে থাকবো? দাওয়াত-টাওয়াত খেয়ে চাচাজান এই যে এত কোমর-মাজা শক্ত করে নিলেন, তা কি কেবল 'ফি-ছাবিলিল্লাহ' বলে আমাকে আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়ার জন্যে? প্রস্তাবটা আজ পর্যন্ত তুলতেই পারলেন না?

ঃ প্রস্তাব !

ঃ তাজ্জব ! আকাশ থেকে পড়লেন ? ঠিক আছে। আমিই গিয়ে এখন তাহলে হযরত-ই-আলাকে বলি আব্বাজান আমি কোতল হয়ে গেছি, শিগগির শিগগির মুরাদ খানের নাতনীটাকে আমার ঘরে এনে দিন, নইলে আপনি পুত্রহারা হবেন !

সেনাপতি কালাপাহাড় সশব্দে হেসে বললেন–তা বললে উনি পুত্রহারা ঠিকই হবেন। এমন পুত্র জিন্দা তাঁর এক লহমাও থাকবে না।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ মানে ?

হযরত-ই-আলা কুপিয়েই তাঁকে হত্যা করবেন। এক আউরতের ঘরে গিয়ে তাঁর ভাতিজা জুনায়েদ খান সাহেব এমনিতেই হযরত-ই-আলাকে আনন্দে টগ্‌বগে করে রেখেছেন! এই মুহূর্তে তাঁর নিজ পুত্র ফের আর এক আউরতকে ঘরে আনার বায়না ধরলে, সোহাগ তাঁর এতই উথলে উঠবে যে, তা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। সোহাগের আধিক্যে তৎক্ষণাৎ তিনি তলোয়ার মেরে বেমালুম পুত্রহারা হয়ে যাবেন।

ঃ চাচা !

ঃ ইন্নাল্লাহা মা-আস্‌-সোয়াবেরীন। আল্লাহ তায়ালা সবুরকারীদের পক্ষে থাকেন। ব্যস্ত হওয়ার সময় এটা নয় শাহজাদা ? বাতাস বড়ই গরম।

ঃ জি ?

ঃ কাজ ঠিকই এগুচ্ছিলো। কিন্তু জুনায়েদ খান সাহেব এর মধ্যে ঐ খামখেয়ালীটা করে বসেই তামাম কিছু গোলমাল করে দিলেন। বুঝতেই তো পারছেন, হযরত-ই-আলার মনের অবস্থা কেমন এখন ?

শাহজাদা থেমে গেলেন পরিস্থিতি আঁচ করে বললেন–তা অবশ্য ঠিক চাচা! তবে–

ঃ এর মধ্যে তবে নেই। স্বাভাবিক ব্যাপার হলে বাধা কিছু ছিল না। কিন্তু জুনায়েদ খান সাহেবদের মতো অতটা না হলেও, এটাও তো কিছুটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। নিতান্তই এক নগণ্য ঘরের আউরতের প্রতি শাহজাদার এই দুর্বলতার কথাটাও তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ইঙ্গিতই বহন করে। এই মুহূর্তে প্রস্তাব হযরত-ই-আলা কিভাবে গ্রহণ করবেন, সে দিকটা ভেবে দেখতে হবে না?

শাহজাদা সমঝে গেলেন। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন–ঠিক চাচা। এই মুহূর্তে আমার সম্বন্ধেও তাঁর খারাপ ধারণা হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়। তাহলে অপেক্ষাই করুন কিছুদিন।

ঃ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন?

ঃ বিলকুল চাচা। এখন দেখছি, ঐ জুনায়েদ খান ভাই সাহেবই সব মাটি করে দিলেন। এত করে বারণ করলাম, তবু কিছুই তিনি শুনলেন না। এখন নিজেও উনি মরলেন, আমার পথেও কাঁটা ছড়িয়ে গেলেন

ঃ জি-জি, বাতাসটা উনিই গরম করে দিয়েছেন।

ঃ আহাম্মক কাঁহাকার। পিঠে খেলেন, পিঠের ফোঁড় গুণে দেখলেন না

ঃ তা যা বলেছেন! কিন্তু ঘটনাটার সত্যতা সম্বন্ধে আমার এখনও সন্দেহ আছে শাহজাদা।

ঃ সন্দেহ?

ঃ জি, সন্দেহ বৈকি? এতটা হীন রুচির লোক বলে তাঁকে আমার কখনও মনে হয়নি।

ঃ সন্দেহ নয় চাচা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঘটনাটা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁকে ঐ জালে জড়িয়ে পড়তে দেখেই আমার এই সন্দেহ হয়েছিল যে, তেলে-পানিতে এক হবে না, নিশ্চয়ই উনি ফেঁসে যাবেন। গেলেনও ঠিক তাই।

ঃ তাজ্জব! শিপ্রাদেবী এইভাবে ডুবিয়েই দিলেন তাঁকে?

জবাব দিতে গিয়ে শাহজাদা এবার হেসে ফেললেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন–তাজ্জব হচ্ছেন কেন চাচা? শিপ্রাদেবীর প্রাণ বাঁচানোর পর যে প্রাণ শিপ্রাদেবী নিঃশর্তভাবে আপনাকেই দিয়ে রেখেছেন, সেই প্রাণের দিকে অন্য কেউ হাত বাড়ালে তাকে তো তিনি ডোবাবেনই?

ঃ শাহজাদা!

ঃ আপনার প্রতি তাঁর মুহাব্বতে ভাটা কোনদিন পড়বে না, এটা আপনারই কথা। দশের সাথে পাল্লা দিয়ে তাঁর মুহাব্বত-হাসিল করার আপনার বিপুল খাহেশ! আপনি তো জিতেই গেছেন চাচা। পাল্লাতে আপনি জয়ী। যান, আর পাল্লা দিতে হবে না। ময়দান প্রায় ফাঁকা। এবার ফাঁকা ময়দানে গিয়ে আপনার জন্যে তাঁর ধরে রাখা মুহাব্বতটা বিনা তকলিফে হাসিল করে আসুন–

কালাপাহাড় সাহেবও এবার সশব্দে হেসে উঠে বললেন–সালাম ছোট হুজুর, শিপ্রাদেবীর মুহাব্বতে আমার লাখো সালাম!

o o o

শাহজাদা দাউদ খান ধৈর্যধারণ করলেন এবং ধৈর্যের সাথে কাল কাটাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দৌলতের অদৃশ্য পরশ তাঁকে উতলা করে তুললেও এবং ক্ষণিকের তরে দীল তাঁর কাব্যকাতর হলেও, এ নিয়ে তিনি অতিশয় অস্থির হতে গেলেন না। আত্মসম্বরণ করে নিয়ে এন্তেজারে রইলেন এবং পরিস্থিতির পাওনা মেটাতে লাগলেন।

দৌলতজাহানের ফুলের তোড়া মাঝে মাঝেই এখন শাহজাদার শয়ন কক্ষে আসে। ফুলের তোড়ায় চোখ পড়লেই দৌলতজাহানের চিন্তা তাঁর প্রবল হয়ে উঠে। আগ্রহ জাগে, তোড়ার সাথে তোড়ার নির্মাতাকেও কক্ষের মধ্যে দেখার। তিনি ফুলের তোড়ায় হাত দেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। ঘ্রাণ নেন। আস্তে আস্তে ফুলের তোড়ায় হাত বুলান। ফুলের তোড়া নেড়ে চেড়ে তার মধ্যে দৌলতজাহানের পরশ খুঁজে বেড়ান। এরপর ফের হেসে উঠে ফুলের তোড়া রেখে দেন। অধিকতর স্বপ্নাতুর হওয়ার জন্যে নিজের কাছে নিজেই তিনি সংকুচিত হয়ে যান।

বইঘর.কম ও রোকন

তোড়া রেখে টান্ হয়ে শুয়ে পড়েন। চোখ বুজে ভাবতে থাকেন। কাজের কথা, নিজের কথা, ভূত-ভবিষ্যৎ-দেশের কথা, হাজার কথা ভাবতে থাকেন। ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে দেখেন, নিজের অজ্ঞাতেই কোন ফাঁকে ফের তিনি দৌলতের কথায় এসে গেছেন। তিনি দৌলতকে পাওয়া-না-পাওয়ার খতিয়ান খুলে বসেছেন। আঁক মিলিয়ে দেখছেন, তাঁকে পেলেই বা এমন কি ফায়দা হবে? সে পাওয়ার আনন্দ কয়দিন তিনি ভোগ করতে পারবেন? রাজনৈতিক এক মারাত্মক চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। কখনও যে ধস্ নামবে, কিছুই বলার উপায় নেই! অন্যে যে যা-ই ভাবুন. দিল্লীর সাথে সংঘাত তাঁদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। অস্তিত্বের এক প্রকট লড়াই একান্তই সন্নিকট। দিল্লীর তুফান তরিয়ে উঠার আগে নিজেদের অস্তিত্ব বলেই যার কিছুই নেই. তলোয়ার হাতে ময়দানেই যার হরওয়াক্ত অবস্থান আসন্ন, সে ময়দানে গাজীর চেয়ে শহীদ হওয়ার সম্ভাবনাই যার অধিক এবং সর্বোপরি, দেশ ও জাতির ডাকের সামনে যার জিন্দেগীর তামাম ডাক তামাম আকর্ষণ খোলামকুচির মতোই একেবারেই নগণ্য, দৌলতজাহানকে পেলেই বা দৌলতের সান্নিধ্যে কয়টা প্রহর কাটবে তাঁর? আল্লাহ তায়ালা না করুন, তাঁর সম্ভাব্য জীবনহানীর ক্ষেত্রে দৌলতই বা আজীবন পাবেন কি? সাদামাটা সংসারে নিশ্চিন্তে জীবন কাটতে পারবে যার, ক্ষণস্থায়ী এই শান-শওকতের বিপদসংকুল আবর্তে অযথা তাকে টেনে এনে তার জিন্দেগী বিরান করে দেয়ার সঠিক যুক্তিটাই বা কি?

ওদিকে আবার না পাওয়ার ক্ষতিটাও বিশাল। প্রাণের স্পন্দনই যদি স্তিমিত হয়ে যায়, অস্তিত্বের লড়াইয়ে গাজী হওয়ার সাধটাই বা থাকবে কি? গাজী হওয়ার দুর্বারতা কোথায় থেকে পাবেন তিনি? গাজী হওয়ার প্রেরণাটা কে যোগাবে পেছন থেকে? দৌলত যেদিন নজরে তাঁর ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেদিন এক বন্দরহীন অর্ণবতরী। উদ্দেশ্য হীন, দায়িত্বহীন কেবলই এক অস্থির অস্তিত্ব। দৌলতজাহানের মধ্যে তাঁর ভাসমান জিন্দেগী আজ বন্দরের খোঁজ পেয়েছে। পেয়েছে সুনির্দিষ্ট গতির, আর অস্থিরতায় স্থিতির এক জোরালো আশ্বাস। এক আলো ঝলমল জিন্দেগী আজ তাঁর সামনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এই আলো নিভে গেলেই তো আবার সেই অন্ধকার? সেই ঠিকানাহীন, নিশানাহীন, দিশেহীন অস্তিত্ব? নিয়ন্ত্রণহীন উচ্ছৃঙ্খল এক তাকত!

এক কথার সূত্র ধরে শাহজাদা দাউদ খান হাজার কথা ভাবতে থাকেন। ভাবনার অন্তরালে গভীর হয় রাত। ভাবতে ভাবতে অবশেষে খেই হারিয়ে ফেলেন তিনি। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

০ ০ ০

শাহজাদার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এখন প্রায় ছাঁচে ঢালা। প্রতীক্ষার দিনগুলি যা হয়, একই রকম বৈচিত্র্যহীন। দপ্তরের নির্দিষ্ট কাজ, আহার বিরাম-নিদ্রা, অতঃপর কোন

বইঘর.কম ও রোকন
কোন দিন ঘুরে বেড়ানো, কোনদিন বা ঘোড় সওয়ারী। আনুষঙ্গিক কাজগুলিও একই রকম। ফুলবাগিচায় যাতায়াত, বাগবাগিচার তদারকি, মুরাদ খানের খবরদারী, জঙ্গীচাচার সঙ্গ লাভ– সবই ঐ ছকে বাঁধা কর্মসূচীর একঘেয়ে জের।

মুরাদ খানের সাথে শাহজাদার গল্পও এখন আগের মতো জমে না। সে গল্পের মধ্যে দৌলতজাহানের প্রসঙ্গ টানতে শাহজাদা এখন সংকোচ বোধ করেন। দৌলতজাহানের সাক্ষাৎ পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা থাকলেও তিনি তাঁদের মকানে যাওয়ার কোন যোগ্য অজুহাত খুঁজে পান না। অনাহুত অতিথি হওয়ার প্রচণ্ড সেই ওয়াদা অদৃশ্য এক অবরোধে শিথিল হয়ে গেছে। দৌলতজাহানকে শাদি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি নিজে নিজেই অবরুদ্ধ হয়ে গেছেন। নিজের ঘরে শাহজাদা নিজেই আজ পরদেশী।

ছকে বাঁধা কর্মসূচীর জের ধরে বরাবরের মতো শাহজাদা আজও ফুল বাগানে এলেন। মুরাদ খানকে আজ একটু অতিরিক্ত প্রয়োজন ছিল শাহজাদার। বাগানে এসে সামনে তাঁকে পেলেন না। এদিক ওদিক ইতস্তত ঘোরাফেরা করে শাহজাদা মুরাদ খানের দপ্তর কক্ষে এসে দেখলেন, সেখানেও মুরাদ খান নেই। বেলা প্রায় শেষ। মালী মজুরের ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেছে। দপ্তরকক্ষ খোলা রেখে মুরাদ খান কোথায় গেলেন, ভাবতে লাগলেন শাহজাদা। ভাবতে ভাবতে একটা কুরসী টেনে সেখানেই বসে পড়লেন। দৌলতজাহানের তোড়া আসা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। এক হপ্তার অধিককাল ধরে দৌলতের কোন ফুলের তোড়া শাহজাদা আর পাননি। এ নিয়ে তাঁর মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। দৌলতজাহান কি আসলেই মকানে তাঁদের নেই, না কোন অসুখ বিসুখ হয়েছে তার? হঠাৎ এই ব্যতিক্রমের বিশেষ কোন কারণ আছে, না কোন মামুলি ব্যাপার কিছু? এই খবরটা জানার জন্যে মুরাদ খানের অপেক্ষায় তিনি সেখানেই চুপচাপ বসে রইলেন।

বেলা আর ছিল না। সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। ঘরের মধ্যের আলোটা ফিকে হয়ে এসেছে। আজান পড়বে খানিক পরেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শাহজাদা উঠতে গেলেন। এই সময় মানুষের পদশব্দ শুনে তিনি সামনের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই তাঁর পেছন দিকের দুয়ার থেকে আওয়াজ এলো– "এই যে দাদু তোড়াটা এনে শাহজাদাকে পৌঁছে দিতে বলেছিলাম, তবু তুমি গেলে না? সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এলো, এত কষ্টে তৈরি করা তোড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে–?"

বলতে বলতে বোরখা ঢাকা দৌলতজাহান শাহজাদার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে সুন্দর একটা মোড়কে তাজা একটা ফুলের তোড়া। দৌলতজাহান এতক্ষণ ভাল করে দেখেননি। ঝোঁকের মাথায় এসেছেন। তিনি ভাল করে দেখতেই আর দৌলতজাহানের কণ্ঠস্বরে শাহজাদা চমকে উঠে পেছন ফিরে চাইতেই, উভয়ে একদম মুখোমুখী হয়ে গেলেন। মুরাদ খানের পরিবর্তে শাহজাদাকে দেখেই দৌলতজাহান চমকে গিয়ে জিবে কামড় দিলেন এবং "ওম্মা!" বলে কয়েক কদম পেছনে সরে গেলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

আচমকা ধাক্কায় পলকখানেক ঐভাবে বসে থাকার পরই শাহজাদার চমক ভাঙ্গলো। তিনি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– আরে সেকি! আপনি?

কম্পিত কণ্ঠে সালাম দিয়ে দৌলতজাহান ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন। সালামের জবাব দিয়েই শাহজাদা ব্যস্তভাবে কয়েক ধাপ এগিয়ে এলেন এবং ব্যস্তভাবে বললেন–আরে-আরে, যান কেন? কি জন্যে এসেছিলেন?

দৌলতজাহান মুশকিলে পড়ে গেলেন। দু'চোখ তাঁর শরমে ঢেকে এলো। অপরদিকে, জবাব না দিয়ে চলে গেলেও শাহজাদাকে অমর্যাদা করা হয়। সর্বোপরি কাঙ্খিতজনকে সামনে পেয়ে তৎক্ষণাৎ সরে যেতে মনটাও তাঁর সমর্থন যোগাচ্ছে না। তাই, শরমের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌলতজাহান দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শাহজাদার প্রশ্নের জবাবে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন–এই তোড়াটা দাদুকে পৌঁছে দিতে।

দৌলতজাহান তাঁর হাতে ধরা ফুলের তোড়া অল্প একটু তুলে ধরলেন। দৌলতজাহানের অতিশয় সংকোচভাবে দেখে শাহজাদা হাসি মুখে বললেন– কি হলো? আমার সাথে আপনার তো এই নতুন সাক্ষাৎ নয়! এত জড়সড় হয়ে গেলেন, কি ব্যাপার?

আরো একটু সংকুচিত হয়ে দৌলতজাহান স্মিতহাস্যে বললেন– জানিনে।

ঃ ও-আচ্ছা। তা কষ্টের তোড়া বললেন যে? তোড়া বানাতে এখন বুঝি আপনার খুব কষ্ট হয়?

ঃ জি। সপ্তাহে একটাই বানাতে পারিনে।

ঃ তাহলে সাদামাটা করে বানাবেন, এত কষ্ট করবেন কেন?

ঃ না, সেজন্যে নয়। এখন তো আর আম্মার সাক্ষাতে তোড়া বানাতে পারিনে, চুরি করে বানাতে হয়।

দৌলতজাহান মুখটিপে হাসতে লাগলেন। শাহজাদা সবিস্ময়ে বললেন–কেন-কেন, চুরি করে কেন?

দৌলতজাহান থমকে গেলেন। তিনি কপট রোষে চাপা-কণ্ঠে বললেন–ইশ্-রে! কেন তা জনাব জানেন না? আমার শরম নেই?

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে শাহজাদা বললেন–কি আশ্চর্য! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে!

আড় চোখে চেয়ে দৌলতজাহান বললেন–আম্মাবেগম আমাদের মকানে এলেন, আমাদের শাদির প্রস্তাব দিয়ে গেলেন, এর পরও তামাসা? আমার মুখ থেকে শুনার খুব সখ বুঝি?

ঃ দৌলত!

ঃ নাকি তর সইছে না?

বইঘর কম ও রোকন

সবলে হাসি চাপতে গিয়েও দৌলতজাহান হাসি চাপতে পারলেন না। ফিক্ ফিক্ করে হাসির আওয়াজ বাইরে বেরিয়ে এলো। লজ্জা ঢাকতে না পেরে তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান থেকে চলে যেতে লাগলেন।

ঘটনাটা এতদূর এগিয়েছে জেনে শাহজাদা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। চকিতে তাঁর খেয়াল হলো তাঁর জঙ্গীচাচার কথা- "কাজ ঠিকই এগুচ্ছিলো। কিন্তু জুনায়েদ খান সাহেব এর মধ্যে ঐ......."

—এসব কথা স্মরণ করতে গিয়েই শাহজাদা দেখলেন, দৌলতজাহান চলে যাচ্ছেন। মুহূর্তের জন্যে শাহজাদা স্থান কাল পাত্রের কথা ভুলে গেলেন। আবেগের বশে তিনি দৌড়ে এসে দৌলতজাহানের পথ আগলে দাঁড়ালেন এবং ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—দোহাই যাবেন না। আর একটা কথা বলে যান। এ শাদিতে সম্মতি আছে আপনার?

দৌলতজাহান বিস্মিত হয়ে বললেন—মানে?

ঃ আপনার নাকি কি একটা খোয়াব ছিল—মানে মস্তবড় আকিঞ্চন?

ঃ তাজ্জব! সেই আকিঞ্চনই তো আল্লাহর রহমে পূরণ হতে যাচ্ছে! জনাব এটুকুও বুঝেন না?

স্মিতহাস্যে দৌলতজাহান মাথা নত করলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁপন ধরে গেল। আনন্দে ও আবেগে আত্মহারা হয়ে শাহজাদা পুনরায় বিহ্বল কণ্ঠে বললেন-দৌলত!

দৌলতজাহানও কি বুঝে মরিয়া হয়ে উঠলেন। ত্রস্ত-হস্তে ফুলের তোড়া বের করে শাহজাদার হাতের মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে বললেন- নিন, আপাতত এই বোধ হয় আমার শেষ তোড়া। মেহেরবানি করে আমার অবস্থাটা বুঝার চেষ্টা করবেন।

ঃ দৌলতজাহান!

ঃ লোকজন কেউ দেখে ফেলতে পারে! আর ছেলেমি করবেন না। আমি যাই—

শাহজাদার পাশ কাটিয়ে দৌলতজাহান কম্পিত পদে চলে যেতে লাগলেন। হন্তদন্ত হয়ে মুরাদ খান এই মুহুর্তে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। শাহজাদার হাতে ফুলের তোড়া দেখেই দৌলতজাহানকে লক্ষ্য করে মুরাদ খান উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন—কি তাজ্জব—কি তাজ্জব! মকানে গিয়ে দেখি,তুমি নেই। ফুলের তোড়াটা হুজুরকে দিয়ে দিয়েছো? মারহাবা! মারহাবা!

০ ০ ০

এ দুনিয়ার সব কিছুই পরিবর্তনশীল সময়ের বিবর্তনে পাল্টে যায় পরিবেশ, উল্টে যায় পরিস্থিতি, বদলে যায় মানসিকতা। আজ যা দুঃসহ, সময়ের ব্যবধানে ক্রমেই তা সহনশীল হয়ে যায়। আজ যা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের, কাল তাতে রেশ লাগে বিস্বাদের। আজ যা মুখ্য, কাল তা গৌণ। আজ যা অনায়াসলব্ধ, কাল তা দুর্লভ। আজ যা অভ্রান্ত, কাল তা মিথ্যা।

বইঘর.কম ও রোকন

স্থিতি নেই কিছুতেই। আজকের তারুণ্যে কাল আসে বার্ধক্য, আজকের নৌপথে কাল চলে গাড়ি, আজকের অরণ্যে কাল জাগে জনপদ। পক্ষান্তরে, আজকের জনপদ কালকের গোরস্তান। এ দুনিয়ায় কোন কিছুই স্থায়ী নয়। সব কিছুই ভঙ্গুর, সব কিছুই অস্থায়ী। স্থায়ী শুধু একমাত্র আল্লাহতায়ালা আর তাঁর বিধান। একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর আর তাঁর বিধানই অনড়। তাণ্ডার পরবর্তী ইতিহাস এই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি।

সময়ের প্রলেপে হযরত-ই-আলার অশান্ত মন শান্ত হলো আবার। স্বাভাবিকতায় ফিরে এসে আবার তিনি সহজ হলেন। সহজ হয়ে সবার সাথে আগের মতোই মিশতে লাগলেন। তাঁর মলিন মুখে আগের মতোই হাসি ফুটে উঠলো। পরিবেশ অনুকূল বোধে পুনরায় তৎপর হলেন আম্মাবেগম। একদিন তিনি নিরালায় হযরত-ই-আলাকে বললেন —জনাব, অভয় পেলে আজ একটা কথা বলতে চাই আমি!

হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী হাসি মুখে বললেন—অভয় কেন বেগম? আমার সাথে কথা বলতে বেগম সাহেবার অভয়ের কি জরুরত?

ঃ জনাব!

ঃ অন্যের কাছে হযরত-ই-আলা হলেও, বেগমের কাছে তা তো আমি নই। তাঁর কাছে কেবলই আমি খসম। বলুন, কি বলতে চান?

ঃ আমি শাহজাদা দাউদের কথা বলতে চাই। তাকে সংসারী আর দায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে চিন্তাভাবনা একদিন আমরা করেছিলাম, মানে জিয়াদা খুব সুরাতের কোন একটা বুদ্ধিমতী স্ত্রী ঘরে থাকলে তার টানে হয়তো সে—

কথার মাঝেই হযরত-ই-আলা বলে উঠলেন—আলবত্-আলবত্! এমন একটা বাঁধন ছাড়া ঐ বেয়াড়াটাকে বাগ মানানো যাবে না। খবর টবর আছে কিছু? এ ধরনের কোন আকেলমান্দ্ দুলহীনের?

ঃ জি জনাব। খবরই স্রেফ নয়, আমি দেখেও এসেছি তাকে। যেমনই সুন্দরী, তেমনই আকেলমান্দ লেড়কী। দাউদেরও তাকে খুব পছন্দ।

হযরত-ই-আলা খুশি হয়ে বললেন—আচ্ছা! কোথায় দেখলেন তাকে? কার মেয়ে?

ঃ এই কথাটা বলতে আমার ভয় হচ্ছে জনাব!

ঃ মানে?

ঃ কোন খানদানী ঘরের আউরত সে নয়। নিতান্তই গরীব ঘরের মেয়ে।

ঃ সে পরিবারের আদব-আখলাক?

ঃ খুবই উঁচু মানের। পরিবারের প্রত্যেকেই খুব উঁচু রুচির মানুষ।

ঃ তাহলে আর এত সংকোচ কিসের?

ঃ সে ঘর যে আমাদেরই এক মামুলি নওকরের ঘর জনাব। বাগান রক্ষক ঐ মুরাদ খানের নাতনীই সেই মেয়ে।

ঃ তাতে কি হয়েছে?

ঃ জনাবের যদি আপত্তি থাকে এতে?

ঃ কেন, তাঁরা মুসলমান নন?

ঃ মুসলমান তো জরুর।

ঃ তাহলে আর বাধা কোথায়? বাদশাহ্ আর নওকরের মধ্যে ইসলামে ফারাক আছে কিছু?

ঃ জনাব!

ঃ বেগম সাহেবা কি ইসলামের সাম্যবাদের বদনাম করতে চান?

ঃ না-মানে হেরেমের ব্যাপার কিনা? হেরেমের তরফ থেকে-

ঃ হেরেমে যাঁরা বাস করেন তাঁদের জাত-গোত্র কি আলাদা?

তাহলে তো তাদেরকেই আগে তাড়াতে হয় হেরেম থেকে।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

ঃ বেগম!

ঃ জনাবের এই মন মানসিকতা আমি জানি বলেই, প্রস্তাবটা তাদের আমি সরাসরি দিয়েই এসেছি জনাব!

ঃ বেশ করেছেন। ধনী-গরীবের প্রশ্ন ছাড়া অন্য কোন বাধা বিপত্তি না থাকলে, বেগম সাহেবার পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। শাহজাদা দাউদের শাদি এখানেই হবে।

ঃ তা বলছিলাম কি জনাব-

ঃ বলুন?

ঃ জনাব যদি নিজে একবার দেখে আসতেন মেয়েটাকে-

হযরত-ই-আলা হেসে উঠে বললেন-আরে-আরে বেগম সাহেবা বলেন কি? তাঁর পছন্দের উপর আর কোন পছন্দ আছে? বেগম সাহেবার কাছে জনাব তো এ ব্যাপারে বিলকুল নাবালক।

ঃ তাহলে আর দেরি না করে কাজটা-

হযরত-ই-আলা পুনরায় হেসে বললেন-বেগম সাহেবার খুবই মনে ধরেছে বুঝি?

ঃ জি জনাব, জি।

ঃ হবে-হবে। আমাদের একেবারেই হাতের মধ্যের ব্যাপার। কিছু দেরি হলেই বা ক্ষতি কি? আমরা যেখানে চাই, সেখানে কার সাধ্য দুলহীনকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়?

ঃ জনাব!

ঃ উতলা হওয়ার কারণ নেই। খোদ শাহজাদার শাদি। ধুমধাম করতে হবে না? জাক লাগানো আনযাম করতে হবে না? এ কাজ মস্ত বড় কাজ। হুট্ করে এ কাজে হাত দেয়া যায় না। দুদিন পরে হলেও একদিন ঠিক আমি হাত দেবো এ কাজে।

বেগম সাহেবা তৃপ্ত হতে পারলেন না। হযরত-ই-আলার কথার উপর আর কথা বলতেও পারলেন না। তিনি ক্ষুণ্ন মনে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু বেগম সাহেবার ক্ষুণ্ন মন প্রসন্ন আর হলো না। 'সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের নয় ফোঁড়েও সারে না' এই প্রবাদই সত্য হলো এখানে। আজ যা সহজ সাধ্য ছিল, কাল তা সুদুর পরাহত হয়ে গেল। বেগম সাহেবার সাধ পূরণের পথে এলো দুর্লঙ্ঘ এক বাধা। অকস্মাৎ ঘটে গেল নিদারুণ এক দুর্ঘটনা। চমকে গেল তামাম বাঙ্গালার মানুষ।

দুদিন পরেই হাত লাগাবেন বলে যে আশাটি পুষে রাখলেন বাঙ্গালার অধিপতি সোলায়মান খান কাররানী সে হাত লাগানোর কিসমত তাঁর আর হলো না। তার আগেই তাঁর সামনে এসে হাজির হলো এ জিন্দেগীর চরমতম পরওয়ানা। কয়েকদিনের অল্প একটু অসুখেই বাঙ্গালার মুকুটমণি হযরত-ই-আলা সোলায়মান খান কাররানী ইহধাম ত্যাগ করলেন। দিন ফুরোলেই যেতে হবে, তাই তাঁকে যেতে হলো। অনড় রইলো আল্লাহতায়ালার বিধান। পাল্টে গেল বাঙ্গালা মুলুকের চিত্রপট। শূন্য হলো তখ্‌ত্। বদলে গেল ইতিহাস। যা এতদিন বেগম সাহেবার মুখ্য বিষয় ছিল, তা এখন একেবারেই গৌণ হয়ে গেল।

www.boighar.com

আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এলো বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায়। হাহাকার পড়ে গেল শাহী মহলে, রাজধানীতে আর গুণগ্রাহীদের ঘরে ঘরে। হতভম্ব হয়ে গেলেন পাত্র-মিত্র শাহী পুরুষ। সাথে সাথেই শংকিত হয়ে উঠলেন বাঙ্গালা মুলুকের শুভাকাঙ্খীরা আর আশার আলো ফুটে উঠলো মতলববাজদের দীলে। তখ্‌ত্ ফাঁকা না থাকায় আফসোসে যাঁরা কাতর ছিলেন, এ সংবাদ শুনামাত্রই তড়াক করে উঠে তাঁরা সোজা হয়ে বসলেন।

কিন্তু শিরণী দরগা পেলো না। সোজা হয়ে বসেই মতলববাজরা আবার কাত হয়ে পড়ে গেলেন! দূরদর্শী প্রধান উজির লোদী খানের বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে সঙ্গে সঙ্গেই রাশি রাশি ছাই পড়লো মতলববাজদের মুখে। লোদী খান ভেবে দেখলেন, যত নিদারুণই হোক, শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন থেকে অধিক সময় বাঙ্গালার মসনদ ফাঁকা রাখলে, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। শাহজাদাদের নিয়ে কোন দুর্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মরহুম হযরত-ই-আলার জামাতাসহ এতগুলো ভ্রাতুষ্পুত্র ও দাবিদার বিদ্যমানে আর মতলববাজ ও গাদ্দারদের চক্রান্তে, মসনদ নিয়ে অচিরেই কারবালার খেল্ শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। ন্যায্য ও যোগ্যজনকে উপেক্ষা করে অযোগ্যদের দাবি নিয়ে অচিরেই নানা দিক থেকে ধেয়ে আসবে নানাজন। প্রত্যক্ষ ও যোগ্যতম উত্তরাধিকারীকে মসনদে বসানো নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও উজির-নাজির ও পাত্র মিত্রের অনেকেই বিভিন্ন মুখী প্রস্তাব তুলে বিপর্যয় পয়দা করবেন,এতে সন্দেহ নেই।

তাই উজিরে আলা লোদী খান সাহেব যথা সময়ে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। যথাযথ মর্যাদার সাথে হযরত-ই-আলার দাফন কাফন সমাপ্ত করে এসেই তিনি কাউকে কোন ভাবনার সুযোগ না দিয়ে মরহুম হযরত-ই-আলার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ খান কাররানীকে মসনদে বসিয়ে দিলেন এবং বাঙ্গালার অধিপতি হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করে দিলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

রাজধানীর তামাম লোক শোকে, আর ঘাপ্‌টিমারা লোকেরা যখন খুশির আনন্দে আচ্ছন্ন, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজধানীর অলিগলি ও পথ-প্রান্তর থেকে সকলের কানে ভেসে এলো ঘোষকের ঘোষণাঃ “বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নয়া অধিপতি জনাবে আজম্‌ হুজুরে মুল্‌ক্‌ বায়াজিদ খান কাররানী বাহাদুর বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার জনগণের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করছেন এবং পাত্রমিত্র সভাসদদের অচিরেই দরবার কক্ষে তসরিফ আনার নির্দেশ প্রদান করছেন.......”

এই মুহূর্তে এই ঘোষণা শুনে অনেকেই স্বম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। গর্জে উঠলেন গাদ্দার ও মতলববাজ সভাসদেরা। তাঁদের সাথে পরামর্শ না করেই এমন কাজ কে করলো তার খবরদারি করার জন্যে এবং এ ঘোষণা বাতিল করার অভিপ্রায় নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দরবার কক্ষে ছুটে এলেন। কিন্তু এসেই তাঁদের দুই চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল। তাঁরা এসে দেখলেন, ইতিমধ্যেই শাহজাদা দাউদ খান, সেনাপতি কালাপাহাড়, সেনাপতি সিকান্দার উজবেক, সেনাপতি ইসমাইল খানসহ বাঙ্গালার বিশিষ্ট বিশিষ্ট সালার ও জঙ্গীব্যক্তিরা এসে বায়াজিদ খানের প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত করে তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছেন এবং পাত্রমিত্র সভাসদদের সিংহভাগই এসে আনুগত্য জ্ঞাপন করে আসন গ্রহণ করেছেন। অবস্থা একান্তই আয়ত্তের বাইরে। তাই, ধরাপড়ার ভয়ে নিরুপায় হয়ে গাদ্দার ও মতলবাজেরাও বায়াজিদ খানের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে আসন গ্রহণ করলেন। বাঙ্গালার অধিপতি বায়াজিদ খান কাররানী প্রবীণ রাজনীতিবিদ লোদী খান সাহেবকে প্রধান উজিরের পদে পুনর্বহাল করে ঐ শোকাচ্ছন্ন মুহূর্তের দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

তাণ্ডার রাজনৈতিক রঙ্গালয়ে যে নয়া দৃশ্যের সূচনা হলো, তার প্রভাবে দৌলতজাহানের খোয়াব, শাহজাদা দাউদ খানের উচ্ছ্বাস, আম্মাবেগমের সাধ-সবকিছুই সাময়িকভাবে উহ্য হয়ে পর্দার আড়ালে চলে গেল। প্রবল বেগে চলতে লাগলো রাজনৈতিক কসরত। সময়ের চাহিদায় শাহজাদা দাউদ খানও দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্ম হয়ে গেলেন।

পিতৃশোক সামলে নিতে বায়াজিদ খান কাররানীর কয়েকদিন সময় লাগলো। এর পরেই তিনি মজবুত হাতে শাসনদণ্ড ধারণ করলেন। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার ও উজির-উমরাহদের পদবিন্যাস সমাপ্ত করার পরেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক নীতি ও পরিচিতি সুনির্দিষ্ট করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। এ কাজে তিনি প্রাথমিকভাবে প্রধান উজির লোদী খান ও শাহজাদা দাউদ খানকে পরামর্শের জন্যে ডেকে নিলেন। এক নিভৃত কক্ষে বসে তিনি লোদী খানকে বললেন– মাননীয় উজিরে আজম, আমি চিন্তা করে দেখলাম, বাঙ্গালা মুলুকের রাষ্ট্রপতির নীতি ও অবস্থান সর্বাগ্রে সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত?

বইঘর.কম ও রোকন

কিঞ্চিৎ চিন্তা করে উজিরে আজম বললেন–বিষয়টি আরো একটু খোলাসা করার প্রয়োজন আছে জনাব। রাষ্ট্রপতির অবস্থান বলতে জনাব কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

ঃ অবস্থান বলতে আমি রাষ্ট্রপতির স্বরূপ ও পরিচিতির কথা বলছি। সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে থাকলেও, বিশেষ এক প্রয়োজনে আমার মরহুম আব্বাজান নিজেকে হযরত-ই-আলা পরিচয়ে পরিচিতি করে সেই মোতাবেক এক নির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে গেছেন। আমাকেও কি তাই করতে পরামর্শ দেন আপনি?

একটু থেমে উজিরে আজম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–প্রসঙ্গটি যেমনই জরুরী তেমনই জটিল জনাব। পরামর্শ দেয়া এখানে মুশকিল। তবে, আমাদের চলতি নীতি কি জনাব নিতান্তই অপছন্দ করছেন?

ঃ শুধু অপছন্দই নয়, ঐ নতজানু নীতি আমি কোনদিনই পরিপাক করতে পারিনি!

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ কিন্তু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে আর তো আমার ভাবপ্রবণ হওয়ার অবকাশ নেই? সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আবেগ বহাল করতে যাওয়ারও অবকাশ নেই আমার! তাই দরবারে তোলার আগে এ প্রসঙ্গে আপনাদের সুনির্দিষ্ট মতামত জানা আমার প্রয়োজন।

উজিরে আজম শাহজাদা দাউদ খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন করলেন–এ ব্যাপারে দানেশমান্দ ছোট হুজুরের অনুভূতি কি?

শাহজাদা দাউদ খান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করে বললেন– অনুভূতি!

উজিরে আজম হেসে বললেন–না-মানে, আমি বলছি, দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে থাকলে, হাজার দিক ভাবতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই স্বচ্ছ দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়। সঠিক মনে হলেও কোন পথকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব জাগে। ছোট হুজুর বুদ্ধিমান, দৃষ্টিও তাঁর স্বচ্ছ। তাই বলছিলাম, তিনি তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তাভাবনায় কি অনুভব করেন?

দাউদ খান বললেন–দেখুন, বয়সে আমি নবীন। আপনি প্রবীণ ব্যক্তি। আমার তুলনায় আমার জনাবে আলা ভাইজান অধিক বয়সী হলেও, আপনার কাছে তিনিও শিশু। তাই আপনার বিবেচনাটাই আগে জানার প্রয়োজন ছিল আমাদের।

লোদী খান থমকে গিয়ে বললেন–ছোট হুজুর!

ঃ কোন অনুভূতি বা আবেগের প্রশ্ন নয়। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে চিন্তাভাবনা করতে হবে আমাদের। কিছু বলার আগে আমি তাই মাননীয় উজিরে আজমকে প্রশ্ন করতে চাই, আমাদের মরহুম আব্বাজানের অনুসৃত ঐ নীতির উপকারিতা কি আদৌ কিছু আছে আর?

বইঘর.কম ও রোকন

লোদী খান চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–তা-মানে–

দাউদ খান বললেন–আরো সহজ করে বলি, দিল্লীর বাদশাহ্ আকবর শাহ্র যে মিত্রতার আশায় আমার মরহুম আব্বাজান ঐ নীতি অবলম্বন করেছিলেন, আকবর শাহ্র সে মিত্রতা কি আমরা এখনও আশা করতে পারি?

উৎসাহিত হয়ে উঠে বায়াজিদ খান বললেন–হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐটেই। আসল বিবেচনার দিক ঐটেই। মাননীয় উজিরে আজম দীর্ঘদিন ধরে দিল্লীর প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে আসছেন। তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে অভিমত প্রকাশ করবেন, এই আমি আশা করছি।

উজিরে আজম মাথা তুলে বললেন–জনাব, মরহুম হুজুরে আলার ঐ নীতির পেছনে আমার ভূমিকাই ছিল অধিক জোরদার। তখন আমি আকবর শাহ্র অসাধু মন-মতলব আন্দাজ করতে পারলেও, তাঁকে থামিয়ে রাখা হয়তো বা কিছু সম্ভব, এই ধারণাই পোষণ করেছি। কিন্তু–

ঃ কিন্তু?

ঃ আজ আর আমার সে ধারণা তিল পরিমাণ নেই। আকবর শাহ্র মতলব আর উদ্দেশ্য এখন দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। তামাম হিন্দুস্তানে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তিনি আজ বদ্ধপরিকর।

ঃ উজিরে আজম!

ঃ কোন প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা না করে নিজের উপলব্ধি খুলে বললে বলতে হয়, দুদিন আগে হোক আর পরে হোক, বাঙ্গালা মুলুক দখল করতে আকবর শাহ আসবেনই। কোন ভেট্ মিত্রতার বেড়া দিয়ে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না।

শাহজাদা দাউদ খান স্মিতহাস্যে বললেন–তাহলেই দেখুন আমার অনুভূতি আলাদা করে প্রকাশ করার জরুরত কি আছে কিছু।

ঃ ছোট হুজুর!

বায়াজিদ খান কথা ধরে বললেন– ও নীতি নিয়ে তাহলে আর মগজ খরচের গরজটা কি? যা অর্থহীন হয়ে গেছে–

লোদী খান চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–গরজ কিছু আছে জনাব। সঙ্গে সঙ্গেই সংঘর্ষে না গিয়ে যে কদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় তা রাখতে পারলে, ক্ষীণ একটা লাভের আশা আছে বৈকি?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ দখল করতে আসবে বলেই তো তাঁরা এখনও আসেননি? মানুষ মরণশীল। মানুষ হাজার রকম বাধা-বিপত্তির দাস। আকাঙ্খা আকবর শাহ্র যত তীব্রই হোক, কোন না কোন কারণে তাঁর এই আগ্রাসন বিঘ্নিত হতেও পারে তো? আর তা যদি হয়েই যায়, তাহলে আর আমাদের ঐ বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নিতে হয় না। ঝুঁকিটা তো আসলেই অত্যন্ত বিপজ্জনক?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ এ আশা কি আদৌ পোষণ করার মতো?

ঃ তা না হলেও, লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকে এই চলতি নীতি আরো কিছুদিন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী আমি। যদিও আমার এই পক্ষপাতের পেছনে শক্তিশালী যুক্তি নেই, তবু যে কদিন চলে, তা চলতে দেয়ার দিকটা বিবেচনা করে দেখার অনুরোধই আমি করবো।

লোদী খান নরমপন্থী লোক। এরপর তিনি যা বোঝানোর প্রয়াস পেলেন, তা হলো, শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা। চরম কোন পদক্ষেপের উদ্যোগ আগেই এবং নিজেরাই গ্রহণ না করে, দিল্লীর ফৌজ সংঘর্ষে এগিয়ে এলে, দায়িত্বটা তাদের ঘাড়েই ফেলে দিয়ে সে পদক্ষেপ তখন গ্রহণ করা। এতে করে বিপজ্জনক মুহূর্তে মিটমাটের পথটা কিছু সুগম থাকে। কিন্তু শাহজাদারা এ দীনতা মেনে নিতে পারলেন না। বাঙ্গালা মুলকের শক্তিও তখন দুর্বার এক শক্তি। বিপজ্জনক মুহূর্ত তাঁদের জন্যেই হবে, দিল্লীর জন্যে হবে না,এমনটি ধারণা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রকৃতপক্ষেই ছিল না। ফলে, শাহজাদারা নিজেদের এত দুর্বল মনে করলেন না। ওদিকে আবার তাদের মানসিকতাও বীরোচিত। যে কয়দিন বাঁচেন, তাঁরা বাঁচার মতো বাঁচতে চান। লোদী খানের এই বক্তব্যে অধিপতি বায়াজিদ খান বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন। তিনি শাহজাদা দাউদ খানকে প্রশ্ন করলেন–আমার বিচক্ষণ ভাই ছোট হুজুরের এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য কি?

এর জবাবে দাউদ খান ধীরকণ্ঠে বললেন–উজিরে আজম সাহেবের আন্তরিকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। তিনি বাঙ্গালা মুলুককে মনে প্রাণে ভালবাসেন। যেভাবেই হোক আর যে কদিনই হোক, বাঙ্গালা মুলুককে বিপদ থেকে আগলে রাখার আগ্রহ তাঁর অপরিসীম। এটা ভাবতেও সত্যিই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু আমার কথা আলাদা। মরি মরি করে দৈনিক মরে থাকা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কোন জোড়াতালি দেয়া নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই!

বায়াজিদ খান সস্নেহে বললেন–ছোট হুজুর!

দাউদ খান বললেন-দুশমনের হামলা বুকের উপর আসন্ন দেখেও, লাঠি হাতে না দাঁড়িয়ে পেছন দিকে ঘুরে দাঁড়ালেই বাঁচা যাবে, এ বিশ্বাস কোনদিনই আমি করিনে, আজও করতে পারিনে।

ঃ সাব্বাস! আমি আমার ছোট হুজুর ভাইকে আরো অধিক স্পষ্ট হতে বলছি।

শাহজাদা দাউদ খান শাণিত কণ্ঠে বললেন–অস্পষ্ট তো আমি এখানে নই জনাব। আমাদের শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের সময়ে যে অবস্থা বিরাজমান ছিল তা এখন নেই, এ সম্বন্ধে জনাবসহ উজির সাহেবও একমত। কাজেই আর এই আত্মপ্রবঞ্চনা কেন?

ঃ দাউদ!

ঃ আমার পূর্বাপর এক কথা। কোন সুবিধের লোভে একজন অসৎ মতলববাজ আর মেকী মুসলমানের কাছে একজন খাঁটি মুসলমান মাথা নত করবে কেন? নিজের ঈমান কি তাতে মজবুত থাকবে তাঁর?

ঃ তারপর?

ঃ পরেরটুকু জনাব চিন্তা করুন। সে সিদ্ধান্ত দেয়ার কাজ আমার নয়। আমার কথা, মুসলমান হোক, অমুসলমান হোক, কারো সাথে মিত্রতার নীতি দোষের নয়। আমাদের মরহুম আব্বাজান সেই প্রয়াসই চালিয়ে গেছেন। কিন্তু মিত্র যখন উলঙ্গভাবে দুশমন, তখন আর কেন আলেয়ার পেছনে ছুটতে যাবো আমরা?

বায়াজিদ খান চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি লোদী খানকে বললেন– মাননীয় উজিরে আজমকে আমি এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে অনুরোধ করছি।

উজিরে আজম বললেন–জবাব তো নেই জনাব। ছোট হুজুরের বিবেচনার মধ্যে আমি কোন ফাঁক খুঁজে পাচ্ছিনে, জবাব দেবো কি? তাঁর কথাও তো যুক্তিহীন কথা নয়?

অধিপতি বায়াজিদ খান এবার প্রত্যয়ের সাথে বললেন–তাহলে এবার আমার কথা শুনুন আপনারা। কুঁজো হয়ে চলার দিন ফুরিয়ে গেছে। আমি এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে প্রয়াসী হবো। আমার ভাই এই ছোট হুজুরের কথাই আমার কথা। যে কদিন বাঁচবো সিংহের মতো বাঁচবো। মুসলমানের মতো শির উঁচু করে বাঁচবো। অনুকম্পার আশায় একজন আগ্রাসী জালিমকে তোয়াজ করে আমি ঈমান খোয়াতে পারবো না।

আচ্ছন্ন নজরে চেয়ে উজিরে আজম বললেন–জনাব!

বায়াজিদ খান বললেন–আমার মরহুম আব্বাজানেরও এই মানসিকতাই ছিল। আকবর শাহ মিত্রতা মানতে না চাইলে, আকবর শাহর গোলামি কবুল তিনিও করতেন না।

লোদী খান সমর্থন দিয়ে বললেন–তা ঠিক–তা ঠিক।

আপনাদের অনুকূল মন্তব্য না পেলে, আমাকে একাই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো। কারণ আমি যা কোনদিনই মেনে নিতে পারিনি, আর যা মেনে নেয়ার আদৌ কোন যুক্তি নেই, তা আমি আজও স্বস্তির সাথে মেনে নিতে পারতাম না।

ঃ জাঁহাপনা।

ঃ তাই আমি মনে করি, পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে আমি সুলতান উপাধি গ্রহণ করবো এবং নিজ নামে খোত্‌বা পাঠসহ নিজ নামে মুদ্রা জারি করবো। তবে আমার এ সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের বিনাবাক্যে গ্রহণ করতে বলবো না। এ সিদ্ধান্ত মনঃপূত না হলে, আপনারা যুক্তি প্রদর্শন করুন, এর ভ্রান্তি ধরিয়ে দিন এবং বিকল্প ব্যবস্থা দিন।

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা দাউদ খান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। লোদী খান সাহেব চিরকালই মধ্যম পথের লোক। এই চরম পন্থার পক্ষে তাই তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশও করলেন না, আবার অযৌক্তিক বলে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে অসম্মতিও জানালেন না।

অচিরেই দরবার ডেকে অধিপতি বায়াজিদ খান তাঁর ইরাদার কথা দরবারে পেশ করলেন। দরবারেও এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে কথা হলো। বিস্তারিত আলোচনান্তে এ প্রস্তাব সেনাপতি কালাপাহাড় ও সিকান্দার উজবেকসহ দক্ষ দক্ষ সেনাপতিদের এবং দরবারের প্রায় সমুদয় সদস্যের উষ্ণ সমর্থন লাভ করলো। কিছু সুবিধেবাদী ও ঝুঁকি-বিমুখ ব্যক্তিদের ওজর আপত্তি পাঠানদের চিরন্তন ও জন্মগত সাহসিকতার সামনে হীনবল হয়ে মিলিয়ে গেল।

অতঃপর বায়াজিদ খান কাররানী নিজেকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা দান করলেন এবং তাঁর নিজ নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রাজারির আদেশ দিলেন। আল্লাহু–আকবর ধ্বনির শব্দে সভাকক্ষ প্রকম্পিত হলো। সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে মুহুর্মুহু আল্লাহু আকবর ধ্বনির মধ্যে দিয়ে সভাসদদের উপস্থিতি সহকারে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন সুলতান বায়াজিদ খান কাররানী তাণ্ডার আকাশে স্বাধীন বাঙ্গালার স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

তড়িৎবেগে এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বাঙ্গালা——বিহার——উড়িষ্যায় নয়া প্রাণের পরশ লাগলো। নতুন এক উদ্দীপনায় স্বাধীনতা প্রিয় জনমণ্ডলী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। অনেক স্থানে অনেকেই এ নিয়ে উৎসব-উল্লাস শুরু করলেন। রাজধানী তাণ্ডাও কয়েকদিন উৎসবে উল্লাসে মুখর হয়ে রইলো।

কিন্তু শাহজাদা দাউদ খান ও সেনাপতি কালাপাহাড় সহ বাঙ্গালার দুর্ধর্ষ ও দূরদর্শী সালার, সেপাই, জঙ্গী পুরুষ কেউই এ উৎসবে গা এলিয়ে দিলেন না। দিল্লীর সম্ভাব্য পদক্ষেপের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সবাই তলোয়ার শান দিতে লাগলেন।

দিল্লীর দরবারে ভেট প্রদান বন্ধ হয়ে গেল। মুঘলদের সাথে তামাম রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হলো। দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ যথাসময়েই এ সংবাদ পেলেন। বাঙ্গালা দখলের আকাঙ্খা তাঁর দীর্ঘদিনের। বাঙ্গালার প্রতি লালসা তাঁর দুর্বার। এ সংবাদে লালসায় তাঁর বালির ছিটে পড়লো। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বাঙ্গালার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনার গরজ তিনি তীব্রভাবে অনুভব করলেন। কিন্তু তখনও তাঁর সে অবকাশ ছিল না। বাঙ্গালার শক্তি দুর্বার শক্তি। সর্বাত্মক অভিযান ছাড়া বাঙ্গালা জয় সম্ভব নয়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজ্যজয় তখনও তার সুসম্পন্ন হয়নি। ঘরের পাশের রাজন্যদের তখনও তিনি পুরোপুরি বাগে আনতে পারেননি। আভ্যন্তরীণ সমস্যার আগুন নির্বাপিত হলেও ধোঁয়া তখনও ছিল। তাই মনের খাহেশ মনে নিয়ে তিনি ঐ দিকেই ব্যাপৃত রইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার দিকে নজর দিতে পারলেন না।

বইঘর.কম ও রোকন

দিল্লীর তরফ থেকে তৎক্ষণাৎ কোন হামলার উদ্যোগ না থাকায় বাঙ্গালার সুলতান বায়াজিদ খান কাররানী আশ্বস্ত হলেন। চর মারফত খবর নিয়ে জানলেন, মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে মুঘলদের সামরিক ও প্রশাসনিক তৎপরতা পূর্ববত্ অব্যাহত থাকলেও বাঙ্গালার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনার কোন আশু উদ্যোগ মুঘলদের নেই। এ সংবাদে শান্ত হয়ে বায়াজিদ খান কাররানী অতঃপর নিবিষ্ট চিত্তে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশে সেপাই সালার লড়াইয়ারাও তরবারি কোষবদ্ধ করে যুদ্ধের উত্তেজনা কমিয়ে দিলেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার দিকে মনোনিবেশ করলেন।

দেশে আবার পূর্বাবস্থা ফিরে এলো। সর্বত্রই শান্ত পরিবেশ বিরাজ করতে লাগলো। সরকারী বেসরকারী তামাম লোকজন নিজ নিজ কর্মসূচীতে ও স্বাভাবিক গৃহকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। আকস্মিক এই রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে কারো মধ্যে কোন আর উত্তেজনা রইলো না।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কুচক্রী ও গাদ্দারের দল। প্রশান্ত পরিবেশে অশান্তির বিষ ছড়াতে তাঁরা আবার তৎপর হয়ে উঠলেন। জুনায়েদ খানকে হাত করতে না পেরে তাঁরা আবার মরহুম হজরত-ই-আলার জামাতা হাঁসু খানের পেছনে মগজ খরচ করতে লাগলেন। মসনদের প্রতি হাঁসু খানের ক্ষীণ একটা আশা ইতিপূর্বেই পয়দা হয়ে গিয়েছিল। এঁদের এই উস্কানিতে সে আশা তাঁর আরো টনটনে হয়ে উঠলো। তিনি সুযোগ সুবিধের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সুযোগও তাঁর এলো। ফাঁকা হলো মসনদ। কিন্তু কোন কিছু ভেবে উঠার আগেই ফাঁকা মসনদ পুনরায় পূরণ হয়ে গেল। হাঁসু খান হতাশ হলেন। আশা ভঙ্গের যাতনায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কতলু খান লোহানী ও তাঁর সহযোগী গাদ্দারেরা। স্বার্থ হাসিলের সম্ভাবনা সংকীর্ণ হয়ে আসায় ইন্ধন প্রদানকারীরাও চুলোর মধ্যে দুহাতে খড়খড়ি ঠেলতে লাগলেন। কতলু খান আর গুজার খানকে ফাঁকে পেয়ে শ্রীহরি রায় বললেন–দেখুন লোহানী সাহেব, কথা আমার ফললো কিনা? প্রধান উজিরের পদটা কি আপনি পেলেন?

বারুদের ঘরে আগুন লাগলো। মর্মব্যথায় অস্থির কতলু খান এ প্রশ্নে আরো অধিক অস্থির হয়ে উঠে বললেন–ঐ লোদী খানই পথের কাঁটা আমার। এ ব্যাটাকে সরাতে না পারলে দীলে আমার শান্তি নেই।

শ্রীহরি রায় ভ্রূকুটি করে বললেন–তাতে লাভটা কি? লোদী খানকে সরাবেন, আর এক খান সাহেব প্রধান উজির হবেন। লোহানী সাহেব হতে পারতেন কোথায়?

ঃ তার মানে?

ঃ কোন পদ-পদবী পাওয়াটা তো যে পায় তার উপর নির্ভর করে না, যে দেয়, নির্ভর করে তার উপর। দাতাই যদি না দেয় তাহলে আর একে ওকে দোষারোপ করে করবেন কি?

বইঘর.কম ও রোকন

কতলু খান হোঁচট খেলেন। কিছুটা সংযত হয়ে বললেন–তা অব্যশ্য ঠিক। তবু–

ঃ তবু কিছু করার নেই। দাতা পক্ষে না থাকলে, গ্রহিতাকে নিয়ে এই মুহূর্তে টানাটানি করতে গেলে মুসিবতটাই বাড়বে শুধু। পারলে বিকল্প চিন্তা করুন।

ঃ বিকল্প চিন্তা কি করবো? ঐ লোদী খান তো এ পথেও কাঁটা ছড়িয়ে দিলে। মসনদ খালি হলো। খালি মসনদে কাকে বসালে ভাল হবে, তা কি কিছু ভাবতে দিলেন উনি?

এবার গুজার খান মুখ খুললেন। তিনি বললেন–ভেবেই বা কি করতেন? আসলে এই বায়াজিদ খান সাহেব ছাড়া ন্যায্য আর যোগ্য তো কেউ ছিল না।

কতলু খান সবিস্ময়ে বললেন–তার অর্থ?

ঃ অর্থ, মুঘলদের এই আগ্রাসনের মুখে আমাদের এই আফগান জাতিকে হেফাজত করার মতো এ মুলুকে এখন লোক বলতে ঐ দুইটি– বায়াজিদ খান আর তাঁর ভাই দাউদ খান। শাহী পরিবারের আর সবাই তো কাঠের ঘোড়া। ওদের উপর আদৌ কোন ভরসা করা যায়?

শ্রীহরি রায় ব্যঙ্গ হাসি হাসলেন। তিনি বললেন– সালার সাহেব, কথায় বলে, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। আপনার নিজেরই যদি অস্তিত্ব কিছু না থাকে, তাহলে আর কার কথা ভাবছেন আপনি? নিজের শোয়ার জায়গাই যাঁর নেই, তিনি আবার অন্যের কথা ভাবতে যান কোন জ্ঞানে?

গুজার খান ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন–কি বলতে চান, খোলাসা করে বলুন।

ঃ আপনি যাঁদের যোগ্যজন ভাবছেন, তাঁরা তো আপনাদের আদৌ তা ভাবছেন না। আপনাদের কদর দেয়ার কোন আগ্রহ তাঁদের মধ্যে আছে কি?

ঃ সেটা আমাদের কিছুটা আফসোসও বটে, আবার নিজেদের দোষও বটে। তবে, আমাদের এই বাঙ্গালা মুলুকের স্বার্থটাও খাটো করে দেখার মওকা নেই আমাদের। দিল্লীর আগ্রাসন ঠেকানো না গেলে, ঐ পদ, পদবী আর শোয়ার জায়গা পেলেই বা কি হবে? দিল্লীর বাদশাহ্ বাঁচতে দেবে আমাদের কাউকে?

শ্রীহরি রায়ের ভ্রূ যুগলে কুঞ্চন দেখা দিল। তিনি বিজ্ঞের মতো বললেন–বড় অসার চিন্তা করেছেন আপনি সালার সাহেব। দিল্লীর ফৌজকে ঠেকাতে কি ঐ দুজনই একা একা পারবে? আমরা আপনারা সবাই মিলে ঠেকালে তবেই তারা ঠেকবে। এখানে বড় কথা, আমাদের সকলের একতা। কোন সুলতান বা অধিপতির একক যোগ্যতা নয়।

কথাটা লুফে নিয়ে কতলু খান বললেন–ঠিক-ঠিক! আমরা এই আফগানেরা সবাই যদি একমত একজোট হতে পারি, তাহলে একটা কলের পুতুল মসনদে থাকলেও দিল্লীর ফৌজ পিছু হটতে বাধ্য হবে। উপরন্তু, এই কিসিমের সহজ সুবিধের লোক যদি মসনদে কেউ থাকতো তাহলে আমাদের নিজেদের নসীবটাও গড়ে নিতে পারতাম আমরা!

একজন জেদি আর কট্টর সুলতানের অধীনে এতটা নাজেহাল হয়ে থাকতে হতো না আমাদের?

ঃ তা যখন তেমন লোক কেউ মসনদে আসেনি, তখন আর এসব ভেবে লাভ কি? কিছুটা কষ্ট হলেও সহ্য করে চলতে হবে।

শ্রীহরি রায় জোরালো কণ্ঠে বললেন–পারবেন না, পারবেন না। যেদিন আপনাকে টপ্‌কে ঐ কাঠগোঁয়ার কালাপাহাড়টাকেই সিপাহ সালার বানিয়ে দেবে, সেদিন লোহানী সাহেবের মতো আপনার মগজেও আগুন ধরে যাবে। যা সহ্য করার মতো নয়, তা কেউ সহ্য করতে পারে না।

ঃ কি রকম?

কতলু খান রুষ্টকণ্ঠে বললেন–কি আফসোস্! এতটার পরও আপনি রকম খুঁজে বেড়াচ্ছেন? যোগ্যজনকে অগ্রাহ্য করে এই সব সুলতানেরা পায়ের তলের নফরদের যেভাবে একটার পর একটা উপরে তুলে দিচ্ছেন, বারবার তা দেখেও আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না?

গুজার খান বিব্রত কণ্ঠে বললেন–তা বুঝেই বা করবো কি? এক কোপে তো একজনকে মসনদ থেকে নামিয়ে আর একজনকে বসিয়ে দিতে পারিনে?

কতলু খান সোচ্চার কণ্ঠে বললেন– এই তো মগজ খুলেছে! পারিনে বলেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে? ভবিষ্যতের ভালাইয়ের জন্যে একটা কিছু তো করতে হবে?

গুজার খান সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন–মতলব?

গুজার খানের মানসিকতা আঁচ করে শ্রীহরি রায় সতর্ক হয়ে গেলেন। কতলু খান জবাব দেয়ার আগেই তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন–আরে না, মানে লোহানী সাহেব বলছেন, পদস্থ লোক হয়ে আপনারা নফরদের নফর হয়ে যাবেন, এটা তো নীরবে মেনে নেয়া যায় না? নিজেদের মান ইজ্জতটা কিভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায়, তা নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করার দরকার! মানে একটু কথা বলা বা ওজর আপত্তি তোলার দরকার।

ঃ ওজর আপত্তি তোলার অর্থ তো কোন উদ্ভট খেয়ালকে প্রশ্রয় দেয়া নয়, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বাস্তব চিন্তা করা। সুলতানের সুনজর থেকে দূরে পড়েছি আমরা। কেন দূরে পড়েছি, কি করলে কাছে আসা যাবে, এসব চিন্তা করা।

ঃ সালার সাহেব!

ঃ নফরেরা এগিয়ে যাচ্ছে। কোন পন্থা অবলম্বন করলে নফরদের পথ রুদ্ধ হয় আর নিজেরা আমরা এগুতে পারি, সুলতানের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারি, এসব কথা ভাবেন। অনর্থক গরম হলে ফায়দা কিছু হবে?

বইঘর.কম ও রোকন

কাজের অধিক তাড়া থাকায় গুজার খান চলে গেলেন। তাঁর গমন পথে চেয়ে কতলু খান সক্রোধে বললেন–আস্ত একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি

শ্রীহরি রায় বললেন–তা যা বলেছেন! এসব বুযদীল লোকের ভরসায় থাকলে চলবে না।

ঃ আহাম্মক কাঁহাকার! ঐ এক কোপে নামিয়ে দেয়া ছাড়া দুস্‌রা পথ আর আছে?

ঃ লোহানী সাহেব!

ঃ সুলতান বদল না হলে যে আমাদের ভাগ্যবদল হবে না, এই সোজা হিসেবটা এসব গিদ্ধরের মাথায় ঢুকে না।

ঃ বিলকুল-বিলকুল। অংকে আপনার ভুল হতে আজ পর্যন্ত দেখিনি।

কতলু খান ফেঁপে উঠে সরোষে বললেন–সুলতানের সুনজর হাসিল নয়, সুলতানের উৎখাতটা কিভাবে করা যায়, এখন সেই মশ্‌লাই খুঁজে দিন রায় সাহেব।

শ্রীহরি রায় উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন– লোহানী সাহেব আসলেই একজন বাস্তববাদী লোক।

ঃ যে সুলতান মসনদে থাকলে কাঙ্গাল হয়ে সুনজর খুঁজতে হবে না, সেই সুলতানকে মসনদে আনাই এখন একমাত্র কাজ আমাদের।

ঃ লোহানী সাহেব বিজ্ঞজন। তাঁর সিঁদ্ধান্তের উপর আর কি কথা থাকতে পারে কারো?

ঃ আপনারা এবার একাজে আমাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করুন।

ঃ অবশ্যই-অবশ্যই। সাহায্য তো করবো আমরা জরুর। তবে হাতিয়ারের জোর আমাদের তো নেই তেমন! সক্রিয় সাহায্য বলতে–

ঃ হাতিয়ার ধরতে হবে না আপনাদের। আপনারা দেবেন বুদ্ধি। হাতিয়ার যা ধরার আমরাই তা ধরবো।

ঃ তা বটে-তা বটে। লোহানী সাহেবদের হিম্মত তো আসলেই অতুলনীয়। আপনি আপনার সিদ্ধান্তে অটল থাকুন, বুদ্ধির অভাব হবে না।

ঃ অটল কি বলছেন? এ আমার প্রতিজ্ঞা। আমাদের সীমিত শক্তি দিয়ে ঐ বিশাল ব্যূহ কি করে ভেদ করা যায়, এখন সেই বুদ্ধিটা বাৎলিয়ে দিন। যে শক্তিশালী চক্র এখন সুলতানকে ঘিরে আছে!

শ্রীহরি রায় ঈষৎ হেসে বললেন–বুদ্ধির কাছে শক্তি কিছুই নয় লোহানী সাহেব। বড় কথা আগ্রহ। ইচ্ছে যার প্রবল, পথ তার আপছে আপ্‌ এসে যায়।

ঃ সেই পথটাই বাত্‌লান।

ঃ পয়লা ধাপ ঐ একটাই। সাহেবজাদা হাঁসু খানকে নিয়ে বসুন। তাঁকে শক্ত করে দাঁড় করাতে পারলে, অর্ধেকেরও অধিক কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাদ বাকি পরের চিন্তা।

শ্রীহরি রায় হাসতে লাগলেন। কতলু খান বললেন–জি-জি। তাঁকে ছাড়া তো কোন কাজই হবে না। তাহলে সেই বসার ব্যবস্থাটাই আগে করে দিন মেহেরবানী করে।

ঃ সে ব্যবস্থা তো আছেই। আপনি আপনার বিশ্বাসী লোকদের নিয়ে আমাদের জল্সা ঘরে মানে ঐ শিপ্রারানীর গানের আসরে আসুন, হাঁসু খানকে সেখানে আমি হাজির করে দেবো।

ঃ রায় সাহেব!

ঃ আপনাদের এই কিসিমের খেদমত করার জন্যেই তো এ ব্যবস্থা করে রেখেছি আমরা।

ঃ বহুৎ-খুব, বহুত-খুব।

ঃ তবু হুঁশিয়ার হয়ে লোক বাছাই করবেন। গুজার খান সাহেবদের মতো দোটানা লোকদের যেন এই গুরুতর আলোচনায় ভুলেও আনবেন না?

ঃ কখখনো না-কখখনো না। ঐ সব অপদার্থ মোসাহেবদের এখানে ডাকবো আমি?

www.boighar.com

ঃ লোহানী সাহেব!

ঃ কেউ হা করলেই তার পেটের খবর আঁচ করতে পারি। গুজার খানদের বাইরে রেখে যতটা সম্ভব কাজটা শুধু আদায় করে নেবো।

শ্রীহরি রায় খুশি হয়ে বললেন-চমৎকার! লোহানী সাহেবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তারিফ আমাকে করতেই হবে। তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি!

লোহানী সাহেব হাত নাচিয়ে বললেন-শুকরিয়া!

o o o

রাত অনেকটা গভীর হয়েছে। কর্মক্লান্ত মানুষেরা খিল দিয়েছে দুয়ারে। রাজপথে লোক চলাচল ক্ষীণ হয়ে এসেছে। থেমে গেছে বাজার-বস্তির হৈ-হট্টগোল-আওয়াজ। শুধু রায় সাহেবদের মকানে নিঃঝুমতা নামেনি। তাঁদের সংরক্ষিত সঙ্গীতকক্ষে গুমরে গুমরে উঠছে যন্ত্রের মূর্ছনা আর শিপ্রাদেবীর সুর। সতর্ক দ্বারী প্রহরী হাওয়া খাওয়ার অছিলায় সঙ্গীতকক্ষের চতুরাংশ প্রদক্ষিণ করছে, অভ্যন্তরে বসেছে জমজমাট আসর। সঙ্গীতের আবরণে যুক্তিশলার আসর।

মরহুম হযরত-ই-আলার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র হাঁসু খানের দুই পাশে শ্রীহরি রায় আর কতলু খান লোহানী ঘন হয়ে বসেছেন। হাঁসু খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কতলু

বইঘর.কম ও রোকন

লোহানী গানের ফাঁকে বললেন– আসলে তো আমাদের এই সাহেবজাদাই বাঙ্গালার তখ্‌তের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার, না কি বলেন রায় সাহেব?

শ্রীহরি রায় সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন দিয়ে বললেন-এটা তো পানির মতো পরিষ্কার! একটা শিশুর কাছেও এ তথ্য আজ অজ্ঞাত কিছু নয়।

কতলু খান বললেন-তাহলে দেখুন, কত বড় একটা অবিচার মুখ বুঝে সহ্য করছি সবাই আমরা?

ঃ তা তো বটেই। অবিচার বলে অবিচার? বড় হুজুরের পরে আসবেন মেজ হুজুর। মেজো হুজুরের পরে সেজো হুজুর আসবেন, সেজো হুজুরের পরে ছোট হুজুর তখ্‌তে আসবেন, এই তো নিয়ম। সেজো হুজুর ছোট হুজুরের অপারগতার ক্ষেত্রে ওয়ারিশ হিসাবে তাদের সুযোগ্য সন্তানেরা মসনদ পাবেন। এই হলো নীতি ধর্মের কথা। কিন্তু কথায় বলে, জোর যেখানে বেশি সেখানে নিয়মনীতি এতিম!

কতলু খান ফের বললেন–এর উপরও বিবেচনা করে দেখুন, আমাদের এই সাহেবজাদা হুজুর শুধু ওয়ারিশই নন, বাড়ির বড় জামাই। তাঁকেও লুকিয়ে দৌড়ে গিয়ে তখ্‌তে উঠতে একটু চক্ষুলজ্জাও হলো না?

হাঁসু খান বিব্রত হয়ে বললেন–ওসব আর এখন বলে লাভ আছে? তখন তো কিছুই আপনারা করলেন না?

কতলু খান ব্যস্তকণ্ঠে বললেন–করার ফুরসুৎ পেলাম কোথায় জনাব? লাশ দাফন করে এসে না বসতেই শুনি, ফাঁকা মসনদ পূরণ হয়ে গেছে। একেবারে ভানুমতির খেল্‌ খেললে ঐ ব্যাটা বুড়ো শকুন লোদী খান। কিছু বুঝে উঠতেই দিলে না।

হাঁসু খান নাখোশ কণ্ঠে বললেন– কিন্তু বুঝতে যখন পারলেন, তখনই বা করলেন কি? সরাসরি গিয়ে তো সালাম ঠুকে দাঁড়ালেন?

ঃ উপায় ছিল না জনাব, উপায় ছিল না।

ঃ উপায় না খুঁজলে উপায় থাকবে কি করে? আমি তো আপনাদের পথ চেয়েই ছিলাম। আগে আপনারা এত উৎসাহ দেখালেন, আর কাজের সময় খামুশ মেরে গেলেন? আপনারা যদি প্রতিবাদ তুলে লোকজন ক্ষেপিয়ে দিতেন আর আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন, তাহলে তো মসনদ দখল কায়েমই তাঁর হতো না।?

শ্রীহরি রায় ভীত কণ্ঠে বললেন–ওরে বাপ্‌রে! সে ফুরসুৎ কি ছিল তখন হুজুর? ঘোষণা শুনেই তো ক্ষিপ্তভাবে ছুটে গেলাম আমরা। কিন্তু গিয়ে কি দেখলাম? দেখি, সালার সেপাই পাত্র মিত্র সবাই তাঁর পক্ষে। বিপক্ষে আমরা মাত্র মুষ্টিমের কয়েকজন! অবস্থা বুঝে সময়োচিত আচরণ না করলে কি উপায় ছিল? ঐ মুহূর্তে কথা বললেই চিহ্নিত হয়ে যেতাম আমরা। চাই কি মাথাটাও যেতে পারতো।

ঃ বটে!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ময়দানের লড়াই আর বুদ্ধির লড়াই এক জিনিস হুজুর। উভয় ক্ষেত্রেই আয়ত্তের বাইরে গেলে পিছু হটতে হয় আর এগুতে হয় কায়দা বুঝে। উল্টা পাল্টা করলে মরতেই হয় শুধু, কাজ কিছু হয় না।

ঃ তাহলে সেই কাজের কথাই বলুন? এখন কি করতে পারেন আপনারা?

কতলু খান সরবে বলে উঠলেন–করতে আমরা পারিনে এমন কাজ নেই জনাব! এখন যা প্রয়োজন, তা জনাবের সম্মতি। জনাবের ইরাদা যদি ঠিক থাকে, আর জনাব যদি শক্ত হয়ে দাঁড়ান, জনাবের জন্যে আমরা সবাই জান দিতে তৈয়ার!

হাঁসু খান বললেন– আমার অসম্মতির কোনই কারণ নেই। আমার সাথে চাতুরী যারা করেছে, তাদের সেই চাতুরী গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে দীলে আমার শান্তি নেই।

খুশির আবেশে শ্রীহরি ও কতলুখান একসাথে আওয়াজ দিলেন-হুজুর!

হাঁসু খান আক্রোশভরে বললেন–এ মসনদ আমার চাই-ই! এক দিনের জন্যে হলেও ঐ মসনদে বসতেই হবে আমাকে।

উল্লাসে আওয়ারা হয়ে উঠে কতলু খান উচ্চকণ্ঠে বললেন-ব্যস-ব্যস! জনাবের ইরাদা এই রকম মজবুত হলে, মসনদ আর আটকায় কে? ও মসনদ জনাবের।

হাঁসু খান বিস্মিতকণ্ঠে বললেন-আমার?

কতলু খান বললেন-বিলকুল-বিলকুল। এখন শুধু তুলে নেয়ার অপেক্ষা।

হাঁসু খান বিরক্ত হলেন। তিনি তিক্তকণ্ঠে বললেন–ওটা কি রাস্তা পথের লা-ওয়ারিশ মাল যে, ইচ্ছে করলেন আর টুপ্ করে তুলে নিলেন?

ঃ তাই বৈকি জনাব? ওয়ারিশকে সরিয়ে দিলেই লা-ওয়ারিশ। দাঁও বুঝে ঘা মারলেই সব ওয়ারিশ সাফ!

ঃ তারপর?

ঃ আমরা আছি। পরেরটুকু সামাল দিতে জনাব আমাদের হরওয়াক্ত পাশে পাবেন!

ঃ সাব্বাস্! এই বুদ্ধি আর এই কিসিমের চিন্তাভাবনা নিয়ে আমাকে মসনদে বসাবেন আপনারা?

ঃ জনাব!

ঃ সেই ঘা'টা মারার পর আমার মাথা কে বাঁচাবে? যে অপরিসীম শক্তি ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির মতো দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে, সেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত রোধ করার সাধ্য আছে আমার, না সাধ্য আছে আপনাদের?

কতলু খান ঘাব্ড়ে গিয়ে বললেন-তা কথা হলো–

ঃ মাতালের মতো আজগুবি একটা যা-ইচ্ছে–তাই বললেন আর হয়ে গেল? আপনার প্রলাপ শুনতে এসেছি আমি?

বইঘর.কম ও রোকন

কতলু খান কেবলই ইতস্তত করতে লাগলে। হাঁসু খান ফের ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন–বাস্তব কোন চিন্তাভাবনা আছে আদৌ আপনাদের, না মশ্‌করা করার জন্যে আপনারা ডেকে এনেছেন আমাকে'?

কতলু খান জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললেন–জ্বিনা জনাব, জ্বিনা। তা হবে কেন? চিন্তা ভাবনা কেন থাকবে না? মানে–

ঃ তাহলে বলুন ঐ বিশাল শক্তিকে ঘায়েল করার কি বুদ্ধি আছে আপনাদের, বলুন?

কতলু খান অতঃপর খাবি খেতে লাগলেন। তা দেখে শ্রীহরি রায় ধীরকণ্ঠে বললেন–অসম্ভব বলে তো এ দুনিয়ায় কোন কিছুই নেই হুজুর! সবই বুদ্ধি আর অধ্যবসায়ের ব্যাপার।

www.boighar.com

ঃ কি রকম?

ঃ ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে পথ তৈরি করে নিলে, গিরি-সাগর সবই পেরিয়ে যাওয়া যায়।

ঃ আপনিও ফের হেঁয়ালী শুরু করলেন? চিন্তাভাবনা কিছু থাকলে তা স্পষ্ট করে বলুন। বলুন, শক্তির ঐ দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর ধ্বসিয়ে দেয়ার পথ কি?

ঃ প্রাচীরের গোড়া আল্‌গা করে দিলেই প্রাচীর পড়ে যাবে হুজুর। কিছু সময় আর সাধনার প্রয়োজন, এই যা।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ হুজুর, সুলতানের বড় শক্তি তাঁর ভাই দাউদ খান আর সেনাপতি কালাপাহাড়। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁদের মতো এতবড় দুর্ধর্ষ লড়াকু আর তাণ্ডায় কেউ নেই। সেনাপতি সিকান্দার উজবেকই বলুন আর ইসমাইল খানই বলুন, তামাম সেপাই সালারদের মূল খুঁটি ঐ দুজনই। তাণ্ডার বর্তমান সামরিক শক্তির মূল স্রোত ওঁরাই। ঐ দুই জানবাজ আর দুর্জেয় লড়াকুর প্রভাবেই সবাই এত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন ঐ পক্ষে। মূলস্রোত যেদিকে ছোটে, পার্শ্বস্রোত তো ঘুরে ফিরে এসে ঐ মূলস্রোতেই মিলিত হয়। ঐ মূলস্রোত বা মূল খুঁটি নড়িয়ে দিলেই বাকিগুলো নড়বড়ে হয়ে যাবে।

হাঁসু খান আর কতলু খান বিপুল বিস্ময়ে শ্রীহরি রায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। শ্রীহরি রায় মুচকি হেসে বললেন-অবাক হচ্ছেন হুজুর?

হাঁসু খান সংশয়ের সাথে বললেন-হবারই তো কথা। আসমানের ঐ মেঘটা ফুটো করে দিলেই তামাম পানি ঝর ঝর করে জমিনে ঝরে পড়বে, শুনতে এটা যত বাস্তবই হোক, আসলে তো আষাঢ়ে গল্প মাত্র।

ঃ হুজুর!

ঃ একজন তাঁর ভাই আর একজন তার ভক্ত। ঐ খুঁটি নড়ানো আর মেঘ ফুটো করা একই ব্যাপার নয় কি? ওদের আপনি টলাবেন কোন শক্তির বলে?

ঃ শক্তি নয় হুজুর বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। ভায়ে ভায়ে বিভেদ সৃষ্টি করে দিন, পেছনের খুঁটি আপ্‌ছে আপ্‌ পেছন থেকে সরে যাবে।

ঃ রায় সাহেব!

ঃ উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলেই দাউদ খানের তলোয়ার খাপের মধ্যে চলে যাবে আর দাউদ খানের তলোয়ার কোষবদ্ধ হলেই কালাপাহাড়ও তৎক্ষণাৎ তলোয়ার খাপে তুলবেন। কারণ, কালাপাহাড়ের পিরীতটা বায়াজিদ খানের সাথে নয়, দাউদ খানের সাথে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কতলু খান বললেন–আলবত্‌-আলবত্‌! পিরীত বলে পিরীত? একদম ঘাড়ে আর গর্দানে। একটা ছাড়া অন্যটার অস্তিত্ব নেই। দাউদ খান বাঘের মুখে রওনা হলে, কালাপাহাড়ও বিনাপ্রশ্নে তার পেছনে ছুটবে, এটা আমরা জানি।

হাঁসু খান রুষ্টকণ্ঠে বললেন–এতই যদি জানেন, তাহলে এ কথাটাও বলে দিন, কি করলে ঐ ভায়ে ভায়ে কোন্দল পয়দা হবে?

ঃ তা মনে, দাউদ খানকে মসনদের লোভ দেখালে–

তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি রায় বললেন– মাথাটাই সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে আপনাকে। আসমানের তারার লোভ দেখালেও, ভায়ের সাথে বেঈমানী তিনি করবেন না।

কতলু খান মুষ্‌ড়ে পড়ে বললেন-তাহলে?

শ্রীহরি রায় বললেন–দীলে আঘাত হানতে হবে। দীলটা তার ভেঙ্গে দিন, দেখবেন, তাঁর চোখের সামনে এ দুনিয়া অন্ধকার।

ঃ দীলে আঘাত।

ঃ জি। আর সে আঘাত হানার মওকাটাও তৈয়ার হয়েই আছে।

কতলু খান বিপুল আগ্রহে বললেন-কি-রকম কি রকম?

শ্রীহরি রায় বিদ্রুপ করে বললেন-লোহানী সাহেব সেরেফ ঘরের মধ্যেই মুগুর ভাঁজেন আর বাঘ সিংহ মারার খোয়াব দেখেন। চারদিকে কি হচ্ছে আর চলছে, কোনই খবর রাখেন না। চারপাশের তামাম খবর রাস্তা পথের হাল হকিকত, বাঘ সিংহের গতিবিধি এ সব কিছু না জানলে আর এসব খবর না রাখলে, বাঘ সিংহ ঘায়েল করতে চাইলেন আর করলেন? এমন ইরাদা থাকলে চোখ কানগুলো সব সময় সক্রিয় রাখতে হয়।

ঃ রায় সাহেব।

ঃ হযরত-ই-আলার ইন্তেকালের আগে শাহজাদা দাউদ খানের শাদির কথা চলছিল, তা কি আপনি জানেন?

ঃ না তো!

বইঘর.কম ও রোকন

শ্রীহরি রায় হাঁসু খানকে উদ্দেশ্য করে বললেন-হুজুর তো নিশ্চয়ই শুনেছেন?

হাঁসু খান সাগ্রহে বললেন-জরুর-জরুর। আমাদের হেরেমের কথা। আমি তা শুনবো না বা জানাবোনা কেন?

ঃ পাত্রীটা কে, তাকি হুজুর জানেন?

ঃ আলবত জানি। আমাদের ফুলবাগিচার রক্ষক কে এক মুরাদ খান আছেন, তাঁরই নাকি নাতনী।

কতলু খান আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি অপার বিস্ময়ে বললেন –সে কি! এক তাজ্জব কথা! মুরাদ খানের নাতনী?

শ্রীহরি রায় বললেন-শুনলেনই তো। ফের প্রশ্ন করছেন কেন?

ঃ তা কি করে হয়? মুরাদ খানের মতো সামান্য একজন নওকরের ঘরে শাহজাদার শাদি?

ঃ হতে তো তাই যাচ্ছিলো।

ঃ শাহজাদা দাউদ খান তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন?

ঃ শুধুই রাজী? ঐ আশায় তিনি-হা-পিত্যেস্ করে বসেছিলেন আর আজও তাই আছেন।

ঃ মানে, ঐ ঘরের ঐ মেয়েকেই উনি নেবেন?

ঃ মাথায় তুলে নেবেন। না পেলে দিউয়ানা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই জিয়াদা।

ঃ তাহলে কি মুহাব্বত?

শ্রীহরি রায় হতাশ কণ্ঠে বললেন–লোহানী সাহেবের বুঝতে এত দেরি হলে তো আর পারিনে!

ঃ আহ্হা! দেরি হবে না কেন? নওকরের ঘরের মেয়ের সাথে শাহজাদার মুহাব্বত, এটা কি এক কথায় মগজে ঢোকার মতো বিষয়?

ঃ কেন, ঐ যে শুনেননি, "রূপোতে মজিল মন, কি বা হাড়ি, কিবা ডোম?"

ঃ সোবহান আল্লাহ্! এই রকম কারবার? মুরাদ খানের মতো, মানে ঐ একটা যাচ্ছেতাই পাত্রীর সাথে——

ঃ ওদের সব খবর কি জানেন?

ঃ আলবত জানি। ওদের হাঁড়ির খবর নাড়ির খবর–সব খবর জানি। মুরাদ খানের একটা নাতনী আছে-সে নাকি বেশ সুন্দরী, শুধু এটুকুই জানিনে। ওরা কে, কারা, আর কি, এসব খবরও মোটামুটি জানা আছে আমার। কিন্তু খোদ শাহজাদা তার মতো একটা মেয়ের পিরীতে হাবুডুবু খাবেন, এটা ভাবার কথাও নয়, আর আমি তা শুনিওনি।

ঃ এবার তো শুনলেন?

ঃ হ্যাঁ, শুনলামই তো!

ঃ এখন ঐ শাদিটা বরবাদ হয়ে গেলেই ঐ হাবুডুবু পিরীতটা বরবাদ হয়ে যায়। ঐ হাবুডুবু পিরীতটা বরবাদ হয়ে গেলেই, শাহজাদা দাউদ খানের মগজটাও বিলকুল বিগড়ে যাবে।

ঃ আচ্ছা! বড় চমৎকার দাঁও তো!

এসব কথা শুনে হাঁসু খানও তাজ্জব হয়ে বললেন–বলেন কি রায় সাহেব। কিছু কিছু কথা কানে আমার এলেও, এতটা তো শুনিনি? ব্যাপারটা এতদূর?

শ্রীহরি রায় বললেন–জি হুজুর। বড় তকলিফ করে এসব তথ্য যোগাড় করতে হয়েছে আমাকে। ব্যাপারটা এতদূরই। এখন ওঁদের ঐ শাদিটা ভেঙে যাক, দেখবেন অবস্থা কি দাঁড়ায়!

হাঁসু খান চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–তাতো বুঝতে পারছি। কিন্তু শাদিটা ভাঙবে কে?

ঃ সুলতান বাহাদুর ভাঙবেন। তাঁকে দিয়েই ভাঙতে হবে শাদিটা। খোদ সুলতান বেঁকে বসলে, শাদি আর হয় কি করে?

ঃ কিন্তু সুলতান তা বেঁকে বসবেন কেন? বেঁকে বসার কারণটা তাঁর কি? ঘর ওদের নিচু বলে?

হ্যাঁ, তাও একটা কারণ।

হাঁসু খান হেসে বললেন– সুলতানকে আপনারা জানেন না। ইসলামে উঁচু নিচুর ভেদ নেই। সুলতান যে কট্টর মুসলমান, তাতে নওকরের মেয়ে কেন, ভিক্ষুকের মেয়ে হলেও, সুলতানের নাখোশ হওয়ার কারণ নেই।

কতলু খান ফুঁসে উঠে বললেন-ইসলামে যে বিধানই থাক, যার বাপের ঠিকানা নেই, জন্মই যার বৈধ নয়, সেই মেয়েকে হেরেমে তুলবেন সুলতান?

হাঁসু খান সবিস্ময়ে বললেন–সেকি! বাপের ঠিকানা নেই মানে?

কতলু খান বললেন-ঐ মেয়ের বাপের পরিচয় কি, তা জানে কেউ? না তারা জানাতে তা রাজী?

ঃ কেন, ঐ মুরাদ খান?

ঃ কেউ নয়। সবই ওদের পাতানো সম্পর্ক। মুরাদ খানকে মেয়েটা বলে 'দাদু' আর তার আম্মা 'চাচা'। সব মুখের বোল্। রক্তের কোন সংশ্রব নেই।

ঃ তাজ্জব। আপনি এত খবর কোথা থেকে জানলেন?

ঃ আচানকভাবেই জেনে ফেলেছি জনাব। মাসুম গজনবী নামে দপ্তরে একজন সামানরক্ষী আছে। লোকটা আলাভোলা। একদিন হঠাৎ করে ওদের কথা উঠে পড়ায় আমি কেমন একটা গন্ধ পেলাম। আর নিছক কৌতুকের বশেই কায়দা করে জেনে নিলাম। তখন কি জানি এই জানাটা আমার এত কাজে লাগবে!

বইঘর.কম ও রোকন

কতলু খান আত্মতৃপ্তিতে হাসতে লাগলেন। হাঁসু খান বললেন– আচ্ছা!

নিজের জোশেই কতলু খান ফের বললেন–মেয়েটার বাপের নাম কি, কোথায় বাড়ি, একই বস্তির মানে একই বাড়ির লোক হয়ে ঐ মাসুম গজনবীই তা জানে না।

ঃ সেকি! গজনবী তা জিজ্ঞেস করেনি ওদের?

ঃ করেছে, কিন্তু জবাব পায়নি। জিজ্ঞাসা করলে ওরা নাকি খুব নাখোশ হয়। এ কথা কেউ জিজ্ঞাসা করুক, ওরা নাকি তা চায় না।

ঃ তাজ্জব!

ঃ মাসুম গজনবী না বললেও বুঝতে আমার বাকি নেই, নির্ঘাত ভেতরে ওদের কেলেংকারী আছে। কোথায় না কোথায় থেকে লুকিয়ে ছাপিয়ে এসে মুরাদ খানের ঘাড়ে চড়ে সমাজে ঠাঁই নিয়েছে। মুরাদ খান সহজ সরল মানুষ। চাচা বলে ডেকেছে আর অমনি সে গলে গেছে। কাজেই, এ কখখনো হতে পারে না জনাব। সুলতানকে সব কথা খুলে বলুন আপনি। বংশ পরিচয়হীন এমন একটা রাস্তার মেয়েকে কখনো সুলতান হেরেমে তুলে নেবেন না।

ঃ না–না, তাতো নেবেনই না। ব্যাপারটা এমন হলে তা নিতে তিনি পারেন না।

শ্রীহরি রায় বললেন-ব্যাপারটা এমনই হুজুর। লোহানী সাহেবের অজ্ঞতা নিয়ে যত মশ্‌করাই করিনে কেন, এ খবরটা উনি রেখেছেন। এ জন্যে লোহানী সাহেব যথেষ্ট তারিফের হকদার।

ঃ রায় সাহেব!

ঃ সুলতান বাহাদুরের সাথে কি হুজুরের কথাবার্তা চলে? মানে খোলামেলা আলাপ হয়?

হাঁসু খান সহাস্যে বললেন-তা হবে না কেন? একই মহলে থাকি আর সম্পর্কও আমাদের আলাপের সম্পর্ক। আমি তাঁর ভগ্নিপতি।

শ্রীহরি রায় খুশি হয়ে বললেন–তাহলে তো কাজটা খুব সহজ আছে হুজুর। যেভাবে হোক সুলতানকে বুঝিয়ে এ শাদি ভেঙ্গে দিন। শাদিটা ভেঙে গেলেই ভাইটি তাঁর তলোয়ার ফেলে আওয়ারা হয়ে ঘুরে বেড়াবেন। সেই সাথে আরো দেখবেন, ঐ কালাপাহাড়ের আগ্রহেও ভাটা নেমে এসেছে। তাঁর আসল লোক আওয়ারা হলে, তিনি আর স্থির থাকবেন কতক্ষণ?

ঃ রায় সাহেব!

ঃ ওঁরা দুইজন নড়বড়ে হয়ে গেলে ওদের স্থানে আস্তে আস্তে হুজুর গিয়ে দাঁড়াবেন। তারপর আস্তে আস্তে সেপাই সালার হাত করবেন। তারপর একদিন–

হাঁসু খান উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন–ব্যস্‌-ব্যস্‌-ব্যস্‌! আভি সমঝ্‌ লিয়া।

ঃ হুজুর!

হাঁসু খান বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন–আকেলমান্দকে লিয়ে ইশারাই কাফি!

নয়

দেশ যমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। হযরত-ই-আলার অভাব জনগণের অনুভূতিতে ম্লান হয়ে গেল। সুলতান বায়াজিদ খান কাররানী সে অভাব সার্থকভাবেই পূরণ করলেন। হযরত-ই-আলার স্মরণে তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের হা-হুতাশ দিনে দিনে স্তিমিত হয়ে এলো!

আম্মাবেগমও স্বামীর শোক সম্বরণ করে নিয়ে আস্তে আস্তে শান্ত হলেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে এলেন। একদিন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান বায়াজিদ খানকে ডেকে বললেন–বাপজান, তোমার আব্বাজানের অসমাপ্ত কাজটা তো এখন সমাপ্ত করতে হয়!

সুলতান বায়াজিদ খান বললেন–কোন কাজ আম্মিজান?

আম্মাবেগম বললেন–শাহজাদা দাউদের শাদিটা আর ধরে রাখা ঠিক হবে না। এ নিয়ে ইতিমধ্যে নানাজন নানা কথা বলতে শুরু করেছে। ওদের বংশ পরিচয় নিয়েও কথা তুলছে কেউ কেউ। শরিয়তের দৃষ্টিতে জিনিসটা ক্রমেই বেখাপ্পা হয়ে উঠেছে।

ঃ আম্মিজান!

ঃ তোমার আব্বাজানের আকস্মিক এই দুর্ঘটনার কারণে বিষয়টা এতদিন চাপা পড়ে ছিল। দাউদেরও এ নিয়ে কোন ভ্রূক্ষেপাদি ছিল না। এখন সেও নাকি আবার এ নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করেছে। একেবারেই কাছে পিঠে ওদের অবস্থান। কখন কোন দুর্নাম-বদনাম হয়ে যায়–

বায়াজিদ খান হেসে বললেন—না-না আম্মিজান, আমার ভাইকে আমি চিনি। সেসব কোন ভয় নেই।

ঃ বাপজান।

ঃ জান গেলেও আমার ভাই এমন কাজ করবে না, যা নিয়ে কেউ কথা বলার মওকা পায় বা যাতে করে মান সম্মান বিপন্ন হয়!

ঃ তা না হলেও এটাকে আর ঠেকিয়ে রেখে লাভ কি? শাদির কথাটা যখন জানাজানি হয়ে গেছে–

ঃ আম্মিজান।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তোমার তরফ থেকে কি কোন ওজর-আপত্তি আছে? মানে ওদের অবস্থা নিয়ে?

ঃ তওবা-তওবা! কি যে বলেন আম্মিজান? আমার মরহুম আব্বাজান যা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেননি, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলবো কেন? তাছাড়া, আমিও যতটা শুনেছি, গরীব হলেও ওঁরা শরীফ আদমি। www.boighar.com

ঃ তাহলে বাপজান, আমি চাই, আর দেরি না করে শুভ কাজটা সম্পন্ন করে ফেলো। একটা ঐ রকম বউ ঘরে এলে দাউদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন আসবে। আল্লাহর রহমতে সব দিক তো এখন ঠিকঠাক! কোন বালাই-বিপত্তি নেই। বলা যায় না, কখন আবার কোন ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড় তুমি!

ঃ তা ঠিক-তা ঠিক। মসনদ তো বারুদের স্তূপ। তাহলে তাই করি আম্মিজান। আমি অবিলম্বে এ ব্যবস্থা নিই।

ঃ হ্যাঁ, তাই নাও। এই ফাঁকে কাজটা সেরে ফেলো।

আম্মিজানের সাথে আলাপের পর সুলতান বায়াজিদ খান এই দিকেই মন দিলেন এবং শাদির ব্যাপারে আলোচনা ও চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। হেরেমে এ কথা জানাজানি হয়ে যেতেই ব্যস্তভাবে ছুটে এলেন সুলতানের ভগ্নিপতি হাঁসু খান। সুলতানকে নিয়ে নিরিবিলিতে বসে হাঁসু খান তাঁদের ভর্তিকৃত বিষের হাঁড়ি সুলতানের দু কানে উপুড় করে ঢেলে দিলেন। বিষের জ্বালায় সুলতান অস্থির হয়ে উঠলেন। ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করার কাজে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন।

শ্রীহরি রায়, বসন্ত রায়, কতলু খান ও তাঁর সহযোগী গাদ্দারের নিশ্চুপ কেউ ছিলেন না। পর্দার আড়াল থেকে বাতাস দিয়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁরা এই চটকদার কাহিনী বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কলংক কথা বাতাসের আগে ছোটে। দেখতে দেখতে এ কথা সাধারণ পর্যায় পেরিয়ে বিশেষ সভাসদ, কর্মচারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কানে কানে পৌঁছে গেল। ফলে, একজন পতিতার পিতৃপরিচয়হীন অবৈধ মেয়ের সাথে শাহজাদা দাউদ খানের শাদি হতে যাচ্ছে, এ নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জরণ ও ফিস্‌ফাস্‌ অন্তঃস্রোতা ফল্গুধারার মতো সর্বত্র প্রবাহিত হতে লাগলো।

সুলতান যখন তথ্য সংগ্রহ করতে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন, এ কথা তিনিই কেবল জানেন না। তিনি ছাড়া, এ কথা না-জানা লোক রাজধানীতে খুবই কম। সঠিক তথ্য না জানলেও, এ কথা তারা শুনেছেন, প্রায় লোকের কাছেই সুলতান এই একই খবর পেলেন। এতে করে সুলতানের কর্ণমূল গরম হয়ে গেল। তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং আম্মাজানকে ডেকে তামাম কথা বললেন। ঘটনা শুনে আম্মা-বেগম অত্যন্ত তাজ্জব হলেন। ক্ষণকাল তিনি কথা বলতেই পারলেন না। এরপর অবিশ্বাসের সুরে বললেন–না-না বায়াজিদ, এ কি করে হয়? এ সব মিথ্যা, এ সব গুজব! আমি এটা কিছুতেই বিশ্বাস করবো না।

বইঘর.কম ওয়েবিকা.

ক্লিষ্ট হাসি হেসে বায়াজিদ খান বললেন–বিশ্বাস করা না করা তো কারোর ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না আম্মাজান? ঘটনা নিয়ে কথা। সারা শহরের লোক যে ঘটনা জানে, হেরেমের মধ্যে থেকে এটা বিশ্বাস করিনে বললে তা চলবে কেন?

আম্মা বেগম তবুও হাল না ছেড়ে বললেন–কিসে চলবে, না চলবে, তা জানিনে। কিন্তু আমি নিজে ওদের যে আদব-আখলাক আর রুচিবোধ দেখে এলাম, তাতে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে, এত নিচু পর্যায়ের মানুষ ওঁরা!

ঃ এ দুনিয়ার কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না আম্মাজান। মানুষের বাইরের আচরণ দেখেই তার ভেতরের খবর সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তাঁদের ঐ আচরণ তো অভিনয়ও হতে পারে? এ দুনিয়ায় এমন মানুষ অনেক আছেন যাঁরা অভিনয়ে খুব পটু।

ঃ বায়াজিদ।

ঃ তাছাড়া, 'যা রটে তা কিছু কিছু বটে'। যতটা লোকে বলছে, ঠিক অতটা না হলেও, গলদ কিছু জরুর ওঁদের পেছনে আছে। যতটা দুধে-ধোওয়া আম্মিজান ওঁদের ভাবছেন, ততটা তাঁরা নন।

ঃ কিন্তু–

ঃ আর গলদটা উপেক্ষার যোগ্য না হলে, ও মেয়েকে ঘরে তোলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঃ বাপজান!

ঃ আপনি তো গিয়ে মেয়ের আম্মার সাথেই কথা বলে এসেছেন। মেয়ের আব্বার কি হদিস কিছু পেয়েছিলেন?

ঃ না–মানে, ঐ বৃদ্ধ মুরাদ খান ছাড়া ও মকানে আর কোন পুরুষ মানুষ দেখিনি। শুনলাম, ঐ মা-বেটি আর মুরাদ খান–এই তিনজনই ঐ মকানে থাকেন।

ঃ মেয়ের আব্বা কোথায় এটা জিজ্ঞাসা করেননি?

ঃ ওর আব্বা নাকি মারা গেছেন, এইটুকুই শুনেছি এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা আমি করিনি।

ঃ কিন্তু উনি কে, কোথায় বাড়ি, কি করতেন, এ সব কথা জানাও আপনার উচিত ছিল?

ঃ ছিল তা বুঝি। কিন্তু মারা যাওয়ার কথা শুনে ঐ মুহূর্তে এ নিয়ে আর অধিক প্রশ্ন করতে যাওয়াটা আমি সমীচীন বোধ করিনি। তাছাড়া, ওদের আচরণ দেখেও আমার মনে হয়েছে, আর যা-ই-হোক, সে লোক নেহায়েতই যাচ্ছেতাই কেউ হবেন না।

ঃ কিন্তু এখন যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সে লোকের আসলে কোন অস্তিত্বই নেই। ওরা আপনাকে প্রতারিত করেছেন।

ঃ বায়াজিদ!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ শাদির প্রস্তাব দেয়ার পরও ওঁরা যখন এ ব্যাপারে কোন কথাই বলেননি, এ দিকটা চেপে গিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তখন নির্ঘাত ওঁরা আপনার সাথে প্রতারণা করেছেন।

আম্মাবেগম নীরব হয় কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। অতঃপর বললেন–তাতে কি হয়েছে? কথাবার্তা, দিন-তারিখ কিছুই তো পাকাপোক্ত করা হয়নি। সেরেফ প্রাথমিক আলোচনাটাই করে এসেছি। পাকা যখন করা হবে, এ সব তথ্য অবশ্যই তখন নিতে হবে। সার্বিক অবস্থা না জেনে তো শাদি আমরা দিতাম না বা দেবো না?

বায়াজিদ খান আপত্তি করে বললেন–না আম্মাজান। পাকা করার কোন চিন্তাভাবনার এখন আর অবকাশ নেই। শাদি নিয়ে কোন কথাবার্তাই এখন আর চলতে পারে না। আগে আপনি আর একবার যান সেখানে। গোপনে আগে সমস্ত দিক ভাল করে জেনে আসুন। সন্তোষজনক হলে, একমাত্র তখনই আমি এ নিয়ে ফের কথাবার্তায় যাবো আর বিস্তারিত আলোচনার জন্যে তাঁদের নিয়ে বসবো। আপনি আগে যান।

আম্মাবেগম ইতস্তত করে বললেন–আমি?

ঃ হ্যাঁ আম্মিজান। উপযুক্ত পুরুষ মানুষ তো নেই ওখানে যে, আমি বা আমরা কেউ যাবো? মেয়ের আম্মাই যখন মেয়ের অভিভাবক আর আপনি যখন একবার গিয়েছিলেনও, তখন খবরটা আগে আপনিই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুন। ওঁরা প্রতারণা করছেন কিনা, এবার গিয়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। জনসমাজে অনেকখানি খেলো হয়ে গেছি। নিশ্চিতভাবে না জেনে এ নিয়ে পুনরায় ঘাঁটাঘাঁটি করে নিজেকে আরো অধিক খেলো করতে পারবো না।

আবার একটু চিন্তা করে আম্মাবেগম বললেন–ঠিক আছে। দু' একদিনের মধ্যেই তাহলে যাই আবার।

আম্মা বেগম দু' একদিনের মধ্যেই খবর নিতে চাইলেন। কিন্তু শাহজাদা দাউদ খান আর একদিনও ধৈর্য ধরতে চাইলেন না। জনগণের ঐ রটনা তাঁর কানেও পড়েছিল। প্রথমে তিনি যার কাছে এসব কথা শুনেন, তার উপর ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু পরবর্তীতে একের পর এক এই একই কথা শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এটা মিথ্যা এবং নিছক মিথ্যা–এই ধারণার উপর তিনি করণীয় স্থির করতে না পেরে আপাতত খামোশ হয়ে থাকেন। মায়ের সাথে ভায়ের এই আলোচনার বিষয়বস্তু. পেক্ষাপট ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তাঁর দীলেও সন্দেহের দোলা লাগে। ভাবতে চরম বেদনাদায়ক হলেও, তিনিও আসলেই প্রতারিত হয়েছেন কিনা, এটা যাচাই করে দেখার স্পৃহা তাঁর দীলেও জোরদার হয়ে ওঠে। ফলে, আম্মাজানের যাচাই করে আসার অপেক্ষায় তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। মুরাদ খানের তালাশে তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন।

'যা রটে তা কিছু কিছু বটে'–এই ধারণা শাহজাদা দাউদ খানকেও পেয়ে বসলো। দৌলতজাহানের বংশ পরিচয় নিয়ে এ যাবত আদৌ তিনি ভাবেননি। তাঁর খেয়াল হলো। এ নিয়ে তাঁরা কোনদিন কোন কথা বলেননি। কোন আভাস ইঙ্গিতও দেননি। মুরাদ খান দৌলতজাহানের দাদু, এইটুকু গন্ডীর মধ্যেই তাঁদের সব পরিচয় সীমিত হয়ে আছে। দৌলতজাহানের আচরণ ও প্রাণের স্পর্শের মধ্যে কোন ভেজাল বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র আভাসও নজরে তাঁর পড়েনি। তামাম অতীত বিশ্লেষণ করে কোন সন্ধানই তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না। অথচ এমন একটা প্রসঙ্গে তাঁদের এই হিম-শীতল নীরবতার হেতু কি?

শাহজাদা দাউদ খান বেশ কিছুটা উত্তেজিতভাবেই মুরাদ খানের দপ্তরে এসে ঢুকলেন এবং মুরাদ খানকে সামনে পেয়েই সরাসরি প্রশ্ন করলেন–আচ্ছা খান সাহেব, আপনি তো দৌলতজাহানের দাদু, তাই নয় ?

মুরাদ খান আকস্মিক এই প্রশ্নের হেতু খুঁজে পেলেন না। তিনি থতমত করে বললেন–জি হুজুর, জি।

শাহজাদা ফের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন–তিনি কি আপনার ছেলের মেয়ে, না মেয়ের মেয়ে ?

www.boighar.com

ঃ জি হুজুর ?

ঃ দৌলতজাহান আপনার কোন দিক দিয়ে নাতনী? ছেলের দিক থেকে, না মেয়ের তরফ থেকে?

মুরাদ খান হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে না পেরে ফের তিনি থতমত করে বললেন–তা মানে, হুজুরের কথাটা–

ঃ বুঝতে পারছেন না? এটা কি এমনই কোন দুর্বোধ্য কথা?

ঃ জি না হুজুর। তবে–

ঃ সেই তবেটা কি? দৌলতজাহানের কেমন দাদু আপনি?

ঃ হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন করছেন হুজুর ?

এই সোজা কথার জবাবটা মুরাদ খান সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারছেন না দেখে শাহজাদা শংকিত হয়ে উঠলেন। সন্দেহ তাঁর ঘনীভূত হতে লাগলো। তিনি রুষ্টকণ্ঠে বললেন–'কেনটা আমার ব্যাপার। সে ব্যাখ্যা আপনাকে দিতে আসিনি। আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

ঃ হুজুরের প্রশ্নের জবাব?

ঃ ভনিতা করছেন কেন? আমি কি আপনার সাথে মশ্‌করা করতে এসেছি!

মুরাদ খান খামোশ হয়ে গেলেন। শাহজাদার এত উগ্র আচরণ তাঁর কাছে এই প্রথম। মাথাটা মেঝের দিকে নিয়ে ধীরকণ্ঠে বললেন–না হুজুর দৌলতের আমি আপন দাদু নই। সে আমার ছেলের মেয়েও নয়, মেয়ের মেয়েও নয়।

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা চমকে উঠে বললেন–তবে?

ঃ সে আমাকে দাদু বলে, আমি তাকে নাতনী বলি, এই আর কি?

ঃ পাতানো সম্পর্ক আপনাদের?

ঃ জি হুজুর।

ঃ তাহলে দৌলতজাহানের পিতৃ পরিচয় কি? কে তাঁর দাদু, কে তাঁর আব্বা?

ঃ হুজুর!

ঃ দৌলতজাহানের আব্বা কে? পরিচয় কি তার ?

মুরাদ খান নীরব হয়ে গেলেন। তিনি নতমস্তকে চুপ করে রইলেন। তা দেখে দাউদ খান ফের বিপুল বিস্ময়ে বললেন–এটাও কি দুর্বোধ্য প্রশ্ন কিছু?

ঃ জি না হুজুর, তা নয়।

ঃ তাহলে জবাব দিচ্ছেন না কেন?

ঃ জবাব দেয়ার সাধ্য আমার নেই হুজুর।

শাহজাদার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠলো। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন–তার মানে! আপনি তাঁর পিতৃপরিচয় জানেন না?

ঃ আমি এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারবো না হুজুর।

ঃ তাজ্জব! পারবেন না কেন ?

ঃ দৌলতজাহানের আম্মার নিষেধ আছে। একমাত্র তিনি এ প্রসঙ্গে যা বলার তা বলতে পারেন। তাঁর এযাযত ছাড়া, আমি কাউকে কিছু বলতে পারবো না।

অবশ হয়ে শাহজাদা পাশের একটা কুরসীর উপর থপ্ করে বসে পড়লেন। এরপর কাঁপতে কাঁপতে বললেন–তার অর্থ, দৌলতজাহানের জন্মকাহিনী তাহলে বলার মতো নয়?

ঃ বলার মতো কিনা, সে কথা নয় হুজুর। বলতে আমি পারবো না, কথা আমার এই।

ঃ কেন আপনি পারবেন না? তাঁর কোন পিতৃপরিচয় নেই বলে?

ঃ বললামই তো হুজুর, দৌলতের আম্মার অনুমতি ছাড়া, এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলার আমার উপায় নেই। এ ব্যাপারে নিজে আমি কাউকে কিছু বলবো না--এই মর্মে দৌলতের আম্মাকে আমি কথা দিয়ে রেখেছি। আমি আমার ওয়াদা ভাঙবো কি করে?

শাহজাদা দাউদ খান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন–আপনি একজন প্রতারক!

ঃ হুজুর!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আপনার সরলতা, ভক্তি, সাধুতা–সবই মেকী, সবই জাল। জেনে শুনে সবাই আপনারা আমার সাথে প্রতারণা করছেন।

মুরাদ খান দুঃখিত কণ্ঠে বললেন–এতটাই মনে করলেন হুজুর?

ঃ হুজুর তা সখ করে মনে করতে যাবেন কেন? আপনাদের চালাকিটা ফাঁশ হয়ে গেছে বলেই তা ধরে ফেলেছেন।

ঃ চালাকি।

ঃ নইলে এমন কি ব্যাপার হলো যে, দৌলতজানের আম্মার এযাযত ছাড়া তাঁর পিতৃ পরিচয়ের ব্যাপারে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না!

ঃ হুজুর না বুঝলে আর আমি কি করবো?

ঃ না বুঝলে মানে?

ঃ বলছিই তো হুজুর তার আম্মাকে আমি কথা দিয়েছি।

ঃ আমিও তো সেই কথাই বলছি, কথা দেয়ার কারণটা কি? একজনের পিতৃপরিচয় এমন আঁটশাঁট করে গোপন করার হেতুটা কি? নিশ্চয়ই তাঁর জন্মঘটিত ব্যাপারটা রহস্যজনক? নিশ্চয়ই একটা মস্ত বড় গলদ আছে সেখানে যার জন্যে আপনার এই লুকোচুরি?

ঃ হুজুর–

ঃ বুঝতে আমার আর বাকি নেই যে, দৌলতজাহান তাঁর মায়ের এক অবৈধ সন্তান।

মুরাদ খান আর সহ্য করতে পারলেন না। এ কথায় তিনি দ্রুতবেগে মাথা তুলে শক্তকণ্ঠে বললেন–দোহাই হুজুর! প্রয়োজন হলে মাথায় আমার লাঠি মারুন, তবু আমার অপারগতার সুযোগ নিয়ে এভাবে আমাদের অপমান আপনি করবেন না!

ঃ অপমান!

ঃ অবশ্যই হুজুর। হুজুরের কাছে এমন আচরণ কখনো আমি আশা করিনি। হুজুরের মানসিকতা এত খাটো বলে আমি ভাবিনি।

দাউদ খান চিৎকার করে বললেন– মুরাদ খান সাহেব? বিন্দুমাত্র না টলে মুরাদ খান বললেন—পেটের দায়ে হুজুরের আমি নকরী করতে এসেছি ঠিকই, কিন্তু মান সম্মান বলে নওকরদেরও একটা কিছু আছে, এ দিকটা হুজুর আদৌ ভাববেন না জানলে, এ নকরী করতে আমি আসতাম না। দৌলতজাহানের আম্মাও মনে প্রাণে চাননি, আমি হুজুরদের নকরী করি।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ দুনিয়ার মুনিব একজন। কোন নওকরের ইজ্জতে হাত দেয়ার অধিকার অন্য কোন মুনিবেরই নেই। একটা অক্ষমতা বা অসুবিধার কারণেই যে মুনিব আমাদের এত জঘন্য মনে করেন, সে মুনিবের অধীনে আর নকরী করা সম্ভব নয় আমার।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ খান সাহেব!

ঃ জনাবের এতদিন আমি যে পরিচয় পেয়েছি, তাঁকে আমি এযাবত যেভাবে জেনেছি, সে জানাটা আমার এমনভাবে মিথ্যা হয়ে যাবে, এটা আমি কল্পনাও করিনি। সবলের সাথে দুর্বলের আন্তরিকতা আসলেই টিকে না। জিন্দেগীর এই শেষ প্রান্তে এসেও এই শিক্ষাই নতুন করে লাভ করলাম আমি!

ঃ মুরাদ খান সাহেব!

ঃ প্রতারণার অপবাদ নিয়ে আর এক মুহূর্তও আমি হুজুরের খেদমত করতে রাজী নই। মেহেরবাণী করে আমাকে অব্যাহতি দিন।

শাহজাদা দাউদখানের চমক ভাঙলো। তিনি উপলব্ধি করলেন, ক্রোধের বশে সত্যিই এই বৃদ্ধের দীলে অধিক পরিমাণ আঘাত করেছেন। নিজেকে সংযত করে নিয়ে শাহজাদা এবার বললেন–তা–মানে আপনাকে তো অপমান করতে চাইনি আমি। একটা সহজ কথার জবাব আপনি দিতে চাচ্ছেন না বলেই তো–

ঃ থাক জনাব। কোন জবাবদিহির মধ্যে আর আমি নেই। এত নিচে নেমে একটা বিষয়ের উৎস সন্ধান করলে, সে সন্ধান দেয়ার রুচি কোন লোকেরই থাকে না।

পুনরায় শাহজাদা রুষ্টকণ্ঠে বললেন–খান সাহেব–

ঃ হুজুরের আমি নওকর। হুজুরেরা এ মুলুকের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। ইচ্ছে করলে তিনি আমার মাথাটাই নিয়ে নিন, তবু আর কোন প্রশ্ন আমাকে করবেন না–এটুকু করুণা আমি করজোড়ে ভিক্ষা চাচ্ছি।

মুরাদ খান দুহাত জোড় করলেন। তাঁর চোখের পাতা ভিজে এলো। দাউদ খান বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন–খান সাহেব!

মুরাদ খান ধরা গলায় বললেন–এই শেষবেলা আর কসুর নেবেন না হুজুর! আর আমি নিজেকে সামলে নিতে পারছিনে। আপাতত আমি যাই–

মুরাদ খানের কণ্ঠস্বর একেবারেই গাঢ় হয়ে গেল। অসমান পদক্ষেপে তিনি দপ্তর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরে ফিরে মুরাদ খান এসব কথা কাউকেই কিছু বললেন না। বিষণ্ন মনে একা একা চুপচাপ বসে রইলেন অসুখ-বিসুখ করছে কিনা জানতে চাইলে সংক্ষেপে 'না' বলে তিনি দৌলতজাহান ও তাঁর আম্মাকে কোন মতে বিদায় করলেন। বাইরের ঐ রটনাটা ইতিমধ্যে দৌলতজাহান ও তাঁর আম্মা দিনারবানুর কানেও এসে পড়েছিল। তাঁরা ভাবলেন, ঐ সব কুৎসার কথা শুনেই হয়তো মুরাদ খান সাহেব এতটা মনমরা হয়ে গেছেন এবং একা থাকতে চাইছেন। রটনাটা একেবারে ভিত্তিহীন হলেও, তাঁরা নিজেরাও এ ব্যাপারে অনেকটা ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তাঁরা এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর

সাথে তৎক্ষণাৎ আলাপে বসতে গেলেন না। সময় সুযোগ মতো এ নিয়ে তাঁরা বিস্তারিত আলোচনায় বসবেন বলে স্থির করলেন।

কমবেশি সকলেই মানসিকভাবে পীড়িত থাকায় রাতটা গুমোট ভাবেই কেটে গেল। প্রত্যেকদিন প্রত্যুষেই কাজে যাওয়ার জন্যে মুরাদ খান সাহেব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কাজে যাওয়ার সময় আজ উত্তীর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। তবু মুরাদ খানকে একেবারেই নিচেষ্ট দেখে মা-বেটি উভয়েই তাজ্জব হয়ে গেলেন। তাঁরা এসে তাঁর এই নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আলতু ফালতু কিছু ওজর আপত্তি দেখিয়ে মুরাদ খান প্রথমে এঁদের নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা একেবারেই নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলে, মুরাদ খান অবশেষে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– নকরী আর আমি করবো না আম্মিজান।

দিনারবানু ও দৌলতজাহান উভয়েই হতবাক হয়ে গেলেন। লহমা খানিক নীরব থেকে দিনারবানু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন–তার অর্থ কি চাচা?

ঃ নকরী করা আর আমার সম্ভব নয়।

ঃ কেন চাচা, সম্ভব নয় কেন?

মুরাদ খান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন-মান সম্মান বেচে দিয়ে নকরী করবো আমি? এ কখখনো হবে না।

আরো অধিক বিস্মিত হয়ে দিনারবানু বললেন-তাজ্জব! ব্যাপারটা কি খুলে বলুন তো চাচা? কেউ কি আপনার মান সম্মানে আঘাত দিয়ে কথা বলেছেন?

ঃ নইলে কি আর অমনি বলছি? গরীব হতে পারি, কিন্তু কেউ মান সম্মানে আঘাত দিলে, তার সাথে আমার আপোষ নেই।

ঃ কে আপনার মান সম্মানে আঘাত দিলেন?

ঃ কে আবার? যা কোনদিন কল্পনাও করিনি, সেই লোক। খোদ শাহজাদা দাউদ খান।

মা মেয়ে উভয়েই যারপরনাই চমকে উঠলেন। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে দিনারবানু সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন-কে কে? কে অপমান করেছেন?

ঃ বলছিই তো, খোদ শাহজাদা দাউদ খান।

ঃ সেকি! তিনি আপনাকে অপমান করেছেন?

ঃ অপমান বলে অপমান? আমাদের মান ইজ্জত কিছুই তিনি রাখেন নি।

দৌলতজাহানের দুই চোখে আঁধার নেমে এলো। তিনি আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন-দাদু-

দিনারবানু কাঁপতে কাঁপতে বললেন-ঘটনা কি চাচা? এ যে আমি কল্পনাও করতে পারছিনে। কি ঘটেছে, সব কথা খুলে বলুন তো শুনি?

আফসোসে ও অভিমানে মুরাদ খান কিছুক্ষণ দম ধরে রইলেন। এরপর নিঃশ্বাস ফেলে তিনি ধীরে ধীরে ঘটনাসহ তামাম কথা বর্ণনা করে শোনালেন। সব কথা শুনার পর দিনারবানু একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। নিঃশ্বাস ফেলার কথাটাও খেয়ালে তাঁর রইলো না। দৌলতজাহানের অবস্থা হলো শরবিদ্ধ পাখীর চেয়েও করুণ! মুরাদ খানের বিবরণে গোটা আসমান সশব্দে তাঁর মাথার উপর ভেঙ্গে পড়লো। দাউদ খানের আচরণ, তাদের সম্বন্ধে দাউদ খানের ধারণা এবং তাঁর জন্মঘটিত ব্যাপারে খোদ দাউদ খানের উক্তি এত জঘন্য হতে পারে, এটা তিনি কস্মিনকালেও চিন্তা করতে পারেন নি। এ সব কথা শুনার পর দৌলতজাহানের হৃদয়ের তারগুলো ছিড়েকেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। গলায় ছুরি দেয়া পশুর মতো অব্যক্ত যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে করতে নিজ কক্ষে ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়ে ডুক্‌রে উঠলেন।

মুরাদ খানের মকানে অতঃপর এক নিঃসীম নীরবতা নেমে এলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক স্থানে চুপচাপ বসে রইলেন। এক্ষণে কি তাঁদের করণীয়, এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো কোন খেয়ালই তাঁদের কারো রইলো না।

অবস্থা যখন এই রকম থমথমে ঠিক সেই সময় মুরাদ খানের মকানে এলেন বাঙ্গালা মুকুলের আম্মাবেগম। আম্মাবেগমের বাঁদী এসে তাঁর আগমন সংবাদ দিতেই দিনারবানু তড়িৎ বেগে নিজেকে সামলে নিলেন এবং যথাসম্ভব সম্মানের সাথে আম্মাবেগমকে এনে নিজ কক্ষে বসালেন। সংবাদ পেয়ে দৌলতজাহানও চুপি চুপি এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন।। আসন গ্রহণ করেই অন্য কোন কথাবার্তায় না গিয়ে আম্মাবেগম দিনারবানুকে বললেন—বহিন, সেবার এসে আমি কেবল শাদির প্রস্তাবটাই দিয়ে গেছি, কিন্তু আসল খবরটা মোটেই করা হয়নি।

এ কথার তাৎপর্য দিনারবানু আঁচ করলেন। তবু না বুঝার ভাব করে তিনি বললেন- কিসের খবর হুজুরাইন ?

আম্মাবেগম বললেন—কনের পিতৃপরিচয় বহিন। মানে, তার বংশ পরিচয়। এটা না জেনেই আমি শাদির প্রস্তাব দিয়ে গেছি। এটা মোটেই আমার ঠিক হয়নি।

কেন হুজুরাইন, মানুষ বড়, না বংশ বড়?

ঃ মানে?

ঃ স্বভাবে-চরিত্রে শিক্ষায়-দীক্ষায় মানুষ যদি উন্নত মানের হয়, সেখানে তাঁর বংশটা কি অধিক কিছু বিবেচ্য বিষয়?

ঃ কেন, তা হবে না কেন? বংশ পরিচয় ছাড়া কি কোন মূল্য আছে মানুষের?

ঃ কিন্তু হুজুরাইন, কেউ যদি অসৎ আর খন্নাস্ মানুষ হয়, কিন্তু তার বংশ যদি উচ্চ হয়, তাহলেই কি সেই মানুষ মূল্যবান মানুষ হবে?

ঃ আমি অতশত বুঝিনে বহিন। বিয়ে শাদির ব্যাপারে বংশের মূল্য অনেক। ওটা ছাড়া তো শাদিই হতে পারে না।

ঃ হুজুরাইন!

ঃ আপনার মেয়েকে খুব আমার পছন্দ। কিন্তু বংশটা যদি মনের মতো না হয়, তাহলে আমার ও পছন্দের কানাকড়িও দাম নেই। তাই, কনের বাপ-দাদা, অর্থাৎ তার বংশপরিচয় চাই আগে।

ঃ ওটাই যদি এত আপনাদের প্রয়োজন, তাহলে আর কাঙালের ঘরে শাদির প্রস্তাব আনলেন কেন হুজুরাইন? রাজা-বাদশাহ আমির-উমরাহ তো কম নেই দুনিয়ায়?

ঃ কি বলতে চান আপনি?

ঃ কাঙাল, কাঙালই। তার আবার বংশ পরিচয় কি?

ঃ তাজ্জব! পাত্রীর জন্মের ঠিক আছে কিনা, আদৌ তার বাপ বলে কেউ আছে কিনা, এটা জানতে হবে না?

দিনারবানু এঁদের মানসিকতা আঁচ করে মনে মনে গোস্বা হলেন।

নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি সংযত ও বিস্মিত কণ্ঠে বললেন-আদৌ বাপ আছে কিনা?

ঃ হ্যাঁ। তা আছে কিনা, জানতে হবে না?

ঃ যদি তা না থাকে?

আম্মাবেগম রুষ্টকণ্ঠে বললেন—তাহলে শাদি হবে না। জন্ম যার অবৈধ, সেই মেয়ের সাথে একটা মুলুকের শাহজাদার শাদি হবে, এটা ভাবেন কি করে?

ঃ বেশ, তাহলে তাই হোক হুজুরাইন?

ঃ মানে?

ঃ আমার মেয়ের সাথে শাহজাদার শাদি দিয়ে কাজ নেই।

আম্মাবেগম ভয়ানক বিস্মিত হলেন। গোস্বাও হলেন সেই সাথে। গোস্বাভরে বললেন—সেকি! তাহলে যা শুনছি তাই-ই ঠিক? আপনার মেয়ের বাপ নেই?

ঃ তা থাকুক না থাকুক, সে খোঁজে আর দরকার কি হুজুরাইন।

শাদিই যখন হবে না, তখন আর ওসব খবরের দরকার কি?

ঃ সে কি কথা বলছেন আপনি? খবরটা যদি ভাল হয়, তাহলে তো শাদি আমরা দেবোই।

ঃ কিন্তু আমি তো শাদি দেবো না হুজুরাইন।

ঃ তার অর্থ?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ একটা পিতৃপরিচয়হীন অবৈধ মেয়েকে শাহজাদার সাথে শাদি দিতে উদ্যত হয়েছি আমি, এ রকম একটা হীন ধারণাও যখন সবাই আপনারা পোষণ করতে পারেন, তখন চাইলেও তো আমার মেয়েকে আপনাদের ঘরে কখখনো আমি পাঠাবো না। এই রকম মানসিকতার সাথে আমার মেয়ের মানসিকতা কখনো খাপ খাবে না।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে আম্মাবেগম বললেন-আপনি আমাকে অপমান করছেন?

ঃ কাঙাল পেয়ে হুজুরাইন তো আমাদের কম অপমান করলেন না?

ঃ বটে! শাক দিয়ে মাছ ঢেকে মান খুঁজে বেড়াচ্ছেন? নিজের মেয়ের কে বাপ, এটা বলার সাহস যার নেই, তার আবার মান সম্মান?

ঃ হুজুরাইন!

ঃ আমি সব চালাকি ধরে ফেলেছি আপনার। শাহজাদার শাদি এখানে হবে না। আমার প্রস্তাব আমি তুলে নিয়ে গেলাম।

ঃ সেটা হুজুরাইনের মেহেরবানী।

আর একটা কথাও না বলে আম্মাবেগম গোস্বাভরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ঐ ভাবেই বাদীকে নিয়ে মহলের দিকে রওনা হলেন।

০ ০ ০

মুরাদ খানের মকান থেকে মহলে ফিরে এসেই আম্মাবেগম আখেরী আওয়াজ তুললেন। তিনি সুলতান বায়াজিদ খানকে জানালেন- বাইরে যা লোকজন বলাবলি করছে তা সম্পূর্ণ সত্য, জার্‌রামাত্র অতিরঞ্জিত নয়। মেয়েটার ঠিকই কোন পিতৃ-পরিচয় নেই। মেয়ের মা সে পরিচয় কিছুই দিতে পারেনি। মায়ের সে ঠিকই একজন অবৈধ সন্তান।

www.boighar.com

খবর শুনে সুলতান বায়াজিদ খান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ নিয়ে তিনি আর একটা কথাও বললেন না। শাহজাদা দাউদ খানের দীলে যে ক্ষীণ একটা আশার আলো ছিল, মায়ের এ খবরে সেটুকু টুপ করে নিভে গেল। নিরাশার অথৈ তলে তিনি নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

তবুও যা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কারো মনে যৎকিঞ্চিৎ হেথা হোথা ছিল, পরের দিন সকালেই তা সাফ হয়ে গেল। পরের দিন সকালেই ইতর-ভদ্র সকলেই অবাক হয়ে দেখলেন, মুরাদ খানেরা নেই। মকানটি যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে; মা, মেয়ে, মুরাদ খান, রাতারাতি সকলেই সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন। সন্দেহের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রইলো না। তামাম লোক নিশ্চিতভাবে জেনে গেলেন, মুরাদ খান একজন প্রতারক! মা-মেয়ে ঐ দুইজন শুধু প্রতারকই নয়, তারা পতিতা।

শ্রীহরি রায়ের চিন্তাভাবনা খাপে খাপে মিলে গেল। শাহজাদা দাউদ খান আওয়ারা হয়ে গেলেন। ক্ষোভে দুঃখে ও আত্মগ্লানির দহনে তিনি বিকারগ্রস্ত হলেন। নিদারুণ এই মর্মপীড়া সামাল দিতে না পেরে তিনি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। অপরিসীম লজ্জার ভার মাথায় নিয়ে কয়েকদিন আর বাইরে বেরুতে পারলেন না।

অভাবনীয় আঘাতের সীমাহীন উত্তেজনায় শাহজাদা দাউদ খান দৌলতজাহানের উপর অবিমিশ্রভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে রইলেন। তাঁর জন্মঘটিত ব্যাপার আর তাঁর প্রতারণার দিকই প্রথম প্রথম কিছু দিন শাহজাদার কাছে একমাত্র ধর্তব্য দিক হয়ে রইলো। চিন্তার এই স্বল্প পরিসর গন্ডী তাঁকে অহর্নিশ ক্ষিপ্ত করে রাখলো।

কিন্তু দিন যত অতিবাহিত হতে লাগলো, শাহজাদার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র ততই প্রসারিত হতে লাগলো। দৌলতজাহানের অকৃত্রিম ঐ আচরণ, তাঁর অন্তরের ঐ অনুপম সুবাস ক্রমেই এই চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়তে লাগলো। এ সব দিক দীলে যতই ঘনীভূত হতে লাগলো, শাহজাদার মনের গতি ততই ভিন্ন দিকে মোড় নিতে লাগলো। দৌলতের প্রতি ততই তিনি আকৃষ্ট ও প্রসণ্ন হতে লাগলেন।

অবশেষে এক সময় ক্রোধ-আক্রোশের স্থলে শাহজাদার দীলে মানবিক চিন্তাভাবনা স্থান করে নিলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, দৌলতজাহানের প্রতি তাঁর ক্ষিপ্ত হওয়ার যুক্তি নেই। অকারণেই দৌলতের উপর তাঁর ক্ষিপ্ত হওয়া অন্যায়। মানুষ তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়, মানুষ দায়ী তার কর্মের জন্যে। সে প্রেক্ষিতে দৌলতজাহান নিষ্পাপ। বিচারে দৌলতজাহান নিরাপরাধ। দৌলতজাহান একজন অনন্যা রমণী। রূপের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, অন্তরের সুবিমল সুষমায় দৌলতজাহান এ জাহানে সর্বজনের সর্বকালের কাঙ্ক্ষিতা এক নারী। একজন বাঞ্ছিতা বান্ধবী, ইপ্সিতা জীবনসঙ্গিনী। তাঁদের ঐ নিবিড় দিনগুলিতে দৌলতজাহানের মধ্যে তিনি যে আচরণ দেখেছেন, অন্তরের যে স্পর্শ পেয়েছেন, হৃদয়ের যে আবেদন উপলব্ধি করেছেন তা শুধু অনাবিল আর অকৃত্রিমই নয়, তা একান্তই দুষ্প্রাপ্য এবং অনেক পুণ্যের জোরে লাভ করার মতোই এক অমূল্য সম্পদ।

দৌলতজাহানের মধ্যে শাহজাদা দাউদ খান সাকুল্যে যে ত্রুটিটুকু খুঁজে পেলেন, তা হলো দৌলতজাহানের ভীরুতা। তিনি ভেবে দেখলেন, তাঁর কাপুরুষোচিত মানসিকতাই তাঁদের এই অনিষ্টের কারণ। দৌলতজাহান যদি কথায় কথায় কোনদিন একবারও সাহস করে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শাহজাদাকে খুলে বলতেন, সাময়িকভাবে যতটাই অতৃপ্তিকর হোক, শাহজাদা তা সামলে নিতে পারতেন এবং এ দিকটা সামাল দেয়ার পথ করতে পারতেন। আরো পারতেন, জন্মের জন্যে নির্দোষ এই মহিলাটির তামাম জড়তা বিমোচন করে দিতে। কিন্তু দৌলতজাহান চিরনীরব রয়ে গেলেন। ভুলেও তিনি ভাবলেন না, জিন্দেগীর এমন একটা অপরিহার্য দিক চিরকাল লুকিয়ে রাখা যাবে না। কোনদিন না কোনদিন প্রকাশ এটা পাবেই আর তা প্রকাশ করতেও হবেই।

বইঘর.কম ও রোকন

কয়েকদিন একটানা লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রইলেন শাহাজাদা। তারপর তিনি একদিন সাহস করে বাইরে এলেন। দীলে তিনি এই শক্তি সঞ্চয় করলেন যে, দৌলতজাহানের জন্ম নিয়ে যত কথাই থাক, দৌলতজাহান নিজে একটি অনন্য কুসুম। এ কুসুমের সুবাস পাওয়ার কিস্‌মত সাধনাতেও সব মানুষের হয় না। সে কিস্‌মতের অধিকারী একমাত্র শাহজাদা দাউদ খানই ছিলেন। এই বল বুকে নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং কারো কোন উৎসাহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তিনি আপনভাবে কাল কাটাতে লাগলেন।

দৌলতজাহানের ব্যাপারে এইরকম উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন এবং অলস আক্ষেপের মধ্যে দিয়ে শাহজাদার যখন দিন কাটতে লাগলো, তখন একদিন সেনাপতি কালাপাহাড় কথায় কথায় বললেন—ছোট হুজুর, আপনারা যে যা-ই চিন্তা করুন, আমি কিন্তু এখনো পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নই।

উদ্বেগহীন কণ্ঠে শাহজাদা প্রশ্ন করলেন—কোন ব্যাপারে চাচা?

কালাপাহাড় সাহেব বললেন—দৌলতজাহান আম্মির জন্ম বৃত্তান্তের ব্যাপারে।

ঃ কেন চাচা, এত ঝাঁকাঝাঁকি করার পরও ফল যখন কিছু এলো না, তখন আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

ঃ ছোট হুজুর, সব প্রশ্নের জবাব কি এক কথায় দেয়া যায়?

ঃ চাচা!

ঃ দৌলতজাহান আম্মির সাথে আমার বেশি আলাপ নেই। কিন্তু তাঁদের আদব-আখলাক আর শিষ্টাচারের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, সর্বোপরি, দৌলতজাহানের আম্মা দিনারবানু বেগমের সাথে কথা বলার কালে যে ব্যক্তিত্ব আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি, কোন অসৎ মহিলার ব্যক্তিত্ব এমন হতে পারে না। এতটা সংযত, সম্ভ্রান্ত আর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব একমাত্র সর্বতোভাবে নিষ্কলুষ আর নিষ্পাপ ব্যক্তির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।

শাহজাদা দাউদ খান ম্লান হাসি হেসে বললেন—দুনিয়াটা বড়ই রহস্যময় চাচা। মানব চরিত্রও তাই। একদিক দেখে আর দিক কিছুই বোঝার উপায় নেই।

ঃ অর্থাৎ!

ঃ কলুষমুক্ত হলে আর ব্যক্তিত্বের জোর থাকলে কেউ কি এভাবে পালিয়ে যায়? মিথ্যা হলে, কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কি মিথ্যাকে এইভাবে ভীরুর মতো মেনে নেয়? বুকে বল থাকলে এর মোকাবেলায় অবশ্যই তাঁরা দাঁড়াতেন।

ঃ তাতে ফল কি হতো। জেহাদ করে নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করার পর তাঁদের মতো মানুষ কি আর শাহজাদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে আসতেন? না সে রুচি তাঁদের থাকতো? অনর্থক তিক্ততা বৃদ্ধি করতে আসবেন কেন তাঁরা?

ঃ চাচা?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ সমানে সমানে হলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। কিন্তু তাঁরা যেখানে গরীব আর ব্যবধানটা বিরাট, সেখানে তো এ প্রশ্ন প্রকট!

শাহজাদা পুনরায় ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললেন—কিসের উপর যুক্তি খাড়া করছেন চাচা? তলাটাই নেই যেখানে, সেখানে এই উপর-বুনোনির মূল্য আছে কিছু?

ঃ তা যা-ই বলুন শাহজাদা, কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, তাঁদের এ পরিচয় সত্য নয়। আসল পরিচয় অন্ধকারেই রয়ে গেছে।

ঃ চাচাজান!

ঃ যা প্রকাশ পেয়েছে তাকেই অন্ধভাবে সত্য মনে না করে, আরো গভীরে সন্ধান করলে হয়তো পৃথক ফল বেরুতো।

ঃ সত্যিই আপনার এই ধারণা চাচা?

কালাপাহাড় সাহেব অনুনয় করে বললেন—এইভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে না থেকে একটু চেষ্টা করুন ছোট হুজুর। নিজে আবার ভাল করে খবর নিন।

শাহজাদা উদাস কণ্ঠে বললেন—তা নিয়েই বা আর ফায়দা কি চাচা? হয়তো দেখবো, ইতিমধ্যেই তিনি আমার নাগালের বাইরে চলে গেছেন।

ঃ শাহজাদা!

ঃ আমাদের জানা খবর সত্যিই যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তো তাঁরা রাগ অভিমান করে অন্য কিছু করে বসতে পারেন!

ঃ দৌলতজাহান আম্মি এত জলদি শাহজাদার প্রতি এত কঠিন হবেন, এ কি শাহজাদার ধারণা হয়?

ঃ তা বলা যায় কি করে? মানুষের মাথায় কখন কোন খুন চাপে!

ঃ তা সে যা-ই হোক, ফলাফলটা শুভ হলে, শাহজাদার দীলে এই সান্ত্বনা তো থাকতো যে, যাকে তিনি এত ভালবেসেছিলেন তিনি আসলে নোংরা কিছু নন, একজন সহি-সাফ ইনসান?

শাহজাদা দাউদ খানের দীল আবার টনটন করে উঠলো। সীমাহীন হতাশার মাঝে তিনি একটা প্রেরণা খুঁজে পেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ঠিক আছে চাচা। ডুবা কিস্তি আবার একটু সেঁচেই তাহলে দেখি!

ঃ শাহজাদা

শাহজাদার চোখেমুখে বেদনা ফুটে উঠলো। তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন—কিঞ্চিৎ সান্ত্বনাও যদি মিলে, এই ভরাডুবির বাজারে তার মূল্যই বা কম কি চাচা?

বইঘর.কম ও রোকন

সেনাপতি কালাপাহাড়ের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে এসে শাহজাদা দাউদ খান নয়া উদ্যমে আবার অনুসন্ধানের কাজে মনোনিবেশ করলেন এবং মুরাদ খানদের চেনাজানা মানুষের কাছে লোক পাঠাতে লাগলেন। তা দেখে শাহজাদার খাসবান্দা কোরবান আলী এক সময় শাহজাদাকে বললো—হুজুর, এ ব্যাপারে আমার কাছে একটা ছোট্ট খবর আছে।

শাহজাদা সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—কি রকম?

কোরবান আলী বললো—ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে আমাদের দুলাহ মিয়া হাঁসু খান হুজুরকে একদিন বলতে শুনলাম, মুরাদ খানের সাথে এক বাড়িতে বসবাসকারী মাসুম গজনবী নামের কে একজন সামানরক্ষী আছেন, তিনিও নাকি মুরাদ খানদের ঐ ভেতরের খবর জানেন না।

শাহজাদা বিরক্ত হয়ে বললেন—তাহলে আর এটা এমন কি খবর হলো?

কোরবান আলী সাহস করে বললো—আমার বিশ্বাস হুজুর, কে এই মাসুম গজনবী, তাঁকে ডেকে নিলেই হয়তো হদিস কিছু পাওয়া যেতো। একই বাড়িতে থাকতেন যখন তাঁরা—

শাহজাদা উৎকর্ণ হয়ে বললেন—কোরবান আলী—

ঃ আর না হোক হুজুর, অন্তত তাঁদের আত্মীয় স্বজনের খবর কিছু দিতে পারতেন। কারা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, কারা তাদের কাছে আসতেন যেতেন, এটা তো তিনি দেখেছেন!

উৎসাহিত হয়ে উঠে শাহজাদা বললেন—ঠিক ঠিক, একথা মন্দ বলোনি!

শাহজাদা তাই করলেন। খোঁজ করে মাসুম গজনবীকে ধরে আনার জন্যে তিনি পাইক পাঠিয়ে দিলেন। যথাসময়ে মাসুম গজনবীকে সাথে নিয়ে পাইক এসে হাজির হলে শাহজাদা মাসুম গজনবীকে নিয়ে এক নির্জন কক্ষে বসলেন।

শাহজাদা দাউদ খানের তলব নিয়ে অকস্মাৎ পাইক গিয়ে হাজির হওয়ায় মাসুম গজনবী ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। শাহজাদার সামনে বসে কেবলই তিনি কাঁপতে লাগলেন। তা দেখে শাহজাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন—ভয় নেই। আপনার কোন কসুরের জন্যে আপনাকে ডাকিনি। আমি কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে।

মাসুম গজনবী আশ্বস্ত হয়ে বললেন—হুজুর!

ঃ আপনি তো আমাদের ফুলবাগানের রক্ষক মুরাদ খান সাহেবকে চিনতেন?

ঃ জি হুজুর, চিনতাম।

ঃ কি করে চিনতেন?

ঃ এককালে আমরা আমাদের ঐ বস্তিতে একজায়গায় থাকতাম হুজুর। এরপর যখন আমরা হুজুরদের দেয়া সরকারী মকানে উঠে এলাম, তখনও আমরা এক জায়গাতেই ছিলাম। আমাদের মধ্যে যাতায়াত ছিল।

ঃ তাই নাকি? আপনি আমাদের ঐ ফুলবাগানের পাশের মহল্লায় থাকতেন?

ঃ জি হুজুর। এখনও আমি সেখানেই আছি।

ঃ আচ্ছা। তা মুরাদ খানেরা হঠাৎ করে কোথায় চলে গেলেন, তা কি কিছু বলতে পারেন?

ঃ জি না হুজুর।

ঃ তাঁদের কোথায় কোন আত্মীয়-স্বজন আছেন, তা কি আপনি জানেন?

ঃ তাও ঠিক জানিনে হুজুর। কোন আত্নীয়-স্বজনকে আসতে তো এখানে দেখিনি, তবে কহলগাঁওয়ে দু' একবার তাঁরা যেতেন।

ঃ তাহলে আপনার কি ধারণা, তাঁরা সেখানেই গেছেন?

ঃ এটাও তো ধারণা করা শক্ত হুজুর। তাঁরা চলে যাবেন এইটুকুই কেবল বলেছিলেন। কহলগাঁওয়ে না কোথায় যাবেন, এমন কোন ইংগিতই তাঁরা দেননি।

শাহজাদা উদগ্রীব হয়ে বললেন—তারা চলে যাবেন, এ কথা আপনাকে বলেছিলেন?

ঃ জি হুজুর, আমাকে আর আমার স্ত্রীকে তা বলেছিলেন।

ঃ কবে সে কথা বলেছিলেন?

ঃ যে রাতে তাঁরা চলে গেলেন হুজুর, সেইদিন সাঁঝরাতে। তখন কি আর জানি, ঐ রাতেই চলে যাবেন তাঁরা!

ঃ হু! তা ওদের পরিবারের মোটামুটি খবর তো আপনি জানতেন, তাই নয়?

ঃ জি, তা জানতাম।

ঃ ঐ দৌলতজাহানের পিতা কে, তাঁর নাম কি, তা কি আপনি জানেন?

মাসুম গজনবী ঘাব্ড়ে গেলেন। কিছুটা আনমনা হয়েও গেলেন তিনি। কি বলবেন, স্থির করতে না পেরে, কেবলই তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে শাহজাদা ফের বললেন— ঘাবড়ানোর কারণ নেই। আপনি যে তা জানেন না, আমি শুনেছি। আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই এটা জিজ্ঞাসা করছি।

ঃ হুজুর !

ঃ আপনি তো আগেই নাকি কাকে বলেছেন, এ বিষয়ে কিছুই আপনি জানেন না!

ঃ জি। তখন তাই বলেছিলাম।

ঃ এখনও তো তাই বলবেন, না অন্য কথা আছে?

ঃ জি হুজুর, আছে।

শাহজাদা সজাগ হয়ে বললেন—আছে?

ঃ জি। তখন আমি জানতাম না। কিন্তু এখন অল্প কিছু জানি। শাহজাদা চমকে উঠলেন। চমকে উঠে বললেন—জানেন? দৌলতজাহানের পিতৃপরিচয়, মানে তার জন্ম-বৃত্তান্ত জানেন?

ঃ জি না হুজুর, অতটা জানিনে। তবে একটা কথা জানি।

ঃ কি জানেন?

ঃ দৌলতজাহান কোন অবৈধ সন্তান নন। তিনি যোগ্য পিতারই সন্তান।

পুনরায় চমকে উঠে শাহজাদা আকুলকণ্ঠে বললেন—আছেন? তাঁর পিতা আছেন?

ঃ জি না হুজুর, এখন নেই। তিনি মারা গেছেন।

ঃ গজনবী সাহেব!

ঃ তিনি নাকি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ছিলেন।

ঃ বলেন কি! তাহলে কে তিনি? কি নাম? কোথায় মকান?

ঃ আমি এর বেশি আর কিছুই জানিনে হুজুর।

ঃ জানেন না?

ঃ জি না হুজুর।

ঃ কিছুই জানেন না?

ঃ জি না।

বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠে শাহজাদা ফের হতাশ হলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—তাহলে এ কথাই বা জানলেন আপনি কোথায়?

ঃ ঐ দৌলতজাহানের আম্মার কাছে হুজুর।

ঃ কবে এ কথা জানলেন?

ঃ যে রাতে তাঁরা তাণ্ডা ছেড়ে চলে গেলেন, ঐদিন সাঁঝরাতে দৌলতজাহানের আম্মা আমাদের, মানে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এইটুকুই শুধু বললেন।

ঃ তাজ্জব! তাহলে এতদিন যা বললেন না, ঐ সময়ে আপনাদের তিনি সে কথা বললে গেলেন কেন?

ঃ কথায় কথায় বললেন হুজুর। আমি আর আমার স্ত্রী যে দৌলতজাহানের আম্মাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি। বাইরের ঐ কুৎসার কারণে আর পাঁচজনের মতো আমরাও তাদের ঘৃণা করতে পারি বলেই কথায় কথায় এ কথা তিনি বললেন।

ঃ কি বললেন?

ঃ বললেন, দেখো গজনবী, এ দুনিয়ার কিছু মানুষ কতই না নোংরা! একজন সম্মানী আর নামজাদা পিতার সন্তানের ব্যাপারেও কি জঘন্য বদনাম ছড়াতে পারে তারা!

শাহজাদা ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—তখনই আপনি সেই লোকের নাম পরিচয় জানতে চাননি?

ঃ চেয়েছি হুজুর। কিন্তু দৌলতের আম্মা এড়িয়ে গিয়ে বললেন— "থাক, ও সব নিয়ে এখন আর কথা বলে কি হবে!" আমি আর একটু পীড়াপীড়ি করতেই উনি ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—"আর পাঁচজনের মতো তুমিও তাহলে সন্দেহ করো আমাকে?" এরপর আর প্রশ্ন করতে সাহস করিনি হুজুর!

একটু থেমে শাহজাদা ফের বললেন—তাহলে এ কথাটা আমাদের কাছে গোপন করলেন কেন তাঁরা? কেন আমাদের বললেন না?

মাসুম গজনবী বললেন—তা বলতে পারবো না। তবে প্রথমেই নাকি হুজুরেরা তাদের চূড়ান্তভাবে অপমান করেছেন, আম্মাবেগমও এসে নাকি অনেক খারাপ কথা বলেছেন। আমার মনে হয় সেই জন্যেই তাঁরা গোস্বা করে বলেন নি।

ঃ গজনবী সাহেব!

ঃ এটা আমার ধারণা হুজুর। স্রেফ ধারণা।

শাহজাদা নির্বাক হয়ে গেলেন। নীরবে বসে এ কথার যথার্থতা অনুভব করতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে চমক ভাঙার মতো হঠাৎ তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন—তখনই আপনি তাহলে এ খবরটা জানান নি কেন আমাদের? একটা ভুলের উপর এত কিছু ঘটে যাচ্ছে দেখেও আপনি চুপচাপ রয়ে গেলেন? একটুও আমাদের জানালেন না?

মাসুম গজনবীও ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— জানাতাম, হুজুর, পরের দিন সকালেই জানাতাম। কিন্তু সকালে যেই দেখলাম, তাঁরা আর নেই, তখন আর সাহস করিনি!

ঃ কেন— কেন?

ঃ তাঁরাও নেই, আমিও এটুকু ছাড়া আর কোন কিছু জানিনে। আমার সেরেফ এইটুকু জানার মুল্য কি হতো হুজুর?

ঃ গজনবী সাহেব!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ ওদিকে আবার হুজুরদের সাথে তাঁরা আর কিছুতেই কুটুম্বিতা করবেন না, এ কথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে আমি আবার কোন ফ্যাসাদে পাড়ি, এই ভয়ে জানাইনি হজুর। ভাবলাম, যা চুকেবুকে গেছে, তা নিয়ে আর ঘাঁটা ঘাঁটি না করতে যাওয়াই ভাল।

শাহজাদা আফসোস্ করে বললেন—উঃ! কি সর্বনাশ আপনি করেছেন গজনবী সাহেব! সকালেই যদি এটুকুই আপনি জানাতেন, তাহলে তখনই তালাশ করে হয়তো তাঁদের নাগাল ধরতে পারতাম আমি। এখন কোথায় না কোথায় তাঁরা চলে গেলেন–

শাহজাদা ছটফট করতে লাগলেন। মাসুম গজনবী ভীতকণ্ঠে বললেন— কসুর আমার মাফ হয় হুজুর।

জবাবে শাহজাদা কোন মতে বললেন—আপনি এবার আসুন—

গজনবী সাহেব ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে গেলেন। শাহজাদা টলতে টলতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

সেনাপতি কালাপাহাড়ের নসিহত ফলপ্রসূ হলো। তাঁর ধী-শক্তির প্রতি শাহজাদার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। ভরাডুবির বাজারে সত্যিই তিনি মস্তবড় সান্তনা খুঁজে পেলেন। দৌলতজাহানের পিতৃপরিচয় আছে। সম্মানজনক পিতৃপরিচয়। যার সাথে এপ মুহাব্বত ছিল তাঁর সে রমণীর অতীত আদৌ হীন নয়। তুচ্ছ বা ম্লান নয়। অতীত তাঁর উজ্জ্বল। জন্ম ইতিহাস সফেদ। শাহজাদার দীলে আলোর পরশ লাগলো। অপরিসীম লজ্জার অন্ধকার সরিয়ে দীল তাঁর রোশনাই হয়ে উঠলো। শাহজাদা সান্তনা খুঁজে পেলেন।

এই সান্তনাই আবার শাহজাদাকে অশান্ত করে তুললো। নিছক এক ভ্রান্তির ঘোরে যে অঘটন ঘটে গেছে, তা সংশোধনের জন্যে ফের অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। যে নিরপরাধ, তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়ার বেদনায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন। বিছানা থেকে উঠে তিনি শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমেই তিনি প্রতিবাদ নিয়ে স্বজনদের কাছে ছুটে গেলেন। কুৎসার কণ্ঠরোধ করতে শাহীমহল তোলপাড় করে তুললেন। নানা জনকে নানাভাবে আসল তথ্য জানালেন।

কিন্তু এত করেও তিনি ফের দমে গেলেন। তাঁর উৎসাহের অনুপাতে সাড়া তেমন পেলেন না। তাঁর আম্মাজান যদিও বা কিছুটা বিশ্বাস করলেন, তাঁর অগ্রজ সুলতান বায়াজিদ খান আদৌ কোন গুরুত্ব এতে দিলেন না। ধাপ্পাবাজী বলে এক কথায় এ তথ্য নাকচ করে তিনি সরাসরি মন্তব্য করলেন—ছলনায় যারা অভ্যস্ত, এমন ভিত্তিহীন অনেক কথাই তারা অনায়াসে অনেককে বলতে পারে।

শাহজাদা হোঁচট খেলেন। কিন্তু তিনি থামলেন না। কারো কাছে তেমন কোন আশা-উৎসাহ না পেয়ে আবার তিনি সেনাপতি কালাপাহাড়ের শরণাপন্ন হলেন। কালাপাহাড় সাহেব শুনামাত্রই একথা লুফে নিলেন এবং সোল্লাসে বলে উঠলেন—আলহাম্‌দুলিল্লাহ! এই হলো আসল ঘটনা।

বইঘর.কম

উৎসাহ পেয়ে শাহজাদা বললেন—সত্যি চাচা? আপনি তাই মনে করেন?

ঃ মনে করার কথা নয়। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ছোট হুজুর। আমার পর্যবেক্ষণ এই কথাই বলে। এই হলো আসল তাঁর পরিচয়।

ঃ চাচাজান!

ঃ খোলামকুচি নয়, রত্ন। এ খবর একদম নিশ্চিত। এখন তা পাওয়ার আশা করলে, হাতগুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না শাহজাদা? মাটিটা খুঁড়তেই হবে!

ঃ চাচা হুজুর!

শাহজাদার দৃষ্টিতে অসহায়তা লক্ষ্য করে কালাপাহাড় সাহেব চাপ দিয়ে বললেন- রত্নের খনি জেনেও কেউ খুঁড়তে নারাজ হলে, রত্নের প্রতি সে ব্যক্তির আসলেই কোন আগ্রহ নেই, এটা তার কেবলই এক অলস কৌতূহল, এইটুকুই প্রমাণ করে ছোট হুজুর। এর অধিক আর আমার কিছু বলার নেই।

দশ

কালাপাহাড় সাহেবকে আর অধিক বলতে হয়নি। শাহীমহলের নিরবচ্ছিন্ন নিরুৎসাহে শাহজাদা দাউদ খানের গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজন ছিল তাঁর বিশ্বাস সমর্থনের। দরকার ছিল বাড়তি কিছু উৎসাহের। তাঁর জঙ্গীচাচার কাছে তিনি সবই তা আশার অধিক পেয়ে গেলেন। গজনবীর দেয়া খবরটা কেউ বিশ্বাস না করলেও শাহজাদা তা অবিশ্বাস করতে পারেননি। এক্ষণে, তাঁর ঐ বিশ্বস্তজনের অবিচল বিশ্বাস সেই সাথে যোগ হওয়ায় তিনি দুর্বার হয়ে উঠলেন। অনুসন্ধান করার জন্যে নানাদিকে লোক পাঠিয়েই ক্ষান্ত তিনি হলেন না, নিজেও অনুসন্ধানে রেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এবার লক্ষ্য দৌলতজাহানের পিতৃ-পরিচয়ই নয় শুধু, দৌলতদেরও খুঁজে পাওয়া চাই তাঁর।

মওকাও তিনি পেয়ে গেলেন। এই সময় পাটনার দুর্গ মজবুত করে তোলার কাজ জোরদারভাবে চলছিল। মুঘল হামলা রোধ করার শক্তিশালী ঘাঁটি। এই নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করার দায়িত্ব শাহজাদা দাউদ খানের উপর অর্পণ করে সুলতান বায়াজিদ খান অবিলম্বে তাঁকে পাটনায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের এ নির্দেশ শাহজাদা লুফে নিলেন। নির্দেশ পালনের জন্যে তিনি খোশদীলে তৈরি হয়ে গেলেন। পাটনায় পৌঁছানোর পথেই তাঁর সামনে পড়বে কহলগাঁও ও অন্যান্য এলাকা। কহলগাঁওয়ে দৌলতদের কিছু আত্মীয় বা পরিচিতজন আছেন। সবার আগে এই দিকেই তাঁর তালাশ করা প্রয়োজন ছিল। এ আদেশ তাঁর প্রয়োজনের পথ সুগম করে দিলো। কালবিলম্ব না করে শাহজাদা দাউদ খান বাছাই বাছাই সেপাইয়ের ক্ষুদ্র একটি নিরাপত্তা বাহিনীসহ তাঁর খাসবান্দা কোরবান আলীকে সঙ্গে নিয়ে পাটনার পথে রওয়ানা হলেন।

তাণ্ডা থেকে পাটনায় যাওয়ার দুইপথ। জলপথ ও স্থলপথ। জলপথ গঙ্গানদী। পাটনা শহর তাণ্ডার মতোই গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই গঙ্গানদীর তীরে তীরে সামনে পড়ে শরকিগলি, চম্পা, কহলগাঁও, মুঙ্গের—ইত্যাদি বর্ধিষ্ণু শহর ও নদীবন্দর। স্থলপথে রওনা হলেও, এসব এলাকার কোনটার উপর দিয়ে কোনটার পাশ দিয়ে পাটনায় যাওয়া যায়। সন্ধান কাজের সুবিধার্থে শাহজাদা বজরা নিয়ে নদীপথে রওনা হলেন। চৌকশ দাঁড়িমাল্লা শক্ত হাতে দাঁড় টেনে ও পালতুলে উজান স্রোতে বজরা ছুটিয়ে চললো।

বইঘর.কম ও রোকন

প্রথমেই সামনে এলো শরকিগলি, এরপর চম্পা। শাহাজাদা এসব স্থানে না থেমে একটানা কহলগাঁওয়ে এসে বজরা ভিড়িয়ে দিলেন এবং দৌলতজাহানদের আত্মীয় স্বজনের সন্ধান কাজে বেরুলেন। নিরাপত্তা দলটি দূরে দূরে রেখে কোরবান আলীকে সঙ্গে নিয়ে শাহাজাদা বসতির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

সন্ধান করতে শুরু করেই শাহজাদা বুঝতে পারলেন, এ কাজটি বড় কঠিন কাজ। সেই সাথে বুঝতে পারলেন, কেন তাঁর অনুচরেরা অচিরেই কিছু উদ্ধার করতে পারছে না। দৌলতজাহানের পরিবারটি তাঁদের কাছে যত চেনাই হোক, একান্তই এই সাধারণ মানুষগুলির বাইরে কোন অস্তিত্বই নেই। কহলগাঁওয়ের যে দু'চারজন শাজহাদাকে চিনতেন, দেখামাত্রই তাঁরা কাছে ছুটে এলেন। যারা চিনতেন না, তাঁরা ও শাহাজাদাকে এক সম্ভ্রান্ত মুসাফির মনে করে কাছে কোলে আনাগোনা করতে লাগলেন। এঁদের সবাইকে শাহজাদা এক এক করে দৌলতজাহানদের আত্মীয় স্বজনের হদিস জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তাঁর চেনাজানা লোকেরাও খবর করতে লেগে গেলেন। কিন্তু ফল কিছু হলো না। বেলাভর মহল্লায় মহল্লায় ঘুরেও শাহজাদা কোন হদিসই পেলেন না। তাণ্ডা শহরের কে বা কোন্ দৌলতাজাহান আর দিনার বানুর কলগাঁওয়ে কে বা কোন্ আত্মীয় স্বজন আছেন, এ খবর শাহজাদাকে কেউ দিতে পারলো না। ঘুরে ঘুরে কোরবান আলী হতাশ হয়ে গেল, কিন্তু শাহাজাদা দমলেন না।

বজরায় ফিরে আহার অন্তে শাহজাদা দাউদ খান পুনরায় বেরুলেন। ঘুরে ঘুরে শেষ বেলায় তিনি এক বৃদ্ধ লোকের সন্ধান পেলেন। বৃত্তান্ত শুনে এই লোকটি এগিয়ে এসে বললেন–হ্যাঁ হুজুর, আমার বাড়ীর পাশেই একঘর লোক বাস করতেন। ঐ রকম নামেরই এক সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে তাণ্ডার এক ভদ্রমহিলা তাঁদের মকানে মাঝে মধ্যে আসতেন। কিন্তু আমার সেই প্রতিবেশী তো আর এখানে থাকেন না। তিনি সপরিবারে চলে গেছেন।

শাহজাদা সবিস্ময়ে বললেন–চলে গেছেন মানে?

ঃ গৌড়ে সেবার পর পর যে কয়েকটা লড়াইয়ের হুটপিট হয়ে গেল, সেই সময় সেখান থেকে চার-পাঁচটা পরিবার এখানে এসে সাময়িকভাবে বসবাস করতে থাকে। পরে তারা সকলেই আবার স্বস্থানে বা অন্যস্থানে চলে যায়। এই পরিবারটা এ পর্যন্ত এই কহলগাঁওয়েই ছিল। অল্প কিছুদিন আগে রুজির ধান্দায় তাঁরাও আবার সাসারামের দিকে কোথায় যেন চলে গেলেন।

শাহজাদা নিরাশ হয়ে প্রশ্ন করলেন–তাহলে ঐ দৌলতজাহানদের কেমন আত্মীয় হতেন তাঁরা, তা কি কিছু জানেন?

ঃ জি না, তেমন কিছু জানিনে। তবে শুনেছি, নিয়ামতুল্লাহ সাহেব নামের এক প্রখ্যাত আলেম গৌড়ের সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের শাহী মহলে গৃহ শিক্ষক ছিলেন। আমার ঐ প্রতিবেশীর আব্বা সেই আলেমের কি রকম এক ভাই

বইঘর.কম ও রোকন
হতেন। সে লোক তো মারা গেছেন, তাঁর ছেলেই এখানে ছিলেন। তাণ্ডার ঐ মহিলারাও ঐ আলেম সাহেবের কে না কে হতেন। সেই সূত্রে ঐ মহিলারা এঁদের এখানে আসতেন।

ঃ এর বেশী আর কিছুই আপনি জানেন না?

ঃ জি না হুজুর, আমি আর জানিনে।

ঃ তাহলে এমন কাউকে কি জানেন, যিনি এ ব্যাপারে হদিস কিছু দিতে পারেন?

ঃ তেমন তো কাউকে জানিনে হুজুর। তবে ঐ আলেম সাহেবের খাদেমের বাড়ি শুনেছি ঐ মুঙ্গেরে। আলেম সাহেবের নাকি বিশ্বস্ত সঙ্গী আর নওকর। আলেম সাহেবের জীবিত অবস্থায় উনি নাকি আলেম সাহেবের কাছ-ছাড়া হননি। আলেম সাহেব মারা গেছেন সেই কবে! উনাকে এখন হয়তো ঐ মুঙ্গেরেই পেতে পারেন।

ঃ তাতে আর কি সুবিধে হবে?

ঃ আর না হোক, আলেম সাহেবের কে কি রকম আত্মীয়, কে কোথায় থাকেন, এসব খবর তো কিছু কিছু দিতে পারবেন?

ঃ হ্যাঁ তা বটে। আচ্ছা ওসব থাক। আপনি বলুন তো, তাণ্ডার ঐ মহিলারা বা তাঁদের কোন বৃদ্ধলোক ইদানিং এদিকে এসেছিলেন কি না? মানে অল্পদিনের মধ্যে আপনি তাঁদের কাউকে এদিকে দেখেছেন কি না?

ঃ জি না। প্রায় বছর খানেক হলো, আমি আর তাঁদের কাউকে দেখিনি।

শাহজাদা ঐ বৃদ্ধ লোকটির মকানের কাছে গেলেন। তার চার পাশের আর কয়েক ঘর লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিন্তু ঐ বৃদ্ধের কথার অতিক্তির কোন তথ্যই তিনি পেলেন না।

ফিরে এসে শাহজাদা বজরা ভাসিয়ে দিলেন। তিনি স্থির করলেন, পাটনার কাজ শেষ করে ফেরার পথে তিনি ঐ আলেম সাহেবের নওকরের খোঁজ করবেন। দৌলতজাহানদের আত্মীয় নন, আলেম সাহেবের নওকর। তদুপরি, তাণ্ডা থেকে আসা ঐ মহিলারা দৌলতজাহানেরাই না অন্য কেউ, এ নিয়েও শাহজাদার দীলে খট্‌কা রয়ে গেল। ফলে, ঐ নওকরকে তালাশ করার উপর আপাততঃ তেমন গুরুত্ব তিনি দিলেন না। কিন্তু বজরা যখন মুঙ্গেরের কাছে এলো, তখন শাহজাদার মনের গতি ঘুরে গেল। দুর্বল উৎস হলেও, এর আকর্ষণ তিনি এড়িয়ে যেতে পারলেন না। মুঙ্গেরের বজরা ঘাটে বজরা ভেড়ানোর আদেশ দিলেন।

মুঙ্গেরে এসে আলেম নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের নওকরকে খোঁজ করার মধ্যে শাহজাদা একটা সুবিধে দেখতে পেলেন। কহলগাঁওয়ে তাঁর সবচেয়ে যে বড় অসুবিধে ছিল তা হলো, আউরাত নিয়ে কারবার। খ্যাতি শ্রুতিহীন সাধারণ দুই মহিলার ভিন দেশে আত্মীয় স্বজন খোঁজ করে বের করা একদিকে যেমন আঁধার ঘরে সুঁই খুঁজে বেড়ানো,

বইঘর.কম ও রোকন
অন্যদিকে তেমনই খোদ শাহজাদা হয়ে গৈ গেরামের আউরাতের মতো দুইজন সাধারণ মেয়ের আত্মীয় স্বজন খোঁজ করাও দৃষ্টিকটু ব্যাপার। খোঁজ করার কালে অনেকের দৃষ্টিতেই অনেক কৌতূহল লক্ষ্য করেছেন তিনি। ফলে তিনি অনেকখানি সংকোচবোধ করেছেন। এই নওকরের বেলায় সেসব বালাই নেই। নিজে তিনি তুচ্ছলোক হলেও, তাঁর পরিচিতি তুচ্ছ নয় । বিখ্যাত এক আলেমের তিনি নকওর। এই মুঙ্গেরেই তাঁর বাড়ি। কেউ চিনুক, চাই না চিনুক, তাঁর খোঁজ করার মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

মুঙ্গেরের ঘাটে বজরা ভিড়িয়ে দিয়ে শাহজাদা তখনই বজরা থেকে নামলেন না। খোঁজ করার কাজে আগে সেপাই আর অনুচরদের প্রেরণ করলেন। নওকরটির সন্ধান বা অন্য কোন উৎস পেলেই তাঁকে তা তৎক্ষণাৎ জানানোর নির্দেশ দিয়ে তিনি তাদের বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

অনুসন্ধান চলতে লাগলো। শাহজাদা উদগ্রীব হয়ে বজরার মধ্যে বসে রইলেন। অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কাউকেই খবর নিয়ে ফিরে আসতে না দেখে শাহজাদা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বজরার মধ্যে কেবলই উঠবোস্ করতে লাগলেন। আরো কিছুক্ষণ পর এক সেপাই হতাশচিত্তে ফিরে এসে জানালো, সেই খাদেম বা নওকরের এক কালে এখানেই বাড়ি ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল আগে থেকেই সে আর এখানে থাকে না। তার বাড়িঘরও নেই।

শাহজাদা প্রশ্ন করলেন–এ খবর তুমি কোথায় পেলে?

সেপাইটি বললো–পথিমধ্যে হুজুর। রাস্তার মাঝে এক লোক এই খবর আমাকে দিলেন। এর বেশী সে লোক আর কিছুই জানে না।

ঃ সে খাদেমের বাড়ি যেখানে ছিল, সেখানে তুমি গিয়েছিলে?

ঃ জি না হুজুর। তার বাড়ি নাকি এই শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। সেখানে তার কেউ নেই।

শাহজাদা রুষ্ট কণ্ঠে বললেন–এই হলো তোমাদের সেপাইয়ের মগজ। তার কেউ না থাকলেও তার প্রতিবেশীরা তো আছেন? তাঁরা তো আরো খবর দিতে পারতেন তোমাকে?

সেপাইটি সসংকোচে বললো–জি হুজুর, তা বোধহয় কিছু পারতেন।

ঃ কিছু নয়, অনেকটাই পারতেন। যাও, জল্‌দি আবার গিয়ে খোঁজ করো সেখানে।

ঃ জি হুজুর–

তৎক্ষণাৎ আবার সেপাইটি ছুটলো। শাহজাদা বসে বসে ভাবতে লাগলেন, তাঁর এ অভিযান ফলপ্রসূ হলো না। লোকজন তাঁর বাইরে। তারা না ফিরলে বজরা ছাড়ার উপায় নেই দেখে তিনি চুপচাপ বসে রইলেন।

বেলা ক্রমেই পড়ে এলো। তা দেখে তিনি তাঁর খাসবান্দাকে বললেন–কোরবান আলী, আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। চলো, নেমে একটু নদীর তীরে হাঁটাহাঁটি করি।

বইঘর.কম ও রোকন

কোরবান আলীও মনে মনে তাই চাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ সে খুশী হয়ে বললো–জি হুজুর, চলুন www.boighar.com

কোরবান আলীকে সাথে নিয়ে শাহজাদা নেমে এলেন। ঘাটের উপর খুবই ভিড়। মুঙ্গেরের বজরাঘাট মশ্‌হুর ঘাট। ভিড় এড়িয়ে শাহজাদা নদীতীরের একদিকে সরে এলেন। ফাঁকে এসে দেখলেন, সুন্দর ও সরল নদীতীর। পায়ে হাঁটার পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত শুকনো পথ। বালীর বাহুল্য নেই। পথের পাশেই অল্প একটু দূর দিয়ে পথ বরাবর অসংখ্য দোকানপাট ও সরাই ছাউনির লম্বা এক সারি। ছোট বড় দোকান আড়ত ও সরাই-ছাউনি একটার পর একটা নদীর সাথে পাল্লা দিয়ে অনেক দূরে লম্বা হয়ে চলে গেছে। দোকানপাট আর সরাইগুলোতে গ্রাহকেরা ভিড় করছে। এরা অধিকাংশই ভিনদেশী। এদের থেকে ফাঁকে নদীর কোল ঘেঁষে এই পায়ে হাঁটার পথ ধরে অল্প কিছু হাওয়া-পিয়াসী লোকজন হাঁটাহাঁটি করছেন।

কোরবান আলী সহকারে শাহজাদা দাউদ খানও তীর-বরাবর হাঁটতে লাগলেন। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা অনেক দূরে চলে এলেন। দোকানপাট এদিকে পাতলা হয়ে এসেছে। ছোট ছোট চালা ছাউনি ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রাহকদের ভিড়ও এদিকে অপেক্ষাকৃত কম। তবে এই বজরাঘাট ব্যস্ত ঘাট হেতু, এদিকেও কেনাকাটা কম বেশি চলছে।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়েই যাচ্ছেন তাঁরা। হঠাৎ একজনের এক আকর্ষণীয় আওয়াজে শাহজাদা ও কোরবান আলী থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আওয়াজ আসছে তাঁদের একদম পাশের এক দোকান থেকে। তাঁরা দোকানের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন, পাগ্‌লাটে চেহারার এক প্রৌঢ় দোকানদার তাঁর মশ্‌লাপাতির ছোট এক দোকানে বসে তাঁর জনৈক সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন–আব্বে বাঙ্গালার বাদশাহ, আরে এই শাহানশাহ, ঘুমুবি তো তাগুায় যা। শাহী মহলে তোর জন্যে ফরাশ পাতা আছে। খামাখা ক্যান্ মরতে এই দোকানের কাজে এসেছিস?

যাকে উদ্দেশ্য করে দোকানদার সাহেব এই উক্তি করছেন, সে একজন বালক। দোকানের এক ধারে বসে বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে বালকটি ঝিমুচ্ছিল। ধমক খেয়ে বালকটি সোজা হয়ে বসলো এবং বড় একটা হাই তুলে নির্বিকার কণ্ঠে বললো–আমাকে কিছু বলছেন দাদু?

একই রকম টিপ্পনী কেটে দোকানদার সাহেব বললেন–এ্যাঁ! তোমাকে? তওবা-তওবা! তোমাকে কিছু বলতে পারি? তুমি খোদ শাহানশাহ বায়াজিদ খান কাররানী, স্বাধীন বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা গোটাই তোমার তালুক! তোমাকে এই বান্দা কিছু বলতে পারে?

ঃ দাদু!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ মেহেরবানী করে এসে এই দোকানের শোভা বর্ধন করেছো, এই তো ঢের!

ঃ আবার গাল দিচ্ছেন?

ফের চীৎকার করে উঠে দোকানদার সাহেব বললেন–মুগুর যে এখনও মারিনি এই তো ভাগ্যি! ব্যাটা নালায়েক নাদান! শুধু একজনকেই তার পাওনাটা দিতে পারিনি বলে কি আর কেউ একটা কড়ি আমার কাছে পাবে? দোকানের এই মিস্‌কীন হালত্ কেন?

ঃ আহহা, কি করতে হবে সেই কথাটা বলেন না?

ঃ তবে রে উল্লুক! মাল কৈ? দোকানে আমার মাল কৈ? মহাজনের পাওনাগোণ্ডা সব শোধ। দুপুরে তোকে পই পই করে বলিনি, মহাজনকে বলে আয়, আর কিছু মাল পাঠিয়ে দিক? গা-গতর নেড়ে একটু যাবি আর বলেই চলে আসবি! এটুকুও পারবিনে, বসে বসে স্রেফ ঘুমুবি?

ঃ আরে! বলে তো সেই কখন আমি এসেছি। মাল হয়তো একটু পরেই এসে পড়বে।

ঃ এ্যাঁ! বলে এসেছিস্?

ঃ ক্যান্, দুপুরে তো খাওয়ার পরেই গেলাম। তারা বললে, সন্ধ্যার মধ্যেই মাল যাবে।

দোকানদারের চোখ মুখ সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তাঁর মধ্যে আর রাগ-গোস্বার লেশমাত্রও রইলো না। তিনি খোশ দীলে বললেন–তাই নাকি? বহুত আচ্ছা–বহুত আচ্ছা। তা সে কথা তো বলবি রে শাহানশাহ? অযথা গাল মন্দ করে কতটা গুনাহ্ করে ফেললাম। যা–যা, চোখ মুখটা ধুয়ে একটু নাস্তা-পানি করে আয়।

ঃ নাস্তা পানি?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, নাস্তাপানি। নে, এই নাস্তা-পানির দামটা নে–

বালকটি আপত্তি করে বললো–না দাদু, আমার মোটেই ভুখ লাগেনি। নাস্তা করতে হবে না।

দোকানদার ফের রেগে গেলেন। তিনি সরোষে বললেন–কি বললি? ভুখ লাগেনি? আমার সাথে চালাকি? সেই কোন–দুপুরে এক টুকরো খেয়েছিস্, এখন প্রায় সন্ধ্যে। ছেলে মানুষের পেটে এতক্ষণ কিছু থাকে?

ঃ আছে দাদু, আছে। বেচা কেনা নেই, শুধু শুধু বাড়তি খরচের দরকারটা কি?

ঃ আমার কড়ি আমি খরচ করবো, তোর তাতে কি শুনি? তোর মাহিনে আমি খরচ করছি?

ঃ না–মানে–

ঃ ওরে বেয়াকুফ, আমি মুখ দেখলেই পেটের খবর বলতে পারি। ভুখ না থাকলে মুখটা এত শুকিয়ে যায়? যা–যা, কিছু খেয়ে আয়। নকরী করবি বলে কি পেট মেরে করবি?

ঃ দাদু–

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আখেরে আমাকে জবাব দিতে হবে না?

দোকানদার সাহেব একটা মুদ্রা তুলে জোর করেই বালকটির হাতে গুঁজে দিলেন। বালকটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে এ দৃশ্য শাহজাদা অবাক হয়ে দেখলেন। বালকটি বেরিয়ে গেলে, শাহজাদা কোরবান আলীকে বললেন—কি বুঝলে কোরবান আলী?

জবাবে কোরবান আলী বললো, বুঝা আমার শেষ হয়েছে হুজুর! বেশ কিছু মশ্‌লাপাতি কিনতে হবে আমাদের। হুকুম পেলে সে কেনাটা আমি এখানেই কিনতে চাই।

ঃ মতলব?

ঃ দুটো কড়িও কোন মতে এঁর দোকানে ঢুকিয়ে দিতে পারলে, অনেকটা সওয়াবের কাজ হবে হুজুর। মেহেরবানী করে এযাযত দিন, কেনাকাটাটা এখানেই সেরে নিই।

শাহজাদা হেসে বললেন—চলো, বাড়তি তো দিতে পারবে না, ন্যায্যটা দিতে পারলেও তৃপ্তি আছে।

উভয়ে এগিয়ে এলেন। শাহজাদা অল্প একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোরবান আলী দোকানে গিয়ে দোকানদারকে সালাম দিয়ে বললো— কিছু মশলা কিনতে চাই দোকানদার সাহেব, কিছু মশলাপাতি দিন।

সালাম নিয়ে দোকানদার সাহেব খোশ দীলে বললেন—বেশ-বেশ। কি কি নেবেন বলুন?

ঃ আপনার কাছে কি বড় কোন মোড়ক আছে, মানে ঠোঙ্গা-থলে?

ঃ জি-জি। যত বড় চাই, তত বড়ই আছে। কি কতটুকু নেবেন, তাই আগে বলুন—

দোকানদার সাহেব নিক্তিতে হাত দিলেন। কিন্তু কোরবান আলী যে ফিরিস্তি দিলো, তা শুনে দোকানদার ফের হাতের নিক্তি রেখে দিলেন এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন গরীব দোকান দেখে মশ্‌করা করছেন জনাব?

কোরবান আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো—কেন, মশ্‌করা করবো কেন? নেই এসব দোকানে আপনার? সবই তো আছে দেখছি!

দোকানদার সাহেব বললেন—আছে তো ঠিকই। কিন্তু এতবড় ফিরিস্তি, এত মশ্‌লা কেউ একসাথে কেনে? মশ্‌করা বৈ কি?

ঃ আরে—না-না, সত্যিই আমি কিনবো।

একটু চিন্তা করে দোকানদার ফের বললেন—তাহলে জনাব কি কোন তেজারতদার? ব্যবসায়ের জন্যে কিনলে এখানে কিনবেন কেন? মহাজনদের ঘরে যান। আমার চেয়ে ওরা অনেক সস্তায় দিতে পারবে। তাতে আপনার মুনাফাটা জিয়াদা হবে।

কোরবান আলী হেসে বললেন–আরে কি মুস্কিল! ব্যবসায়ের জন্যে নয় সাহেব, খাওয়ার জন্যেই কিনবো।

ঃ খাওয়ার জন্যে এত মাল? এ যে বিলকুল শাহানশাহী কারবার!

ঃ জি-জি, তাই বৈকি!

ঃ তাজ্জব! কোথা থেকে এসেছেন? জনাবের মকান কোথায়?

ঃ আমাদের মকান তাণ্ডায়। আমরা সফরে এসেছি।

দোকানদার সাহেব উৎসুক হয়ে বললেন–তাণ্ডায়? জনাব কি তাহলে শাহী এলাকার লোক? শাহী চত্বরে যাতায়াত আছে?

ঃ তা থাকবে না কেন? আমরা ওখান থেকেই এসেছি। ঐ যে উনি আমার মুনিব!

কোরবান আলী শাহজাদার প্রতি ইঙ্গিত করলো। দোকানদার সাহেব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন–শাহী লোকদের সাথে তো তাহলে যোগাযোগ আছে আপনাদের, মানে কর্মচারীদের সাথে?

কোরবান আলী স্মিতহাস্যে বললেন–হ্যাঁ, তা তো আছেই।

দোকানদারের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন–মা'শা আল্লাহ! এই তো আমার ঋণ মুক্তির মওকা। যোগ্য লোক পেয়ে গেছি–

বলতে বলতে তিনি ব্যস্তভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন এবং শাহজাদার সামনে এসে সালাম দিয়ে অনুনয় করে বললেন–জনাব জুরুর কোন হোমরা চোমরা লোক! একটু মেহেরবানী করলে আমার বড় উপকার হয় জনাব! নসীব গুণে জনাবদের যখন পেয়েই গেলাম!

সালাম নিয়ে শাহজাদা সবিস্ময়ে বললেন—–উপকার!

ঃ জি জি। আমি দেনাদার হয়ে আছি। জনাব একটু মেহেরবানী করলে আমার দায় মুক্তির একটা ব্যবস্থা হয়।

ঃ দায়!

ঃ ইচ্ছে করে নয় জনাব, মওকা পাইনি বলেই আমি দেনার দায়ে আবদ্ধ হয়ে আছি। পাওনাদারকেও পাইনে, পাওনাদারকে যে খবর দেবো এমন লোকও পাইনে। জনাবেরা রাজধানীর লোক, ওখানকার কর্মচারীদের চেনেন। দয়া করে তাঁকে একটা খবর দিলে মস্তবড় উপকার হয় আমার। নির্ঘাত তিনি ভুলেই বসে আছেন।

ঃ তাই নাকি! তা কে তিনি?

ঃ ওখানেই আছেন, জনাবদের ঐ এলাকাতেই। শুনেছি, সুলতানের নকরী করেন আর শাহী চত্বরে থাকেন। অনেক দূরের পাল্লা জনাব। নিজে আমি পাওনা দিতে অতদূরে গেলে দোকানটা আমার বিরাণ হয়ে যায়। খেটে খাওয়া একক লোক আমি, দেখার কেউ নেই। এ নিয়ে তাই বড় মুসিবতে আছি আমি জনাব!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আচ্ছা। তা পাওনাদার ভুলে বসে থাকলে আপনার এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে?

ঃ সে কি জনাব! দেনা নিয়ে মারা গেলে আখেরে তো ঠেকে যাবো আমি! সেখানে তাঁর পাওনা আমি শোধ করবো কি করে?

শাহজাদা ঈষৎ হেসে বললেন–হুঁ, সে তো জরুর কঠিন কাজ!

ঃ তাই দয়া করে তাঁকে একটু খবরটা পৌঁছাবেন জনাব। জলদি জলদি এসে যেন তিনি তাঁর পাওনাটা নিয়ে যান।

ঃ নাম কি আপনার?

ঃ মুমিনউদ্দীন। মুহম্মদ মুমিনউদ্দীন। কিন্তু কি ফ্যাসাদ দেখুন, পরের পাওনা মেরে খেলে কোন মুসলমান আর মুমিন থাকে?

ঃ তা বটে–তা বটে এবার বলুন দেখি,লোকটা কে, নাম কি তার?

ঃ মুরাদ খান–মুরাদ খান। একদম আলাভোলা মানুষ। বিলকুল বেভুল।

শাহজাদা ও কোরবান আলী চমকে একদম আন্দোলিত হয়ে উঠলেন। শাহজাদা শশব্যস্তে প্রশ্ন করলেন–মুরাদ খান! কোন্ মুরাদ খান? দোকানদার সাহেব বললেন–ঐ যে ঐ খাদেম। গৌড়ের ঐ মশ্‌হুর আলেম নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের নওকর।

দিশেহারা হয়ে শাহজাদা বললেন–নওকর?

ঃ ঠিক নওকর বলা যায় না। বরং আলেম সাহেবের ভাই বললেই ঠিক বলা হয়। একদম ভাইয়ের মতো দেখতেন তাঁকে। দুইজনই খুব ঈমানদার তো?

দোকানদার সাহেবের শেষ কথাগুলো শাহজাদার কানেই আর গেল না। এতক্ষণ দোকানদার সাহেব আকুল ছিলেন। এবার শাহজাদা নিজেই আকুল হয়ে উঠলেন। তিনি অস্থির কণ্ঠে বললেন আপনি তাঁকে চেনেন? মানে ঐ মুরাদ খানকে?

ঃ সে কি জনাব! চিনবো না কেন? একই জায়গার প্রায় একই বাড়ির লোক আমরা। তাঁর জমিন আমিই কিনলাম। আমি তো তাঁর কথাই বলছি।

ঃ ইনি কি সেই মুরাদ খান—মানে যাঁর সাথে দুইজন মহিলা আছেন? দুইজন মহিলা নিয়ে তাণ্ডায় যিনি থাকতেন?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ। তাঁর সাথে তো ওঁদেরই থাকার কথা। ওঁদের নাকি উনি এখন দেখাশুনা করছেন।

ঃ ওঁরা তাহলে কারা? ঐ দুই মহিলা?

ঃ অবশ্যই ওরা ঐ আলেম সাহেবেরই মেয়ে আর নাতনী হবেন। আলেম সাহেব তো মারা গেলেন। আলেম সাহেবের জামাইও নাকি মারা পড়েছেন। ওঁদের এখন দেখবে কে? উনিই এখন একমাত্র অভিভাবক ওঁদের। শুনেছি, ওদের নিয়েই উনি এখন ব্যস্ত আছেন।

ঃ বলেন কি!

ঃ আচ্ছা, ঐ মহিলা দুইজনের নাম কি কেউ আপনারা জানেন? আলেম সাহেবের মেয়ের নাম দিনার বানু, নাতনীর নাম দৌলতজাহান। মেয়ে নাতনীকে নিয়ে আলেম সাহেব অনেকদিন আগে এখানে একবার এসেছিলেন। তাঁর নাতনীটা তখন খুব ছোট। একেবারে পরীর মতো—তাঁর কথার মাঝেই শাহজাদা বিপুল উৎসাহে নড়ে উঠে বললেন-

ঃ এ্যাঁ-সেকি! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মায়ের নাম দিনার বানু। দিনার বানু বেগম। মেয়ের নাম দৌলতজাহান?

ঃ এই ঠিক ধরেছেন। অনেকদিনের ব্যাপার হলেও ওঁদের নাম আমার ঠিক মনে আছে। আলেম সাহেবের ছোট্ট ঐ নাত্নীটা মানে ঐ দৌলতটা বড়ই সুন্দর ছিল দেখতে। তাকে নিয়ে মুরাদ খান ভাইয়ের সাথে কি মাতামাতিই না করলাম আমরা কয়দিন। কচি ঐ মুখটা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

শাহজাদা দাউদ খান স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শাহজাদার এই উৎসাহ দেখে দোকানদারও তাজ্জব হয়ে শাহজাদার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর দোকানদার সাহেব বললেন–মুরাদ খান ভাইদের জনাব তো দেখছি বিশেষভাবে চেনেন!

অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে শাহজাদা বললেন–হ্যাঁ, চিনি বৈ কি? আমার সাথে তার জব্বর খাতির। আচ্ছা, আপনাকে নিয়ে আমি কি একটু বসতে পারি? কথা হলো, আপনি কি একটু সময় দিতে পারবেন?

দোকানদার সাহেব সাগ্রহে বললেন–আলবত-আলবত! তাহলে আসুন জনাব, আমার দোকানেই একটু বসি–

–বলেই ফের দোকানদার সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন–তা-মানে, দোকানে তো আমার ভাল কোন আসন নেই জনাব! মাচার উপর সেরেফ এটা মাদুর পাতা! জনাবেরা গণ্যমান্য লোক–

www.boighar.com

শাহজাদা ব্যস্তভাবে বললেন–ওতেই হবে–ওতেই হবে। চলুন–

দুইজন এসে মাচার উপর বসলেন। কোরবান আলী এসে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। শাহজাদা এরপর আগ্রহভরে বললেন–আচ্ছা মুরুব্বী, আপনি কি ঐ দিনার বানু বেগম সাহেবার স্বামীর পরিচয় জানেন? কি নাম, কোথায় মকান–

দোকানদার সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন–ওদিকটা তো আমি ভাল জানিনে জনাব? আমি কেবল ঐ আলেম সাহেবের খবরটাই কিছু জানি।

ঃ আলেম সাহেবের?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জি-জি। সেই প্রথম দিকে মুরাদ খান ভাই মাঝে মধ্যেই এই মুঙ্গেরে আসতেন। তারপর সুদীর্ঘ কাল কেটে গেছে, আর তাঁর এদিকে যাওয়া আসা নেই। ছেলেপুলে ছিল না। বউটাও মারা গেল। তাই সেবার এসে কেবল জমিনটাই বেচে গেলেন, দুটো দিনও থাকলেন না। আলেম সাহেবের মেয়ে-জামাই আছেন এটুকুই শুধু শুনেছিলাম আর সেই সাথে তাদের উড়ো-উড়ো দু'চার কথা জেনেছিলাম। পরে আর তাঁদের সম্বন্ধে বেশি কিছু জানার মওকা পাইনি আমি।

ঃ উড়ো-উড়ো কথা?

ঃ জি, তাও ঐ আলেম সাহেবের প্রসঙ্গেই।

ঃ বেশ, তাহলে ঐ আলেম সাহেবের সম্বন্ধে কি জানেন, মেহেরবানী করে তাই একটু বলুন তো!

ঃ আমার সব শুনা কথা জনাব। মুরাদ ভাইয়ের কাছেই শুনা। তাও আবার খুব বেশি নয়।

ঃ আচ্ছা তাই আপনি বলুন। ওটা জানার আমার বিশেষ দরকার আছে।

ঃ তাই নাকি? আচ্ছা—আচ্ছা। ঐ আলেম নিয়ামতুল্লাহ সাহেব একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন জনাব। খোদ বাঙ্গালার সুলতান দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর সাহেব ছিলেন ঐ আলেম সাহেবের তালেবে এলেম। আলেম সাহেবের গভীর এলেম দেখে ঐ দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর সাহেবের বড় ভাই সুলতান প্রথম গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর আলেম সাহেবকে কোন এক মস্তবড় মাদ্রাসা থেকে এনে শাহী হেরেমের গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেনএবং তাঁকে সপরিবারে শাহী মহলে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন।

ঃ সপরিবারে মানে? আলেম সাহেবের পরিবারে কে কে ছিলেন?

ঃ আলেম সাহেবের তো স্ত্রীপুত্র কেউ ছিলেন না। তাঁর পরিবার বলতে তাঁর মেয়ে, নাতনী আর ঐ মুরাদ খান ভাই। এঁদের নিয়েই শাহী মহলে এলেন তিনি।

ঃ তাহলে তাঁর জামাই? মেয়ে নাতনী তাঁর কাছে থাকতেন কেন? জামাইয়ের কাছে থাকতেন না?

ঃ কি করে জনাব? সে-ও যে এক কাহিনী। মুঘল পাঠানদের মধ্যে যে বিরোধ শুরু হলো, সেই বিরোধের ফলে আর পাঁচজন নকরীহারা সৈনিকের মতো তাঁর জামাইও নাকি ছিলেন এক নকরীহারা যোদ্ধা। স্ত্রীকন্যাকে বাঙ্গালা মুলুকে শ্বশুরের কাছে রেখে বাঙ্গালা মুলুকের বাইরে বিভিন্নজনের বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকেন। কোথায়ও তিনি স্থায়ী হতে পারেন না বা স্থায়ী পদে বহাল হওয়ার মওকা পান না।

ঃ কেন, বাঙ্গালার বাহিনীতে নকরী পাননি তিনি?

ঃ সে চিন্তা নাকি তাঁর প্রথম দিকে ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল মুঘলদের প্রতিহত করা। শুনেছি, পরে নাকি তিনি বাঙ্গালা মুলুকেই ফিরে আসেন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ মুরাদ ভাইয়ের কাছে আমি যখন শুনি, তখন আলেম সাহেবের জামাই ঐ যাযাবর মাফিকই বাইরে বাইরে থাকতেন আর তাঁর স্ত্রী কন্যাদের শ্বশুরের কাছে রাখতেন।

ঃ তারপর?

ঃ হেরেমে নাকি তাঁর স্ত্রী কন্যারা খুবই সমাদর পেতেন জনাব। আলেম সাহেবের প্রভূত সম্মান ছিল শাহী মহলে। সেই সুবাদে আলেম সাহেবের মেয়ে নাতনী শাহী মহিলাদের সম পরিমাণ কখনো বা ততোধিক মর্যাদা ভোগ করতেন। মুরাদ খান ভাই বলেছিলেন–আলেম সাহেবের ঐ সুন্দরী আর সৎস্বভাবের নাতনীটাকে খোদ সুলতান দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর সাহেব নাকি খুবই স্নেহ করতেন। তাঁকে নাকি তিনি আম্মি বলে ডাকতেন আর মহলে শাহজাদীর সম্মান দিতেন।

ঃ তাজ্জব! মুরাদ খান সাহেব তাহলে–

ঃ ঐ যে জোয়ান কালে আলেম সাহেবের নকরীতে গিয়ে ঢুকলেন, সেই থেকেই তাঁর পরিবারের একজন হয়ে রয়ে গেলেন। আলেম সাহেবও তাঁকে ছোট ভাইয়ের মতো আগলে রাখলেন।

ঃ তাহলে মুরাদ খান সাহেব আর এখানে আসেন নি?

ঃ এসেছিলেন জনাব। ঐ যে বললাম, এসে তাঁর ভিটে জমিন আমার কাছে বিক্রি করে গেলেন। একদিন মাত্র ছিলেন। দাম প্রায় সবই দিলাম, সামান্য কিছু পাওনা তাঁর রয়ে গেল। টানাটানির মধ্যে ছিলাম আমি। মুরাদ খান ভাইকে দুটো দিন থাকতে বললাম, কিন্তু কিছুতেই উনি থাকলেন না। বললেন–ও কয়টা কড়ি এমন কিছুই নয়। এক সময় এসে নিয়ে গেলেই চলবে। কিন্তু সেই যে গেলেন আর এলেন না।

ঃ বলেন কি!

ঃ না আসার কারণটাও পরে পরেই বুঝতে পারলাম। মুরাদ খান ভাই চলে যাওয়ার অল্পদিন পরেই খবর পেলাম, আলেম সাহেব মারা গেছেন। বাঙ্গালা মুলুকে এসে তাঁর জামাইটাও নাকি কিছুদিন পর মারা পড়েছেন। এতে করে মুরাদ খান ভাইয়ের ঘাড়ে আলেম সাহেবের ঐ মেয়ে নাতনীর দায়িত্ব এসে পড়েছে। এজন্যেই তিনি আসার ফুরসুৎ পাননি, তা বুঝতে পেরেছি।

ঃ হুঁ। তা উনি তাণ্ডায় আছেন, এটা জানলেন কি করে?

ঃ অল্পদিন আগে এই মুঙ্গেরের এক লোক তাণ্ডা থেকে এসে এই খবর আমাকে দিয়েছিল

বইঘর.কম ও রোকন

এরপর শাহজাদা নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার বললেন–তাহলে এর বেশি আর আপনি জানেন না?

ঃ জি না জনাব।

ঃ ঐ দিনার বানু বেগমদের কি খেয়াল আছে আপনার? দেখলে এখন চিনতে পারবেন?

ঃ জি-না জি-না। দিনার বানু বেগম সাহেবাকে তাঁর কাঁচা বয়সে সেই পর্দা ঢাকা অবস্থায় কয়দিন দেখেছিলাম। ও দেখায় কি এখন তাঁকে আর চেনার উপায় আছে আমার? আলেম সাহেবের ঐ নাতনীটাও বড় হয়ে কেমন হয়েছেন এখন, তাই বা কে জানে? তাঁরা নিজেরা পরিচয় না দিলে, আমার আর সনাক্ত করার উপায় নেই।

ঃ ইদানিং তাঁরা এদিকে কেউ এসেছিলেন বলে কি শুনেছেন?

ঃ জিনা-জিনা। তাও শুনিনি।

ঃ তাঁদের আর কোন আত্মীয় স্বজনকে চেনেন কি?

ঃ না-না, আর কাউকে চিনি না তবে কহলগাঁওয়ে আলেম সাহেবের কি রকম এক ভাতিজা ছিলেন শুনেছিলাম। এখন নাকি তিনিও আর ওখানে থাকেন না।

শাহজাদা থেমে গেলেন। আর কোন প্রশ্ন না করে তিনি চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন এবং অতঃপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তা দেখে দোকানদার সাহেব এবার সবিস্ময়ে বললেন– ব্যাপারটা কি জনাব? এত কিছু জিজ্ঞাসা করলেন! মানে কি জন্যে এত জানতে চাইলেন?

শাহজাদা ম্লান হেসে বললেন–তাঁদেরই খুঁজতে আমি বেরিয়েছি। সেই মুরাদ খান সাহেব দিনার বানুদের নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন। আমি তাঁদের খোঁজ করছি। তাদের সাথে বিশেষ প্রয়োজন ছিল আমার।

অপরিসীম বিস্ময়ে দোকানদার সাহেব আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন–সে কি! তাঁদেরই খোঁজ করছেন?

ঃ হ্যাঁ। তাঁদের আমার খুঁজে পাওয়া বিশেষ প্রয়োজন!

ঃ জনাব!

ঃ তাঁদের যদি দেখা পাই, আপনার দেনার কথাটা অবশ্যই আমি মুরাদ খান সাহেবকে বলবো।

শাহজাদা দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। বাক্ হারিয়ে দোকানদার সাহেব হা করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। অতঃপর কোরবান আলীর তাকিদে ভারাক্রান্ত চিত্তে দোকানদার সাহেব মাল মেপে দিতে লাগলেন। মাল দিয়ে দাম হাতে নিতে নিতে দোকানদার সাহেব কোরবান আলীকে উদাস কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন–ঐ জনাব বুঝি তাণ্ডার কোন কর্মচারী?

কোরবান আলী স্মিতহাস্যে বললো–জি না। খোদ বাঙ্গালার সুলতানের উনি ভাই। উনি শাহজাদা দাউদ খান কাররানী বাহাদুর।

কোরবান আলী শাহজাদার অনুসরণে বজরার দিকে রওনা হলো। দোকানদারের কম্পিত হাত থেকে হাতে ধরা মুদ্রাগুলো ঝনঝন করে মাচার উপর পড়ে গেল।

০ ০ ০

সেই রাতেই শাহজাদা বজরা ভাসিয়ে দিলেন এবং আর কোথাও না থেমে একটানা পাটনায় চলে এলেন। এক অব্যক্ত বেদনায় তিনি সারা রাত বজরার মধ্যে ছটফট করে কাটালেন। চোখের দুইপাতা কোথাও এক করতে পারলেন না। অবিরাম ভাবতে লাগলেন, এমন যার বংশ পরিচয়, এমন অভিজাত পরিবেশে মানুষ হয়েছেন যিনি, তাঁর প্রতি কি হীন ধারণাই না পোষণ করেছেন তিনি! শুধু তাঁর প্রতিই বা কেন, তাঁদের সবার প্রতি কি অবিচারই না করেছেন তাঁরা শাহী মহলের সবাই মিলে সকলেই। মানুষের সবচেয়ে অবমাননাকর অপবাদটাই তাঁরা সবাই মিলে আরোপ করেছেন দৌলতজাহানদের উপর। ইতরবিশেষ গণ্য করেছেন তাঁদের। কি নির্মম মতিভ্রম! কি মর্মান্তিক ঘটনা বিভ্রাট!

শাহজাদা দাউদ খান কাররানীর এই মর্মদাহ কয়েকদিন পরেই আরো অধিক দুর্বিষহ হয়ে উঠলো আকস্মিক আর এক ঘটনায়। পাটনায় এসেই শাহজাদা কাজের মধ্যে ডুবে যান। পাটনার দুর্গ পরিদর্শন করার কালে দুর্গের কিছু কৌশলগত মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি শাহজাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করার ব্যাপারে তাকিদ, পরামর্শ ও পরিকল্পনা দান করা নিয়ে কয়েকদিন তিনি ব্যাপৃত হয়ে থাকেন। এতে করে দৌলতজাহানদের প্রসঙ্গ অন্তরে তাঁর কিছুদিন গৌণ হয়ে থাকে। কিন্তু অকস্মাৎ এক কারণে সে প্রসঙ্গ পুনরায় মুখ্য হয়ে উঠলো এবং শাহজাদা আরো অধিক পেরেশান হয়ে পড়লেন।

পাটনার দুর্গ পুনর্বিন্যাস করার কাজে কামিন-কারিগর ছাড়াও ছোট বড় একপাল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা তাণ্ডা থেকে পাটনায় এসে সমবেত হয়েছিলেন। কামিন কারিগর নিয়ে কাজ করার অবসরে হেথা হোথা বসে তাঁরা আড্ডা-আসর জমজমাট করে তুলেছিলেন। শাহজাদা দাউদ খানের পরিদর্শন কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এখন তাঁর ফিরে যাওয়ার পালা। এমনই একদিন অকস্মাৎ এমনই এক আসরের সম্মুখীন হলেন তিনি।

কর্মক্লান্ত কামিন-মজুর-কারিগরদের শেষ বিকেলে ছুটি দিয়ে একদল মাঝারী গোছের সামরিক কর্মকর্তা নির্মাণ কাজের পাশেই দুর্গের এককক্ষে এসে সমবেত হলেন এবং সেখানে বসেই নাস্তাপানির আনযাম নিয়ে খোশ গল্প জুড়ে দিলেন। দু'তিনজন বাদে এঁরা সবাই ছিলেন ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন। স্ত্রী পরিজন তাণ্ডায় রেখে তাঁরা অনেকদিন

বইঘর.কম ও রোকন

যাবত এই পাটনার দুর্গ মজবুত করে তোলার কাজে পাটনায় এসে পড়ে আছেন এবং প্রবাসী জীবন যাপন করছেন। আলাপটা তাঁদের শুরু হলো সেই প্রসঙ্গেই। পরিবার পরিজন নিয়ে আলাপ শুরু করে তাঁরা তাণ্ডার কথায়, রাজনীতির কথায় এবং শেষ পর্যন্ত শাহজাদা দাউদ খানের ব্যক্তিগত কথাবার্তায় চলে এলেন।

শাহজাদা দাউদ খান এই সময় এঁদের খোঁজেই আসছিলেন। কক্ষের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা কানে পড়তেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এই কক্ষের পাশেই ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের ফাঁকা এক বিরাম কক্ষে এসে বসে পড়লেন। ঊর্ধতন কর্মকর্তারা নির্মাণ কাজ চলার কালে দু'একবার কেউ কেউ হঠাৎ করে পরিদর্শনে আসেন এবং ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখেশুনে এসে এই কক্ষে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। কক্ষটি তাই কাজের সময়ই ফাঁকা থাকে অধিক সময়। কাজ শেষে এটি কুল্লে লা-ওয়ারিশ।

কক্ষ দু'টি একদম লাগালাগি। পাশের কক্ষের তামাম কথাই শাহজাদার কানে এসে পড়তে লাগলো। আড়াল থেকে কারো কথা শুনবেন তিনি, সে ইচ্ছা শাহজাদার নয়। তাঁর নিজের প্রসঙ্গে আলোচনার মাঝে হঠাৎ করে সেখানে গিয়ে হাজির হলে আলোচনাকারীরা অপ্রস্তুত হবেন বিবেচনায় তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু আলোচনাটি ক্রমশঃই এমন পর্যায়ে এলো যে শেষ পর্যন্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে সে আলোচনা শ্রবণ করতে বাধ্য হলেন শাহজাদা। পাশের কক্ষ সহকারে চারপাশে কেউ কোথাও নেই জেনেই.আলাপকারীরা মন খুলে বলগাহীন আলাপ জুড়ে দিলেন। আলাপকারীদের একজন সরবে বলে উঠলেন–তা আপনারা যা-ই বলুন, তারিফ না করে পারা যায় না আমাদের এই শাহজাদা দাউদ খান বাহাদুরের। এতবড় একটা দাগা খাওয়ার পরও যে এমন একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে মানুষ, না দেখলে এটা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। অনেকদিনের ব্যাপার তো নয়, একেবারে সদ্য আঘাত।

অপর একজন প্রশ্ন কররেন–সদ্য আঘাত মানে? কিসের আঘাত?

প্রথম বক্তা বললেন–কেন শোনেন নি? শাহজাদা গভীরভাবে একজনের মুহাব্বতে পড়েছিলেন আর তাঁকে শাদি করতেও যাচ্ছিলেন? কিন্তু শেষ মুহূর্তে মেয়েটার এমন গলদ বেরিয়ে পড়লো যে, শরমে শাহজাদার গলায় দড়ি দেয়ার অবস্থা!

ঃ সেকি! না তো, শুনিনি তো!

ঃ এই তো সেদিনের কথা। এ নিয়ে তাণ্ডা শহর এখনও গরম হয়ে আছে। সেদিন আমাকে তাণ্ডা যেতে হলো না? গতকাল এসেছি। নিজে আমি দেখেশুনে এলাম।

সকলেই উৎসুক হয়ে উঠলেন। তৃতীয় একজন বললেন–বলেন কি? অনেকদিন হয়ে গেল, তাণ্ডার কোন খবরই আমরা কেউ রাখিনে। সেই যে এসে পড়ে আছি তো আছিই। কি ঘটনা খুলে বলুন তো? কি ঘটেছে এর মধ্যে?

প্রথম ব্যক্তি বললেন—ঘটনা বড় করুণ! শাহজাদার ফুল বাগানের রক্ষক মুরাদ খান ছিলেন না? তাঁর নাতনী দৌলতজাহান নাকি নাম? শাহজাদা তার মুহাব্বতে চরমভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শাদির কথা পাকাপাকি করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, বাপই নেই মেয়েটার। জন্মই তার অবৈধ।

অকস্মাৎ বিস্মিত হয়ে প্রায় সকলেই এক সঙ্গে আওয়াজ দিলেন—কি তাজ্জব-কি তাজ্জব! একি দিগ্‌দারী!

ঃ দিগদারী বলে দিগদারী। এক পিতৃ পরিচয়হীন আউরাতের সাথে খোদ শাহজাদার মুহাব্বত, খোদ শাহজাদার শাদি—একি একটা কম শরমের কথা? দেখলাম, এ নিয়ে তাণ্ডাতে আজও ছি-ছি'র রেশ লেগেই আছে।

এইসব সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে দুই তিনজন ছিলেন পাটনায় স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী কর্মকর্তা। এরা বাঙ্গালার ভূতপূর্ব সুলতান তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের কেউবা ফৌজদার, কেউবা সহকারী সালার ছিলেন। কাররানীরা বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করার পর এঁরা কাররানীদের আনুগত্য স্বীকার করে কাররানীদের বাহিনীভুক্ত হন এবং এই পাটনা দুর্গে নিয়োগ লাভ করেন। তাণ্ডায় কিছু গমনাগমন থাকলেও এরা এই পাটনাতেই স্থায়ীভাবে আছেন। এঁদের একজন সবিস্ময়ে বলরেন—সেকি! কার কথা বলছেন?

প্রথম বক্তা বললেন—হুজুরদের বাইরের মহলের বাগান রক্ষক মুরাদ খানের নাতনীর কথা।

ঃ মুরাদ খান মানে যিনি দৌলতজাহান আর তাঁর আম্মাকে নিয়ে ওখানে সংসার পেতে আছেন?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তার কথাই তো বলছি ভাই সাহেব। ঐ মুরাদ খানের নাতনী দৌলতজাহানের যে আসলেই বাপ নেই, সে একজন পতিতার মেয়ে, এ কথা এর আগে তাণ্ডার কেউ জানত না।

পাটনার এই সামরিক কর্মকর্তাটি আরো অধিক বিস্মিত হয়ে বললেন—পতিতার মেয়ে মানে? একি বলছেন আপনি?

ঃ পতিতা—পতিতা। পতিতার মেয়ে দৌলতজাহান। তার যে বাপের ঠিক নেই এটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মুরাদ খান ঐ আউরাত দুটিকে নিয়ে রাতারাতি তাণ্ডা থেকে উধাও হয়ে গেছেন। একদম লাপাত্তা।

ঃ সেকি! মুরাদ খান সাহেবেরা আর ওখানে থাকেন না?

ঃ আরে না-না। এরপর আর থাকতে পারে ওখানে? কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে, খোঁজ করেও আর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ঃ তাজ্জব!

বইঘর.কম ও রোকন

পাটনার এই কর্মকর্তাটি অপরিসীম বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। দিশেহারা নজরে তিনি তাণ্ডার এই কর্মকর্তার অর্থাৎ প্রথম বক্তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তা দেখে তাণ্ডার এই কর্মকর্তাটি হাসি মুখে বললেন–এতে আপনি এত তাজ্জব হচ্ছেন কেন? দিন বরাবর ঘটনা এটা।

তাণ্ডার কর্মকর্তা রুষ্টকণ্ঠে বললেন–কোনটা দিন বরাবর ঘটনা?

ঃ মুরাদ খানের নাতনী ঐ দৌলতজাহানের জন্ম অবৈধ। তার বাপের পরিচয় নেই।

ক্রোধে ফেটে পড়লেন পাটনার এই সামরিক কর্মকর্তা। নিজের অজ্ঞাতেই তিনি তাণ্ডার কর্মকর্তাকে ধমক দিয়ে বললেন–থামুন! আসফ খান সাহেবের মেয়ের বাপ নেই, একথা আপনি কোন আক্কেলে বলছেন?

তাণ্ডার কর্মকর্তাটি থমকে গিয়ে বললেন–আসফ খান সাহেবের মেয়ে! কোন আসফ খান সাহেবের?

পাটনার কর্মকর্তা ঐ একই কণ্ঠে বললেন–ফৌজদার আসফ খান। আপনিও তো সে লড়াইয়ে ছিলেন। এত শিগগির ভুলে গেছেন ব্যাপারটা?

ঃ ফৌজদার আসফ খান–মানে ঐ–

ঃ জি-জি। আর কিছুক্ষণ যে ব্যক্তি বেঁচে থাকলে আপনাদের হাড়গুলোও এতদিন মাটিতে খেয়ে নিতো, সেই ফৌজদার আসফ খানকে চিনতেই আজ পারছেন না?

তাণ্ডার কর্মকর্তা চমকে উঠে বললেন–ওরে বাপরে! সেকি! সেই ভয়ংকর তুফান, মানে সেই মত্ত হস্তি ফৌজদার আসফ খান?

ঃ সেই ফৌজদার আসফ খান। এই দৌলতজাহান সেই আসফ খানেরই মেয়ে।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ আজ আর যখন মুরাদ খান সাহেবেরা সেখানে নেই, তখন বললে আর তাদের মুসিবত হবে না বলেই বলছি। যে আসফ খানের নাম শুনলে আমাদের কাররানী হুজুরেরা আজও শিউরে উঠেন, সেই আসফ খানের মেয়ে হলো অবৈধ সন্তান আর তার বাপের পরিচয় নেই?

আসফ খানের ঘটনা যাঁরা জানতেন, এ কথা শুনে সবাই তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মুখে তাঁদের রা শব্দটিও এলো না। যাঁরা জানতেন না, তাঁরা ঘিরে ধরলেন এই কর্মকর্তাকে। সবাই তারা বিপুল আগ্রহে বললেন–সেকি–সেকি! ঘটনা কি বলুন তো ভাই সাহেব? সাংঘাতিক একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে!

ঃ কোন ঘটনা?

আগ্রহীদের একজন বললেন–ঐ আসফ খান সাহেবের ঘটনা। মানে যিনি দৌলতজাহানের আব্বা, তাঁর ঘটনা। কে ঐ আসফ খান সাহেব? কি ঘটেছিল তাকে নিয়ে?

ঃ তাঁকে নিয়ে কিছু ঘটেনি। তিনিই ঘটিয়েছিলেন। আমাদের এই কাররানী হুজুরদের মসনদে আসার লড়াইয়ে আসফ খান সাহেব এই হুজুরদের চরম মুসিবত পয়দা করেছিলেন।

ঃ বলেন কি? আপনি তাঁকে চিনতেন?

ঃ চিনবো না মানে? এককালে আমি তো ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের বাহিনীতেই ছিলাম। আসফ খান সাহেবের সাথে সেদিন আমিও তো আমাদের এই হুজুরদের বিরুদ্ধে লড়েছি।

ঃ সেকি! আপনি আমাদের এই হুজুরদের বিরুদ্ধে লড়েছেন মানে ঐ সুলতান তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের পক্ষ হয়ে?

ঃ কেন লড়ব না? তখন আমি তো ঐ সুলতান তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের নকরী করতাম। যার নকরী করি, যার নুন খাই, তার পক্ষে লড়ব না? এখন আমি এই হুজুরদের নকরী করি, এই হুজুরদের নুন খাই। এখন আমি এই হুজুরদের পক্ষ হয়ে লড়ব, এটা তো আমার জন্যে ফর্‌জ্‌।

এ কথায় অনেকে বললেন–ঠিক-ঠিক। আমরা সৈনিক। নকরী আর নুনের সাথেই আমাদের তলোয়ারের সম্পর্ক।

পাটনার কর্মকর্তাটি আরো একটু যোগ দিয়ে বললেন–জরুর। আমাদের সৈনিক জীবনের এইটেই হলো ধর্ম। শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম যে, মাতৃভূমির আজাদী আর সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হলে, নুন আর নকরীর প্রসঙ্গ থাক আর চাই না থাক, মাতৃভূমিকে হেফাজত করার জন্যে স্বগরজে প্রাণপাত করাটাও একজন সৈনিকের পরমতম ধর্ম। মাতৃভূমি পুত্রবৎ একজন সৈনিকের কাছে এইটেই আশা করে।

জোর সমর্থন দিয়ে সকলেই আবার বললেন–আলবত-আলবত!

আগ্রহীদের অপর একজন অধৈর্য হয়ে বললেন–আরে ভাই, ধর্ম কর্তব্য যা-ই বলুন, আমাদের সৈনিক জীবনের এইটাই তো মূলমন্ত্র। এ নিয়ে আর এত কথা কেন? ঐ আসফ খান সাহেবের ব্যাপারটা কি, তাই আগে বলুন।

আগ্রহীরা সবাই আবার এই ব্যক্তিকে সমর্থন দিয়ে বললেন–হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলুন–তাই বলুন--

ফৌজদার আসফ খান সম্বন্ধে পাটনার এই কর্মকর্তাটি যে বিবরণ দিলেন, তা নিম্নরূপঃ

ভূতপূর্ব সুলতান প্রথম ও দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের শাহী মহলের শিক্ষক প্রখ্যাত আলেম নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের জামাতা ছিলেন এই ফৌজদার আসফ খান সাহেব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ ও প্রতিভাবান যোদ্ধা। আসফ খানের পিতা ছিলেন একজন মশহুর সৈনিক ও শহিদ। স্ত্রী কন্যাকে স্বশুরের কাছে রেখে প্রথম

বইঘর.কম ও রোকন
আসফ খান সাহেব বাঙ্গালা মুলুকের বাইরে থেকে দিল্লীর বিরুদ্ধে লড়ে বেড়ান। পরে তিনি বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে আসেন এবং সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের বাহিনীতে ফৌজদার হয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু নসীবের মার বড় মার। সিপাহসালার হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় বাঙ্গালামুলুকে এসে পরে তিনি একজন সহকারী সালার হতেও পারেন না। ঐ ফৌজদার পদেই থাকেন। আসফ খান সাহেব বাঙ্গালায় এসে যে বাহিনীতে ঢোকেন, সেই বাহিনীর সালার ছিলেন একজন হীনমন্য ব্যক্তি। আসফ খান সাহেবের অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখে তিনি শংকিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর নিজের পদ বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে ভয়ে নানা কৌশলে তাঁকে ঐ ফৌজদার পদেই আটকে রাখেন, উপরে উঠতে দেন না। শেষ অবধি দৌলতজাহানের নানাজান অর্থাৎ আসফ খানের শ্বশুর এ বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য হন। তাঁর মাধ্যমে সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর ঐ চক্রান্তের কথা জানতে পেরে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখেন। ঘটনা সত্য হওয়ায় ঐ সালারকে তিনি যৎপরনাস্তি অপমান করেন এবং আসফ খান সাহেবকে যোগ্য পদে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বেঁকে বসে আসফ খান সাহেবের নসীব। সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার আগেই এই সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব ইন্তেকাল করেন। তাঁর অযোগ্য পুত্র বাঙ্গালার তখতে উঠে বসেন। ঐ সালারের সাথে এই নয়া সুলতানের জিয়াদা দোস্তী-দহরম মহরম ছিল। সালারটি এই সুযোগ গ্রহণ করেন। অতীত অপমানের বদলা নেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এক গভীর ষড়যন্ত্র গড়ে তুলেন। ঐ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে এই নয়া সুলতান আসফ খান সাহেবকে নকরী থেকে বরখাস্ত করেন। মুসিবত যখন আসে তখান একসাথে আসে। সালারের ঐ ষড়যন্ত্রটি পোক্ত হয়ে উঠার আগেই আসফ খান সাহেবের শ্বশুর আলেম নিয়ামতুল্লাহ সাহেবও ইন্তেকাল করলেন। ফলে, নকরীচ্যুত আসফ খান সাহেব বাধ্য হয়েই স্ত্রী কন্যা সহকারে রাজধানী গৌড় ত্যাগ করলেন।

এই পর্যন্ত বলে বক্তা একটু থামলেন এবং এরপর ফের বলতে শুরু করলেন—এই নয়াসুলতানের সুলতানীও অধিককাল স্থায়ী হল না। ছয় সাত মাস না পেরুতেই তার অযোগ্যতার দরুন একজন শক্তিশালী আফগান নেতা তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর নামে বাঙ্গালার তখতে উঠে বসলেন। মসনদলাভের কিছুদিন পর আসফ খান সাহেবের রণনৈপুণ্যের কথা শুনে তৃতীয় এই গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেব নিজ আগ্রহে আসফ খান সাহেবকে তাঁর বাহিনীতে ডেকে নেন এবং অচিরেই পদোন্নতির ওয়াদা দিয়ে আপাততঃ ঐ ফৌজদার পদেই নিয়োগ দান করেন।

কিন্তু আসফ খান সাহেবের আর পদোন্নতি হয়নি। এর মধ্যেই এই কাররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কাররানী হুজুরের সাথে তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের লড়াই শুরু হলো। তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের কাছে ঋণী থাকায় আর নুনের দাম দিতে গিয়ে আসফ খান সাহেব এ লড়াইয়ে জানবাজী রেখে লড়লেন এবং তাজ খান কাররানী হুজুরের বিপুল বিপর্যয় ঘটানোর পর অবশেষে নিহত হলেন।

বক্তা কর্মকর্তাটি তাঁর বিবরণ শেষ করলেন। তিনি থামতেই আগ্রহীরা পুনরায় প্রশ্ন করলেন–বিপুল বিপর্যয় মানে? কি বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন তিনি?

জবাবে বক্তাটি ফের বললেন–বিপর্যয় মানে, লড়াই কিছুক্ষণ চলার পর তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের পরাজয় যখন নিশ্চিত হয়ে উঠল, তখন ফৌজদার আসফ খান সাহেবের মাথায় আগুন ধরে গেল। সিপাহসালারের অযোগ্যতার কারণেই এই পরিণতি ঘটছে দেখে তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন। সিপাহসালারের নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করে তিনি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে এসে ময়দানের সম্মুখভাগে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুহূর্তেই প্রলয় সৃষ্টি করলেন। তাঁর অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও সৈন্য-চালনার ফলে দেখতে দেখতে কাররানী হুজুরদের অধিকাংশ সৈন্যই ধরাশায়ী হলো এবং বাদবাকিরা রণস্থল ত্যাগ করে পলায়ন শুরু করল। দিশেহারা হয়ে তাজখান কাররানী হুজুর লড়বেন, না পালাবেন–এ কথা ভাবতেই আসফ খান সাহেব তাঁকে সদলবলে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললেন। তাজ খান হুজুরের সাথে তখন কয়েকজন মাত্র সেপাই। প্রচণ্ড প্রলয়ের মুখে কয়েকখানা খড়কুটো মাত্র। তাজ খান হুজুরের মৃত্যু একদম নিশ্চিত হয়ে গেল। আর পলক কয়েক বিলম্ব হলেই আসফ খান সাহেবের তলোয়ার তাজ খান কাররানী হুজুরের কাঁধের উপর পড়ত। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে? ঠিক এই মুহূর্তেই অকল্পনীয়ভাবে আসফ খান সাহেবের অশ্বের সামনের এক পা সরু এক গর্তের মধ্যে বরাবর ঢুকে যাওয়ায় অশ্বটি তাঁর উল্টে পড়ে গেল এবং আসফ খান সাহেব ছিটকে কয়েক হাত সামনে গিয়ে পড়লেন। তাঁর হাতে আর ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। সামলে নিয়ে উঠতে তার কিঞ্চিৎ সময় লাগলো। এই ফাঁকে কাররানী হুজুরের এক সেপাই তাঁর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করে সবলে বর্শা ছুড়ে মারল। বর্শাটি তাঁর বক্ষঃস্থল আমূলভেদ করল। আসফ খান সাহেব আবার লুটিয়ে পড়লেন এবং ইন্তেকাল করলেন।

শ্রোতারা সবিস্ময়ে আওয়াজ দিলেন—কি তাজ্জব! কি তাজ্জব! www.boighar.com

বক্তা ব্যক্তি বললেন—তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। আসফ খান সাহেব নিহত হওয়ায় তাঁর সেপাইরা হকচকিয়ে গেল এবং এ সংবাদে কাররানী হুজুরদের পলায়নরত সেপাইরা আবার ফিরে এসে দ্বিগুণ উৎসাহে লড়াই শুরু করলো। সুলতান তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সাহেবের বাহিনী আর এদের এঁটে উঠতে পারল না। তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর নিহত হলেন এবং তাঁর সেপাই-সেনা রণস্থল থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। কাররানী হুজুরদের জয় হলো।

শ্রোতারা ফের বললেন–সোবহান আল্লাহ! বড় তাজ্জব ঘটনা!

বক্তাটিও সঙ্গে সঙ্গেই বললেন– আমরাও সেই পলায়নকারীদেরই দলভুক্ত।

–বলেই তিনি তার পার্শ্বে উপবিষ্ট পাটনার দুইজন সামরিক কর্মকর্তাদের প্রতি ইংগিত করলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

শ্রোতারা বললেন–তাই নাকি?

ঃ জি। কাররানী হুজুরেরা বাঙ্গালার মসনদে আসীন হলে তাঁদের আহ্বানে আমরা আবার ফিরে এসে এই হুজুরদের প্রতি আনুগত্য জানালাম এবং হুজুরদের নকরী গ্রহণ করলাম।

শ্রোতৃমন্ডলীর একজন অভিভূত কণ্ঠে বললেন–বলেন কি! এই আসফ খানের মেয়ে ঐ দৌলতজাহান?

ঃ জি-জি। এই আসফ খানেরই মেয়ে।

ঃ তাহলে তাঁর স্ত্রী কন্যারা আবার তাণ্ডায় এলেন কিভাবে?

ঃ ঐ মুরাদ খানের সাথে। মুরাদ খান ছিলেন আসফ খান সাহেবের শ্বশুর আলেম নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের সঙ্গী ও খাদেম। আসফ খান সাহেবের স্ত্রী কন্যা উভয়কেই তিনি সস্নেহে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। শ্বশুর জামাই-এর ইন্তেকালের পর ঐ মহিলা দুটির ভার মুরাদ খানের উপরই পড়ে। আসফ খান সাহেবের মৃত্যু আর তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরের পতন ঘটলে মুরাদ খান এই মা-মেয়েকে নিয়ে, তখনই আবার গৌড় থেকে পালিয়ে যান। এরপর লড়াইয়ের হৈ-হট্টগোল থেমে গেলে আর দেশে শান্তি ফিরে এলে তাঁরা আবার বাঙ্গালা মুলুকে ফিরে আসেন। কিন্তু গৌড়ে না গিয়ে তাণ্ডায় এসে জায়গা খরিদ করেন এবং আত্ম পরিচয় গোপন করে রাজধানী থেকে দূরে তাণ্ডায় বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তীতে আমাদের মরহুম হযরত-ই-আলা রাজধানী আবার গৌড় থেকে তাণ্ডায় নিয়ে এলে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। কিন্তু যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট স্থান না থাকায় তাঁরা চুপচাপ ওখানেই রয়ে যান।

ঃ আচ্ছা। তা মুরাদ খান সাহেব আবার এই হুজুরদের নকরীতে এলেন কি করে?

ঃ দায়ে ঠেকে। নগদ পুঁজি ফুরিয়ে যাওয়ায় সংসারে ওঁদের অনেক আগে থেকেই টানাটানি শুরু হয়। নক্সা, সেলাই ও অন্যান্য হাতের কাজ করে মা মেয়ে যা রোজগার করতেন তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। তা দেখে মুরাদ খান সাহেব কাররানী হুজুরদের নকরী নিতে আগ্রহী হন। কিন্তু দৌলতের আম্মা এ কথায় আঁতকে উঠেন। প্রথমে তিনি রাজীই হতে চাননি। কিন্তু অভাব আরো প্রকট হয়ে উঠায় আর কাররানী হুজুরদের সাথে তাঁদের মৌলিক কোন বিরোধ না থাকায় অবশেষে তিনিও রাজী হন।

ঃ মৌলিক বিরোধ মানে?

ঃ মানে দৌলতের আব্বা তো এই হুজুরদের কোন জাত দুশমন নন। কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা এই কাররানী হুজুরদের সাথে তাঁর ছিল না। আমাদের মতোই তিনিও লড়েছেন নকরীর কর্তব্যে আর নুনের দাম দেয়ার জন্যে। হুজুরদের সাথে দুশমনী করার জন্যে নয়।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ জি-জি। তা অবশ্য ঠিক। সে হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত কসুর জরুর ধরা যায় না।

ঃ সেইজন্যেই দৌলতজাহানের আম্মা মুরাদ খান সাহেবের নকরী নেয়াতে আপত্তি আর করেননি। মুরাদ খান সাহেব তাঁদের পরিচয় সংক্রান্ত কোন কথাই কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না, এই মর্মে ওয়াদা করিয়ে নিয়ে তাঁকে নকরী করতে দেন। হুজুরদের নকরীতে আসার কিছুদিন পর আমাদের এই শাহজাদা দাউদ খান কাররানী হুজুরের তাঁকে খুব পছন্দ হয়। তিনি মুরাদ খান সাহেবকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ফুলবাগানের রক্ষক নিয়োগ করেন।

ঃ তাজ্জব! এত কথা কার কাছে জানলেন আপনি?

ঃ ঐ মুরাদ খান সাহেবের কাছেই। সেবার আমি তাণ্ডায় গেলাম না? গিয়ে সেখানে মুরাদ খানকে দেখেই তো আমি চমকে উঠলাম। পরে আড়ালে বসে মুরাদ খান সাহেবের কাছেই তামাম কথা শুনলাম। আমিও দেখলাম, আত্ম পরিচয় গোপন করে তাঁরা যখন কোন মতে করে খাচ্ছেন, খেতে থাকুন। খামাখা এ নিয়ে হৈ চৈ করতে যাওয়াটা ঠিক নয়।

ঃ তা বটে। কিন্তু আসফ খান সাহেব তো আসলেই আমাদের এই হুজুরদের দুশমন ছিলেন না। তবু তাঁরা তাঁর পরিচয় গোপন রাখলেন কেন?

ঃ ভয়ে। আমাদের এই হুজুরদের এতবড় বিপর্যয় যিনি ঘটিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী কন্যা রাজধানীতেই বাস করছেন জানলে, আমাদের হুজুরেরা এটা সহজভাবে নাও নিতে পারেন তো ? সেই ভয়ে।

সবাই এবার সমর্থন দিয়ে বললেন–ঠিক ঠিক। এ ভয় তাঁদের থাকাটাই স্বাভাবিক।

এরপর সকলেই চুপ হয়ে গেলেন। এমন একটি তাজ্জব ব্যাপার নিয়ে তাঁরা ভেবেই সারা হতে লাগলেন। একটু পরে তাণ্ডার ঐ সামরিক কর্মকর্তাটি, মানে প্রথম বক্তা ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন–কি আশ্চর্য–কি আশ্চর্য! ঘটনা তাহলে এই? সেরেফ একটা ভুলের জন্যেই তাহলে এত বড় একটা দিগ্‌দারীতে পড়ে আছেন আমাদের এই শাহজাদা?

ঃ যা আপনি আমাদের শুনালেন, তাতে তো তাই-ই। স্রেফ একটা ভ্রান্তির ঘোরেই ঘুরপাক খাচ্ছেন সকলেই।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিনে, আমাদের এই শাহজাদার মতো একজন বিচক্ষণ আর বলিষ্ঠ চিত্তের মানুষ একটা অদনা আদমীর মতো। এতবড় এক পরিহাসের শিকার হলেন কি করে? আসফ খান সাহেবের মতো একটা বাঘা মানুষের মেয়েকে তিনিও চিনতে ভুল করলেন? একটা অবৈধ সন্তানের অতিরিক্ত মেয়েটার আচরণের মধ্যে তিনি আর কিছুই খুঁজে পেলেন না?

গোটা কক্ষটি তোলপাড় করে সকলেই এবার একসাথে বলে উঠলেন– জানাতে হয়—জানাতে হয়! ঘটনাটা এক্ষুণি শাহজাদাকে জানাতে হয়!

শাহজাদাকে জানাতে কিছুই হল না। পাশের কক্ষে উপবিষ্ট শাহজাদা দাউদ খানের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। নিজের অস্তিত্বটাও তখন তিনি বিস্মিত হয়ে গেছেন।

বইঘর.কম ও রোকন
হারিয়ে গেছেন অস্তিত্ব হরণকারী মহা বিস্ময়ের আবর্তে। কিছুই তাঁর মস্তিষ্কে আর নেই এখন। আছে শুধু হাজার একটা প্রশ্ন। সেই আসফ খানের কন্যা এই দৌলতজাহান? সেই বিস্ময়কর বাহাদুর আসফ খানের মেয়ে? শাহজাদা আর তাঁর পরিবারের প্রত্যেকের কাছে আসফ খান শুধু একটি পরিচিত নামই নয়, অত্যধিক আলোচিত নাম ও একটি আতংকের নাম। দুশমন পক্ষের হলেও আর প্রাণনাশে উদ্যত হলেও, আসফ খানের বাহাদুরীর এন্তার তারিফ তাঁর বড় চাচা তাজ খান কাররানী আমৃত্যু করে গেছেন। দৌলতাজাহান সেই বীরেরই কন্যা? বজরাঘাটে প্রথম দিন দৌলতজাহানকে দেখেও শাহজাদার এই ধারণাই হয়েছিল যে, নিছকই এক বস্তির আউরাত কখনও তিনি নন, জরুর কোন বাঘের ঔরসে জন্ম এই মেয়েটার। ধারণা তো আদৌ তাঁর মিথ্যা নয়? দৌলতজাহানের আসল পরিচয় এই? ওহ্! কি মর্মান্তিক অবিচার! কি বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ।

শাহজাদা কিছুক্ষণ বেহুঁশ হয়ে বসে রইলেন। হুঁশ ফিরে আসতেই তিনি ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। পাটনার ঐ কর্মকর্তাকে তলব দিয়ে নিয়ে ফের তিনি নিরিবিলিতে বসলেন এবং হাজার রকম আরো প্রশ্ন করলেন। এর ফলে, দৌলতজাহানদের অতীত জীবনের খুঁটিনাটি আরো অনেক কথাই তিনি জানতে পারলেন বটে, কিন্তু দৌলতজাহানদের পাত্তা বা তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের হদিস সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যই পেলেন না। নিকটতম আত্মীয়েরা গত হয়ে গেছেন, দূরবর্তী আত্মীয়ের রাজনৈতিক ঐ ঝড় তুফানে কে কোথায় ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে পড়েছেন, পাটনার এই কর্মকর্তাটি সে বিষয়ে অজ্ঞ।

দৌলতজাহানের পরিচয় পর্ব শেষ হল। শুরু হলো দৌলতজাহানকে খুঁজে পাওয়ার তৎপরতা। দৌলতজাহানকে খুঁজে পাওয়া শাহজাদার এখন প্রয়োজনই নয় শুধু। এটা এখন তাঁর জন্যে আশু ও অপরিহার্য বিষয়। দৌলতের সাথে পুনর্মিলন নসীবে তাঁর ঘটুক আর না ঘটুক, দৌলতজাহান তাঁর অপেক্ষায় থাকুন আর না থাকুন, এই অমানবিক অপরাধের দুর্বিষহ গ্লানি, নসীবের মারের এই দুরন্ত দাহ, দৌলতজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিঞ্চিৎ লাঘব করতে না পারলে, শাহজাদার আর স্বস্তির সাথে প্রাণ ধারণের উপায় নেই। পরমতম মুহাব্বতের এই নির্মমতম পরিণতির বেদনা ক্ষীণ পরিমাণ হলেও হ্রাস না করে শাহজাদার আর তা বয়ে বেড়ানোর সাধ্য নেই। যেখানেই আর যত দূরেই থাকুন, দৌলতজাহানকে তালাশ করে পেতেই হবে শাহজাদাকে।

শাহজাদা মনস্থির করে ফেললেন। পাটনার দুর্গ পরিদর্শনের প্রতিবেদন সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর দলকে আরো খাটো করে নিয়ে এখান থেকেই দৌলতজাহানের অনুসন্ধানে বেরুবেন, শাহজাদা দাউদ খান এই সিদ্ধান্ত নিলেন। দৌলতজাহানদের কহলগাঁওয়ের সেই আত্মীয় জীবিকার সন্ধানে সাসারামের দিকে গেছেন এ খবর তিনি কহলগাঁওয়েই পেয়েছেন। অনুসন্ধানের কোন নিশানাই নেই যখন, তখন, এবার লক্ষ্য ঐ সাসারাম।

এগার

মানুষের চিন্তার গণ্ডী সীমিত। ভবিষ্যৎ তার কাছে অজ্ঞাত। তার অপরিহার্য বোধটিও তাই আপেক্ষিক ও ক্ষণস্থায়ী। ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে যতই তার সামনে এগিয়ে আসে ততই তার করণীয় পরিবর্তিত হয়। অপরিহার্যের পরেও অপরিহার্য এসে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের অপমৃত্যু ঘটায়। অবধারিত না হলেও এ প্রক্রিয়া অবাস্তব নয় আদৌ।

সাসারামে যাবেন বলে শাহজাদা দাউদ খান স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। করণীয় শেষ করে তৈরি হয়ে গেলেন। পরের দিন প্রত্যুষেই রওনা হবেন সাসারামে। পরেরদিন প্রত্যুষটাও যথা নিয়মে এলো। কিন্তু সাসারামে যাওয়া আর তাঁর হলো না। প্রত্যুষেই যে সংবাদ পেলেন, তাতে তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। কল্পনাতীত দুঃসংবাদ! তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুলতান বায়াজিদ খান কাররানী নিহত। বায়াজিদ খানের হত্যাকারী হাঁসু খান কাররানী এখন বাঙ্গালা মুলুকের সুলতান।

o o o

রায় বাবুদের বুদ্ধি আর গাদ্দারদের গাদ্দারী লক্ষ্যভেদ করেছে। শ্রীহরি রায়ের চাল আর হাঁসু-কতলুর কু-কর্ম সফলকাম হয়েছে। আঙ্গুলের তালের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার ফলেই গাদ্দারদের এই কামিয়াবী। এতে করে এক গাদ্দার গদী পেয়ে আদাব আদাব করছেন, আর এক গাদ্দার উজির হয়ে হরঘড়ি জিকির তুলছেন শ্রী আঙ্গুলের প্রশংসায়।

প্রশংসা করতেই হয় রায় সাহেবদের তেলেসমাতির। শ্রী হরি রায় প্রণীত ঐ পরিকল্পনার শিকার হয়েই আওয়ারা হলেন শাহজাদা দাউদ খান কাররানী। হাতের অসি কোষে গুঁজে পথে নামলেন তিনি। অধিনায়ক উদাস হওয়ায় তাঁর অধীনস্থ সেপাই-সেনাও এতিম হয়ে গেলেন। ঐ পরিকল্পনা মাফিকই শূন্যস্থান পূরণ করলেন হাঁসু খান। ভাঙ্গাচুড়া লোক লস্কর ও পাইক-পেয়াদা সমন্বয়ে তড়িঘড়ি একটা সেনাবাহিনী খাড়া করে হাঁসু খান তার অধিনায়ক হলেন এবং সেই সূবাদে এসে বায়াজিদ খানের পক্ষে তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন। এ টুকুই শুধু নয়, দাউদ খানের ঘাটতিটা পুষিয়ে দেয়ার ভান করে সুলতানের ওয়াস্তে জান কোরবান করার হরওয়াক্ত ঢেকুর তুলতে লাগলেন।

কতলু খানের আনুগত্যেও বান ডেকে গেল। মসনদের হেফাজতি নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞায় গাছের একটা পাতা খসার শব্দেও ঘড়িঘড়ি তিনি তলোয়ার টানতে লাগলেন। শ্রীহরি রায়ও ঘরে ঘুমিয়ে রইলেন না। তিনিও দরদ নিয়ে এগিয়ে এলেন। প্রথমে তিনি

দূরে দূরেই রইলেন। প্রধান উজির লোদী খান স্বাধীন বাঙ্গালার দূত হয়ে দিল্লীর সালার মুনিম খানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে গমন করলে গুটি গুটি হেঁটে তিনিও এসে মসনদের পাশে ভিড়ে গেলেন এবং বাঙ্গালা মুলুক তথা বায়াজিদ খানের ভালাই চিন্তায় মাথা কুটতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই চক্রেরই মন্ত্রণায় সুলতান বায়াজিদ খান পাটনার দুর্গ পরিদর্শন করার অছিলায় শাহজাদা দাউদ খানকে সফরে পাঠিয়ে দিলেন। সুলতানকে তারা বুঝালেন,এতে করে শাহজাদার মরা মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে। দাউদ খান যাত্রা করার কয়েকদিন পরেই উজিরে আজম লোদী খানও দূত হয়ে রাজধানীর বাইরে চলে গেলেন। প্রধান অন্তরায় বলতে এখন রাজধানীতে রইলেন শুধু সালার কালাপাহাড়। তাঁকে সরানোর ব্যাপারেও দাঁও একটা সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল। এই সময় অকস্মাৎ উড়িষ্যার জাজনগরে গোলমাল দেখা দিলো। প্রশাসনিক কোন্দল নিয়ে গোলমাল। কতলু খানের লোকেরা গুজব ছড়াতে লাগলো, জাজনগরের প্রশাসন উড়িষ্যার এ অংশ নিয়ে দিল্লীর সাম্রাজ্যের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই বিদ্রোহের পেছনে আকবর শাহর কয়েকজন সুদক্ষ সালার নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। জাজনগর সহকারে গোটা উড়িষ্যা রাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাই তাঁদের লক্ষ্য।

সুলতান বায়াজিদ খান এ খবরে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যেই তিনি হাঁসু-কতলু আর শ্রীহরিদের আবর্তে অনেকটা জড়িয়ে গেছেন। উজিরে আজম লোদী খান আর শাহজাদা দাউদ খান হাতের কাছে না থাকায়, পরামর্শের জন্যে তিনি এদেরই আহ্বান করলেন। ভগ্নিপতি হাঁসু খান এ প্রেক্ষিতে সুলতানকে সমঝালেন, তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপার এটা নয়। বাঙ্গালা-বিহার উড়িষ্যা গ্রাস করার ব্যাপারে আকবর শাহর নীল নকসার এই হলো প্রথম উদ্যোগ। শুরুতেই যদি দিল্লীর ফৌজ শক্ত বাধা না পায়, ওদের সাহস ও আকাঙ্ক্ষা আরো শতগুণে বেড়ে যাবে। ওদের এই আকাঙ্ক্ষা অংকুরেই বিনাশ করা হোক।

হাঁসু খানকে সমর্থন দিয়ে শ্রীহরি রায় পরামর্শের ছলে বললেন যে, কাজটা বড় শক্ত কাজ। দিল্লীর ফৌজের অন্তরে আতংক পয়দা না হলে, ওদের এ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হবার নয়। এদিকে আবার সে আতংক পয়দা করা সবার পক্ষেও সম্ভব নয়। একমাত্র দুর্ধর্ষ আর বাহাদুর সালার কালাপাহাড় সাহেব যদি তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, তবেই সে লক্ষ্য হাসিল হতে পারে।

সুলতান বায়াজিদ খান ঘটনাটাকে এতটা বড় ভাবতে না পেরে ইতঃস্তত করতে লাগলেন। তা দেখে কতলু খান লোহানী বিজ্ঞের মতো বললেন, আল্লাহতায়ালার মেহেরবানীতে ঘটনাটা যদি এত বড় না-ও হয়, প্রস্তুত হয়ে যেতে তো দোষ কিছু নেই। গোলমাল বিদ্রোহ যা-ই থাকুক, ক'দিনেই মিটিয়ে দিয়ে সবাই আবার ওয়াপস্ চলে

বইঘর.কম ও রোকন
আসবেন। কম প্রস্তুতি নিয়ে ফালতু কেউ গেলে আর ব্যাপারটা সত্যি হলে, অবস্থা কি দাড়াবে, একথা তো অবশ্যই ভাবতে হবে।

সুলতান বায়াজিদ খান এ কথা আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। সেনাপতি কালাপাহাড়কে তাঁর তামাম ফৌজ নিয়ে জাজনগরে রওনা হওয়ার জন্যে সুলতান তখনই আদেশ দিলেন। হাঁসু আর কতলু খানের স্বতস্ফূর্ত আনুগত্যে প্লাবিত হয়ে নিজের নিরাপত্তার কথাটা সুলতান বায়াজিদ খান বিলকুল ভুলে গেলেন।

কিন্তু আদেশ শুনে থম্‌কে গেলেন সেনাপতি কালাপাহাড়। মামুলি এক কারণে এহেন পদক্ষেপের মধ্যে তিনি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন। ফলে, তিনি ইতঃস্তত করতে লাগলেন এবং এদিকে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা পেতে লাগলেন। বিন্তু সুলতান তখন সিদ্ধান্তে তাঁর অটল। কালাপাহাড়ের গড়িমসিতে তিনি বরং নাখোশ হলেন এবং তাঁকে রওনা হওয়ার জন্যে জোর তাকিদ দিতে লাগলেন। বিশ্বস্ততা বিপন্ন হয়ে উঠায় সেনাপতি কালাপাহাড় বাধ্য হয়েই তাঁর গোটা বাহিনী নিয়ে জাজনগরে যাত্রা করলেন। মশা মারতে কামান দাগার এই উদ্যোগ নিয়ে অন্তরে তাঁর অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল।

শ্রীহরিদের ও কতলু-হাসুঁর অন্তরায় বিদুরিত হলো। দাউদ খান, কালাপাহাড় আর লোদী খান অভাবে সালার সিকান্দর উযবেক ও ইসমাইল খান আব্দুর কমজোর হয়ে গেলেন। কতলু খানের লোহানী গোত্রের সেপাইরা এখন সংখ্যায় অনেক অধিক হয়ে গেল। মতলববাজদের কারসাজিতে সমুদয় লোহানী গোত্রসহ অন্যান্য সেপাই, সালার ও সভাসদেরা অধিকাংশই হাঁসু-কতলুকে কেন্দ্র করে একত্র হয়ে গেল। এবার অদৃশ্য আঙ্গুলের নিখুত নির্দেশনায় ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন গান্দারের দল। সুলতান বায়াজিদ খানকে ঘিরে ধরে তারা তাঁকে হত্যা করলো এবং হাঁসু খান দৌড়ে গিয়ে মসনদে উঠে বসলেন। মেড়ার কান মুচ্‌ড়ে দেয়ার পর রায় বাবুরা এই খুন-খারাবী আর মসনদ দখলের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় এমন ভূমিকা পালন করলেন যে, এ সবে তাঁদের কোন হাত আছে, সীমিত কয়জন গাদ্দার ছাড়া অন্য কেউ তা তেমন একটা আঁচ করতে পারল না। স্বপ্নোত্থিতের মতো তাণ্ডার আপামর জনসাধারণ অকস্মাৎ ঘোষণা শুনলো, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুলতান এখন হাঁসু খান এবং এ মুলুকের প্রধান উজির এখন কতলু খান লোহানী।

আকস্মিক এই ঘটনায় অবশিষ্ট সেপাই সেনা ও সভাসদ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ বোকা বনে রইলেন। বুদ্ধি ফিরে পেতেই তাঁরা আবার অধিকাংশরাই চালাক হয়ে গেলেন। বিশেষ করে হোমরা চোমরারা নয়া সূরুযের বন্দনায় ধেয়ে এলেন এবং পদ, সম্পদ ও সুবিধে লাভের লালসায় নয়া সুলতানের জয়গানে আত্মনিয়োগ করলেন। দেখতে দেখতে তাণ্ডার সিংহভাগ শক্তিই হাঁসু খানের করতলগত হলো। সালার সিকান্দর উযবেক ও ইসমাইল খান ছোট ছোট কয়েকজন সালার সেনা নিয়ে

বইঘর.কম ও রোকন
দূরে দূরেই রইলেন। প্রধান উজির লোদী খান স্বাধীন বাঙ্গালার দূত হয়ে দিল্লীর সালার মুনিম খানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে গমন করলে গুটি গুটি হেঁটে তিনিও এসে মসনদের পাশে ভিড়ে গেলেন এবং বাঙ্গালা মুলুক তথা বায়াজিদ খানের ভালাই চিন্তায় মাথা কুটতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই চক্রেরই মন্ত্রণায় সুলতান বায়াজিদ খান পাটনার দুর্গ পরিদর্শন করার অছিলায় শাহজাদা দাউদ খানকে সফরে পাঠিয়ে দিলেন। সুলতানকে তারা বুঝালেন,এতে করে শাহজাদার মরা মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে। দাউদ খান যাত্রা করার কয়েকদিন পরেই উজিরে আজম লোদী খানও দূত হয়ে রাজধানীর বাইরে চলে গেলেন। প্রধান অন্তরায় বলতে এখন রাজধানীতে রইলেন শুধু সালার কালাপাহাড়। তাঁকে সরানোর ব্যাপারেও দাঁও একটা সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল। এই সময় অকস্মাৎ উড়িষ্যার জাজনগরে গোলমাল দেখা দিলো। প্রশাসনিক কোন্দল নিয়ে গোলমাল। কতলু খানের লোকেরা গুজব ছড়াতে লাগলো, জাজনগরের প্রশাসন উড়িষ্যার এ অংশ নিয়ে দিল্লীর সাম্রাজ্যের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই বিদ্রোহের পেছনে আকবর শাহর কয়েকজন সুদক্ষ সালার নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। জাজনগর সহকারে গোটা উড়িষ্যা রাজ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাই তাঁদের লক্ষ্য।

সুলতান বায়াজিদ খান এ খবরে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যেই তিনি হাঁসু-কতলু আর শ্রীহরিদের আবর্তে অনেকটা জড়িয়ে গেছেন। উজিরে আজম লোদী খান আর শাহজাদা দাউদ খান হাতের কাছে না থাকায়, পরামর্শের জন্যে তিনি এদেরই আহ্বান করলেন। ভগ্নিপতি হাঁসু খান এ প্রেক্ষিতে সুলতানকে সমঝালেন, তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপার এটা নয়। বাঙ্গালা-বিহার উড়িষ্যা গ্রাস করার ব্যাপারে আকবর শাহর নীল নকসার এই হলো প্রথম উদ্যোগ। শুরুতেই যদি দিল্লীর ফৌজ শক্ত বাধা না পায়, ওদের সাহস ও আকাঙ্ক্ষা আরো শতগুণে বেড়ে যাবে। ওদের এই আকাঙ্ক্ষা অংকুরেই বিনাশ করা হোক।

www.boighar.com

হাঁসু খানকে সমর্থন দিয়ে শ্রীহরি রায় পরামর্শের ছলে বললেন যে, কাজটা বড় শক্ত কাজ। দিল্লীর ফৌজের অন্তরে আতংক পয়দা না হলে, ওদের এ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হবার নয়। এদিকে আবার সে আতংক পয়দা করা সবার পক্ষেও সম্ভব নয়। একমাত্র দুর্ধর্ষ আর বাহাদুর সালার কালাপাহাড় সাহেব যদি তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, তবেই সে লক্ষ্য হাসিল হতে পারে।

সুলতান বায়াজিদ খান ঘটনাটাকে এতটা বড় ভাবতে না পেরে ইতঃস্তত করতে লাগলেন। তা দেখে কতলু খান লোহানী বিজ্ঞের মতো বললেন, আল্লাহতায়ালার মেহেরবানীতে ঘটনাটা যদি এত বড় না-ও হয়, প্রস্তুত হয়ে যেতে তো দোষ কিছু নেই। গোলমাল বিদ্রোহ যা-ই থাকুক, ক'দিনেই মিটিয়ে দিয়ে সবাই আবার ওয়াপস্ চলে

বইঘর.কম ও রোকন
আসবেন। কম প্রস্তুতি নিয়ে ফালতু কেউ গেলে আর ব্যাপারটা সত্যি হলে, অবস্থা কি দাঁড়াবে, একথা তো অবশ্যই ভাবতে হবে।

সুলতান বায়াজিদ খান এ কথা আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। সেনাপতি কালাপাহাড়কে তাঁর তামাম ফৌজ নিয়ে জাজনগরে রওনা হওয়ার জন্যে সুলতান তখনই আদেশ দিলেন। হাঁসু আর কতলু খানের স্বতস্ফূর্ত আনুগত্যে প্লাবিত হয়ে নিজের নিরাপত্তার কথাটা সুলতান বায়াজিদ খান বিলকুল ভুলে গেলেন।

কিন্তু আদেশ শুনে থম্‌কে গেলেন সেনাপতি কালাপাহাড়। মামুলি এক কারণে এহেন পদক্ষেপের মধ্যে তিনি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন। ফলে, তিনি ইতঃস্তত করতে লাগলেন এবং এদিকে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা পেতে লাগলেন। বিন্তু সুলতান তখন সিদ্ধান্তে তাঁর অটল। কালাপাহাড়ের গড়িমসিতে তিনি বরং নাখোশ হলেন এবং তাঁকে রওনা হওয়ার জন্যে জোর তাকিদ দিতে লাগলেন। বিশ্বস্ততা বিপন্ন হয়ে উঠায় সেনাপতি কালাপাহাড় বাধ্য হয়েই তাঁর গোটা বাহিনী নিয়ে জাজনগরে যাত্রা করলেন। মশা মারতে কামান দাগার এই উদ্যোগ নিয়ে অন্তরে তাঁর অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল।

শ্রীহরিদের ও কতলু-হাসুঁর অন্তরায় বিদুরিত হলো। দাউদ খান, কালাপাহাড় আর লোদী খান অভাবে সালার সিকান্দর উযবেক ও ইসমাইল খান আব্দুর কমজোর হয়ে গেলেন। কতলু খানের লোহানী গোত্রের সেপাইরা এখন সংখ্যায় অনেক অধিক হয়ে গেল। মতলববাজদের কারসাজিতে সমুদয় লোহানী গোত্রসহ অন্যান্য সেপাই, সালার ও সভাসদেরা অধিকাংশই হাঁসু-কতলুকে কেন্দ্র করে একত্র হয়ে গেল। এবার অদৃশ্য আঙ্গুলের নিখুত নির্দেশনায় ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন গান্দারের দল। সুলতান বায়াজিদ খানকে ঘিরে ধরে তারা তাঁকে হত্যা করলো এবং হাঁসু খান দৌড়ে গিয়ে মসনদে উঠে বসলেন। মেড়ার কান মুচ্‌ড়ে দেয়ার পর রায় বাবুরা এই খুন-খারাবী আর মসনদ দখলের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় এমন ভূমিকা পালন করলেন যে, এ সবে তাঁদের কোন হাত আছে, সীমিত কয়জন গাদ্দার ছাড়া অন্য কেউ তা তেমন একটা আঁচ করতে পারল না। স্বপ্নোত্থিতের মতো তাণ্ডার আপামর জনসাধারণ অকস্মাৎ ঘোষণা শুনলো, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুলতান এখন হাঁসু খান এবং এ মুলুকের প্রধান উজির এখন কতলু খান লোহানী।

আকস্মিক এই ঘটনায় অবশিষ্ট সেপাই সেনা ও সভাসদ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ বোকা বনে রইলেন। বুদ্ধি ফিরে পেতেই তাঁরা আবার অধিকাংশরাই চালাক হয়ে গেলেন। বিশেষ করে হোমরা চোমরারা নয়া সূরুযের বন্দনায় ধেয়ে এলেন এবং পদ, সম্পদ ও সুবিধে লাভের লালসায় নয়া সুলতানের জয়গানে আত্মনিয়োগ করলেন। দেখতে দেখতে তাণ্ডার সিংহভাগ শক্তিই হাঁসু খানের করতলগত হলো। সালার সিকান্দর উযবেক ও ইসমাইল খান ছোট ছোট কয়েকজন সালার সেনা নিয়ে

বইঘর.কম ও রোকন
কোণঠাসা অবস্থায় দিশেহারা হয়ে গেলেন। লোদী খান, দাউদ খান, কালাপাহাড়, কোন কেউ হাতের কাছে না থাকায় কোন পদক্ষেপ নেবেন তাঁরা স্থির করতে পারলেন না। খবরটা কোন মতে শাহজাদাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে সিকান্দর উযবেক সাহেবেরা ফাঁকে ফাঁকে ঘুরতে লাগলেন। হাঁসু খান এঁদের দলে ভেড়ানোর জন্য প্রথমে কিছু লোভ-টোপ ছড়ালেন। ব্যর্থ হয়ে অমনি তিনি হুংকার ছেড়ে তেড়ে এলেন। এই মুহূর্তে সংঘাতে যাওয়া ঠিক নয় দেখে, হাঁসু খানের প্রতি মৌন সমর্থন দিয়ে তাঁরা কালক্ষয় করতে লাগলেন।

উন্নতমানের চরিত্রের জন্যে সালার সিকান্দর উযবেক ও ইসমাইল খান আব্দুর সাহেবেরা দাউদ খান ও কালাপাহাড়ের পরেই সাধারণ সেপাইদের কাছে সবিশেষে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁদের এই মৌনতা ও তাঁদের উপর হাঁসু খানের হুমকি তাণ্ডার সাধারণ সেপাইদের মাঝে একটা ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। হাঁসু খানের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের ব্যাপারে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল।

ওদিকে আবার, সালার গুজার খান কতলু চক্রের সহযোগী হলেও সুলতান বায়াজিদ খানকে হত্যা করার আদৌ তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এতে করে তাঁর অজ্ঞাতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হল। সালার গুজার খান এর জন্যে হাঁসু-কতলুর বিরুদ্ধাচরণ না করলেও অতিশয় ক্ষুণ্ন হয়ে রইলেন।

মসনদ আর উজিরী পেয়েই হাঁসু খান আর কতলু খান খুশিতে জার জার হয়ে রইলেন। অন্তরালের এই প্রতিক্রিয়া তাঁদের চোখে পড়লো না। কিন্তু শ্রীহরি রায়দের নজর সর্বক্ষণ সবদিকেই সজাগ ছিল। এ বিষয়টি তাঁদের নজর এড়ালো না। এই বিজয়ই চরম বিজয় নয়, এটা রায় সাহেবরা ভোলেননি। রাজদণ্ডের সাথে অন্যান্য সালার সেপাইদের মদদ পেয়ে কালাপাহাড় বৃদ্ধ লোদী খান আর প্রেমোন্মাদ দাউদ খানের প্রত্যাঘাতকে অদূরদর্শী হাসু খান ও মাথামোটা কতলু খান খড়কুটোবৎ ভাবলেও, শ্রীহরি রায় একবিন্দু তা ভাবেন নি। তাঁর যা ধ্যান ধারণা তা হলো, তাণ্ডার সমুদয় শক্তি ছলে কি কৌশলে যেভাবেই হোক, হাত করতে হবে এবং তা হাত করা গেলে তবেই ঐ তিনজনকে সাময়িকভাবে সামাল দেয়া সম্ভবপর হবে। এরপর দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে দিল্লীর ফৌজ ঐ তিনজনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারলে, তবেই তাদের এই সাফল্য চূড়ান্ত সাফল্যে পরিণত হবে। এ কারণে তিনি প্রথম থেকেই হাঁসু খানকে আকর্ষণীয় টোপ আর বেপরোয়া মিথ্যা ওয়াদার মাধ্যমে বিরূপ শক্তিটাকে হাত করার জোর তাকিদ দিতে থাকলেন। শক্তি-হুমকির লেশমাত্র প্রয়োগ করতে নিষেধ করলেন। চূড়ান্তভাবে বিপদ মুক্তি হয়ে গেলে তখন শুধু ওয়াদা খেলাপই নয়। বিরূপ আর বিপক্ষ শক্তিটাকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে এ বুদ্ধিও দিলেন।

কিন্তু অদূরদর্শী হাঁসু খান এ যাবত মন্ত্রণাদাতাদের মন্ত্রের প্রতি যতটা একনিষ্ঠ রইলেন, এই শেষে এসে থাকতে তা আর পারলেন না। ক্ষমতার গরমে তিনি তালকানা

বইঘর.কম ও রোকন
হয়ে গেলেন। ফলে, অল্প একটু নরম আচরণ করেই তিনি হুংকার ছেড়ে বসলেন। এতে করে হাঁসু খানের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন অর্জনের যে আশাটুকু শ্রীহরি রায় করেছিলেন, তা নস্মাৎ হয়ে গেল। শ্রীহরি রায় থমকে গেলেন। তিনি জানতেন, দাউদ খান আর কালাপাহাড়কে এমনিতেই সামাল দেয়া অতি কঠিন। তাঁরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লে ফলাফল কি দাঁড়াবে, তা একেবারেই অনিশ্চিত। তার উপর আবার যদি ভেতর থেকে মদদ পায়, জয়ের আশা দুরাশা। রায় সাহেবেরা এ জন্যে আগে থেকেই সামাল দিয়ে চলছিলেন। সিকান্দর উযবেকদের ঐ মৌনতাসহ সাধারণ সেপাইদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব দেখে তাঁরা আরো অধিক সতর্ক হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত শাহজাদা দাউদ খানের দল জয়ী হলে, তাঁদের পক্ষেরই লোক হিসাবে নিজেদের সরবে জাহির করার কোন অন্তরায় যাতে করে পেছনে তাঁদের না থাকে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে তাঁরা হাঁসু খানদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলেন এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

o o o

যথা সময়েই খবর এলো পাটনায়। খবর শুনেই ক্ষণিকের জন্যে জ্ঞান হারালেন শাহজাদা দাউদ খান কাররানী। জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি লাফিয়ে উঠে তলোয়ারে হাত দিলেন এবং সেনা সৈন্যদের হাঁক দিতে গেলেন। বার্তাবাহক তাঁকে তাজিমের সাথে নিরস্ত করে সবিনয়ে বললেন–একটু ধৈর্য ধরতে হবে হুজুর। সবাই এসে হাজির হলে, যা করার এক সাথে করবেন।

থতমত খেয়ে শাহজাদা বললেন- সবাই এসে হাজির হলে মানে?

বার্তাবাহক বললেন-আমি মাননীয় উজিরে আজম আর সালার কালাপাহাড় সাহেবের কথা বলছি হুজুর। তাঁদের কাছেও কাসেদ গেছে খবর নিয়ে।

ঃ সেকি! তাঁরা কেউ রাজধানীতে নেই?

ঃ জি না হুজুর, তাঁরাও রাজধানীর বাইরে।

ঃ রাজধানীর বাইরে! কারণ?

বার্তাবাহক লোদী খান আর কালাপাহাড় সাহেবের বাাইরে আসার বিবরণটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললেন- কাসেদদের বলে দেয়া আছে, প্রধান উজির ও সালার সাহেব-দুইজনই আগে পাটনার দুর্গে এসে হুজুরের সাথে মিলিত হবেন এবং তারপর যা করণীয় একসাথে পরামর্শ করে করবেন।

বার্তাবাহকের বিবরণ শুনে শাহজাদা দাউদ খান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিঞ্চিৎ পরে বললেন-বটে! ঘটনা তাহলে এই? শয়তানেরা এই চাল চেলেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে?

ঃ জি হুজুর। সালার কালাপাহাড় সাহেবকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে উড়িষ্যায় পাঠানো হয়েছে।

বইঘর.কম ও রোকন

শাহজাদা আফসোস করে বললেন-ওহঃ! ভাইজান এই শয়তানদের শয়তানী কিছুই ধরতে পারলেন না? সালার সিকান্দর উযবেক আর ইসমাইল খান সাহেব? তাঁদের খবর কি? তাঁরা কি করছেন?

ঃ তাঁরা বড় বেকায়দায় আছেন হুজুর। সালার সভাসদ অধিকাংশেরাই গাদ্দারী করায় তাঁরা কিছুই করতে পারছেন না। হাঁসু খানের সাথে তাল মিলিয়ে চলছেন আর হুজুরদের এন্তেজারে পথ চেয়ে আছেন।

খেয়াল হতেই শাহজাদা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন–আর মহলের খবর? আমার আম্মাজানের খবর কি? তিনি কি হালতে আছেন?

ঃ আম্মা বেগম মহলে এখন নজরবন্দী হয়ে আছেন হুজুর। মহলের অন্যান্যদের অবস্থাও প্রায় তাই-ই।

ঃ কোন জুলুম বা দুর্ব্যবহার?

ঃ জি না। হুজুরদের সাথে মোকাবেলা শেষ হওয়ার আগে মহলের কারো উপর কোন জুলুম করার সাহস পাচ্ছেন না হাঁসু খান সাহেব।

ঃ কেন ?

ঃ যা তিনি ঘটিয়েছেন এতেই অধিকাংশ সেপাই নাখোশ। শুধু সালারদের গাদ্দারীর জন্যেই তারা এখনও খামোশ হয়ে আছে। আম্মা বেগম বা এ রকম আর কারো উপর জুলুমের খবর বাইরে এলেই সাধারণ সেপাইরা বিদ্রোহ করবে সন্দেহ নেই।

ঃ হুঁ।

ঃ আম্মা বেগম আর সালার উযবেক সাহেবেরা বলেছেন, উজিরে আজম সাহেবের পরামর্শ ছাড়া, হুজুরকে এককভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে। উজির সাহেব আর সালার কালাপাহাড় সাহেবকে নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক একসাথে অগ্রসর হতে হবে। তাণ্ডায় এখন গাদ্দারের সংখ্যা অনেক বেশি। অসতর্কভাবে তাণ্ডায় এখন হাজির হওয়া যাবে না।

শাহজাদা আর প্রশ্ন তুললেন না। নিদারুণ শোক ও মর্মদাহ বুকে নিয়ে তিনি লোদী খান ও কালাপাহাড় সাহেবের পথ চেয়ে রইলেন।

পরের দিন দুপুরেই উজিরে আজম লোদী খান তাঁর নিরাপত্তা বাহিনী সহ পাটনায় এসে পৌঁছলেন। শাম ওয়াক্তে সসৈন্যে এসে হাজির হলেন সেনাপতি কালাপাহাড়। তাঁরা এসে প্রথমে শোকাচ্ছন্ন দাউদ খানকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দান করলেন। এরপর উজিরে আজম লোদী খানের নেতৃত্বে বিশ্বস্ত লোকজন নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যে সবাই তাঁরা বসলেন। অধিপতি সহকারে পাটনা দুর্গের বিশিষ্ট কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাকেও এই বৈঠকে আহ্বান করা হলো। আলোচনার শুরুতেই কালাপাহাড় সাহেব আফসোস্ করে বললেন–এমন একটা বদ-মতলবের গন্ধ আগেই আমি

বইঘর.কম ও রোকন
পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বদ-নসীব যে, সুলতান বাহাদুর আমার কথায় কিছুতেই কান দিলেন না। আমাকে যদি তাণ্ডা থেকে না সরাতেন তিনি, তাহলে একাই আমি ইনশাআল্লাহ্ ওদের কবরে পাঠিয়ে দিতাম।

শাহজাদা দাউদ খান বললেন-আপনি থাকলে তো একাজে ওরা হাত দেয়ারই সাহস পেতো না। মাননীয় উজিরে আজম সাহেবও তাণ্ডায় হাজির থাকলে, এ অঘটন ঘটাতে ওরা পারতো না। কিন্তু-

উজিরে আজম বললেন-অতীত নিয়ে আর আফসোস করে ফায়দা নেই। বর্তমানের দিকে নজর দিন সবাই। এখানে বসে অধিক সময় ব্যয় করা মানেই দুশমনদের আরো মজবুত হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়া আর হেরেমবাসীদের মুসিবত আরো ঘনীভূত করে আনা।

কালাপাহাড় সাহেব বললেন-আমরা মাননীয় উজিরে আজমের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। তাঁর নির্দেশ পেলে এই রাতেই আমরা বেরিয়ে পড়তে তৈরি।

উজিরে আজম বললেন-বেরিয়ে পড়তে অবিলম্বেই হবে আমাদের। কিন্তু লক্ষ্যহীনভাবে হাওয়ার উপর নয়। সেপাই সেনাদের সামনে একটা নিশানা থাকা চাই। নির্দিষ্ট একটা ঝাণ্ডার তলে তাদের আগে সমবেত করা চাই।

ঃ জনাব!

ঃ কি জন্যে, কার জন্যে আর কোন উদ্দেশ্যে লড়বে তারা? তাদের মাথার উপর ছাউনিটাই বা কি?

www.boighar.com

ঃ অর্থাৎ? মাননীয় উজিরে আজম সাহেবকে আমি স্পষ্ট হওয়ার অনুরোধ করছি।

ঃ অস্পষ্ট আমি নই। সবকিছুর আগে হাঁসু খানকে সুলতান হিসাবে অবৈধ ঘোষণা করতে হবে আর সেই সাথে আমাদের এই শাহজাদা দাউদ খান কাররানী সাহেবকে বাঙ্গালা-বিহার উড়িষ্যার সুলতান রূপে ঘোষণা দিয়ে সেনাসৈন্যদের এই নয়া সুলতানের ঝাণ্ডা তলে একত্রিত করতে হবে। ঝাণ্ডাহীন লড়াই আর ছাদহীন অট্টালিকা অর্থহীন।

সুলতান হওয়ার কোন প্রকার চিন্তাভাবনা শাহজাদা দাউদ খানের মস্তিষ্কে কোনদিনই আসেনি, এ পর্যন্তও না। সুলতান বায়াজিদ খানের নিহত হওয়ার খবর পাওয়ার পরও তিনি কেবল ভ্রাতৃশোকে কাতর আর ভ্রাতৃহত্যার বদলা নেয়ার চিন্তার মধ্যেই আছন্ন হয়েছিলেন, মসনদ দখল করে সুলতান হওয়ার কথা একবারও ভাবেননি। উজিরে আজমের কথা শুনে তিনি তাই কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন এবং ইতস্ততঃ করে বললেন-সুলতান-মানে-আমি এ মুলুকের সুলতান হবো? তা কি করে হয়?

উজিরে আজম লোদী খান তীর্যককণ্ঠে বললেন–দ্বিধাদ্বন্দ্বের আদৌ কোন অবকাশ নেই শাহজাদা। আপনি ছাড়া ঐ মসনদের বৈধ, ন্যায্য আর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কেউ নেই। সুলতান হত্যার বদলা নিতে হলে হাঁসু খানকে সরাতেই হবে মসনদ

বইঘর.কম ও রোকন
থেকে। এরপর তো আর বাঙ্গালার মসনদ ফাঁকা রাখা যাবে না। তাই,এ নিয়ে অনর্থক কালক্ষয় না করার জন্যে শাহজাদার প্রতি আমি আবেদন রাখছি। সময় এখন আমাদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান।

শাহজাদা দাউদ খান নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। সেনাপতি কালাপাহাড় খোশ দীলে আওয়াজ দিলেন-কি তাজ্জব- কি তাজ্জব! দানেশমান্দ উজিরে আজম যথার্থ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এমন একটি জরুরী আর অপরিহার্য প্রাথমিক পদক্ষেপের কথা কেউ আমরা আদৌ ভাবিনি।!

পাটনা দুর্গের অধিপতিও সঙ্গে সঙ্গেই বললেন–ঠিক- ঠিক। এ ঘোষণা দেয়া হলে এ দুর্গের তামাম সেপাই সালারদের একডাকে আমরা মাননীয় শাহজাদার পতাকাতলে এনে দাঁড় করাতে পারবো। হাঁসু খান সুলতান বলে কারো দীলে আর কোন সংশয়ই থাকবে না।

সেনাপতি কালাপাহাড় তখনই আবার ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন– আমার সবিনয় আরজ, মাননীয় উজিরে আজম এখানেই আর এখনই এই ঘোষণা দেবেন।

হাজেরান মজলিসের তপ্ত সমর্থনে উজিরে আজম লোদী খান এই বৈঠকেই হাঁসু খানের মসনদ দখল অবৈধ ঘোষণা করতঃ শাহজাদা দাউদ খান কাররানীকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুলতান হিসেবে ঘোষণা দান করলেন। 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বলে আর 'আল্লাহু-আকবার' আওয়াজ তুলে হাজেরান মজলিস বিপুল উল্লাসে এ ঘোষণা সমর্থন করলেন।

এর পরেই এ ঘোষণা পাটনা দুর্গের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হলো এবং দুর্গাধিপতির এক ডাকে দুর্গের তামাম সালার সেপাই নয়া সুলতান দাউদ খান কাররানীর ঝাণ্ডা তলে এসে সমবেত হলো। সমবেত হলো সেনাপতি কালাপাহাড়ের তামাম ফৌজ ও উজিরে আজম লোদী খানের নিরাপত্তা সেপাইরা। এতে করে সুলতান দাউদ খান কাররানীর পক্ষে নিজ ফৌজসহ অল্পক্ষণের মধ্যেই এক সুবিশাল ও শক্তিশালী সমর বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। সুলতানের নির্দেশে সেনাপতি কালাপাহাড় এ বাহিনীর সিপাহ্‌সালারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অতঃপর সকলেই সসৈন্যে তাণ্ডার দিকে ছুটলেন।

তাণ্ডার পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই আরো খানিক পরিবর্তিত হলো। হাঁসু খানের অবস্থার আরো অনেক অবনতি ঘটলো। একটা হুকুমাত পরিচালনা করার মতো কোন রকম যোগ্যতাই হাঁসু খানের ছিল না। ধীশক্তির শোচনীয় অভাব ছিল হাঁসু খানের মগজে। তাঁর লোভ ছিল সীমাহীন, সাধ্য ছিল শূন্যের কোঠায়। ছিল না অন্তরে তাঁর সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য বোধের বালাই। এর ফলে, গুজার খানের মতো এক অপরিহার্য শক্তিকেও অচিরেই তিনি বৈরী করে তুললেন। কতলু খানদের মতো অধিক সোচ্চার না হলেও গুজার খান তাঁর পক্ষেরই লোক। তাঁর পক্ষেরই দুর্বার একশক্তি। বায়াজিদ খানের হত্যাকে আদৌ তিনি সমর্থন করতে না পারলেও,হাঁসু খানের বিরুদ্ধাচরণ করেননি।

বাঙ্গালার ইজ্জত সমুন্নত রাখার মতো একজন সুযোগ্য সুলতানকে এভাবে সরিয়ে দেয়ার কারণে তিনি মানসিকভাবে ব্যথিতই ছিলেন শুধু, এর প্রতিবাদও করেননি বা প্রতিকার করতেও যাননি। দলে গেঁথে যাওয়ার ফলে গুজার খানের সমর্থনটা বরাবরই হাঁসু খান কাররানীর পক্ষেই ছিল।

কিন্তু গুজার খানের এই ব্যথিত হওয়ার ব্যাপারটাও হাঁসু খান বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁকে সমঝানো বা প্রবোধ দেয়ার পরিবর্তে হাঁসু খান তাঁর সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে বসলেন। দাউদ খান কাররানী সসৈন্যে এসে তান্ডায় হানা দেয়ার প্রাক্কালে হাঁসু খান একদিন ফালতু এক কারণেই গুজার খানের প্রতি হুংকার দিয়ে উঠলেন এবং প্রকাশ্য দরবারে যৎপরনাস্তি অপমান অপদস্ত করে তাঁকে দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন।

গুজার খান মনে প্রাণে একজন বাঙ্গালার শুভাকাংখী ও দুর্ধর্ষ লড়াইয়া। এ অপমান কিছুতেই তিনি পরিপাক করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা না করে নীরবে তিনি দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং হাঁসু খানের পক্ষ ত্যাগ করে ঐ দিনই তিনি তাঁর তামাম ফৌজ নিয়ে বিহারের দিকে রওনা হলেন। গুজার খানকে ঠেকা দেয়ার সাধ্য হাঁসু খানের ছিল না বা গুজার খানের তান্ডা শহরে উপস্থিতিকেও হাঁসু খান আর নিরাপদ মনে করলেন না। গুজার খান বিনাবাধায় তান্ডা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বিহারের পথ ধরলেন।

হাঁসু খানের কুকর্মের পরোক্ষ মদদদাতা হিসাবে শাহজাদা দাউদ খানের সামনে আসার মুখ তাঁর ছিল না। নিহত হওয়ার কালে সুলতান বায়াজিদ খানের স্ত্রীপুত্র দক্ষিণবিহারে ছিলেন। গুজার খান সসৈন্যে সেখানে এসে হাজির হলেন এবং আক্রোশের বশে আপাততঃ মরহুম বায়াজিদ খানের পুত্রকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুলতান রূপে ঘোষণা দিয়ে বাঙ্গালার মনসদ পুনরুদ্ধারের চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন।

রায় সাহেবদের কুবুদ্ধি আর হাঁসু-কতলুর হঠকারিতা শুধু বাঙ্গালা মুলুকের অশান্তিই বৃদ্ধি করলো না, এর ফলে মরহুম হযরত-ই-আলার নেতৃত্বে সুসংহত বাঙ্গালার শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একদল হাঁসু-কতলুর অধীনে, একদল দাউদ খানের অধীনে ও একদল গুজার খানের অধীনে-এই তিনভাগে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে গেল। বাঙ্গালার সালতানাতের চরম খোশনসীব যে, এই মুহূর্তে আকবর শাহ বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণ করার ফুরসৎ করতে পারলেন না। তা পারলে, এই ওয়াক্তেই বাঙ্গালার স্বাধীন অস্তিত্বের সমাধি হয়ে যেতো।

মতলববাজদের কুবুদ্ধির আর গাদ্দারদের গাদ্দারীর তেজারতি এ দফায় লাভজনক হলো না। হাঁসু খানের পেছন থেকে গুজার খানের সরে পড়ার সাথে সাথেই হাঁসু খানের অবস্থা হল ছিন্নমূল বৃক্ষের চেয়েও অসহায়। ঝড়ঝঞ্ঝা তো নয়ই, একটা বাউড়ি বাতাসের ধাক্কাও সামাল দেয়ার সামর্থ্য আর এই বৃক্ষের রইলো না। পরিস্থিতির এই

বইঘর.কম ও রোকন
শোচনীয় অবনতি লক্ষ্য করা মাত্রই শ্রীহরি রায় ঝঞ্ঝাপিষ্ট পত্রবৎ থর থর করে কেঁপে উঠলেন এবং তাঁর তামাম শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার শোকে তিনি টলতে টলতে ঘরে ফিরে কাঁথা মুড়ি দিলেন। গুজার খানকে বলা হতো বাঙ্গালার বাঘ। হাঁসু খানের পক্ষে এই গুজার খানই ছিলেন একমাত্র বল। অন্যান্যরা সকলেই 'ঢোকা ধরা' শক্তি। পারলে দাউদ খান আর কালাপাহাড়কে এই গুজার খানই কিছুটা ঠেকিয়ে দিতে পারতেন। সেই গুজার খান সরে যাওয়ায় শ্রীহরি রায়ের পরিকল্পনা সম্পূর্ণটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। হাঁসু খানের পতনও মানুষের মৃত্যুর মতোই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

মিত্র হোক আর বান্ধব হোক, ডুবন্তকে তোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নেয়ার মানুষ রায় সাহেবরা নন। ফুটো নৌকা ছেঁচার কাজ রায় সাহেবরা করেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তারা চাল বদল করলেন। দাউদ খানের শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে কিঞ্চিৎ সম্পর্ক তলে তলে তাঁরা ইতিমধ্যেই স্থাপন করে ফেলেছিলেন। এবার তাঁরা হাঁসু খানের ইষ্টচিন্তায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে দাউদ খানের পক্ষ নেয়ার পথটা আরো সুগম করে তোলার মতলব এঁটে নিলেন। গায়ের কাঁথা ছুড়ে ফেললেন শ্রীহরি রায়। সময়ের কাঁজ সময় থাকতেই করতে তিনি বিশ্বাসী। দাউদ খানের আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে দোস্তী-দহরম গরম করে তোলার ইরাদায় তৎক্ষণাৎ তিনি সংগোপনে মাঠে নেমে পড়লেন।

সবার আগে শ্রীহরি রায় দাউদ খানের মাতা আম্মা বেগমের সাথে পাত্তা লাগাতে ছুটলেন। হাঁসু খানের সাথে কথা বলার বাহানায় তিনি শাহী প্রাসাদে এলেন এবং 'গুজার খান নেমকহারামী করলেও আদৌ তাঁরা দুর্বল নন,'এই মর্মে প্রথমে তিনি হাঁসু খানকে কিছু সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। এরপরেই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হলেন শ্রীহরি রায়। শত্রুপক্ষের মানসিকতা যাচাই করার অছিলায় আম্মা বেগমের সাথে তিনি পাত্তা লাগিয়ে নিলেন। শ্রীহরিকে দেখেই আম্মা বেগম আনমনা হয়ে গেলেন। উঠতে বসতে ভক্তির স্রোতে হাবুডুবু খেতেন যাঁরা, তাঁদের দীল কেমন করে শুকিয়ে গেল অকস্মাৎ , আম্মা বেগম এই ভাবনাই ভাবতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীহরি রায় আম্মা বেগমের ভাবনা বৃদ্ধি পেতে দিলেন না। লোক দেখানো কিছু আলতু ফালতু কথা বলার পর গোপনে তিনি আম্মা বেগমকে, এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, আম্মা বেগমের না-উম্মিদ হওয়ার কোনই কারণ নেই। গোলাম তাঁদের গোলামই আছেন এখনও। হাঁসু খানকে সরিয়ে শাহজাদা দাউদ খানকে মসনদে আনার উদ্দেশ্যে আম্মা বেগমদের কেনাগোলাম শ্রীহরি রায় সর্বক্ষণ প্রাণপাত করছেন। কামিয়াবীও হাতের কাছে এসে গেছে। আর মাত্র কয়টা দিন। এরপরেই এ দুর্দিন কেটে যাবে জরুর।

শ্রীহরি রায়ের প্রভুভক্তিতে আম্মা বেগম প্রীত হলেন। আসল ঘাট মজবুতভাবে বেঁধে ফেলতে পারলেন দেখে শ্রীহরিও হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে গমন করলেন। কিন্তু এক ঘাট বেঁধেই শ্রীহরি রায় নিশ্চিত হয়ে রইলেন না। পরক্ষণেই বেরিয়ে ছোটবড় আরো

অনেকের সাথেই তিনি সমঝোতা স্থাপন করলেন। এরপর সালার সিকান্দর উযবেক ও ইসমাইল খান আব্দুরের সাথে দোস্তী করতে এলেন। পরম শত্রু ভাবলেও ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রায় সাহেবেরা তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণে এসব লোকদের মুখোমুখী ক্ষুণ্ন কখনও করেন নি। সেই সুবাদে শ্রীহরি রায় এবার এলেন সমবেদনা নিয়ে। এসব কাজে রায় সাহেবদের মস্তবড় যে সুবিধে ছিল তা হলো, তাঁদের কোন কথা বা আচরণ নিয়ে গিয়ে কেউ হাঁসু খান বা তাঁদের চক্রের অন্য কারো কানভারী করে তুলবে, এ দুর্ভাবনা রায় সাহেবদের ছিল না। হাঁসু খানদের তাঁরাই মন্ত্র ও কর্মগুরু। তাঁরাই তাঁদের কৃতকর্মের বিপক্ষে কাজ করছেন, মুগুর মেরেও সে চক্রের কারো মাথায় একথা ঢোকানোর সাধ্য কোন বক্তিরই ছিল না। তবু যথা সম্ভব গা ছাপিয়ে এসে শ্রীহরি রায় সালার সিকান্দর উযবেককে বললেন-সালার সাহেব, বলি বলি করেও সাহস পাইনি বলার। এতবড় একটা অন্যায় ঘটনা ঘটে গেল আর আমরা কেউ টু'শব্দটি করলাম না,এটা কি আমাদের ঠিক হল?

অনুমানে ধরলেও, এই কুকর্মে শ্রীহরি রায়দের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা সিকান্দর সাহেবের নজরে কখনো পড়েনি। শ্রীহরি রায় কতলু খানদের পেয়ারের লোক, আচরণ তাঁদের সন্দেহজনক, রায় সাহেবদের সম্পর্কে সিকান্দর সাহেব এই পর্যন্ত জানেন। শ্রীহরি রায়ের কথা শুনে সিকান্দর উযবেক বিস্মিত হলেন। কোনচ্ছলে কোন কথা তিনি আদায় করতে চান ভেবে, সিকান্দর উযবেক সাহেব সতর্ক হয়ে বললেন-ঠিক হলো মানে?

শ্রীহরি রায় বললেন-মানে এতদিন যার নুন খেলাম, চোখের সামনে সে লোকটি খুন হয়ে গেল, তবু আমরা কেউ কিছু করলাম না। এটা কি উচিত হলো আমাদের?

ঃ নুন তো এ হুকুমাতের সকলেই খেয়েছেন। উচিত অনুচিত বোধটা কি আমাদের কারো একার?

ঃ একার না হলেও আবার একদিক দিয়ে একার। কিছু করার যাদের শক্তি আছে এ বোধটা সবার আগে তাঁদের উপরই বর্তায়।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনারা সৈন্যাধ্যক্ষ। শক্তির মালিক আপনারা। কিছু করলে তো আপনারাই করতে পারবেন। অন্যেরা তো পারবে না।

ঃ যারা সৈন্যাধ্যক্ষ, শক্তির মালিক, তাদেরও তো মালিক আছেন। মালিকের হুকুম ছাড়া সৈন্যাধ্যক্ষদের করার আছে কি?

ঃ মালিকের হুকুম মানে? কথাটা স্পষ্ট হলো না সালার সাহেব। কে আপনাদের মালিক?

ঃ মালিক আমাদের সুলতান। যিনি মসনদে থাকেন তিনি। মালিকের হুকুম পালন করাই সামরিক লোকদের কাজ।

ঃ সেকি! একজন অন্যায়ভাবে মসনদ দখল করলেও তিনি মালিক আপনাদের?

ঃ জরুর। আমরা হুকুমের গোলাম। মসনদ দখলের ন্যায় অন্যায় দেখবেন মসনদের উত্তরাধিকারীরা। আমরা কেউ মসনদের উত্তরাধিকারী নই। ও নিয়ে আমরা কেন মাথা ঘামাতে যাবো?

শ্রীহরি রায় বুঝলেন, নিজে তিনি ডালে ডালে ফিরলেও, সিকান্দর উযবেক সাহেবেরা পাতায় পাতায় ফেরা লোক। সবাই হাঁসু-কতলু নন। এভাবে এখানে ডা'ল সেদ্ধ হবে না। তাই তিনি সরাসরি নিজ বক্তব্য তুলে ধরলেন। কণ্ঠস্বর করুণ করে বললেন-দেখুন, আমাকে আপনি কোন চোখে দেখছেন জানিনে, তবে আমার কথা হলো, শাহজাদা দাউদ খান কাররানীর দিকটা একেবারেই উপক্ষো করা কারোই আমাদের উচিত হবে না। তাঁর পিতার ও ভ্রাতার অনেক নুন পেটে আছে আমাদের। তদুপরি, শাহজাদা দাউদ খান সর্বগুণে গুণী ব্যক্তি। তিনি বিচক্ষণ ও হৃদয়বান। ন্যায়ত ধর্মতঃ এ মসনদ তাঁরই প্রাপ্য। ভগবান আমাদের সবাইকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। বিবেক বুদ্ধি নিয়ে যদি ন্যায় অন্যায়ের দিকটা আমরা না দেখি,তাহলে আর না হোক, ভগবান এটা সইবেন না।

শাহাজাদা দাউদ খানের স্মরণে দুঃখ বেদনা মিলিয়ে শ্রীহরি রায় এই রকম আরো এমন সব কথা বললেন এবং কথা শেষে নিঃশ্বাস ফেলে ভারাক্রান্ত চিত্রে তিনি এমনভাবে প্রস্থান করলেন যে, সেনাপতি সিকান্দর উযবেক দিশেহারা হয়ে গেলেন। শ্রীহরি রায়ের এই দরদটা সবটুকুই মেকী, এটা শক্তভাবে ভাবার মতো মনোবল-আর তাঁর রইলো না।

এই একইভাবে শ্রীহরি রায় সালার ইসমাইল খানদেরও আন্দোলিত করে ফিরতে লাগলেন এবং সেই সাথে পুনঃ পুনঃ শাহী মহলে গিয়ে হাঁসু খানকেও নানাচ্ছলে খুশি রাখতে লাগলেন।

হাঁসু খানের অবস্থা যখন এই রকম নড়বড়ে ঠিক সেই সময় সুলতান দাউদ খান কাররানী তাঁর সালার সেপাই সহকারে এসে অতর্কিতে তান্ডার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাঁসু খানের দায়িত্বহীন গুপ্তচরদের অলস দৃষ্ট এড়িয়ে এমন ক্ষিপ্রগতিতে দাউদ খান তান্ডায় এসে হানা দিলেন যে, এজন্যে তৈরি থাকা সত্ত্বেও হাঁসু খান তাল হারিয়ে ফেললেন। পূর্ববর্তী কোন রকম খবর আভাস না থাকায় অকস্মাৎ এই হামলায় তিনি বাইরের দিক সামলাবেন, না ভেতরের দিক সামলাবেন, দিশে করতে পারলেন না। কালাপাহাড়ের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তাঁর প্রাথমিক প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং দাউদ খানেরা শাহী এলাকায় ঢুকে পড়লেন। খবর পেয়ে কতলু খান ও অন্যান্য গাদ্দারেরা বাহিনী নিয়ে হৈ হৈ করে আসতে আসতেই দাউদ খান ও লোদী খান নিজ নিজ বাহিনীর কিয়দংশ নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে শাহী প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন ও হাঁসু খানের দুর্বল প্রতিরোধ মুহূর্তেই নস্যাৎ করে শাহী প্রাসাদ দখল করলেন। হাঁসু খান

কয়েদ হলেন এবং দাউদ খানের হস্তক্ষেপের আগেই তাঁর বিক্ষুব্ধ সেপাইদের হাতে হাঁসু খান নিহত হলেন।

শাহী প্রাসাদের বাইরে তখন তুমুল লড়াই চলছিল। কতলু খান লোহানী ও গাদ্দার সালারদের তামাম ফৌজের বিরুদ্ধে সিপাহসালার কালাপাহাড় একাই এতক্ষণ লড়ছিলেন এবং একাই দুশমনদের সম্মিলিত বাহিনীর মাঝে আতংক পয়দা করেছিলেন। এবার সসৈন্যে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন দাউদ খান ও লোদী খান। অপরপক্ষ এবার প্রলয়ের মুখে পড়লো। মরণ নিশ্চিত দেখে তারা পিছু হটে পলায়ন করতে গেল। কিন্তু পেছন ফিরে চেয়েই তারা আঁতকে উঠে দেখলো, পলায়নের পথ তাদের রুদ্ধ। তাদের পেছন পথ সসৈন্যে আটকে আছেন সালার সিকান্দর উযবেক, সালার ইসমাইল খান ও দাউদ খান কাররানীর অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী সালার-সেনা-ফৌজদারেরা। তাঁদেরও সেপাই সংখ্যা অনেক। দেখতে দেখতে দাউদ খানের ও সিকান্দর সাহেবদের সেপাইরা দুশমনদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো। পলায়নের পথ না থাকায় কতলু খানের নেতৃত্বে গাদ্দার সালালেরা নিরুপায় হয়ে লড়তে লাগলেন ও একের পর এক ধরাশায়ী হতে লাগলেন। ধরাশায়ী হতে লাগলো গাদ্দারদের বিপুল সংখ্যক সেপাই-সেনা। সবাই তারা বাঙ্গালা মুলুকের এবং বাঙ্গালার হুকুমাতেরই ফৌজ। এ অবস্থা দেখে লোদী খান চমকে উঠলেন। তিনি বুঝলেন এ অবস্থা আর কিছুক্ষণ চললে গাদ্দারদের আঁওতাধীন ঐ বিপুল সংখ্যক সেনাসৈন্য তামামই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যা পক্ষান্তরে বাঙ্গালা মুলুকের শক্তিকেই দুর্বল করে দেবে।

www.boighar.com

সঙ্গে সঙ্গে লোদী খান সামনে ছুটে এলেন। তিনি হাঁসু খানের মৃত্যুর খবর জানিয়ে আর সৈন্যক্ষয় না করে আত্মসমর্পণ করার জন্যে কতলু খানকে আহ্বান করলেন। কিন্তু কতলু খান তখন মরিয়া। কতলু খান দেখলেন, এতবড় বেইমানীর পর ধরা দিলে আর বাঁচার আশা নেই। মরতে তাঁকে হবেই। কাজেই প্রাণপণে লড়ে যদি বাঁচার পথ করা যায় আত্মসমর্পণ করার চেয়ে সেইটেই হবে বেহতর। কতলু খান থামলেন না। তিনি প্রাণপণে লড়তে লাগলেন আর সৈন্যক্ষয় করতে লাগলেন।

এবার লোদী খান, দাউদ খান, কালাপাহাড় সাহেব—সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিজয় চূড়ান্ত হওয়ার পরও এইভাবে এই মুলুকেরই সৈন্যক্ষয় কি করে রোধ করা যায় তাঁরা ভাবতে লাগলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে তাঁরা তিনজনই সবিস্ময়ে দেখলেন, ছোট্ট একটি সৈন্যদল ময়দানের বাইরে থেকে দাউদ খানের জয়ধ্বনি দিতে দিতে তাদের সামনে এগিয়ে আসছে। উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে এ বাহিনীর নেতৃত্বে যিনি আছেন, তিনি শ্রীহরি রায়। শ্রীহরি রায় সামনে এসেই দাউদ খানকে কুর্নিশ করে ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন—দোহাই হুজুর, দুশমন পক্ষের সৈন্যক্ষয় আর করবেন না। বিপক্ষে থাকলেও ওরা এদেশেরই ফৌজ। নিজের হাতে নিজের সৈন্য মারবেন না। মেহেরবানি করে এই সৈন্যক্ষয় বন্ধ করুন

বইঘর.কম ও রোকন

শ্রীহরি রায়ের পূর্বাপর ভূমিকা কি, এটা যাচাই করার অবকাশ তখন কারো ছিল না। তাঁর কথার জবাবে লোদী খান বললেন—মারতে তো আমরা চাইনে। কিন্তু তারা যদি তবুও লড়েই মরতে চায়, তাহলে আর কি করতে পারি আমরা?

শ্রীহরি রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন—মাফ করে দিন জনাব, ক্ষমা ঘোষণা করুন। ক্ষমা ঘোষণা করলেই এই লড়াই থেমে যাবে।

লোদী খান এ কথা লুফে নিলেন। তিনিই এমনই একটা চিন্তাভাবনা করছিলেন। তবে শ্রীহরি রায়ের অন্তর্নিহিত ইচ্ছে ছিল, কতলু খান সহকারে সকলেরই ক্ষমা। লোদী খান এখানে একটু হাত রাখলেন। সুলতান দাউদ খান ও সিপাহসালার কালাপাহাড়ের সমর্থন নিয়ে লোদী খান তখনই একমাত্র সাধারণ সেনা-সৈন্যের ক্ষমা ঘোষণা করলেন। এতেও যাদুর মতো কাজ হল। সবিস্ময়ে ও সপুলকে সকলেই দেখলেন, ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই বিপক্ষের সেপাইরা সকলেই তলোয়ার কোষ বদ্ধ করে ফেলেছে। চমৎকৃত হয়ে সুলতান দাউদ খান কাররানী শ্রীহরি রায়ের বুদ্ধির তখনই কিছু তারিফ না করে পারলেন না।

শেষ হলো লড়াই। অপরপক্ষের সেপাইরা তলোয়ার খাপে ফেলতেই এ পক্ষের সেপাইরা কয়েকজন গাদ্দার সহ কতলু খানকে কয়েদ করে ফেললো। শ্রীহরি রায়ের উদ্দেশ্য সফলকাম হলো না। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কতলু খান লোহানী নিহত হলে এই হুকুমাতে রায় বাবুদের নির্ভরযোগ্য তেমন আর বাহন ও বান্ধব কেউ থাকে না। কিন্তু তিনি নিরুপায়। শেষ চেষ্টা হিসাবে কয়েদ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি সুকৌশলে কতলু খানকে জানালেন, বাঁচার এখন একমাত্র পথ হলো, সনির্বন্ধ ক্ষমা প্রার্থনা করা। এখানে কার্পণ্য করলে চলবে না।

দরদে নয়, প্রয়োজনের খাতিরেই শ্রীহরি রায় কতলু খানকে এই বুদ্ধি দিলেন। চূড়ান্তভাবে বিজয় ঘোষণার পর কয়েদীদের সামনে আনা হলে, সুলতান দাউদ খান কাররানী তাদের হত্যা করার আদেশ দিতে গেলেন। কিন্তু হাত দিলেন লোদী খান। লোদী খান তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সবিনয়ে বললেন—শাস্তি-ক্ষমা এইভাবে নয় জনাব। সুলতানকে এখন সুলতানের মতোই চলতে হবে। দণ্ড-ক্ষমা সব কিছুই যথাযথ বিচারের পর। সামনে আমাদের কাজ আছে জরুরী। কয়েদীদের আপাততঃ কয়েদখানায় প্রেরণ করার জন্যে আমি আরজ পেশ করছি।

দাউদ খান নিরস্ত হলে এবং লোদী খানের কথামতো কয়েদীদের কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর লোদী খানের নেতৃত্বে সুলতান দাউদ খান কাররানীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙ্গালার তখ্‌তে অধিষ্ঠিত করা হলো। নিদারুণ এক প্রলয়ের পর দেশে আবার শান্তি ফিরে এলো।

o o o

মানসিকতায় সুলতান দাউদ খান কাররানী একজন প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা মানুষ। অধীনতাকে আজীবন তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। তাই, মসনদে বসার পরই তিনি তাঁর

মরহুম ভ্রাতা বায়াজিদ খান কারবানীর নীতিই পুরোপুরি অনসরণ করে নিজেকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণাদান করলেন এবং নিজের নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রাজারীর আদেশ দিলেন। ভাইয়ের নীতির জের ধরেই তিনি অন্যান্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন এবং লোদী খানকেই পূর্ববৎ প্রধান উজিরের পদে অধিষ্ঠিত করলেন।

নিজের অবস্থান ও প্রশাসন গুছিয়ে নেয়ার মধ্যেই তাঁর কিছুদিন কেটে গেল। সব কিছু সুসংহত করে নেয়ার পর তিনি কতলু খান ও অন্যান্য গাদ্দারদের বিচারের কথা ভাবতে লাগলেন। সেই সাথে ভাবতে লাগলেন গুজার খানের কথা। গুজার খানের খ ব তিনি লড়াইকালেই পেয়েছিলেন। কতলু খানের চেয়ে গুজার খানের প্রতি অনেকটা বিশ্বাস ছিল সুলতানের। সেই গুজার খানের এই হঠকারিতা সুলতানকে বড় চিন্তিত করে তুললো। গুজার খানের ফায়সালাটাও অবিলম্বে করতে হবে এ কথাও তিনি ভাবতে লাগলেন। এসব কথা ভাবতেই তার খেয়াল হলো শ্রীহরি রায়ের কথা। শ্রীহরি সেই থেকেই তাঁর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন। প্রশাসন গুছিয়ে নেয়ার কাজে শ্রীহরি রায় যে অক্লান্ত শ্রম দিলেন, তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। অনেকের অনেক গাদ্দারীব অকাট্য প্রমাণ বেরিয়ে পড়ছে দিন দিন। কিন্তু সন্দেহটুকু ছাড়া, এ পর্যন্ত শ্রীহরি রায় বা তাঁর অগ্রজ বসন্ত রায়ের বিরুদ্ধে গাদ্দারীর প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুলতান ভাবতে লাগলেন, শ্রীহরি রায়ের এই আন্তরিকতা কি অতীতেও ছিল, না অবস্থা বুঝে কাজ করছেন শ্রীহরি রায়? সুলতান এটা যাচাই করে দেখার কাজে প্রবৃত্ত হলেন।

'সাবধানের মার নেই', 'বুদ্ধির বড় বল নেই'— চিরন্তন বাণী। শ্রীহরি রায়দের ব্যাপারেও এই সনাতন বাণীর মাহাত্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো। সুলতান দাউদ খান কাররানী বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেও কতলু খানদের সাথে মেলামেশার দরুন সন্দেহটুকুর অধিক রায় সাহেবদের বিরুদ্ধে বেইমানীর প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণই পেলেন না। উপরন্তু সালার সিকান্দর উযবেক সহকারে আরো অনেকের কাছেই যা তিনি জানলেন, তাতে এই বর্তমানেই নয়, মৌখিকভাবে হলেও অতীতেও তাঁর প্রতি রায় সাহেবেরা কিছুটা সমবেদনাই দেখিয়েছেন, বিষোদিগরণ করেন নি। এ থেকে সুলতানের এই ধারণাই হলো যে, হোক তাঁদের দীল কিছুটা অপরিষ্কার বা হোন তাঁরা মানসিকভাবে কিছটা হীনমন্য, পরিস্থিতির ধাক্কায় অনেক মানুষেরই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে, রায় সাহেবদের মধ্যেও হয়তো ঝ সেই পরিবর্তন এসেছে। হাজার হোক তাঁরাও তো মানুষ! নুনের দকটা তাঁদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যে আনবেই না, মোখতছার এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

পরিস্থিতির পরিহাস! রায় সাহেবদের ব্যাপারে সুলতানের চিন্তাভাবনা এমনই যখন

বইঘর.কম ও রোকন

নাজুক, ঠিক সেই সময়ই আম্মা বেগম শ্রীহরি রায়কে উজিরের পদে অধিষ্ঠিত করার জন্যে সুলতানের উপর দুর্বার চাপ সৃষ্টি করলেন এবং শ্রীহরি রায়ের বিশ্বস্ততার প্রশংসায় জান ছেড়ে দিলেন। এর ফলে, শ্রীহরি রায়ের বিশ্বস্ততা নিয়ে সুলতানের দীলে যা কিছু বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, খোদ আম্মাজানের এই ওকালতিতে তা বিদূরিত হয়ে গেল। তিনি এবার ভাবতে লাগলেন, রায় বাবুরা বুদ্ধিমান। দূরে সরিয়ে না রেখে এঁদের কাছে রেখে কাজে লাগালে, অনেক সুফল পাওয়া যাবে।

কৌতূহলের বশেই সুলতান একদিন শ্রীহরি রায়কে বললেন — রায় সাহেব, আপনি যে যথেষ্ট বুদ্ধিমান সে পরিচয় আমি অনেকবারই পেয়েছি। এবার বলুন তো দেখি, যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে আমার?

শ্রীহরি রায় বিনয়ের সাথে বললেন — হুজুর এসব ব্যাপার বড় ব্যাপার। বড় মাথার কাজ। এতবড় জটিল একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার মাতো নগণ্য একজন মানুষ কি মন্তব্য করবে হুজুর?

ঃ তবু বলুন দেখি, আপনি যদি সুলতান হতেন, তাহলে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিতেন আপনি?

শ্রীহরি রায় কাঁচুমাচু করে বললেন — গোস্তাকী মাফ হয় হুজুর। আমাকে নিয়ে হুজুর কেন যে এই রসিকতা করছেন, কিছুই আমি ঠাহর করতে পারছিনে।

সুলতান এবার কিছুটা গম্ভীর হয়ে বললেন — এটা আমার রসিকতা নয়। আপনিও একজন একেবারেই নগণ্য লোক নন। এই হুকুমাতের একজন পদস্থ লোক আপনি। অনেকদিন ধরে রাজনৈতিক অনেক কর্মকাণ্ড আর অনেক হেরফের স্বচক্ষে আপনি দেখে আসছেন। আপনার সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন, এইটেই আমি আশা করি।

আর ভণিতা করার সাহস শ্রীহরি রায়ের হলো না। সুলতানের বিশ্বাসভাজন হওয়ার লক্ষ্যে তিনি যথাসম্ভব সৎ যুক্তি দেয়ারই চেষ্টা করলেন। বিনীত ও সংযত কণ্ঠে বললেন— হুজুর, আমার যা ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি তাতে গাদ্দারদের গাদ্দারীর দৃষ্টান্ত মূলক সাজা হওয়াই উচিত।

স্থির নজরে চেয়ে সুলতান ফের প্রশ্ন করলেন — সবাইকে হত্যা করারই পক্ষপাতি আপনি?

ফাঁক পেয়ে শ্রীহরি রায় বললেন— না, ঠিক তা নয় হুজুর। কোন অপরাধী যদি দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, নিজের সততা প্রমাণের মিথ্যা চেষ্টা না করে, তাহলে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাকে ক্ষমা করাও যায়

ঃ ক্ষমা করাও যায়?

ঃ যায় এই কারণে হুজুর যে, মন্দকে ভাল হওয়ার সুযোগ দেয়া একদিক দিয়ে যেমন মহত্ত্বের কাজ হয়, অন্যদিক দিয়ে তেমনি নিজের শক্তিটাকেও অক্ষত রাখা হয়। মতিভ্রমের কারণে বা অন্যের প্রলোভনে পড়ে একবার গাদ্দারী করেছে বলেই নির্দ্বিধায় নিজের লোক সবাইকে কোতল করে ফেললে, নিজের বাহুকেই কমজোর করে ফেলা হয় হুজুর। বাঙ্গালার স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতান তো অজাতশত্রু নন। নিজের বাহু মজবুত রাখার জরুর তাঁর দরকার আছে।

ঃ কিন্তু ক্ষমা পেয়ে ভবিষ্যতে আবার যদি কেউ বেইমানী করে বসে?

ঃ নিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সে ঝুঁকি তো কিছুটা নিতেই হবে হুজুর। যে কারণে হুজুর বিপক্ষের তামাম সেপাই খতম করতে পারলেন না, এ ব্যাপারটাও তো সেই রকমই। তবে কারো ঈমানদারীর ব্যাপারে হুজুর যদি সংশয়মুক্ত না হোন, অর্থাৎ কারো আচরণ আর অনুশোচনার মধ্যে বিশ্বস্ততার আভাস যদি সুস্পষ্ট হয়ে না উঠে, তাকে তো নির্ঘাত হুজুর ক্ষমা করতে পারেন না।

ঃ হুঁউ!

ঃ হুজুর!

সুলতান এবার ঈষৎ হেসে বললেন— এই তো তোফা কথা বলছেন। তবু বলবেন, আপনি কিছু বোঝেন না?

ঃ আমার জ্ঞান অতি সীমিত হুজুর।

ঃ তা হোক। আবার বলুন দেখি, গুজার খান সাহেবের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া আমার উচিত হবে? তাঁর এই এতবড় হঠকারিতা কি মাফ করা যায়?

শ্রীহরি রায় চিন্তা করে দেখলেন, তিনি উল্টাপাল্টা বললেও সৎ ও যোগ্য যুক্তি দেয়ার আরো অনেক লোক আছেন। তাই নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার অভিপ্রায়ে শ্রীহরি বিনয়ের সাথে বললেন— কসুর নেবেন না হুজুর। কিছুটা কষ্টকর হলেও আমর ধারণায় তা করতে পারাটাই বোধ হয় ভাল হয়। কারণ, তাঁর মতো একটা দুর্বার শক্তিকে উচ্ছেদ করলে, ঘুরে ফিরে ঐ একই কথা আসে হুজুর, মানে নিজেকে নিজেই দুর্বল করে ফেলা। হরওয়াক্ত আমরা এক মহা বিপদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছি। দিল্লীর শক্তিকে মোকাবেলা করার কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে কেন মেহেরবান।

সুলতানের নজর আবার মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো। পরক্ষণেই নজর নামিয়ে নিয়ে তিনি সহজকণ্ঠে বললেন— তাই?

ঃ এর বেশি আর কিছু তো আমার ধ্যান ধারণায় আসে না হুজুর।

ঃ আচ্ছা!

ঈষৎ হেসে সুলতান শ্রীহরিকে বিদায় দিলেন। নিতান্তই অলস কৌতুকে সুলতান

বইঘর.কম ও রোকন

দাউদ খান কাররানী শ্রীহরি রায়ের সাথে এসব আলাপ করলেন। তাঁর কোন পরামর্শ তিনি গ্রহণ করবেন, আদৌ এ কারণে নয়। কিন্তু আলাপ অন্তে শ্রীহরি রায়ের কথাগুলো সুলতানের দীলে অনেকখানি রেখাপাত করলো।

পরে যখন এসব ব্যাপারে কার্যকরী পরামর্শের জন্যে সুলতান তাঁর পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিচক্ষণ উজির লোদী খান সাহেবের শরণাপন্ন হলেন, তখন তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, উজির লোদী খানও তাঁকে এই পরামর্শই দিচ্ছেন। সেরেফ দিচ্ছেনই নয়, এই পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে উজির সাহেব চাপ সৃষ্টি করছেন।

কাজের বেলাতেও ঘুরে ফিরে সুলতানকে এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হলো। বিচারে বসে দেখা গেল, গাদ্দারেরা অনেকেই ছলনা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের নির্দোষ বলে সাফাই গাইতে লাগলেন। অনুতাপের কোন নিদর্শনই তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হলো না। স্বাভাবিক ভাবেই সুলতান তাঁদের গুরুদণ্ড দিলেন এবং লোদী খানও এই দণ্ডের পক্ষপাতি হলেন। কিন্তু কতলু খান লোহানী একেবারেই ভিন্ন আচরণ করলেন। শ্রীহরি রায়ের পূর্ববর্তী পরামর্শেই হোক, আর মানসিক প্রতিক্রিয়ার জন্যেই হোক, কতলু খান অকপটে দোষ স্বীকার করলেন এবং আন্তরিকভাবে অনুপপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অপরাধের অনুপাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত এবং সুলতান একান্তই অনুগ্রহ না করলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডই দেয়া হোক। কতলু খান এ ইচ্ছাও ব্যক্ত করলেন। তাঁর ব্যাপারে মতামত চাইতে গেলে উজিরে আজম কতলু খানকে ক্ষমা করারই পক্ষপাতি হলেন। যুক্তি হিসাবে লোদী খান দেখালেন, কতলু খান লোহানী বিপুল সংখ্যক লোহানী গোত্রের সেপাইদের নেতা। তাঁকে হত্যা করা হলে এইসব সেপাইদের ক্ষুণ্ন করা হবে। এই হুকুমাতের জন্যে প্রাণপাত করার ক্ষেত্রে তারা অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করবে। অনুতপ্ত না হলে দুর্জনকে ক্ষমা করার প্রশ্নই কিছু উঠতো না। কিন্তু কতলু খান যেখানে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত, সংশোধন হয়ে গেলে ভবিষ্যতে তিনি সুলতানের শক্তিই বৃদ্ধি করবেন। এতে করে কতলু খান সহকারে আরো কয়েকজন কয়েদীকে সুলতান ঐ একই নীতিতে ক্ষমা করে দিলেন।

বিচারপর্ব শেষ হলে গুজার খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার যখন কথা উঠলো এবং সুলতান যখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করারই কিছুটা পক্ষপাতি হলেন, তখনও লোদী খান তা সমর্থন করতে পারলেন না। গুজার খান মনেপ্রাণে এই বাঙ্গালার একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। গুজার খান এই সালতানাতের অদম্য এক শক্তি। এ শক্তিকে লোদী খান কিছুতেই রুষ্ট বা হাতছাড়া করতে চাইলেন না। আসন্ন দিল্লীর হামলার দিকে নজর রেখেই লোদী খান গুজার খানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে নিজেদের গোলমাল মিটিয়ে নেয়ার উপর জোর সুপারিশ করলেন।

সুলতান এ সুপারিশ উপেক্ষা করতে পারলেন না। কারণ, সুলতান নিজেও জানেন,

বইঘর.কম ও রোকন

গুজার খান, জুনায়েদ খান—এরা হলেন সালার কালাপাহাড় আর সিকান্দর উযবেকদের মতোই বাঙ্গালার শক্তির এক একটা স্তম্ভ। জুনায়েদ খান নেই। গুজার খানও না থাকলে তাঁর শক্তি স্বাভাবিকভাবেই কমজোর হয়ে যায়। তাছাড়া, গুজার খানের মন মানসিকতাও যে উন্নত, এটাও সুলতানের অজানা নয়। এ সব ভেবে যুদ্ধযাত্রার আগে সুলতানও সমঝোতার চেষ্টা নিতে আগ্রহী হলেন।

সুলতানের অনুরোধে উজিরে আজম লোদী খান সাহেবকেই এই সমঝোতা স্থাপনের কাজে বিহারে যাত্রা করতে হলো। কয়েকদিনের মধ্যেই আশাতীত সাফল্য নিয়ে লোদী খান সুলতানের কাছে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন গুজার খান স্বয়ং। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে গুজার খান একবাক্যে সুযোগ্য সুলতান দাউদ খান কাররানীর আনুগত্য স্বীকার করেছেন এবং লজ্জার খাতিরে যে কাজটি তিনি নিজে করতে পারেননি, সুলতান স্বয়ং সে সুযোগ করে দেয়ায়, অর্থাৎ সুলতান দাউদ খানের সাথে একাত্ম ঘোষণা করার মওকা করে দেয়ায়, গুজার খান অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। সুলতানের এই আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ তাণ্ডায় ছুটে এসেছেন। রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ও অপরিণত বয়স্ক সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্রও এজন্যে খুশি হয়েছেন এবং অচিরে তিনিও তাঁর পরিবারবর্গ সহকারে চাচার কাছে ফিরে আসছেন।

পরিস্থিতির চাহিদায় এইভাবেই সব কিছু মিটমাট হয়ে গেল। অতঃপর সালার গুজার খান, কতলু খান লোহানী ও অন্যান্য সকলেই মসনদের পাশে এসে খোলাদীলে দাঁড়িয়ে গেলেন। তামাম সমস্যার এই সন্তোষজনক সমাধান ও সমন্বয় হওয়ার জন্যে সুলতান দাউদ খান কাররানী প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কাছে শুকুর গোজারী করলেন। তৎপরেই তিনি উজিরে আজম লোদী খানকে প্রাণ ঢেলে মোবারকবাদ জানালেন। সেই সাথে শ্রীহরি রায়ের কথাও সুলতান ভুলে যেতে পারলেন না। মন্ত্রিত্ব দানের জন্যে আম্মাজনের নিরন্তর পীড়াপীড়ির মুখে সুলতান শ্রীহরি রায়কে দরবারের একজন পদস্থ সদস্যের পদ দান করতঃ সহকারী কোষাধ্যক্ষ থেকে কোষাগারের তামাম দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করলেন। এ ছাড়াও, তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রসঙ্গে তাঁকে কিংবদন্তির রাজা বিক্রমাদিত্যের (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের) সাথে তুলনা করে সুলতান দাউদ খান কাররানী শ্রীহরি রায়কে "বিক্রমাদিত্য" উপাধিতে ভূষিত করলেন।

বারো

বাইরের ঝড় থেমে গেল। সুলতান দাউদ খান কাররানী বিপদমুক্ত মসনদে মজবুত হয়ে বসলেন। প্রশান্ত পরিবেশে প্রশাসন হাতে নিলেন। অশান্ত রাজ্যপাটে শান্তি ফিরে এলো। কিন্তু শান্তি নামক সুখপাখিটি সুলতানের ছায়াটিও স্পর্শ করতে পারলো না।

বইঘর.কম ও রোকন
মুলুক ও মসনদের দুর্নিবার চাহিদায় সাড়া দেয়া শেষ হতেই সুলতান দাউদ খান কাররানীর হৃদয়ের চাহিদা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ঝড় উঠলো সুলতান দাউদ খানের অন্তরে। দৌলতজাহান কোথায় আর কি অবস্থায় আছেন আজ, কে জানে!

দরবার ও প্রশাসনের ঝুটঝামেলা মিটিয়ে মহলে ফিরে এলেই তিনি বিমনা হয়ে যান। নিঃসঙ্গ শয়নকক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথে দীল তাঁর হাহাকার করে উঠে। রাজ্য-মসনদ, অর্থ-ঐশ্বর্য, সবকিছু থাকতেও তিনি বড় নিঃস্ব। পবিবার পরিজন পরিবেষ্টিত হয়েও তিনি বড় একা। যা তিনি চাননি, সেই রাজ্যপাট উড়ে এসে তাঁর ঘাড়ে চেপে বসেছে। যা তিনি চেয়েছেন, প্রাণপাত করেও তা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নজরে তাঁর পড়ছে না।

শাহী খাটে শুয়ে শুয়ে বিনিদ্র রজনী তিনি অতিবাহিত করেন। কুসুম পেলব বিছানা কাঁটার মতো ফুটে। ফুলদানীতে চোখ পড়লেই চমকে উঠেন সুলতান। তাঁর বিপর্যস্ত বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠে। টনটন করে উঠে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল। সেই স্বর্ণালী স্বপ্নটা স্বপ্ন হয়েই রয়ে যাওয়ার হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি।

তরতাজা ফুলের তোড়া আজও তাকে ফুলদানীতে। নিত্য নতুন তোড়া দিয়ে এখনও ফুলদানিটা সুশোভিত রাখা হয়। কিন্তু সে শোভা সুলতানের চোখের জ্বালাই বৃদ্ধি করে, তৃপ্তি দান করে না। যে তোড়া সুলতানের মানসপটে বিদ্যমান তার স্থানে ভিন্ন তোড়ার অবস্থান তিনি সহ্য করতে পারেন না। এ দৃশ্য সুলতানকে পীড়িত করে তোলে। সময় সময় এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। ক্ষিপ্ত হলেই ছুটে গিয়ে ফুলের তোড়ায় হাত দেন। নিজের প্রায় অজ্ঞাতেই তোড়া তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলেন। এ কারণে খাসবান্দা ভীত হয়ে পড়ে। সুলতানের মন উঠেনি ভেবে আরো অধিক সুন্দর তোড়া ফুলদানীতে রাখে।

বেশ কিছুদিন হয়ে গেল সুলতান দাউদ খান কাররানী বাঙ্গালার তখ্‌তে বসেছেন। এর মাঝে একদিনও নিশ্চেষ্ট তিনি থাকেন নি। তখ্‌তে উঠে বসার পরই দৌলতজাহানদের অনুসন্ধানে আবার তিনি তৎপর হয়ে উঠেছেন। প্রশাসন গুছিয়ে নেয়ার হুটোপাটির মধ্যেই তিনি এক সুদক্ষ গোয়েন্দাদল সাসারামে প্রেরণ করেন। দৌলতজাহান, দিনারবানু, মুরাদখান বা তাদের হদিস-জানা কোন লোকের দেখা সাক্ষাৎ পেলেই, তাঁদের এনে রাজধানীতে হাজির করতে বলেন। হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে প্রেরিত সেই গোয়েন্দা দল। সাসারাম ও তার আশেপাশে কোথাও দৌলতের বা তাঁদের হদিস-জানা কোন কাউকে খঁজে পায়নি তারা। দাউদ খান কাররানী এখন বাঙ্গালা মুলুকের সর্বেসর্বা। তাঁর হুকুমের গোলাম প্রশাসনের সকলেই। অনুসন্ধানের কাজে তিনি অসংখ্য লোক চারদিকে নিযুক্ত করে রেখেছেন। কিন্তু ফলাফল আজ পর্যন্ত শূন্য। সন্ধান তো দূরের কথা, একটু আভাসও আজতক্ কেউ আনতে পারেনি।

নিরাশার অথৈ তলে দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছেন সুলতান। তাজ্জব হয়ে ভাবছেন, এমন হাওয়া হয়ে একদম মিলিয়ে গেলেন কোথায় তাঁরা? জীবিত না মৃত, ঘর সংসার পেতেছেন, না পথে পথে ঘুরছেন— এটুকু তথ্যও কেউ আনতে পারলো না? নাকি তারা বিলকুল ত্যাগ করেছেন এ মুলুক? ক্ষোভে-দুঃখে আক্রোশে এই সালতানাতের ত্রিসীমানার বাইরে চলে গেছেন তাঁরা? নয়া মুল্লুকে গিয়ে কি নয়া জিন্দেগী শুরু করেছেন দৌলতজাহান? নয়া কাউকে নিয়ে সংসার পেতে কি অতীতের তামাম স্মৃতি মন থেকে বিলকুল মুছে ফেলে দিয়েছেন?

www.boighar.com

আর ভাবতে পারেন না সুলতান। আকুলি বিকুলি করে উঠে নিশ্চুপ হয়ে যান। দৌলতকে পাওয়ার আশা আর তিনি রাখেন না। সে আশা তিনি ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছেন পুরোটাই। শুধু আত্মতৃপ্তির খাতিরে তাঁদের সন্ধানটা চাই তাঁর। ক্ষমা চাওয়ার মওকাটাও আদৌ যদি না থাকে, না থাকুক। কোথায় তাঁরা আছেন, কি হালতে আছেন, জীবিত না মৃত—এতটুকু জানতে পারলেও অশান্ত দীল তাঁর স্থির হয় কিঞ্চিৎ। এদিকটার উপর একটা ইতি টানতে পারেন। কিন্তু দিনের পর দিনই শুধু অতিবাহিত হচ্ছে, সে সব কোন আভাসই সুলতান আজও পাচ্ছেন না।

এমনই ধারা চিন্তাভাবনায় সুলতান যখন পেরেশান, তখন একদিন ভয়ে ভয়ে হাজির হলেন মাসুম গজনবী। ইতস্ততঃ চরণে শাহী প্রাসাদে এসে তিনি কুণ্ঠার সাথে সুলতানের দর্শনপ্রার্থী হলেন। সকাল থেকে সারাদিন উজির-নাজির দাবড়িয়ে এসে সুলতান তখন ক্লান্তভাবে তাঁর খাস কামরায় গা এলিয়ে দিয়েছেন এবং শুয়ে শুয়ে আসমান জমিন ভাবছেন। মাসুম গজনবী সুলতানের দর্শনপ্রার্থী, বান্দা এসে এ খবর দেয়ামাত্র সুলতান আবার সোজা হয়ে শয্যার উপরে উঠে বসলেন এবং মাসুম গজনবীর আগমনের উদ্দেশ্য কি, জানতে চাইলেন। জবাবে বান্দা যা জানালো তাহলো, উদ্দেশ্যের কথা মাসুম গজনবী বান্দাকে কিছু বলেননি, সুলতানের সাথেই গজনবী সাহেবের কি যেন এক ব্যক্তিগত আলাপ আছে— মাসুম গজনবী ভয়ে ভয়ে এই কথাই জানিয়েছেন।

ব্যক্তিগত আলাপ! সুলতানের সাথে মাসুম গজনবীর ব্যক্তিগত আলাপ! সুলতানের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। তবে কি দৌলতজাহানের কোন খবর, না ফাটল ধরেছে প্রশাসনের কোথাও? মামুলী এক কর্মচারী হলেও, মাসুম গজনবী প্রকৃতই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। কোন্ খবর এনেছেন তিনি? গজনবীকে খাস কামরাতেই পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে বান্দার প্রতি হুকুম করলেন সুলতান।

একটু পরেই মাসুম গজনবী খাস কামরায় ঢুকলেন এবং শংকিত ভাবে কুর্ণিশ করে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সুলতান তাঁকে সামনে এসে বসার নির্দেশ দিলে, নিরতিশয় দ্বিধার সাথে মাসুম গজনবী এসে সসংকোচে বসলেন এবং মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগলেন। তা লক্ষ্য করে সুলতান তাঁকে সবিস্ময়ে বললেন—কি ব্যাপার?

বইঘর.কম ও রোকন
আপনাকে তো আমি তলব দেইনি। আপনি নিজেই আমার মোলাকাতে এসেছেন। তবু এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

মাসুম গজনবী ঢোকগিলে বললেন— মানে, আমি অসময়ে আর অনেকটা মামুলী এক কারণে হুজুরের বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছি বলে আমি ভয় পাচ্ছি হুজুর। কসুর আমার মাফ হয়।

ঃ মামুলী এক কারণে!

ঃ জি হুজুর। বিষয়টা হুজুরকে জ্ঞাত করা উচিত বলেই মনে করি আমরা। কিন্তু হুজুর যদি এটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে না ভাবেন?

ঃ কি রকম? কোন রাজনৈতিক খবর?

ঃ জি না হুজুর। ওসব কিছু নয়। অন্য ব্যাপার। আমার স্ত্রী বলছেন, হুজুরকে জানানো এটা খুবই জরুরী। তাই আমি এসেছি হুজুর।

সুলতান আরো সজাগ হয়ে বললেন— অন্য ব্যাপার? আপনার স্ত্রী আমাকে জানানোর জন্যে বলেছেন! তাহলে কি দৌলতজাহানদের কোন হদিস পেয়েছেন নাকি আপনারা? কোথায় আছেন, কার কাছে আছেন, এমন কোন খবর?

ঃ জি না হুজুর। সেসব কোন হদিস কিছুই পাইনি। আর সেই জন্যেই তো বলছি, তেমন কোন জরুরী বিষয় নয়।

সুলতান রুষ্ট হলেন। রুষ্ট কণ্ঠে বললেন— তাহলে আর এসেছেন কেন আপনি?

ঃ একটা খত্ হুজুরকে দেখানোর জন্যে হুজুর।

মাসুম গজনবী তার জেব থেকে একটা চিঠি টেনে বের করলেন। সুলতান দাউদ খান কাররানী সবিস্ময়ে বললেন— খত্! আমাকে কেউ লিখেছেন?

ঃ জি না। লিখেছেন আমার স্ত্রীকে।

ঃ আপনার স্ত্রীকে! আপনার স্ত্রীকে লেখা খত্ আমাকে দেখাতে এনেছেন কেন?

ঃ এখানে যে হুজুরের প্রতিও কিছু ইঙ্গিত করা আছে। মেহেরবানি করে দেখুন। দেখলেই হুজুর বুঝতে পারবেন।

ঃ তাজ্জব।

দোদুল্যমান চিত্তে সুলতান দাউদ খান কাররানী মাসুম গজনবীর হাত থেকে চিঠিখানা নিলেন। চিঠি খুলে, কে লিখেছেন আগে তা জানার জন্যে চিঠির শেষ প্রান্তে নজর দিয়েই বিপুলভাবে চমকে উঠলেন সুলতান এবং তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। লেখিকা দৌলতজাহান!

দৌলতজাহান মাসুম গজনবীর স্ত্রী ফিরোজাবানুকে লিখেছেন—

ভাবী,

বাদ তসলিম জানাই, অনেকদিন হয়ে গেল আপনাদের সাথে আর কোন যোগাযোগ নেই আমাদের। আমরা কোথায় আছি তাতো আপনারা জানেন না, তাই

যোগাযোগ না থাকার অপরাধটা আমাদের উপরই বর্তায়। এত আপনলোক আপনারা, অথচ এতদিন হয়ে গেল তবু যদি নীরব থাকি, আপনাদের কথা আদৌ আমরা ভুলিনি— এ কথাটা যদি আপনাদের কাছে না পৌছাই, তাহলে আপনারা আমদের অমানুষ আর অকৃতজ্ঞ ভাববেন বলেই বাধ্য হয়ে এই পত্র লিখছি। কোথায় আছি, সে কথা থাক। নকরী করতে গিয়ে শেষ বয়সে নিদারুণ ঐ আঘাত পাওয়ার পর দাদুর শরীরটা একদম ভেঙ্গে গেছে। নকরী করার সামর্থ্য তাঁর আর নেই। দীর্ঘদিন যাবত আম্মাজানও রোগশয্যায়। উঠে দাঁড়াতে পারেন না। তাঁকে মুখে তুলে খাওয়াতে হয়। সুতরাং, কি হালে আছি, নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন। সুখের আশা সবই আমার নস্যাৎ হয়ে গেছে। কুসুমের মধ্যেও কীট বসত করে। তাই দীলটা অনেকখানি কুসুম মাফিক হওয়া সত্ত্বেও ঐ দাম্ভিকটা ক্ষমতা ও খানদানীর দম্ভে আমার জিন্দেগীটা বরবাদ করে দিয়েছেন। শুনছি, এখন তিনি সুলতান। কাজেই, এখন তো অবস্থান তাঁর আসমানে। তবু বদদোআ করবো না। তিনি সুখে থাকুন, সহিসালামতে থাকুন, এই কামনাই করবো। যে রকম খেয়ালী আর সরল সহজ মানুষ, তাতে কখন যে কোন মুসিবতে পড়েন, কে জানে! মসনদ তো বারুদের স্তুপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হেফাজত করুন, শান্তিতে রাখুন, এই কামনাই এখন বড় কামনা আমার। তিনি সুখে আছেন—এটা জানতে পারলেও, এই বিরাণ জিন্দেগীতে অনেকখানি শান্তির প্রলেপ পাবো আমি। আমার নিজের তো আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। এখন তাঁর সুখেই সুখ আমার। দীল তো আমার একটাই। সেই দীলটা গোটাই একজনকে উজার করে দেয়ার পর আমার আর কি আছে বলুন? তাই নতুনভাবে ঘর বাঁধার সম্বলও আমার নেই। সে চিন্তাও আমার কাছে গলিত লাশের চেয়েও কদর্য। দুঃখ কষ্ট সব সয়ে বেঁচে থাকতে পারি আমি, কিন্তু দ্বিচারিণী হয়ে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

থাক এসব কথা। যে কথা বলতে চাই তাহলো, এরপর যদি যোগাযোগ আর না করতে পারি, এইটেই শেষ যোগাযোগ ধরে নিয়ে ক্ষমা করবেন আমাদের। তবে জেনে রাখবেন, যেখানে আর যে অবস্থায় থাকিনা কেন, আপনাদের কথা আমাদের সব সময়ই ইয়াদ আছে। কোথায় আছি সে ঠিকানা দিলাম না। দেবার মতো নয় বলেই দিলাম না। যে কাঙাল হালে আমাদের দিন গুজরান হচ্ছে এখন, তা দেখলে আপনারা সহ্য করতে পারবেন না। পুনঃ পুনঃ সাহায্য নিয়ে ছুটে আসবেন বলেই ঠিকানাটা দিলাম না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া মানুষের সাহায্যে কারো দুঃখ মোচন হয় না। ওটা আমরা গ্রহণ করতে পারবো না।

ঠিকানাটা না দেয়ার আর একটা বড় কারণ আপনাদের ঐ সুলতান। হয়তো রাগটা তাঁর ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে। কিংবা আমার পিতৃপরিচয় ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন।

বইঘর.কম ও রোকন
তাঁর দীলের খবর তো জানি আমি। ঠিকানা আর আমাদের দুর্দশার কথা জানলেই করুণার ভাণ্ডার নিয়ে উনি ছুটে আসবেন নির্ঘাত। তা যদি আসেন, তাহলে নির্ঘাত তাঁর সাথে চরম দুর্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। এ জিল্লতির ফাঁক রাখতে চাইনে। দীলের দাবীতে যা আমি পাইনি, করুণা হিসাবে তা গ্রহণ করার তিল পরিমাণ রুচি আমার নেই। ওটা আমার কাছে বিষ।

আপনারা সবাই সুখে থাকুন। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আপনাদের সুখে রাখুন—এই কামনা করা ছাড়া আর আমার বলার কিছু নেই।

দোআপ্রার্থিনী,

দৌলতজাহান

এক নিঃশ্বাসে পত্রপাঠ শেষ করেই সুলতান দাউদ খান কাররানী বিছানা থেকে ছিট্‌কে গিয়ে কক্ষটির এককোণে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাধ্য অশ্রু আর উদগত কান্নার বেগ রোধ করতে লাগলেন। অনেক চেষ্টার পর নিজেকে কিছুটা সংযত করে নিয়েই ক্ষিপ্রপদে ফিরে এসে তিনি মাসুম গজনবীকে আকুলকণ্ঠে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন—কোথায় পেলেন এ পত্র? কে এসেছিল পত্র নিয়ে? নাম কি সেই পত্র বাহকের? ঠিকানা কি সে লোকের?

জবাবে মাসুম গজনবী বললেন—সে লোককে আমরা চিনিনা হুজুর। দেখাও হয়নি তার সাথে।

সুলতান ফের বিপুল বিস্ময়ে বললেন—দেখাও হয়নি মানে?

ঃ মানে, সকালবেলা দেউটি খুলতে এসে দেখি, দেউটির পাশে পড়ে আছে খত্‌খানা। দেউটির ফাঁক দিয়ে কে যেন কখন খত্‌খানা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। তা আমরা কিছুই টের পাইনি হুজুর।

ঃ তাজ্জব!

ঃ দৌলতজাহানের হাতে লেখা তো আমরা চিনি হুজুর। তাই এই খত্‌ যে দৌলতজাহানই কাউকে দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা বুঝতে পারলাম।

ঃ আচ্ছা!

ঃ খত্‌ পড়েই আমার স্ত্রী বললেন, 'শিগ্‌গির খত্‌খানা হুজুর বাহাদুরকে দিয়ে আসুন। এ খবর হুজুরের জানা খুবই জরুরী। তাই সেই সকাল থেকেই এই খত্‌ নিয়ে ঘুরছি আমি হুজুর। কিন্তু হুজুরের সাক্ষাত লাভে সক্ষম হয়নি।'

ঃ বলেন কি!

ঃ কসুর তে কিছু করিনি হুজুর?

ঃ কসুর!

ঃ মানে এই খত্ নিয়ে হুজুরের কাছে অসময়ে আসার জন্যে—

সুলতানের অন্তরে তখন ঝড় বইছে উথালপাথাল। মাসুম গজনবীর কথায় তিনি আহত হয়ে বললেন— আপনার স্ত্রীর মাথায় যেটুকু মগজ আছে, তার অর্ধেকটাও কি আপনার মাথায় নেই? এটা যে জানা আমার কত জরুরী, এ খবর যে আমার কাছে কতটা মূল্যবান, এত কিছু দেখে শুনেও আপনি কিছুই বুঝতে পারেন না?

মাসুম গজনবী নত মস্তকে বললেন—বুঝতে কিছুটা ঠিকই পেরেছি হুজুর। তবে হুজুরের তো হাজারটা ঝুটঝামেলা! তাই ভাবলাম, হুজুর কখন নাখোশ থাকেন—

গজনবীর কথায় কান না দিয়ে সুলতান আবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন— এই খত্টা আমার কাছে রেখে যেতে কি আপত্তি আছে আপনার?

মাসুম গজনবী সরবে বললেন— কিছু না হুজুর, কিছু না। আমার স্ত্রী এই খত্টা হুজুরকেই দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন।

ঃ আপনার স্ত্রীকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, তাঁর এই বুদ্ধি আর সহানুভূতির জন্যে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তাঁর জন্যেই আপনাকে আমি অচিরে একটা পদোন্নতি দেবো।

ঃ হুজুর মেহেরবান।

ঃ আপনি এবার আসুন। আগামীকাল দপ্তরে একবার সাক্ষাৎ করবেন আমার সাথে।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর—জি আচ্ছা।

কুর্ণিশ করে মাসুম গজনবী বিদেয় হলেন। মাসুম গজনবী রেরিয়ে যেতেই সুলতান আবার তখনই পত্রখানা মেলে ধরলেন। একাধিকবার সে পত্র তিনি পড়লেন আর একাধিকবার চোখের পানি মুছলেন। দৌলতজাহানের দুঃখের কথা জেনে দীল তাঁর বেদনায় দীর্ণ হতে লাগলো। একই সাথে দৌলতজাহানের অন্তরের কথা জেনে দীলে তাঁর আসমানী এক তৃপ্তির পরশ লাগলো। আনন্দবেদনা মিশ্রিত এক অনুভূতি নিয়ে সুলতান বিহ্বল হয়ে ভারতে লাগলেন, দৌলতজাহান তাঁরই। দৌলতজাহান তাঁরই আছেন। দৌলতজাহানকে পাওয়ার আশা আদৌ তাঁর বরবাদ হয়ে যায়নি।

অতঃপর তল্লাশী আরো জোরদার করে তুললেন তিনি।

০ ০ ০

—আরে এই যে মিতাজি, কেয়া তাজ্জব! দূর এয়সা নজদিক্! আদাব—আদাব—

—কে? আরে সেকি! রাজ্যেশ্বর না? মানে রাজ্যেশ্বর ঢালী? তুমি এমন আদাব আদাব করছো মানে?

—জরুর করতে হবে। তুমি এখন একজন পাক্কা মুসলমান আর জবরদস্ত আদমী। আদবের সাথে বাৎচিত করতে হবে না।

বইঘর.কম ও রোকন

কেমন আছো?

—আছি ভালই। তা তুমি এমন গড় গড় করে ফারসী শব্দ বলছো! ও ভাষাও ইতিমধ্যেই শিক্ষা করে ফেলেছো নাকি?

রাজ্যেশ্বর ঢালী সহাস্যে বল... আরে দূর! এলেম শিক্ষার কোন মগজ আদৌ কি ছিল আমার কখনও? ঐ দুই একটা কথা উস্তাদজির মুখে শুনে শুনে শিখেছি।

—উস্তাদজি!

—হ্যাঁ, জব্বর উস্তাদ। উনাকে নিয়েই তো আছি এখন।

— ও, তাই বলো। তাই তুমি এখানে কোথা থেকে? কোথাও নকরী করছো এখন?

—নকরী! ওসব নকরী-নওকরী আর করিনে ইয়ার। ঢাল-তলোয়ার সব এখন চাঙ্গে।

—সেকি!

—ঐ ঢাল টেনে আর বেড়াইনে। এখন আমি অন্যকাজ করি। খানদানী এক কাজ নিয়ে আছি এখন।

—খানদানী এক কাজ? নকরী করা ছেড়ে দিয়েছো?

—বিলকুল।

—তাজ্জব! শেষ নকরী কোথায় ছিল?

—খড়্গাপুরে। ওখানেই ও কারবার খতম করে দিয়েছি।

—বলো কি!

—শালা বেঈমানদের জন্যে গতর খাটানোর মুখে আগুন। এখন কিছু সৎ মানুষের সাথে আরামে আছি মিতাজি। উস্তাদজি, কুঞ্জবাবু, পীর মুহাম্মদ, গিরিধারী, ভানুসিং—মানে যাদের সাথে আছি, সবাই এঁরা ভাল মানুষ। রোজগারটাও যা হয় তাতে দিন গুজরান আটকায় না।

ঃ তাই নাকি?

ঃ কাজটাও দীলমন প্রফুল্ল করার কাজ ইয়ার। মারদাঙ্গার বালাই নেই।

কথা চলছে দুই ইয়ারের মধ্যে। www.boighar.com

হাজীপুরের বেসরকারী বজরাঘাটে কয়েকটি বেসরকারী যাত্রীবাহী বজরা আগে থেকেই ভেড়ানো ছিল। এর একটির পাশে এক সরকারী বজরা এসে ভিড়লো। সরকারী বজরাটির ছাদের উপর উপবিষ্ট ছিলেন সালার কালাপাহাড় ও নয়া সৈনিক মাসুম গজনবী। পাশের ঐ যাত্রীবাহী বজরার ছাদে বসেছিলেন রাজ্যেশ্বর ঢালী। পদোন্নতির ওয়াদা মাফিক সেনাবাহিনীর এক ভাল পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে সুলতান দাউদ খান কাররানী সামানরক্ষী মাসুম গজনবীকে নিয়মিত বাহিনীতে পার করে নিয়েছেন এবং

বইঘর.কম ও রোকন
প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁকে তৈরি করে তোলার ভার সেনাপতি কালাপাহাড়ের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। কালাপাহাড় সাহেব বিহারের পশ্চিম সীমান্তে দিল্লীর ফৌজের আনাগোনা ও অবস্থান জরিপ করে দেখার কাজে এসেছেন এবং মাসুম গজনবীকে এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্যে সঙ্গে করে এনেছেন। জরিপ করে দেখার কাজ অনেকটা শেষ হয়েছে। কালাপাহাড় সাহেব এখন বজরা নিয়ে 'আরা'র দিকে যাবেন। কিন্তু কিছু খবরসহ মাসুম গজনবীকে এখনই তাণ্ডায় পাঠানো প্রয়োজন হওয়ায় তাণ্ডাগামী একটা বেসরকারী বজরাতে মাসুম গজনবীকে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যে কালাপাহাড় সাহেব এই বেসরকারী ঘাটে বজরা ভিড়িয়ে দিলেন।

রাজ্যেশ্বর ঢালী যে বজরাটির ছাদের উপর একাই উপবিষ্ট ছিলেন সেই বজরার একদম কোল ঘেঁষে কালাপাহাড় সাহেবের বজরা এসে ভিড়লো এবং রাজ্যেশ্বর ও কালাপাহাড় এতে করে মুখোমুখী হয়ে গেলেন। কথা বলছেন এরাই দুইজন।

রাজ্যেশ্বর কালাপাহাড়ের এককালের বন্ধু। কালাপাহাড় সাহেবের নাম যখন রাজু এবং কিশোরকালে বীরজাওন এলাকায় এক ফৌজী উস্তাদের কাছে যখন তিনি ঢাল তলোয়ার চালানোর শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন তখন রাজ্যেশ্বরও কিশোরকালে ঐ উস্তাদের কাছেই ঐ শিক্ষা নিচ্ছিলেন। রাজ্যেশ্বরকেও তখন সবাই রাজু বলে ডাকতো। ফলে, তখন থেকেই এই দুইজন একে অপরের মিতা এবং তখন থকেই এই দুয়ের মধ্যে দোস্তী। এরপর দুইজনই একসাথে যৌবনে পদার্পণ করেন। কালাপাহাড় বা রাজু ঢাল তলোয়ারে তালিম নেয়ার পরও ঘোড়া-সওয়ারী ও অন্যান্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু রাজ্যেশ্বর রাজু ঢাল তলোয়ার চালনাটা রপ্ত করার পরই রোজগারের প্রয়োজনে এক সামন্ত রাজার অধীনে নকরী নিয়ে চলে যান। তখন তাঁর উপাধি হয় 'ঢালী'। সেই থেকেই উভয়ের আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। দীর্ঘদিন পর অকস্মাৎ এই মোলাকাত।

রাজ্যেশ্বর কালাপাহাড়কে আগেই দেখেতে পেলেন এবং 'আদাব-আদাব' বলে তাঁকে সম্মান দেখাতে লাগলেন। অতঃপর উভয়ে কথা বলতে বলতে রাজ্যেশ্বর ঢালী যখন বললেন, যে কাজ নিয়ে এখন তিনি আছেন সে কাজটা দীল মন প্রফুল্ল করার কাজ, মারাদাঙ্গার বালাই নেই, তখন কালাপাহাড় ইষৎ হেসে বললেন— তাই নাকি ইয়ার? মারাদাঙ্গার বালাই নেই?

রাজ্যেশ্বর সরবে বললেন— একদম না, একদম না। বিলকুল শান্তির কাজ। খানদানী কাজ।

ঃ সেই খানদানী কাজটা তাহলে কি মিতাজি? কি কাজ করছো এখন?

উৎসাহ ভরে জবাব দিতে গিয়ে রাজ্যেশ্বর ঢালী থেমে গেলেন এবং ইতস্তত করতে লাগলেন। তা দেখে কালাপাহাড় সাহেব পুনরায় প্রশ্ন করলেন— কি হলো দোস্ত?

বইঘর.কম ও রোকন

রাজ্যেশ্বর আমতা আমতা করে বললেন— না— মানে, আমাদের নজরে খানদানী কাজ হলেও তোমাদের নজরে এটা তা না-ও হতে পারে মিতাজি। তোমরা তো মুসলমান। তোমরা হয়তো অনেকেই এটা পছন্দ করবে না।

ঃ আরে মুশকিল! কাজটার কথা বলোই না আগে। না শুনলে বুঝবো কি করে আমাদের নজরে তা ভাল না মন্দ?

ঃ সঙ্গীতের কাজ মিতাজি। সুর সাধনার কাজ। একটা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান খুলে সেখানে এখন সুরের জগতে আছি।

ঃ বলো কি! একদম সংগ্রাম ছেড়ে সঙ্গীত?

ঃ হ্যাঁ বন্ধু, সঙ্গীত মানে সুর সাধনা।

ঃ বেশ ভাল। তা সুর সাধনার কাজ মুসলমানেরা একেবারেই পছন্দ করে না, এ ধারণা হলো তোমার কি করে?

ঃ না মিতাজি, একেবারেই পছন্দ করে না, তা বলিনি। বরং এই হিন্দুস্তানে মুসলমানেরাই এটাকে এখন জোরদার করে তুলছেন। তবে গান-বাজনাকে অনেকেই তোমরা পছন্দ করো না কিনা—

ঃ হ্যাঁ, সব রকম গান আর সব যন্ত্রের বাজনাকে আমরা পছন্দ করিনে। তাছাড়া গান বাজনা যদি সেরেক অসংযত ফূর্তির বিষয় হয়, অশ্লীল আর কামোত্তেজক হয়, তাহলে তা কোন মুসলমানই পছন্দ করতে পারে না। কিন্তু সঙ্গীত বা সুর সাধনা যদি পবিত্র লক্ষ্যে হয়, আত্মার উন্নতির জন্যে হয় আর স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাহাত্ম্য প্রচারে হয়, তাহলে তা আমাদের অপছন্দ হবে কেন?

ঃ মিতাজি!

ঃ কোরান মজিদের সুর মাধুর্য তোমার তো জানা নেই। কিন্তু আজানের ধ্বনিটা তো দিনের মধ্যে পাঁচ পাঁচবার শুনতে পাও? লক্ষ্য করোনি, ওটা একটা নিছকই আওয়াজ নয়, এক পরিপূর্ণ সুরব্যঞ্জনা? আযানের ধ্বনিটাকে সুললিত করার লক্ষ্যে মুয়াজ্জিনেরা কতটা তৎপর?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা বটে—তা বটে।

ঃ মুসলমানেরাও সুরের পক্ষপাতি, যদি তা পবিত্র হয় আর পবিত্র লক্ষ্যে হয়। ইসলাম চিরকালই আবিলতার বিপক্ষে।

রাজ্যেশ্বর তৎক্ষণাৎ কলকণ্ঠে বলে উঠলেন— আবিলতা নেই মিতাজি, কোন রকম আবিলতা নেই। আমাদের উস্তাদজি বড় কড়া লোক। মনোরম পরিবেশে রুচিপূর্ণ আর সাধনাধর্মী সুর সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়। বড়রা, বাচ্চারা, সকলেই ভক্তি আর শৃঙ্খলার সাথে শিক্ষা গ্রহণ করে।

ঃ তাই?

ঃ আর ওদিকে কুঞ্জবাবু, আমাদের মহল্লা প্রধান কুঞ্জলালদেব মহাশয়, যেমনই সদাশয় তেমনিই বাঘের বাচ্চা। কোন খন্নাস্ আদমীর সাহস নেই যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের আশে পাশে ভিড়ে বা হৈ-হট্টগোল করে।

ঃ আচ্ছা। তাহলে কোথায় তোমার সে প্রতিষ্ঠান? ওসব নিয়ে কোথায় আছ তুমি এখন?

ঃ মন্দারণে। মন্দারণ শহরে।

ঃ সে কি! একদম অতদূরে গিয়ে আছো এখন?

ঃ হ্যাঁ বন্ধু। খড়্গাপুর থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই উস্তাদের খুব নামডাক শুনতে পেলাম। সেখানে গিয়ে হাজির হলে, প্রতিষ্ঠানের কাজে উস্তাদজি আমাকে নিয়ে নিলেন। ব্যস! জিন্দেগীর পাতা একদম পাল্টে গেল।

রাজ্যেশ্বর হাসতে লাগলেন। কালাপাহাড় সাহেব বললেন—সাব্বাস্। তাহলে এখানে তুমি কোথা থেকে?

ঃ এলাহাবাদ থেকে। আমাদের উস্তাদজির নিজ মুলুক তো এলাহাবাদ। ওখানে তাঁর কিছু আত্মীয়স্বজন আছেন। উস্তাদজী কয়দিনের জন্যে এলাহাবাদে এলেন আর আমি তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

ঃ আচ্ছা। তা এখন কোন্‌দিকে যাবে?

ঃ ঐ মন্দারণেই আবার ফিরে যাবো।

ঃ তাই নাকি? তাহলে তো তাণ্ডা হয়েই যাবে? মানে এ বজরা তাণ্ডাতক্ যাবে?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ। ঐটাই তো পথ। ওখানে গিয়ে বজরা বদল করে ফের সিধে দক্ষিণ মুখ।

ঃ তাহলে তো ভালই হলো। আমার এই সঙ্গীটাও তাণ্ডায় ফিরে যাবেন। ইনাকে তাহলে তোমার সাথেই দেই?

কালাপাহাড় সাহেব মাসুম গজনবীর প্রতি ইংগিত করলেন। রাজ্যেশ্বর ঢালী উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন— উত্তম কথা, উত্তম কথা। এই বজরাতেই দাও। একেবারে একা আমি। গল্পে গল্পে যাওয়া যাবে।

ঃ কখন ছাড়বে বজরা তোমাদের?

ঃ এই একটু পরেই । যাত্রীরা অনেকেই নেমে গেছেন, এখনই সবাই এসে পড়বেন। আসুন ভাই সাহেব, আসুন—

রাজ্যেশ্বর উঠে এসে মাসুম গজনবীকে তাঁর বজরায় পার করে নিলেন এবং ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজের আসনের পাশেই গজনবীকে বসিয়ে দিয়ে ঢালী আবার ছাদে

বইঘর.কম ও রোকন

ফিলে এলেন। যাত্রীরা ইতিমধ্যেই দুই একজন করে ফিরে আসা শুরু করলো। রাজ্যেশ্বর কালাপাহাড়ের আরো কাছাকাছি হওয়ার জন্যে ছাদের একদম কেনারে এসে বসলেন এবং আগ্রহ ভরে বললেন—এবার তোমার কথা বলো ইয়ার। তোমার কথা তো তোমার মুখে কিছুই শোনা হলো না।

এ প্রশ্নে কালাপাহাড় সাহেব লহমা খানেক নীরব হয়ে রইলেন। এরপর ভারী কণ্ঠে বললেন—লোক মুখে তো শুনেছো সব?

রাজ্যেশ্বর একবার কিঞ্চিত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— হ্যাঁ বন্ধু। কিছুদিন পরে আমি সবই শুনেছি। তোমার বর্তমান জীবনেরও সব খবরই রাখি এখন।

ঃ আমার অতীত জীবনের ঘটনা?

ঃ সে কাহিনীও তামামই শুনেছি? শুনে যা কষ্ট পেয়েছি, সে কথা আর কি বলবো তোমাকে!

ঃ রাগ হয়নি আমার উপর?

ঃ রাগ? বলো কি? আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে এতটা জানতে পারতাম, নকরী ফেলে এসে আমিই ঐ ভণ্ডদের দু'চারজনকে ভবসিন্ধু পার করে দিতাম। ইশ্! ব্যাটারা এইভাবে জীবনটা তোমার ছারখার করে দিলো?

ঃ এইভাবেই দিলো মিতা। ধর্মের মাহাত্ম্য জাহির করার নামে এতবড় অধর্ম করতে তারা একবিন্দু টলেনি!

ঃ পাষণ্ড! ব্যাটারা একদম পাষণ্ড!

ঃ মিতাজি!ঃ

ঃ মানুষকে এভাবে ঘৃণা করা আর মানুষকে এভাবে নির্যাতন করা ভগবান কখনও সইতে পারেন? মানুষ হয়ে মানুষকেই যে ভালবাসতে পারলো না, ভগবান আর ভগবানের সৃষ্টির প্রতি কি ভক্তি থাকতে পারে তার?

ঃ তবুও ওরাই হলো ধর্মের ধারক বাহক।

ঃ এইটেই বড় আফসোস্। তবে তোমার কিন্তু হামেশাই আমি তারিফ করি মিতাজি। মরদের কাজ করেছো একখান বটে!

ঃ বন্ধু।

ঃ মন্দির-বিগ্রহ ভাঙ্গাটা আমি পছন্দ করিনি ঠিকই, কিন্তু ঐ ব্যাটাদের কয়েকজনকে যে আচ্ছামতো ধোলাই দিয়েছো, এতে আমি জব্বর খুশি হয়েছি

ঃ আমার অবস্থায় পড়লে ঐ মন্দির বিগ্রহের উপর তোমারও বিতৃষ্ণা এসে যেতো।

ঃ তা কি হতো জানিনে। সব কিছুই তো অবস্থার উপর নির্ভরশীল! তবে ঐ ভণ্ডদের আরো বেশী শিক্ষা দেয়া উচিত ছিল তোমার।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ একা আর আমি কতটুকু পারি বলো? যে অস্পৃশ্যদের জন্যে জীবন আমার বরবাদ হয়ে গেল, ওদের উসকানিতে ভুলে ঐ অস্পৃশ্য শূদ্ররাও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল।

ঃ বড়ই করুণ ব্যাপার। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, এখন তুমি আর একবার ঐ ব্যাটাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে অবশ্যই যাবে সেখানে। এখন তো আর একা নও? এখন হাতে কত শক্তি তোমার! কিন্তু এত শক্তি নিয়ে কেন তুমি গেলে না আর একবার?

আরো অধিক গম্ভীর হয়ে কালাপাহাড় সাহেব বললেন— যেতাম মিতাজি। যেতাম আর ঐ চিহ্নিত ভণ্ডদের সাথে মন্দির বিগ্রহের নাম নিশানাও ও এলাকায় আর একবার মুছে দিয়ে আসতাম। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কি?

ঃ এখন আর আমি তা পারিনে। সে কাজ করার চিন্তাও এখন আমার পাপ।

ঃ পাপ!

ঃ আমি যদি আজও হিন্দু থাকতাম, তাহলে আর রেহাই ছিল না ওদের। ধর্মের নামে ওদের ঐ ভণ্ডামী আমি ছুটিয়ে দিয়ে আসতাম। কিন্তু এখন আমি মুসলমান। ও ধরনের কোন চিন্তাই আর মনে আ[illegible] পারিনে আমি।

ঃ কেন?

ঃ পরধর্মের প্রতি আঘাত করার কোন বিধানই দ্বীন-ইসলামে নেই। বিধর্মীরা অধীনস্থ হলে তাদের ধর্ম হেফাজত করারই কঠোর নির্দেশ আছে। নিজের আক্রোশ চরিতার্থ করতে গিয়ে তো আমি ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করতে পারিনে? তাহলে আমি বেঈমান হয়ে যাবো, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবো।

ঃ বলো কি!

ঃ আমি বানিয়ে কিছু বলিনি।

ঃ না-না, বানিয়ে বলবে কেন? এই ধরনের কথাবার্তা আমাদের উস্তাদজিও মাঝে মধ্যেই বলেন। বড় সুন্দর বিধান তো!

শুধু ঐ একটাই নয়। ইসলামের সব বিধানই সুন্দর। বাইরে থেকে একে তোমরা যে নজরেই দেখনা কেন, এর ভেতরে একবার যে এসেছে সেই বুঝতে পেরেছে, নীতি নির্দেশ বলে ইসলামে যা কিছু আছে, সব কিছুই গর্ব করার বস্তু, লজ্জা পাওয়ার মতো কোন কিছুই দ্বীন ইসলামে নেই।

www.boighar.com

ঃ বন্ধু!

ঃ সৌন্দর্য আর কল্যাণের বাইরে কোন কথাই দ্বীন ইসলাম বলে না।

ঃ মিতাজি।

ঃ এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাক। আসল কথা, এই কারণেই আর ঐ কাজে বীরজাওনে যেতে পারিনা আমি।

বইঘর.কম ও রোকন

ইতিমধ্যেই যাত্রিরা সব ফিরে এলো। মাঝি মাল্লারা বজরা ছাড়ার জানান দিতে লাগলো। সংক্ষেপে কিছু পারিবারিক আলাপ করে শুভেচ্ছা বিনিময় অন্তে রাজ্যেশ্বর ঢালী তাঁর নিজ বজরার অভ্যন্তরে গমন করলেন এবং কালাপাহাড় সাহেব তাঁর বজরা 'আরা' বন্দরের উদ্দেশ্যে ছুটিয়ে দিলেন।

একটু পরেই এ বজরাও তাণ্ডার দিকে ছুটলো। পাশে বসে রাজ্যেশ্বর ঢালী খুব মৌজ করে আবার মাসুম গজনবীর সাথে গল্প জমিয়ে তুললেন।

০ ০ ০

অনুসন্ধান তৎপরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলেও সুলতান দাউদ খান কাররানী সফলকাম হলেন না। চতুর্দিক থেকে অনুসন্ধানকারীরা একে একে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে লাগলো। দৌলতজাহানদের কোন খবর কেউ আনতে পারলো না। এই অনুসন্ধানে নেমে অনেকেই ফেরিওয়ালা, মোটওয়ালা, সবজিওয়ালা থেকে শুরু করে ফকির মিসকীনদের পেছনেও হন্যে হয়ে ছুটেছেন। মুরাদ খানের নকরী করার সামর্থ্য নেই যখন, তখন পেটের দায়ে নিশ্চয়ই তিনি এই ধরনের একটা কিছু করছেন ভেবে তালাশকারীরা নগরে, বন্দরে, বজরাঘাটে, ফেরিঘাটে, এদরে পেছনেও তৎপর হয়ে ছুটেছেন আর পুনঃ পুনঃ হতাশ ও বেইজ্জত হয়েছেন।

তালাশকারীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে সকলেই সুলতানকে এই মর্মে সমঝালেন যে, নির্দিষ্ট কোন শহর বা পল্লীর ব্যাপার নয়, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা সহ তামাম এই হিন্দুস্তানে অসংখ্য শহর আর অগণিত পল্লীবস্তি। কাঙাল-দুঃখী-নিঃস্ব মানুষের সংখ্যাও বেশুমার। এই অগণিত কাঙাল-দুঃখীর ভিড়ে কোন পল্লীর বা বস্তির নিভৃত কোন কোণে দৌলতজাহানেরা কাঙাল হালে গা ঢাকা দিয়ে আছেন, বিশাল এই হিন্দুস্তানের প্রতিটি বাড়ি বস্তি ঘুরে ঘুরে সে হদিস করা আসলেই একটা অবাস্তব ব্যাপার। তাঁরা স্বইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ না করলে, বিশাল এই বিশ্ব খুঁজে তাঁদের হদিস করা সম্ভব নয়। তদুপরি এই হদিস করা কাজটিও এই কয়েক শত তালাশকারীর কাজ নয়। বাঙ্গালা মুলুকের তামাম লোককে একাজে নিয়োগ করা সম্ভব হলে, তবেই হয়তো আশা কিছু করা যায়। কিন্তু তা কি আসলেই সম্ভব?

তা কখনো সম্ভব নয়। সুলতান দাউদ খান কাররানী তালাশকারীদের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, এই এক তাণ্ডাতেই কেউ গা ঢাকা দিয়ে থাকলে তাকে তালাশ করে বের করতে অনেক কাঠখড়ই পোড়াতে হয় যেখানে, সেখানে গোটা হিন্দুস্তান তো দূরের কথা এই বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যারই সর্বত্র তালাশ করে আত্ম-গোপনে-তৎপর জনকে বের করা বাস্তাবিকই দুরূহ কাজ। স্বেচ্ছায় তাঁরা আত্মপ্রকাশ না করলে আর কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, সুলতান দাউদ খান কাররানী

যখন এই চিন্তায় মজবুর ঠিক সেই সময় মাসুম গজনবী হাজীপুর থেকে এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন—দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ বাঙ্গালা মুলুক দখল করার কাজে পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। আকবর শাহের আদেশে খান-ই খানান মুনিম খান চূণার দূর্গ থেকে পাটনার দিকে সৈন্য চালনা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। কিছু সৈন্য ইতিমধ্যেই এসে ও অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে। বিস্তারিত খবর করার জন্যে কালাপাহাড় সাহেব 'আরা' অঞ্চলে গেছেন। শ্রীঘ্রই তিনি ফিরে আসবেন। অগ্রিম খবর হিসাবে কালাপাহাড় সাহেব তাঁর মারফত জাঁহাপনাকে জানিয়েছেন যে, প্রস্তুতি গ্রহণ এখন থেকেই শুরু করা হোক, দিল্লীর সাথে রণ তাঁদের আসন্ন।

শোনামাত্রই সুলতান দাউদ খান কাররানীর দুই চোখ জ্বলে উঠলো। দৌলতজাহানের তামাম চিন্তা তাঁর মন থেকে সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল। স্বাধীনচেতা বীর সুলতান দাউদ খান কাররানী দেশ ও স্বাধীনতার প্রতি হুমকির খবর শোনার পর আর প্রিয়ার প্রেমের খোয়াবে বিভোর থাকতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। তিনি তাঁর তামাম·চিন্তা লড়াইয়ের দিকে ফেরালেন।

সেনাপতি কালাপাহাড়ও অচিরেই ফিরে এলেন। ফিরে এসে জানালেন, মাসুম গজনবীর মারফত তিনি যে প্রাথমিক তথ্য পাঠিয়েছিলেন, তা একদম মামুলী। অবস্থা আরো জটিল। মুনিম খান সাহেব তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যেই পাটনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা বিপুল এবং অধীনে রয়েছেন আকবর শাহর কয়েকজন সুদক্ষ সালার। পাটনার বাহিনীকে তৈরি থাকার এত্তেলা দিয়েই তিনি খবর নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছেন।

গর্জে উঠলেন দাউদ খান কাররানী। সাজ সাজ রব উঠলো রাজধানীতে। সালার ফৌজদার রণবিদদের তৎক্ষণাৎ তলব দিয়ে সুলতান এসে তাঁর সামরিক মন্ত্রণাকক্ষে বসলেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে অপেক্ষমান দুশমনী আজ দ্বারপ্রান্তে হাজির। জান কবুল, দ্বার থেকে দুশমনদের মুষ্ঠাঘাতে ফিরিয়ে দেয়া চাইই।

সালার ফৌজদার সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সর্বশক্তি দিয়ে দুশমনদের মোকাবেলায় একাত্ম ঘোষণা করে তাঁরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রধান উজির লোদী খান অখণ্ড আত্ম প্রত্যয় নিয়ে দুশমনদের মোকাবেলা নিজে যেতে আগ্রহী হলেন। প্রধান উজিরের আগ্রহের মুখে অন্যান্যেরা বাধ্য হয়েই নিজ আগ্রহ সম্বরণ করে নিলেন। আলোচনান্তে স্থির হলো, আকবর শাহর বাহিনীর প্রাথমিক এই মোকাবেলা উজর লোদী খানই করবেন সসৈন্যে। তাঁর সাথে থাকবেন বাঙ্গালার বাঘ গুজার খান।

পরের দিনই সসৈন্যে তাঁরা পাটনার দিকে রওনা হলেন। বিহারের পশ্চিম সীমান্তে এসে দেখলেন, সেনাপতি কালাপাহাড়ের তথ্য একদম নির্ভুল। মুনিম খানের অধীনে

দিল্লীর বাদশাহর ফৌজ চারিদিক প্রকম্পিত করে বিহারের সীমান্তের কাছে পৌঁছে গেছে। দেখামাত্রই তারও বিপুল বেগে ধাবিত হয়ে দিল্লীর ফৌজের মুখোমুখী দাঁড়ালেন এবং তাদের অগ্রগতি রোধ করে দিলেন। মুনিম খানের সাথে লোদী খানের বাক্যালাপের পূর্বেই উভয়পক্ষের উত্তেজিত সৈন্যদল, উভয়পক্ষের উপর দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। কয়েকদিন একটানা তুমুল লড়াই চলার পরও ফলাফল কিছুই হলো না। বাঙ্গালার বাহিনীর প্রতিরোধ যত সহজে উড়িয়ে দেয়ার খোয়াব নিয়ে দিল্লীর বাহিনী লড়াই শুরু করলো, কার্যতঃ সে খোয়াব তাদের খোয়াবই রয়ে গেল। গুজার খানের বিপুল চাপের মুখে দিল্লীর ঐ বিশাল বাহিনী কিছুটা পশ্চাদপদ হওয়া বই এক চুল সামনে এগুতে পারলো না।

ইতিমধ্যেই দিল্লীর সালার মুমিন খান জানতে পারলেন, বাঙ্গালার বাহিনীর নেতৃত্বে লোদী খান সাহেব আছেন। লোদী খানের প্রতি মুনিম খানের একটা অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল। দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার কারণে এই দুইয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল। দূরদর্শী ও শান্তিকামী এই প্রবীণ উজিরকে মুনিম খান সেরেফ খাতিরই করতেন না, তাঁকে সমীহ করতেন ও সম্মান দিতেন। মুনিম খানের মতো আকবর শাহও যদি বিবেচক ও ঈমানদার হতেন, তাহলে মুসলমানে মুসলমানে সংঘাতের প্রশ্ন কিছুতেই উঠতো না। কিন্তু আকবর শাহের কাছে ইসলাম ছিল নিতান্তই মামুলী এক ব্যাপার। ইসলামের সৌন্দর্য আর পবিত্র বিধানের প্রতি আকবর শাহ ছিলেন বরাবরই উদাসীন। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে বাতিল সহির কোন বাছবিচার তিনি করেন নি। ফলে, মুনিম খানের উপলব্ধি আকবর শাহর মধ্যে একতিলই আসেনি। ছলে বলে কৌশলে বাঙ্গালা মুলুক আকবর শাহর-চাই-ই।

কিন্তু মুনিম খান একেবারেই বিবেকটা বেচে খেতে পারলেন না। সংঘাতটা এড়িয়ে চলারই উদ্যোগ নিলেন তিনি। বাঙ্গালার বাহিনীর নেতৃত্বে লোদী খান আছেন জেনেই তাঁর সাথে কথা বলার অভিপ্রায়ে মুনিম খান লড়াই থামিয়ে দিলেন এবং লোদী খানকে আহ্বান করলেন। লোদী খানও সানন্দে সে আহ্বান গ্রহণ করলেন। উভয় পক্ষের সেপাই সালার তরবারি কোষবদ্ধ করে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রইলেন। দুই নেতা নিরালায় আলোচনায় বসলেন।

শুভেচ্ছা বিনিময় অন্তে দিল্লীর সাথে বাঙ্গালার অতীত সুসম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে মুনিম খান সাহেব সমঝোতার কথা তুললেন। তিনি লোদী খানকে প্রস্তাব দিলেন, দিল্লীর বাদশাহর এই অভিযান শক্তির মাধ্যমে না ঠেকাতে গিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে ঠেকিয়ে দেয়ার প্রয়াস পাওয়াই ভাল। কারণ, দিল্লীর বিশাল শক্তির সাথে মুখোমুখী লড়াই করে বাঙ্গালার শক্তির লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তার চেয়ে বরং বাদশাহর নামে

কিছু উপঢৌকন পেলে তিনি তাই নিয়ে লড়াই বন্ধ করে এখান থেকেই সসৈন্যে ফিরে যাবেন। তিনি আরো জানালেন, লোদী খানের মুখ চেয়েই এ প্রস্তাব দিচ্ছেন তিনি। তাছাড়া, এটা পরাধীনতাও কবুল করা নয়, একটা সুসম্পর্ক বজায় রাখা মাত্র। এটুকুও না পারলে মুনিম খান লাচার। আরো দুই তিন গুণ ফৌজ এনে লোদী খানের এ অবরোধ ছিন্ন তিনি করবেনই।

লোদী খান রাজী হলেন। দুই তিন গুণ ফৌজের ভয়ে নয়। মুনিম খান ফৌজ বাড়ালে, বাঙ্গালার ঘাঁটি বন্ধ্যা হয়ে যায়নি, লোদী খানও ফৌজ বাড়াতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ফলাফলটা কোন পক্ষের জন্যে সুনিশ্চিত কিছু নয়। কিন্তু লোদী খান ভেবে দেখলেন, জিদের বশে শক্তি পরীক্ষা একেবারেই অপরিহার্য করে তুলে বাঙ্গালার নসীবটাকে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়া ঠিক নয়। পথ না থাকলে সে কথা আলাদা। কিন্তু পথ যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন সামান্য একটু গা-কাটা হলেও এই মহাসংকটকে না টেনে পথ থেকেই ফিরিয়ে দেয়া বেহতর । এতে চূড়ান্ত ফল না ফললে, তলোয়ার তো হাতে তাদের থাকছেই।

লোদী খান এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সম্মানজনক নগদ কিছু উপঢৌকন প্রদান করে মুনিম খানকে ওখান থেকেই সসৈন্যে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি জালাল খান কারোরী নামক জনৈক সঙ্গীকে সুলতান দাউদ খানের কাছে তাঁর পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্যে পাঠালেন।

০ ০ ০

'সুখে খেতে ভূতে কিলোয়', একথা যেমন একেবারেই উড়িয়ে দেয়ার কথা নয়, তেমনি 'কুকুরের বাঁকা লেজ টেনে কখনও সোজা করা যায় না' —এটিও একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। কতলু খানের মতলব কিছুটা আঁকাবাকা হলেও শ্রীহরি রায়ের ভূমিকা এ সত্যের সাথে আগাগোড়া সমান্তরাল।

চূড়ান্তভাবে বিপদ মুক্তি হয়ে যাওয়ায় কতলু খান আবার তাঁর স্বকীয়তায় ফিরে এলেন। আরামে ও অবসরে দিন গুজরানের মওকা পেয়েই তাঁর অন্তরের কুপ্রকৃতি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। লোভ আর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠায়, সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ততার ভিত্ তাঁর নড়বড়ে হয়ে গেল। ফশ্‌কা হয়ে গেল তাঁর কৃতজ্ঞতার গেরো।

শ্রীহরি রায়ের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। লক্ষ্য তাঁর বরাবরই স্থির। কতলু খান সময়ে ভাল, সময়ে সময়ে মন্দ। কুমন্ত্রণা অতি সহজেই তাঁর উপর ভর করে। তখন আর ভাল থাকতে পারেনা। কিন্তু শ্রীহরি রায়ের কুমতলবে পরিবর্তন নেই। কতলু খানের মতো শ্রীহরি রায়ের লক্ষ্য দোদুল্যমান নয়। পরিস্থিতির হের ফেরে তিনি তাঁর ভোল্‌টাই বদল

বইঘর.কম ও রোকন

করেছেন মাত্র, লক্ষ্য বদল করেন নি। সুলতানের সবিশেষ আস্থাভাজন হয়ে নিজের অবস্থানটা মজবুত করে নেয়ার পর তিনি আবার নজর তাঁর লক্ষ্যের দিকে ফেরালেন। সুখে খেতে কতলু খানকে ভূতে কিলিয়ে কিলিয়ে প্রধান উজিরের পদের প্রতি তাঁকে কিছুটা প্রলুব্ধ করে তুললে, শ্রীহরি রায় অমনি এসে আবার তাঁর ঘাড়ের উপর সওয়ার হলেন। কতলু খানকে প্রধান উজির করা গেলে শ্রীহরিদের নসীবটা তবেই আবার খুলবে। শুরু হলো লোদী খানের বিরুদ্ধে সুলতানের কর্ণ-কুহরে বিষ ঢালা প্রক্রিয়া।

বিহারের সীমান্ত থেকে জালাল খান কারোরী লোদী খানের ব্যাখ্যা নিয়ে তাণ্ডায় আসার আগেই সুলতান দাউদ খান বার্তাবাহী দূত মারফত যুদ্ধের খবর পেয়েছিলেন। লোদী খানের পদক্ষেপে রুষ্ট না হলেও আবার সেই উপঢৌকন দেয়ার প্রশ্নে তিনি মনভারী করেছিলেন। যা তিনি চান না, প্রধান উজির সেই কাজই করে বসায়, তাঁর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী প্রধান উজিরের প্রতি সুলতানের দীলে এই সর্বপ্রথম একটা না-খোশের ধোঁয়া সৃষ্টি হলো। ধোঁয়া দেখে ছুটে এলেন শ্রীহরি ও কতলু খান। পানির বদলে হাতে হাতে পাখা নিয়ে এলেন তাঁরা। বাতাস দিয়ে ধোঁয়া থেকে আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারলেই কিস্তিমাৎ!

জালাল খান কারোরী ব্যাখ্যা নিয়ে এসে সুলতানের সামনে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন শ্রীহরি ও কতলু খান। কোন কথা না বলে, এসে তাঁরা প্রথমে চুপচাপ বসে রইলেন আর বাতাস দেয়ার মওকা খুঁজতে লাগলেন। বাঙ্গালা মুলুককে বিপদ মুক্তরাখার প্রয়াসেই লোদী খান সাহেব এই পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে কারোরী সাহেব ব্যাখ্যা শুরু করলে, নাখোশ অভিব্যক্তি নিয়ে তাঁরা সুলতানের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সুলতান দাউদ খান কারোরীর কথার মাঝেই প্রশ্ন করলেন—লোদী খান সাহেব কেমন করে নিশ্চিত হলেন যে, এই পদক্ষেপ নিলেই বাঙ্গালা মুলুক বিপদমুক্ত হবে?

কারোরী সাহেব সবিনয়ে বললেল—যতক্ষণ বিপদমুক্ত থাকে ততক্ষণ ভাল বোধে প্রধান উজির সাহেব এই পদক্ষেপ নিয়েছেন জনাব। ঠেলেঠুলে বিপদটাকে সরিয়ে রাখাই তিনি কল্যাণকর মনে করেন।

সুলতান এতে তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি সখেদে বললেন—উজির সাহেবের এই একটা মস্তবড় বিমার এতে যে আদৌ কোন বিপদ মুক্তি আসবে না, এটা তিনি কিছুতেই বুঝতে চান না।

জালাল খান কারোরী সমঝানোর চেষ্টা করে বললেন—যেভাবেই হোক, দিল্লীর এবারের হামলাটা তো প্রতিহত হলো জনাব। পরের চিন্তা পরে করেই দেখা যাবে।

এর জবাবে সুলতান কিছুই বললেন না। তিনি মনমরা হয়ে বসে রইলেন। ফাঁক পেয়ে এবার শ্রীহরি রায় উস্‌খুস্‌ করে বললেন—এ কেবল বড়ি খাইয়ে বেদনাটাকে

সাময়িকভাবে উপশম করে রাখা হলো কারোরী সাহেব। রোগের চিকিৎসা কিন্তু আদৌ এটা হলো না।

প্রত্যুত্তরে কারোরী সাহেব বললেন—আপাততঃ উপশমটাও একটা চিকিৎসা বই কি রায় সাহেব!

কতলু খান হাঁ-হাঁ করে বলে উঠলেন—মোটেই নয়, ওটা কোন চিকিৎসাই নয়। উপঢৌকন দিয়ে দুশমনদের ফিরিয়ে দেয়া মানেই নিজেদের দুর্বলতা দুশমনের কাছে তুলে ধরা আর পুনরায় হামলা করার জন্যে দুশমনকে উৎসাহিত করা।

কারোরী সাহেব কি বলবেন ভাবতে লাগলেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে বললেন—কি এমন ঘটলো যার জন্যে দুর্বলতা প্রকাশ করতে হলো? এই পদক্ষেপ না নিলে আমাদের তামাম ফৌজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এমন কোন পরিস্থিতি কি পয়দা হয়েছিল?

কারোরী সাহেব বললেন—না জনাব। তেমন কোন পরিস্থিতি আদৌ পয়দা হয়নি। বরং জানবাজী রেখেও দিল্লীর ফৌজ আমাদের ফৌজকে বিন্দু পরিমাণ পেছনে ঠেলতে পারেনি। তারাই বরং অনেকখানি পেছনে সরে গিয়েছিল। সেদিক দিয়ে আমাদের ফৌজ বাহাদুরীর দাবী রাখে।

সুলতান বিস্মিত হয়ে বললেন—তাহলে এ অবস্থায় লোদী খান সাহেব শান্তি প্রয়াসে গেলেন কেন?

ঃ উজির সাহেব আগে যাননি জাঁহাপনা। মুনিম খান সাহেবই তাঁকে ডেকে নিয়ে সমঝোতায় বসেন আর আমাদের উজির সাহেবও নানাদিক চিন্তাভাবনা করে এই সমঝোতায় আসেন।

ঃ তাজ্জব! বিপর্যয় নেই, পরাজয় নেই, অথচ সমঝোতা!

ঃ সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করেই উজির সাহেব এ পদক্ষেপ নিয়েছেন জাঁহাপনা।

এর বেশি কারোরী সাহেব আর বলতে পারলেন না। সুলতানও এরপর আর কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুলতান জালাল খান কারোরীকে বিদেয় করে দিলেন। অন্যান্য আগন্তুকও সেই সাথে বিদেয় হলো। রইলেন শুধু কতলু খান লোহানী ও শ্রীহরি। সুলতানকে একা পেয়েও কতলু খান বললেন—আমি বুঝতে পেরেছি জনাব, এ চাল মুনিম খানেরই। তিনি একজন মস্তবড় ধড়িবাজ। সে তুলনায় আমাদের উজির সাহেব সরল সহজ মানুষ। নিজে আসন্ন পরাজয় উপলব্ধি করেই মুনিম খান কায়দা করে আমাদের উজির সাহেবকে দিয়ে এই তেতো ওষুধ গিলিয়েছেন। আসলেই আমাদের উজির সাহেব বুড়ো হয়ে গেছেন, হুঁশ বুদ্ধি কমে গেছে। প্রধান উজিরী করার মতো তাঁর সামর্থ্য আর নেই।

বইঘর.কম ও রোকন

দাউদ খান কাররানী নাখোশ কণ্ঠে বললেন—তা না থাকুক, পাগল তো এখনও হননি! একজন তেঁতো ওষুধ গেলাতে চাইলেই উনি তা গিলবেন কেন? অসুখ যেখানে নেই, অর্থাৎ বিপদের আশংকা নেই যেখানে, সেখানে ঐ তেঁতো ওষুধ কেন উনি গিলবেন?

শ্রীহরি রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কসুর মাফ হয় হুজুর। এর যথার্থ কারণটাই আমি অনুমান করতে পারছি বলে মনে হচ্ছে।

সুলতান উদাস কণ্ঠে বললেন—অর্থাৎ?

শ্রীহরি রায় বললেন—হুজুর মুনিম খান সাহেব আমাদের প্রধান উজির সাহেবের অতি প্রিয় ব্যক্তি। দীর্ঘদিন প্রভুজ্ঞানে মুনিম খানের অশেষ মনোতুষ্টির কারণ হয়েছেন প্রধান উজির উজির লোদী খান সাহেব। সে কারণে লোদী খান সাহেবের উপর মুনিম খানেরও অপরিসীম অনুকম্পা। জয় আমাদের সুনিশ্চিত হলেও, উজির সাহেব কি মুনিম খানের বিপর্যয় ঘটাতে পারেন?

শ্রীহরি রায়ের কথা সুলতানের চিন্তসূত্রে ধাক্কা দিলো। সুলতান আগ্রহভরে বললেন—রায় সাহেব?

ঃ কথাটা শ্রুতিকটু কথা হুজুর। তদুপরি এটা আমার অনুমান। এসব অনুমানের কথা অবশ্য আমার না বলাই উচিত।

সুলতানের আগ্রহটা লক্ষ্য করেই বিনয়ের মাধ্যমে রায় সাহেব তাঁর নিজের বিশ্বস্ততা আর তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে চাইলেন। লক্ষ্য তাঁর হাসিল হলো। সুলতান তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন— না— না, বলুন। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আপনার অনুমানের গুরুত্ব আছে অনেক।

ঃ হুজুর, উজির সাহেব সেধে যখন এই লড়াইয়ে গেলেন, ফলাফলটা যে এমনই হবে, তা আমি তখনই অনুমান করতে পেরেছি। কিন্তু কি করবো হুজুর? আমি একজন অতিশয় নগণ্য ব্যক্তি। এ নিয়ে তো আগেই আমি কথা বলতে পারিনে।

ঃ রায় সাহেব।

ঃ মুনিম খান এ লড়াইয়ের সেনাপতি জেনেই উনি আগ্রহ করে গিয়েছেন। অন্য কেউ দিল্লীর বাহিনীর প্রধান হলে, কখ্খনো তা যেতেন না। অন্ততঃ এই আমার বিশ্বাস।

ঃ কারণ?

ঃ বাঙ্গালার অন্যকোন সালার গেলে মুনিম খান বিপদগ্রস্ত হতে পারেন ভেবেই উনি গিয়েছেন। উজির সাহেব বেঁচে থাকতে মুনিম খান বাঙ্গালার ফৌজের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হোন, এটা উনি চান না বলেই আমার ধারণা।

সুলতান দাউদ খান বিস্মিত হয়ে বললেন—এতটাই ধারণা করেন আপনি?

শ্রীহরি রায় সঙ্গে সঙ্গে কুর্নিশ করে বললেন—বাস্তবতা যতই থাক এর মধ্যে, এটা আমার স্রেফ ঐ ধারণাই হুজুর। হুজুরের অভয় পেয়েই আমি আমার ধারণাটা খোলাখুলি ব্যক্ত করে ফেলেছি। আমার গোস্তাকী মাফ হয়।

শ্রীহরি রায় নীরব হলেন। সুলতান এতটা গ্রহণ করতে না পারলেও শ্রীহরি রায়ের ধারণা সুলতানের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করলো এবং লোদী খান ও দাউদ খানের হৃদ্যতার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ফাটল ধরে গেল।

প্রধান উজির লোদী খান সসৈন্যে পাটনায় রয়ে গেলেন। গুজার খান তাঁর বাহিনীসহ তাণ্ডায় ফিরে এলেন। এরপরেই ইতিহাস ভিন্ন দিকে মোড় নিলো। দিল্লীর বাদশাহর এলাকা গোরক্ষপুরে অকস্মাৎ বিদ্রোহ দেখা দেয়ায় মুনিম খান বিদ্রোহ দমনের কাজে সেই দিকে ছুটলেন। ঠিক এই সময়ই আবার এ অঞ্চলে দিল্লীর সালারদের মধ্যে প্রকট বিরোধ দেখা দেয়ায়, দিল্লীর সালারদের অনেকেই মুনিম খানের বিরুদ্ধে চলে গেলেন। এতে করে এ অঞ্চলে দিল্লীর ফৌজের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। যথা সময়ে এ খবর তাণ্ডাতেও এলো। শ্রীহরি—কতলু ও আরো কিছু মতলববাজদের উসকানীতে সুলদান দাউদ খান কাররানী এবার লোদী খানের বিশ্বস্ততা যাচাই করতে উদ্যোগী হলেন।

লোদী খানকে বিপদগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই কুচক্রীরা সুলতানকে এই উৎসাহ দিলেন যে, দিল্লীর বাহিনীর এখন বড়ই দুঃসময়। দিল্লীর সালার মুনিম খান এখন ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত। এই সুযোগে দিল্লীর এলাকায় হানা দিলে মুনিম খান তথা দিল্লীর বাহিনী আর তাল সামলাতে পারবে না। তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এবং ঢিল মারলে যে পাটকেলটি খেতে হয়, এ মর্মে তারা একটা মস্তবড় শিক্ষা লাভ করবে। এই প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে, দিল্লীর ফৌজ আর দুস্‌রা বার বাঙ্গালা মুলুক আক্রমণ করার দুঃসাহস করবে না।

এদের কথায় উৎসাহিত হয়ে সুলতান দাউদ খান, গুজার খান ও কালাপাহাড়কে দিল্লীর ঘাঁটি জৌনপুর আক্রমণ করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু যুক্তিদাতারা সুলতানকে বোঝালেন, তাণ্ডা থেকে নতুন করে বাহিনী পাঠানো নিষ্প্রয়োজন। কারণ, পাটনায় তো স্থায়ী ফৌজ আছেই, তার উপর লোদী খান সাহেব তাঁর নিজস্ব ফৌজ নিয়ে ওখানেই অবস্থান করছেন। এই অভিযান পরিচালনা করার দায়িত্ব লোদী খানকেই দেয়া হোক। এতে করে লোদী খানের বিশ্বস্ততাও যাচাই করা হবে, মুনিম খানের বিরুদ্ধে লড়াই করলে উনি কত নিষ্ঠার সাথে তা করতে আগ্রহী, এই থেকে সেটাও প্রমাণ হবে।

মুনিম খানের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে লোদী খানের বিশ্বস্ততা নিয়ে সুলতান ইতিমধ্যেই সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। এদের কথায় সেই বিশ্বস্ততা যাচাই করার স্পৃহা

বইঘর.কম ও রোকন
তাঁর দুর্বার হয়ে উঠলো। তিনি লোদী খানকেই দিল্লীর শিবির জৌনপুর আক্রমণ করার জন্যে আদেশ করে পাঠালেন। তবে বাঙ্গালার বাহিনী যাতে করে সেখানে কোন মুসিবতে না পড়ে সেদিক চিন্তা করে সুলতান দাউদ খান সালার কালাপাহাড়কে লোদী খানের সাহায্যার্থে সসৈন্যে প্রেরণ করলেন।

দিল্লীর ফৌজের বিরুদ্ধে সালার কালাপাহাড়ের আক্রোশ ছিল অপরিসীম। তারা হানা দিলে তাদের বিরুদ্ধে জান ছেড়ে দিয়ে লড়তে তিনি সততই তৈরি ছিলেন। কিন্তু গায়ে পড়ে দিল্লীর ফৌজকে আক্রমণ করা ঠিক হবে কিনা, এ নিয়ে তাঁর দীলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়ে গেল। সুলতানের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেও তিনি সুদুত্তর পেলেন না। সুলতান এ দিকটা চিন্তা করতেই চাইলেন না। বাধ্য হয়েই রওনা হলেন তিনি।

পাটনায় এসে সুলতানের আদেশ লোদী খানকে জানানোর পর এ প্রসঙ্গে কথা উঠলে লোদী খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—সালার সাহেব, এ আদেশ নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক। যদিও দিল্লীর ফৌজকে আক্রমণ করার পক্ষে এ সময়ই উপযুক্ত সময় এবং আক্রমণ করলে, এইক্ষণেই তা করা উচিত, তবুও এ পদক্ষেপ হঠকারিতারই নামান্তর।

জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে কালাপাহাড় সাহেব বললেন— জনাব!

লোদী খান বললেন—বিশাল এই দিল্লী সাম্রাজ্য আক্রমণ করে আমরা তার কিছুই করতে পারবো না। সাময়িকভাবে আর স্থানবিশেষে কামিয়াব আমরা হলেও, দিল্লীর শক্তিকে তাতে করে কিছুমাত্র কমজোর করা যাবে না। এতে আরো বরং দিল্লীর বাদশাহর দুশমনীকে উস্‌কে দেয়াই হবে। যদিও আকবর শাহ বাঙ্গালা মুলুক দখল করতে সবিশেষ আগ্রহী, তবু তাদের আক্রমণ করে সৈন্যক্ষয় করার চেয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাদের হামলা প্রতিহত করাই হতো বুদ্ধিমানের কাজ। পুনঃ পুনঃ তাদের হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হলে আকবর শাহর বাঙ্গালা জয়ের খাহেশটা ঝিমিয়ে পড়তো আপসে আপ। আর তাঁর শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাঙ্গালার আজাদী রক্ষা করার এইটেই হতো প্রকৃষ্ট পন্থা।

এ অবস্থায় তাহলে তাঁদের কি করা উচিত এখন, সেনাপতি কালাপাহাড় এ প্রশ্ন করলে, লোদী খান ফের দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—দিরুক্তির কোন অবকাশ নেই এখানে। সুলতানের আদেশের তিল পরিমাণ অন্যথা করা বিদ্রোহিতারই সামিল। আক্রমণ আমরা করবোই। তবে আমার ধারণা, সুলতান কারো বদ্‌বুদ্ধির প্রভাবে চালিত হতে শুরু করেছেন।

কালাপাহাড় সাহেব সমর্থন দিয়ে বললেন—এ বিশ্বাস আমারও। তবে নিজে তিনি বিচক্ষণ। কোন বদ্‌বুদ্ধি তাঁকে অধিক্ষণ চালিত করতে পারবে না, এ ভরসা এখনও আমার আছে।

কিন্তু কালাপাহাড়ের এ ভরসা কালোত্তীর্ণ হলো না। চারপাশের লোকের নিরতিশয়

হীন প্রবৃত্তি বিচক্ষণের বিচক্ষণতাও ভোঁতা করে দেয়। প্রকাশ্য দুশমনদের দুশমনী প্রতিহত করা সহজ। কিন্তু বন্ধুবেশী দুশমনদের দুশমনী রোধ করা দুরূহ। তদুপরি, পরিস্থিতি আবার যদি কুমন্ত্রণাদাতাদের কুমন্ত্রণার একেবারেই অনুকূল হয়, তাহলে চোখা মাথাও গুলিয়ে যেতে অধিক সময় লাগে না। সব চেয়ে বড় কথা, মগজ যার যত ধারালোই হোক, মুকুট মাথায় উঠলেই সে ধার তৎক্ষণাৎ অর্ধেকটা ঝড়ে যায়। মুকুটবাহী মস্তক অস্থির থাকে নিয়তই। প্রতিকূল পরিস্থিতি আর মানুষের নিদারুণ মনুষ্যত্ব হীনতার প্রভাবে সে মাথা সহজেই অসহায় হয়ে পড়ে। প্রশংসনীয়ভাবে বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও সুলতান দাউদ খান কাররানীর বিচক্ষণতা ঐভাবেই অসহায় হয়ে গেল। পরিস্থিতি আর কুমন্ত্রণা এক সাথে মিলে তাঁকে বিপদগামী করলো।

কালাপাহাড় সহকারে প্রধান উজির লোদী খান অমিতপরাক্রমে জৌনপুর আক্রমণ করলেন। তাঁদের অসামান্য উদ্যম ও অসাধারণ রণকৌশলের সামনে জৌনপুরের দিল্লীবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল। জৌনপুরের পতন আসন্ন হয়ে উঠলে দিল্লীর সালার মুনিমখান দিল্লীর পূর্বাঞ্চলীয় ফৌজের বিপুল এক অংশ নিয়ে এসে লোদী খানদের প্রতিরোধ করে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে শুরু হলো সত্যিকারের যুদ্ধ। প্রচণ্ড রণনিনাদে দশদিক কম্পিত হয়ে উঠলো। কিন্তু পক্ষাধিক কাল ধরে সমানে লড়েও মুনিম খান এবারও সুবিধে করতে পারলেন না। তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

লোদী খান ও কালাপাহাড় এই সন্ধি নিয়ে এই মর্মে খোশ প্রকাশ করলেন যে, দিল্লীর শক্তিকে আতংকিত করে তোলাই ছিল সুলতান দাউদ খানের লক্ষ্য। দিল্লী সম্রাজ্য জয় করা নয়, বা সে বাতুলতাও সুলতান নিশ্চয়ই পোষণ করেন না। সুলতানের সে উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে হাসিল হয়েছে। নতি স্বীকার করে দিল্লীর সালারের এই সন্ধি স্থাপন করাই তার প্রমাণ।

কিন্তু দূত মারফত বাঙ্গালার সুলতান এবারও এই মর্মে অবহিত হলেন যে, নিশ্চিত জয়ের মুখে প্রধান উজির লোদী খান মুনিম খানের সাথে পুনরায় সন্ধি স্থাপন করেছেন। শুনামাত্রই সুলতান দাউদ খানের শরীরের তামাম রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো। এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব কালাপাহাড়কে না দিয়ে কেন তিনি লোদী খানকে দিলেন, এই আফসোসে সুলতান কাতর হয়ে পড়লেন। কুচক্রীরা হাজির হয়ে সুলতানের উষ্ণ রক্তে অগ্নি সংযোগ করলো।

কতলু খান আর শ্রীহরি রায়ের সাথে এবার গুজার খানও এলেন। শ্রীহরির ইংগিতে কতলু খান এসেই সুলতানকে জানালেন, লোদী খানের লুকোচুরি ফাঁস হয়ে গেছে। তিনি বরাবর দিল্লীর পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছেন, এবং এক্ষণে মুনিম খানের সহায়তায় বাঙ্গালার তখ্‌তে লোদী খান তাঁর ভাবী জামাতা মরহুম সুলতান তাজ খানের পুত্র

বইঘর.কম ও রোকন

ইউসুফকে প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। বার বার জয়ী হয়েও মুনিম খানের সাথে তাঁর বার বার সন্ধি স্থাপন ঐ বদমতলবেরই আলামত।

সুলতান গুজার খানের অভিমত জানতে চাইলে গুজার খান সাহেব বললেন—মুনিম খানের সাথে যে প্রধান উজির সাহেবের প্রগাঢ় হৃদ্যতা আছে, গতবার আমি তা স্বচক্ষে দেখে এসেছি জনাব। কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রে আছেন তিনি, আমার তো মনে হয়নি। কিন্তু এখন আর তো তা অবিশ্বাস করতে পারছিনে।

সুলতান সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—কেন তা পারছেন না?

জবাবে গুজার খান বললেন—লোদী খান সাহেবের ভাবী জামাতা ইউসুফ খানের আচরণের প্রেক্ষিতে। এখনই ইউসুফ খান সাহেব অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে উঠেছেন। তিনি আমাকে এই মর্মে শাসিয়েছেন যে, অচিরেই তিনি বাঙ্গালার মসনদে উঠবেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য রেখে না চললে মসনদে উঠেই তিনি আমার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্তরালে কোন কারসাজী না থাকলে তখ্‌তে উঠার খোয়াব ইউসুফ খানের এতটা প্রবল হলো কি করে?

www.boighar.com

পরিস্থিতির পরিহাস নির্মম। ঠিক এই মুহূর্তেই ইউসুফ খান কাররানী অবিমিশ্রকারিতার বশে গুজার খান সহকারে আরো অনেকের সাথে সত্যি সত্যিই দুর্ব্যবহার শুরু করেন। বাঙ্গালা মুলুকের তিনিই যে ভবিষৎ সুলতান, এ হুমকিও তিনি অনেকের প্রতি প্রদান করতে থাকেন। তবে তাঁর ভাবী শ্বশুর লোদী খান সাহেবের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি সুলতান হবেন, বাস্তব ঘটনা তা নয়। তাঁর সুলতান হওয়ার আশা পোষণের পেছনে এমন কোন প্রসঙ্গই ছিল না। দাউদ খান কাররানীর পরে তিনি ছাড়া এ বংশে মসনদের আর যোগ্য কোন উত্তরাধিকারী নেই এবং তাঁর বংশের সবাই তাঁকে এখন থেকেই ভাবী সুলতান ভাবেন ও সেই মোতাবেক সম্বোধন-সমীহ করেন। এই জোশেই নির্বোধ ইউসুফ খান গরম হয়ে ওঠেন এবং এই জটিল মুহূর্তে গুজার খানের মতো একজন পরাক্রমশালী সালারের সাথেও দুর্ব্যবহার করে বসেন।

ইউসুফ খানের এই দুর্মতিই এই হুকুমাতের চরম বিপর্যয় ডেকে আনলো। আরো অনেকের কাছেই সুলতান ইউসুফ খানের এই ঔদ্ধত্যের প্রমাণ পাওয়ায় তাঁর দীলের তামাম দ্বিধা দূরীভূত হলো। তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন এবং গুজার খানকে বললেন—সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করুন খান সাহেব। ঐ বৃদ্ধ বেঈমান লোদী খানকে শায়েস্তা করতে আমি নিজে যাবো সীমান্তে। লোদী খানকে কয়েদ করা চাই-ই।

অতঃপর সেনাপতি গুজার খান, কতলু খান ও শ্রীহরিকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান দাউদ খান কাররানী বিহারের পশ্চিম সীমান্তে সসৈন্যে রওনা হলেন।

বইঘর.কম ও রোকন

খবর শুনেই চমকে উঠলেন লোদী খান। সুলতান দাউদ খান রওনা হওয়ার পরের দিনই আবার আচানকভাবে নিহত হলেন লোদী খানের ভাবী জামাতা ইউসুফ খান। এ খবরও লোদী খান সঙ্গে সঙ্গেই পেলেন। এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই ঐ শান্ত-ধীর লোকটিও বাঘের মত গর্জে উঠলেন। প্রতিকারের প্রয়োজনে তিনি মুনিম খানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মুনিম খানও তাঁর সাহায্যার্থে সসৈন্যে এগিয়ে এলেন। প্রধান উজির লোদী খান এবার দাউদ খানের উদ্দেশ্যে তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে যোগ দিয়ে এই অবিচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিকার করার জন্যে তিনি সালার কালাপাহাড়ের প্রতি আহ্বান জানালেন।

কালাপাহাড় সাহেব পড়ে গেল মসিবতে। নিতান্তই একটা ভুল বুঝাবুঝির কারণে এই চরম অনর্থ ঘটেছে, তা তিনি বুঝতে পারলেন। তাই লোদী খানের আহ্বানের জবাবে তিনি লোদী খানকে জানালেন, সুলতান দাউদ খানের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করা তাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর যে কাজটিই পারুন তিনি, এ কাজটি প্রাণান্তেও পারবেন না। তবে প্রধান উজিরের না-উম্মিদ হওয়ার কারণ নেই। স্রেফ একটা ভ্রান্তির উপর সব কিছুই ঘটেছে। তলোয়ার হাতে না দাঁড়িয়ে আগের মতোই স্নেহ নিয়ে গিয়ে সুলতানের সামনে দাঁড়ালে এবং সুলতানকে সব কিছু বুঝিয়ে বললে, সব ভ্রান্তি দূর হবে।

লোদী খান কিছুটা শান্ত হলেন। ক্রোধের বশে যত যা-ই তিনি ভাবুন,দাউদ খানের প্রতি তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। তাই, ক্ষিপ্ত মানুষের সামনে অস্ত্র রেখে শুধুমাত্র হৃদয় নিয়ে দাঁড়াতে যাওয়া সমীচীন হবে কিনা, লোদী খান সাহেব এ প্রশ্ন তুললে, কালাপাহাড় সাহেব বললেন—আপনি এখানে আপাততঃ অপেক্ষা করুন। আমি গিয়ে পথিমধ্যেই সুলতানকে সব কিছু বুঝিয়ে বলে শান্ত করি। এরপর আপনি আসুন।

কালাপাহাড় সাহেব তখনই সুলতানের তালাশে তাণ্ডার দিকে ছুটলেন। কিন্তু নসীবের নির্মমতা তখনও শেষ হয়নি। সুলতান দাউদ খান যে পথে এগুচ্ছিলেন, কালাপাহাড় সাহেব তার উল্টো পথ ধরে তাণ্ডার দিকে অগ্রসর হলেন। ফলে, সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ তাঁর ঘটলো না। সুলতান সসৈন্যে বিহারের সীমান্তে এসে ছাউনি ফেললেন এবং লোদী খানকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান করলেন। লোদী খানও সরলচিত্তে এই আহ্বানে সাড়া দিতে নিরস্ত্রভাবে সুলতানের ছাউনির দিকে রওনা হলেন।

কুচক্রীদের চক্রান্তের শাখা- প্রশাখা অনেক। বিবেক বা লাজও তাদের নেই। তাই কখন তারা কোন পথে হাঁটবে, হদিস করে সাধ্য কার? সুলতানের আহ্বান শুনেই কতলু খানেরা বুঝতে পারলেন, লোদী খান নির্ঘাত এ আহ্বানে সাড়া দিতে আসবেন। লোদী খান সামনে এসে দাঁড়ালেই সুলতান গলে যাবেন। তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বইঘর.কম ও রোকন

কানে মুচড় পড়লো মেড়ার। মেড়ার প্রধান উজির হওয়া আর তাঁর হলো না। কতলু খান তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তখনই তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর একদল বিশ্বস্ত সেপাইকে গোপনে ছাউনির বাইরে বের করে দিলেন এবং লোদী খানের আগমন পথে অবস্থান নিতে বললেন।

কতলু খানের অভিলাষ পূর্ণ হলো। যে লোদী খানের হস্তক্ষেপে কতলু খান একদিন নিশ্চিত মউত থেকে রেহাই পেলেন, সেই লোদী খানেরই প্রাণ নিলেন কতলু খান। পথিমধ্যেই কতলু খানের সেপাইরা অতর্কিতে চড়াও হয়ে লোদী খানকে বন্দি করলো এবং তৎপরেই তাঁকে হত্যা করে তাঁর লাশ পথের মাঝে ফেলে রেখে চলে এলো। সুলতানের ছাউনিতে গুজর রটে গেল, অতীত আক্রোশের বদলা নিতে কে বা কোন দিল্লীর আততায়ী লোদী খানকে পথের মাঝেই হত্যা করে রেখে গেছে, মুনিম খানের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে অর্ধেক পথও এগুতে তিনি পারেন নি।

লোদী খানের লাশ পথ থেকে কুড়িয়ে সুলতান দাউদ খানের সামনে এনে রাখা হলো। পিতৃতুল্য লোদী খানের লাশের উপর নজর পড়তেই জ্ঞান হারিয়ে গড়িয়ে পড়লেন বাঙ্গালার সুলতান দাউদ খান কাররানী।

তের

তাণ্ডায় এসে কালাপাহাড়ের মাধ্যমে সমুদয় তথ্য জেনে সুলতান দাউদ খান কাররানী লোদী খানের স্মরণে একটানা কয়েকদিন হা-হুতাশ করে কাটালেন। তাঁকে অহেতুক উত্তেজিত করে তোলার কারণে তাঁর সব রাগ কতলু খান, গুজার খান ও শ্রীহরির উপর পড়লো। এই সব কিছুর পেছনে এঁদেরই হাত আছে, এটাও তিনি অনেকখানি অনুমান করতে পারলেন। কিন্তু তখন তিনি অসহায়। লোদী খানের অপমৃত্যুতে বাঙ্গালার ফৌজের মধ্যে বিরাট এক ভাঙ্গন ধরে গেল। এদের অর্ধেকটারই আস্থা তিনি হারিয়ে ফেললেন। ওদিকে আবার দিল্লীর ফৌজ মার মার রবে বিহারের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, এক কালাপাহাড় আর সিকান্দর উযবেকেরা ছাড়া সুলতানের পক্ষে আর তেমন কেউ থাকে না। দিল্লীর হামলা প্রতিহত করতে হলে বাঙ্গালার ফৌজের মধ্যে এখন ঐক্য বজায় রাখা একেবারেই অপরিহার্য। তদুপরি সুলতান ও কালাপাহাড় সাহেব গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখলেন, লোদী খানের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছাড়া, এই চক্রান্তকারীরা দিল্লীর শক্তিকে প্রতিহত করার ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করে না। এ ব্যাপারে সবাই তারা আন্তরিকভাবে আগ্রহী। সুতরাং, অনেকখানি অনুমান করতে পারলেও, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সুলতান কোন পদক্ষেপ নিতে পারলেন না। গায়ের জ্বালা গায়েই তিনি মেটালেন।

বইঘর.কম ও রোকন

ঢিল মারলে পাটকেলটি খেতে হয়, এমন ঘটনা হর হামেশাই ঘটে। কিন্তু শক্তি থাকলে ঐ পাটকেল খাওয়া ব্যক্তিও যে আবার পাহাড়টাই তুলে নিয়ে ছুটে আসে, এ ঘটনাও বিরল নয়। সন্ধির শর্ত অমান্য আর লোদী খানের গুপ্তহত্যার খবর পাওয়ামাত্রই মুনিম খান অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সোলায়মান কাররানীর বাঙ্গালার প্রতি তাঁর সমস্ত অনুকম্পা উবে গেল। এবার আর অংশ বিশেষ নয়, আকবর শাহর আদেশে তাঁদের পূর্ব অঞ্চলের সমস্ত ফৌজ একত্র করে নিয়ে তিনি আক্রোশভরে পাটনার দিকে রওনা হলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এ খবর তাণ্ডায় এসে পৌছলো। স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী সুলতান দাউদ খান কাররানীও এ খবরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বিচক্ষণতায় তার কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি ঘটলেও, বীরত্বে ও সাহসে তাঁর সমকক্ষ বাহাদুর নখে গোনার মতোও দিল্লীর শিবিরে তথা তৎকালীন হিন্দুস্তানে ছিল না। দিল্লীর বাদশাহর বড় বল তাঁর বেশুমার সৈন্যবল। ঐতিহাসিকের ভাষায়, সংখায় তারা এত যে, অরণ্য ও ময়দান একসাথে নিয়েও তাদের স্থান সংকুলান হয়না। সে তুলনায় বাঙ্গালার ফৌজ নদীর পাশে নালা। কিন্তু সৈন্যবলই লড়াই জেতার সবচেয়ে বড় বল নয়। বড় বল—দক্ষতা, সাহস ও নিয়াত। নিয়াত তো ছিলই, দক্ষতা আর সাহসও বাঙ্গালার ফৌজ উল্লেখের দাবি রাখে। ঐ বেশুমার দিল্লীর ফৌজের এই মুখোমুখী মোকাবেলার ওয়াক্তে যদি সালতানাতের দায়দায়িত্ব আগ্‌লে নিয়ে আজ সোলায়মান খান কাররানী বা বায়াজিদ খান কাররানী তাণ্ডার তখ্‌তে থাকতেন, সালতানাতের চিন্তাভাবনা মাথা মগজে না রেখে সেরেফ সালার হয়ে যদি দাউদ খান কাররানী কালাপাহাড়ের সাথে ময়দানে নামতে পারতেন আর যদি জুনায়েদ খানও দাঁড়িয়ে যেতেন গুজার খানের পাশে, তাহলে বলার অপেক্ষা রাখে না। পয়লা সংঘাতেই আকবর শাহকে তাঁর বাঙ্গালা জয়ের খাহেশটা ঐ বেশুমার সেপাইদের রক্তস্রোতেই ভাসিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে হতো, পুব অঞ্চলে পা বাড়াবার সাহস তাঁর দ্বিতীয়বার হতো না।

কিন্তু সৌভাগ্যের সে সংযোগ বাঙ্গালা মুলুকের আসমানে ইতিমধ্যেই অস্তমিত হয়ে গেছে। দাউদ খান কাররানীর জন্যে সে মওকা আর নেই। এখন তিনি সুলতান। সালতানাতের দায় দায়িত্বের কাছে আর সেই স্বার্থে হাজার জনের হাজার উপদেশ বিবেচনা করে দেখার কাছে মন-মাথা বন্ধক দিয়ে রেখে সেরেফ হাতের জোরে তাঁকে এখন তলোয়ার চালনা করতে হবে। হাতের সাথে মন-মাথা এক করতে পারবেন না। নিবেদিত সৈনিকের মতো শহিদ হওয়ার নিশ্চিন্ত জোশ নিয়ে দুশমনের ডেরায় ঢুকে ডেরা তাদের তছনছ করতে পারবেন না। www.boighar.com

এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতেও অদম্যবীর দাউদ খান মুনিম খানের এই মরণ কামড়ের খবর শুনে তিল পরিমাণ হতোদ্যম হলেন না। সিংহের মতো গর্জে উঠে তৎক্ষণাৎ

বইঘর.কম ও রোকন
তিনিও লড়াইয়ের হাঁক দিলেন। অনুমান তাঁর মিথ্যা নয়। দিল্লীর ফৌজের মোকাবেলার হাঁক শুনেই কালাপাহাড়দের পাশাপাশি মুক্ত তলোয়ার হাতে নিয়ে দুর্মদবেগে ছুটে এলেন গুজার খান, কতলু খান ও তাঁদের সমমনা সালার সেনা। শ্রীহরি রায়ও ছুটে আসতে অধিক বিলম্ব করলেন না।

রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রেখে সুলতান দাউদ খান কাররানী তাঁর দুর্ধর্ষ সালার-ফৌজদার ও মস্তবড় সৈন্যদল সহকারে দুরন্ত বেগে পাটনার দিকে ধাবিত হলেন। দিল্লীর ফৌজ ইতিমধ্যেই সীমান্ত পার হয়ে পাটনার নিটকবর্তী হয়েছিল। সুলতান দাউদ খান সসৈন্যে এসে পাটনার দুর্গে অবস্থান নিলেন এবং পাটনার দুর্গকে কেন্দ্র করে দিল্লীর ফৌজের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। কালাপাহাড়ের পরামর্শ অনুযায়ী, সুবিশাল দিল্লীর ফৌজকে তাড়া করতে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না পড়ে, বাঙ্গালার ফৌজ দলবদ্ধভাবে দুর্গটিকে ঘিরে এক সুনিপুণ ব্যূহ রচনা করলো এবং হামলাকারীদের বাগের মধ্যে পাওয়ামাত্র তাদের উপর চরম আঘাত হানার জন্যে তৈরি হয়ে রইলো। কালাপাহাড় ও দাউদ খানের দক্ষ পরিকল্পনায় তৈরি এই প্রতিরোধ ব্যূহ পরিচালনায় বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন দাউদ খান, কালাপাহাড়, গুজার খান, সিকান্দর উযবেক প্রমুখ দুর্ধর্ষ লড়াইয়ারা।

দিল্লীর সালার খান-ই-খানান মুনিম খানও একজন বিশিষ্ট রণবিদ। সসৈন্যে আর কিছুটা অগ্রসর হয়ে এই প্রতিরোধ ব্যূহ দেখেই তিনি চমকে গেলেন। বাঙ্গালার ফৌজের এই অভূতপূর্ব রণকৌশল তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। এবার তিনি বুঝতে পারলেন, কিসের বলে বাঙ্গালার সুলতান দিল্লীর বাদশাহর বেশুমার সৈন্যবলকে থোড়াই জ্ঞান করেন। এ রণকৌশল এমনই একটা কৌশল যা দ্বারা কাউকে আক্রমণ করা যাবেনা, কিন্তু কোন হামলাকারীরা হামলা করতে এলে তাদের ফিরে যাওয়ার মওকা অধিক থাকবে না—তা সংখ্যায় তারা যতই হোক। অসংখ্য ডাকাতদের তাড়া করতে না গিয়ে প্রবেশ পথের মুখে মুখে এ যেন গৃহস্বামীর কামান বাগিয়ে বসে থাকা।

মুনিম খানের স্মরণ হলো লোদী খানের কথা। জৌনপুরের সন্ধিতে বসে লোদী খান বলেছিলেন, "কুচক্রীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েই বাঙ্গালার সুলতান এই হামলার আদেশ দিয়েছেন। নইলে দিল্লীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালার সামরিক নীতি এটা নয়। বাঙ্গালার বাহিনী দিল্লী মুলুক দখল করতে বা দিল্লীর মসনদ কেড়ে নিতে কোনদিনই আসবে না, আর এলেও তা পারবে না। কিন্তু যে কোন হামলাকারীর হামলা প্রতিরোধ ও বিধ্বস্ত করতে বাঙ্গালার বাহিনী সম্পূর্ণ সক্ষম। বাঙ্গালা জয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষার সাথে দিল্লীর বাদশাহর এ কথাটাও স্মরণ রাখা ভাল।" সন্ধিতে বসে মুনিম খান বাঙ্গালার শক্তিকে অবমূল্যায়ন করলে, লোদী খান এই হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

মুনিম খান ভাবতে লাগলেন, লোদী খান আজ নেই, কিন্তু লোদী খানের নসিহত মূর্তিমান হয়ে তাঁর সামনে আজ উপস্থিত। মুনিম খানের ধারণা ছিল, খবর পেয়েই বাঙ্গালার ফৌজ ছুটে এসে আগের মতোই আক্রমণ করবে তাঁদের। আর তা করলে, দিল্লীর বাহিনীর এবারের এই সমুদ্রের মধ্যে বাঙ্গালার বাহিনী পলকেই হারিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যূহ দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, বাঙ্গালার ফৌজ হামলার নীতি গ্রহণ করেনি, করেছে প্রতিরোধের। এ প্রতিরোধ এমনই এক প্রতিরোধ, সৈন্য সংখ্যা সঙ্গে তাঁর যতই থাক, একে ভাঙ্গতে তিনি আদৌ কখনও পারবেন—এ ভরসা তাঁর হলো না। কারণ, এসব ব্যূহের অন্তর্নিহিত কলাকৌশল হাজারটা। কোন কৌশল গ্রহণ করেছে বাঙ্গালার ফৌজ, কে জানে। তদুপরি সঙ্গে ঐ পাটনাদুর্গের হেফাজতি। এসব ব্যূহ খোলা ময়দানে বড় একটা কার্যকর হয় না। এজন্যে চাই কেল্লা, দুর্গ, গিরিপথ বা সাগর-নদীর আবেষ্টনী।

মুনিম খান আরও বুঝলেন, এ পদ্ধতি গ্রহণ করায় বাঙ্গালার ফৌজের উদ্বেগ নেই। কারণ, তারা দিল্লী মুলুক জয় করতে আসেনি, তারা হামলা করতে আসবে না। দুশ্চিন্তা দিল্লীর ফৌজের। কারণ তারা বাঙ্গালা মুলুক জয় করতে এসেছে, তাদের হামলা করতে হবেই। এই প্রতিরোধ এড়িয়ে যে ভিন্ন পথে তাঁরা বাঙ্গালার দিকে এগুবেন, এ মূর্খামিও মুনিম খান কখনও করতে পারেন না। শের খাঁকে পেছনে রেখে হুমায়ুনের বাঙ্গালা মুলুকে ঢুকে পড়ার মতো এই দুর্বার শক্তি পেছনে রেখে মুনিম খান মরণ ফাঁদে ঢুকে পড়তে নারাজ। সামনে আছে রাজধানী তাণ্ডার বাহিনী, পেছনে এই লড়াকু দল। কোন দুর্গম স্থানে ঢুকিয়ে নিয়ে দুই দিক থেকে চেপে ধরলে, দিল্লীর মুখ আর কেউ তাঁরা দেখবেন না।

ফলে, আক্রমণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই দেখে মুনিম খান তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে সবিক্রমে চড়াও হলেন বাঙ্গালার এই ব্যূহের উপর। চড়াও হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই তিনি সবিশেষ উপলব্ধি করলেন, ধারণা তাঁর নির্ভুল। এ ব্যূহ কোন মামুলি ব্যূহ নয়, এটি একটি পাহাড়ের প্রাচীর। এ কৌশল একেবারেই অভিনব। দুর্বার বেগে ছুটে গিয়ে তাঁর কাতার কাতার সেপাইরা ঐ পাহাড়ের সাথে ঠক্কোর খেয়ে একই বেগে পুনরায় পেছন দিকে ছিটকে আসতে লাগলো এবং মরণ আঘাত বুকে নিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ ভূলুণ্ঠিত হতে লাগলো। কেউ আবার ছিটকেও আসতে পারলো না। ওখানেই গড়িয়ে পড়ে প্রাণ দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে মুনিম খানের সামনে তাঁর সেপাইদের স্তূপীকৃত লাশই আর এক প্রতিরোধ প্রাচীর তৈয়ার করে ফেললো। কয়েকদিন একটানা এই প্রক্রিয়ায় অসংখ্য সৈন্য ডালি দিয়ে মুনিম খান পিছিয়ে এসে ছাউনি গেড়ে বসলেন এবং পাটনার দুর্গ অবরোধ করে রইলেন।

দিন কেটে যেতে লাগলো। পাটনার ফৌজ রইলো নিরাপদ পাটনার দু[illegible]

বইঘর.কম ও রোকন
আর দিল্লীর বাহিনী বসে রইলো নীল আসমানের নীচে। কিন্তু ঐ নীল আসমানের নীচে ফৌজ নিয়ে মুনিম খানের জনমভর বসে থাকলে চলবে না। বাঙ্গালার ব্যূহ ভাঙ্গতেই হবে তাঁকে। মাঝে মাঝে মুনিম খান ঐ একইভাবে এসে ব্যূহের উপর হামলা চালাতে লাগলেন এবং ঐ একইভাবে বিপুল সংখ্যক দিল্লীর সেপাই কোরবানী দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে ফিরে আসতে লাগলেন। অবস্থান ও পদ্ধতিগুণে দিল্লীর বাদশাহর একশতজন সৈন্যক্ষয়ের কাছে বাঙ্গালার ফৌজের দু'পাঁচজনের অধিক সৈন্যক্ষয় হলো না।

দিনের পর আর দিন নয়, এই অবস্থায় গড়িয়ে চললো মাসের পর মাস। ক্ষয়িষ্ণু বাহিনীকে পরিপূর্ণ করার জন্যে মুনিম খান মাঝে মাঝেই নয়া সৈন্য আমদানী করতে লাগলেন। আর ঐ একইভাবে আবার তা খরচ করতে লাগলেন। অবশেষে দিল্লীর শিবিরে হতাশা দেখা দিলো। রসদের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতেই দিল্লীর বাহিনীর মনোবল করুণভাবে ভেঙ্গে পড়লো। মুনিম খান দুই চোখে আঁধার দেখতে লাগলেন। এর উপর আবার পাটনা বিজয় অচিরেই সুসম্পন্ন করার জন্যে দিল্লী থেকে পুনঃ পুনঃ তাকিদ দিচ্ছেন আকবর শাহ। এত সৈন্য ডালি দেয়ার পর অক্ষমতা প্রকাশ করার মুখ আর মুনিম খানের ছিল না। তাই, নিদারুণ সংকটের মুখেও মুনিম খান ছাউনি তুলতে পারলেন না। পাটনা দুর্গ অবরোধ করে রাখার নামে তিনি অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন।

অর্ধেক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষাকাল চলে এলো। পুব অঞ্চলের তামাম শক্তি এক সাথে মিলে এক পাটনার দুর্গই জয় করতে অক্ষম হলো দেখে দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নিদারুণ এক মর্মদাহে দগ্ধ হতে লাগলেন তিনি। শুধু হতাশার ব্যথাই নয়, আকবর শাহর এটা একটা মস্তবড় ইজ্জতের প্রশ্ন। অনেক বাঘ সিংহ ঘায়েল করে বাঙ্গালার মুলুককে এ যাবত তিনি সেরেফ একটা ছাগ শিশু ঠাউরিয়েছেন। থাবা মেরে বাঙ্গালা মুলুক জয় করবেন বলে অনেক হুংকার ছেড়েছেন। সেই ছাগ শিশুই তাঁর ঐ বিশাল ফৌজের নাভিশ্বাস তুলবে, বাঙ্গালার হাতে মার খেয়ে আকবর শাহকে লেজ গুটিয়ে নিয়ে বাঙ্গালা বিজয় পরিহার করতে হবে, এটা গোটা দিল্লী সাম্রাজ্যের চরম এক বেইজ্জতির ব্যাপার। দিল্লীর ভাবমূর্তি ধূলোয় লুটিয়ে যাওয়ার বিষয়। আকবর শাহ এ অবস্থা মেনে নিতে পারেন না। হাত যখন দিয়েছেনই, সর্বশক্তি নিয়োগ করে এ বেইজ্জতি আকবর শাহকে তরিয়ে উঠতেই হবে।

আকবর শাহ নিজে উঠে দাঁড়ালেন। অন্যের ভরসায় না থেকে বাঙ্গালার মোকাবেলা নিজেই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বর্ষাকাল। পাটনা দুর্গ নদীতীরে অবস্থিত। সেই মর্মে দিল্লীর সিংহভাগ সালার সেপাই আর সমরাস্ত্র সহ বিশাল এক নৌবাহিনী নিয়ে আকবর শাহ পাটনার দিকে ধাবিত হলেন।

কিন্তু পাটনায় এসে দেখলেন, তাঁদের জয়ের আশা সত্যি সত্যিই ক্ষীণ। স্থলপথে

পাটনা বিজয় অসম্ভব। কারণ পাটনার ঐ ব্যুহ স্রেফ সৈন্যবলে ভেদ করা যাবে না। নদীপথে এগুতে গিয়ে দেখলেন, এগুনোর পথ নেই। গঙ্গানদী সমুদ্র নয়। বড় হলেও তার পরিধি সীমিত। সেই সীমিত পরিধি পথ বাঙ্গালার নৌবহর আগে থেকেই রুদ্ধ করে নিয়ে আছে। বাঙ্গালার রণতরী সংখ্যায় পাঁচশো আর দিল্লীর রণতরী সংখ্যায় পাঁচ লাখ হলেও, নদী বক্ষে রণের বেলায় উভয়েই সমান সমান। কারণ,সমান সমান সংখ্যক রণতরীই সামনা সামনি লড়াই করার মওকা পাবে। সামনের বহর এগুতে না পারলে, পেছনের বহর নীরব দর্শক।

আকবর শাহ চিন্তায় পড়লেন। পাটনার দুর্গ কোন পথে জয় করা সম্ভব, ভাবতে লাগলেন। ভাবতে গিয়েই তাঁর খেয়াল হলো পাটনা দুর্গের রসদের কথা। কত রসদ জমা আছে সেখানে? রসদের অভাব না ঘটলে পাটনার পতন ঘটবে না। খোঁজ নিয়েই জানতে পারলেন, রসদের অভাব কখনও তাদের ঘটবে না। কারণ, হাজীপুর থেকে অবিরাম আসতেই আছে রসদ। এ খবর জানা মাত্রই আকবর শাহ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে পাটনা আর তাঁর নিকটেই উত্তর তীরে হাজীপুর বন্দর ও হাজীপুর উপদুর্গ। এই হাজীপুর ধ্বংস করতে পারলেই, শিকড় - কাটা বৃক্ষের মতো নুয়ে পড়বে পাটনা।

কিন্তু একাজটিও অধিক সহজ ছিল না। স্থলপথে হাজীপুরে এগুনোর পথ নেই। হাজীপুরের এপাশে গঙ্গানদী যা বাঙ্গালার নৌবহরে আবৃত। অদূরে হাজীপুরের পশ্চিমদিকে গঙ্গার উপনদী গগ্‌রা ও গণ্ডক যার তীরে তীরে বাঙ্গালার ফৌজ শক্ত পাহারায় রত। ফলে গঙ্গার উপর দখল আনতে না পারলে হাজীপুরে পৌঁছানোর পথ নেই। নৌযুদ্ধই একমাত্র পথ এখন। পরাস্ত করতে না পারলেও বাঙ্গালার নৌবহরকে কিছুটা পিছু হটিয়ে দিয়ে হাজীপুরে পৌঁছানোর পথ করতে হবেই। আকবর শাহর আদেশে সর্বশক্তি নিয়োগ করে দিল্লীর নৌবহর বাঙ্গালার বহরের উপর চড়াও হয়ে গেল। শুরু হলো তুমুল নৌযুদ্ধ।

একটানা কয়েকদিন প্রচণ্ড নৌযুদ্ধ চললো। কিন্তু আকবর শাহর এতে কোন সুবিধেই এলো না। দিল্লীর বহর প্রতিপক্ষকে পিছু হটাতে পারলো না বা পারবে বলে প্রতীয়মানও হলো না। আকবর শাহ আবার দুর্ভাবনায় পড়লেন। ডুবো মুলুকের লোকেরা যে নৌযুদ্ধে এতটা মজবুত ডাঙ্গা মুলুকের লোকেরা তা কল্পনা করতে পারেনি। আকবর শাহ ভাবতে লাগলেন, এ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন চললে রসদের অভাব ঘটবে তাঁর নিজেরই শিবিরে। নৌবহর সহ এত ফৌজ সঙ্গে এনেছেন তিনি যে, সুদূর দিল্লী থেকে এত ফৌজের অবিরাম রসদ যোগানো সম্ভবপর ছিল না। তার চেয়েও বড় চিন্তা, আকবর শাহ নিজেও শত্রুমুক্ত নন। দিল্লীর তখ্‌ত অরক্ষিত রেখে সিংহভাগ শক্তি নিয়ে নিজে

তিনি এই দূর অঞ্চলে দীর্ঘদিন আটকে থাকলে, তাঁর তখ্‌তটাই যে কোন সময় বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

আকবর শাহ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উপায়ন্তর না দেখে অবশেষে তিনি ছলনার আশ্রয় নিলেন। এতদুদ্দেশ্যে কয়েকটি পরিকল্পনা এঁটে নিয়ে মোটা অর্থের বিনিময়ে তিনি কতকগুলো গাদ্দার হাত করলেন। বাঙ্গালা মুলুকের মাটি একই সাথে বীর ও গাদ্দার উৎপাদনে সমপরিমাণ উর্বর। পয়লা চাল হিসাবে গাদ্দারদের সহায়তায় আকবর শাহ বাঙ্গালার নৌবহরে গুজব ছড়িয়ে দিলেন যে, গগ্‌রা গণ্ডকের পথ ঘুরতে না গিয়ে হাজীপুরে আঘাত হানার জন্যে আকবর শাহ গঙ্গা নদীর ভাটি দিয়ে অর্থাৎ পাটনার খানিকটা পূর্ব দিয়ে সসৈন্যে গঙ্গা নদী অতিক্রম করছেন। গুজবটির সমর্থনে কিছু দিল্লীর ফৌজ পাটনার পূর্ব পাশে গঙ্গা তীরে ছুটোছুটি শুরু করলো।

তকদিরের মার আর 'ছান্দে'কে? আকবর শাহর পয়লা চালই কার্যকর হলো। গঙ্গার এদিকটা সত্যি সত্যিই উন্মুক্ত ছিল। কি করে আকবর শাহ গঙ্গা নদী পার-হবেন এ চিন্তা না করেই বাঙ্গালার স্বল্পকায় নৌবাহিনীর অর্ধেকটাই তৎক্ষণাৎ ঐ মুক্ত এলাকার দিকে আকবর শাহর ঐ তথাকথিত গঙ্গা নদী অতিক্রম রোধ করতে ছুটলো।

নসীব পাল্টে গেল। বাঙ্গালার ক্ষুদ্রকায় নৌবহর এতে করে আরো অধিক ক্ষীণকায় হয়ে গেল। বর্ষার গঙ্গায় তখন উদ্দাম স্রোত। স্রোতের উজানবাহী বাঙ্গালার এই ক্ষীণকায় নৌবহর স্রোতের ভাটিগামী আকবর শাহর ঐ বিশাল নৌবহরের চাপ আর আটকে রাখতে পারলো না। পিছু হটতে হটতে সেটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। প্রতারিত ঐ অর্ধেক অংশ ফিরে এসেও আর তাল সামলাতে পারলো না। হৃত লড়াই লড়তে গিয়ে পরাজিতই নয় শুধু,বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বিশাল বাহিনী নিয়ে আকবর শাহ মার মার রবে হাজীপুরে হানা দিলেন। হাজীপুর উপদুর্গের ক্ষুদ্র প্রতিরোধ ছিন্ন করে হাজীপুর দুর্গ সহ গোটা হাজীপুর বন্দরটাই তিনি পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন।

পাটনা দুর্গে রসদ আসা বন্ধ হলো। এতদিনে পাটনার দুর্গে হাহাকার পড়ে গেল। রসদ না এলে হপ্তাকালও বাঙ্গালার ফৌজ টিকে থাকতে পারবে না। হাজীপুরের দুঃসংবাদ পাওয়ামাত্র বাঙ্গালার সালারেরা বজ্রাহত হলেন। সময় থাকতেই পলায়ন করা ছাড়া আর করার কিছু নেই, এ সম্পর্কে সকলেই এক সিদ্ধান্তে এলেন। কিন্তু বেঁকে বসলেন সুলতান দাউদ খান কাররানী। প্রাণের ভয়ে পলায়ন করতে তিনি কিছুতেই রাজী নন। দিল্লীর ফৌজের সাথে মুখোমুখী লড়াই করার জন্যে সবাইকে তিনি তৈরি হতে বললেন। যুক্তি হিসাবে দেখালেন, প্রতিরোধ পদ্ধতি কার্যকর না হলে আক্রমণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, এটা নতুন কথা নয়। তদুপরি জান বাজী রেখে ঈমানের সাথে লড়লে, দিল্লীর ঐ বেশুমার সৈন্যসংখ্যা উদ্বেগের কোন কারণও নয় সম্মুখ যুদ্ধেই দিল্লীর শক্তির উপর মরণ আঘাত

হানার জন্যে জিদ ধরলেন সুলতান নসীব নারাজ হলে, পলায়ন বা পরাজয় কবুল করার চেয়ে মউতকে আলিঙ্গন করাই বেহতর বলে বিবেচনা করলেন তিনি।

সম্মুখ যুদ্ধে নামলে যে বাঙ্গালার বাহিনী কিছুই করতে পারবে না, এ চিন্তা বাঙ্গালার কোন সালারই করেন না। কিন্তু তাদের চিন্তা হলো, এই সম্মুখ যুদ্ধে নেমে অসংখ্য সৈন্যক্ষয় করার চেয়ে কায়দা মতো স্থানে গিয়ে আবার দিল্লীর ফৌজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। সুলতানের এই জিদের প্রেক্ষিতে সালার কালাপাহাড় সাহেব বললেন—জনাব, লড়াই ফেলে পলায়ন করা আমারও স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু এটা তো পলায়ন করা নয় । এক কৌশল ত্যাগ করে অন্য কৌশল গ্রহণ করা। জান দিতে সবাই আমরা পারি, কিন্তু জনাবকে তো জান দিলে কিছুতেই চলবে না। আল্লাহ তায়ালা না করুন, জান বাজী রেখে লড়তে গিয়ে জনাব যদি নিহত হন, তাহলে তো সব শেষ। লড়াই শেষ, আজাদী শেষ, বিকল্প পন্থা গ্রহণ করার জরুরতও শেষ। কাকে নিয়ে আর লড়তে যাবে বাঙ্গালা মুলুকের সুলতানহীন বাহিনী।

এর উপর যুক্তি নেই। দাউদ খান সেরেফ সালার নন। তিনি বাঙ্গালা মুলুকের সুলতান। তাঁকে মরলে চলবে না। তাঁকে বেঁচে থেকে সব আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। সব লড়াই লড়তে হবে, এবং তাঁকে বেঁচে থেকে সব লড়াই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সুলতান ভেবে দেখলেন, মসনদ আগলে নিয়ে তিনি আজ তাণ্ডায় থাকলে তাঁর সালারেরা জানবাজী রেখে লড়ে শহিদ গাজী যা হয় কিছু হতে পারতেন । কিন্তু নিজে তিনি এ লড়াইয়ে সম্পৃক্ত। সবাইকে রেখে লড়াই ফেলে একা তাঁর পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর আদৌ রুচিসম্মতও নয়। আর একা সেই পালিয়ে যাওয়াটা নিরাপদও নয় মোটেই।

দুঃসহ বেদনা বুকে নিয়ে সুলতান দাউদ খান রাজী হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পাটনার পতনের সাথেই বিহার মুলুক চলে গেল এবং বাঙ্গালার ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে গেল। এখন বিভিন্ন স্থানে খণ্ড লড়াই লড়েই বাঙ্গালার আজাদী রক্ষা করার কোশেশ করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। সামনে আছে প্রতিরোধের একমাত্র স্থান তেলিয়াগড় গিরিপথ। বিহার তো গেলই তেলিয়াগড়ে দিল্লীর ফৌজকে আটকাতে না পারলে,রাজধানী তাণ্ডাও তাদের দখলে চলে যাবে। তাণ্ডা গেলে তাঁর শক্তির উৎস খতম। সব সম্পদ দিল্লীর দখলে গেলে তার আর লড়াইয়ের তাকত থাকবে না।

দাউদ খান সজাগ হয়ে উঠলেন। পাটনার দুর্গ ত্যাগ করার আগে পাটনার তামাম সম্পদ হেফাজত করতেই হবে তাঁকে । দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে তাণ্ডার সম্পদও হেফাজত করতে হবে। দিল্লীর ফৌজ শহর -বন্দর দখল করে করুক, বাঙ্গালার বিশাল ধনসম্পদ কিছুতেই তাদের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। তিনি কোষাধ্যক্ষ শ্রীহরি

বইঘর.কম ও রোকন
রায়কে আহ্বান করলেন। কালাপাহাড় ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখে পাটনা তথা বিহারের নগদ ধনসম্পদ নৌকা বোঝাই করে নিয়ে সুলতান শ্রীহরি রায়কে বাঙ্গালায় গিয়ে নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করতে বললেন এবং পরবর্তীতে সুলতান যেখানে থাকেন সেখানে গিয়ে সুলতানের সাথে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পাটনার তাবত ধনসম্পদ নৌকা বোঝাই করে নিয়ে শ্রীহরি রায় তাঁর বিশ্বস্ত লোকজন সহ রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গাপথে যাত্রা করলেন। রাত্রির অন্ধকারেই সালার-সেপাই সহকারে সুলতান দাউদ খান কাররানীও পাটনার দুর্গ ত্যাগ করে স্থলপথে তেলিয়াগড় গিরিপথকে লক্ষ্য করে ছুটলেন।

সন্ধান পেয়েই আকবর শাহ্ পাটনার শূন্য দুর্গ দখল করলেন ও বাঙ্গালার ফৌজকে ধাওয়া করতে বেরুলেন। বর্ষাকালের রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত থাকার দরুন বাঙ্গালার বেশ কিছু হাতি ঘোড়া আকবর শাহর হস্তগত হলো। বাঙ্গালার ফৌজকে ধাওয়া করে আকবর শাহ দরিয়াপুর তক্ এলেন এবং অরক্ষিত রাজধানী ও মসনদের কথা চিন্তা করে ওখান থেকেই ঘুরে তিনি দিল্লীতে ফিরে গেলেন। যাবার আগে তিনি বাঙ্গালার ফৌজকে ধাওয়া করার এবং বাঙ্গালা বিজয় সম্পন্ন করার দায়িত্ব মুনিম খানের উপর ন্যস্ত করলেন। মুনিম খানকে সহায়তা করার জন্যে তিনি তাঁর অন্যতম সালার রাজা তোডরমলকে সসৈন্যে রেখে গেলেন।

বাঙ্গালার প্রবেশদ্বার তেলিয়াগড় গিরিপথে পৌঁছেই সুলতান দাউদ খান কাররানী সালার সেপাই নিয়ে পাটনার মতো আবার ঐ একইভাবে ব্যুহ রচনা করলেন এবং দিল্লী ফৌজের গতিপথ রোধ করে দাঁড়ালেন। মুনিম খান ও তোডরমল সসৈন্যে এসে পুনরায় ঐ একইভাবে ঠেকে গেলেন। আবার তাঁদের সামনে সেই ব্যুহ,সেই মরণফাঁদ। বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশ করার দুস্‌রা রাহা নেই। বিশেষ করে বাঙ্গালার রাজধানীর নাগাল পাওয়ার এই তেলিয়াগড়ই একমাত্র পথ। দুস্‌রা পথের সন্ধান তাঁরা জানেন না। আবার মুনিম খান ছাউনি গেড়ে বসে ঐ একইভাবে সৈন্য ডালি দিতে লাগলেন। রসদ তার ফুরিয়ে আসতে লাগলো। এত দূরে রসদের যোগান দিল্লী থেকে পাওয়ার আশা ক্ষীণ।

দিল্লীর ফৌজের সামনে তেলিয়াগড় গিরিপথ হারাম হয়ে গেল। অথচ বাঙ্গালা মুলুকে যেভাবেই হোক প্রবেশ করতে হবেই তাদের। সস্যৈন্যে প্রাণ দিতেও মুনিম খান রাজী, বাঙ্গালা জয়ে ব্যর্থ হয়ে দিল্লীতে তাঁর ফিরে যাওয়া চলবে না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে যে দিগ্‌দারীতে পড়তে হবে তাঁকে, তা মৃত্যু চেয়েও করুণ। সুতরাং পথ চাই। আসমান দিয়ে হলেও বাঙ্গালায় ঢোকার পথ একটা পেতেই হবে তাঁকে। কিছু ফৌজ আগে ঢুকে তাণ্ডার উপর চড়াও না হলে বা এই তেলিয়াগড় গিরিপথের পেছনের মুখ আগলে না দাঁড়ালে বাঙ্গালার ফৌজ তেলিয়াগড় ছাড়বে না।

রাজা তোডরমলকে নিয়ে মুনিম খান পরামর্শে বসলেন। বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশ করার বিকল্প পথ আছে কিনা, বা প্রবেশ করার অন্য কোন হুনোর-হিক্‌মত জানা লোক কেউ কোথাও আছে কিনা, তোডরমলকে মুনিম খান এমন লোকের তালাশ করতে বললেন।

পদস্থ লোক ছাড়া এমন খবর এমন হিক্‌মত সাধারণ লোকের রাখার কথা নয়। এ জন্যে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত লোক চাই। রাজা তোডরমল অমুসলমান। কোন মুসলমান পদস্থ লোক এসব সন্ধান তাঁকে নাও দিতে পারেন ভেবে, তোডরমল বুদ্ধি করে তাঁর স্বজাতীয় রাজা জমিদার চারপাশে যারা ছিলেন, তাদের আহ্বান করলেন। খড়্গাপুর রাজ সংগ্রাম সিংহ, গিধৌররাজ পুরনমল ও অন্যান্য যে সমস্ত রাজা জমিদার এই কয়দিন আগেও সুলতান দাউদ খানের ওয়াস্তে জান কোরবান করার তরতাজা ওয়াদা সহ হরঘড়ি তাঁর স্তুতি গেয়ে বেড়ালেন, সেই দাউদ খানের বিপর্যয় শুরু হতে না হতেই তাঁরা সুর পাল্টিয়ে ফেললেন। স্বজাতীয় দিল্লীর সালার তোডরমলের আহ্বান পাওয়া মাত্রই তাঁরা দিল্লীর বাদশাহর প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে দিল্লীর বাদশাহর জন্যে আবার জান কোরবান করার বুলন্দ ওয়াদা পেশ করলেন।

তোডরমলের ক্ষীণ একটা সন্দেহ ছিল, তাঁর আহ্বানে হয়তো বা কেউই সাড়া দেবেন না। হাজার হোক, দীর্ঘদিন বাঙ্গালার সুলতানের নুন খেয়েছেন তাঁরা। নুনের তো দক একটা আছে। তাঁদের এই স্বতস্ফূর্ত সাড়াতে তাই তোডরমল অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বললেন—আপনাদের এই সুবুদ্ধির আর আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। দিল্লীর বাদশাহর যথাযথ অনুকম্পা সবাই আপনারা পাবেন। তবে এক্ষণে যে জন্যে আপনাদের আমি ডেকেছি, আর যা করতে পারলে দিল্লীর বাদশাহর আরো অনেক বেশি সুনজর পাবেন সবাই, তা হলো—তেলিয়াগড়ের ঐ অবরুদ্ধ গিরিপথ ছাড়া বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশ করার দ্বিতীয় কোন পথ আপনাদের জানা আছে কিনা, আর না থাকলে, এই পথে প্রবেশ করার কোন রকম কায়দা কৌশল আপনারা কেউ বাৎলে দিতে পারেন কিনা, বলুন। এ কাজটি করতে পারলে আপনাদের রাজ্য ও জমিদারি বাদশাহকে বলে আমি লাখেরাজ করে দেবো।

বাঙ্গালার মুসলমান শাসনের ঘটনাপঞ্জির মাঝে আর যেখানে যত গরমিলই থাক, এক জায়গায় এর মিল আছে প্রকট। বাঙ্গালার প্রতিটি বিপর্যয়ের মূলে আছে একটানা গাদ্দারী। অমুসলমানদের সাথে কিছু নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলমানদের সীমাহীন গাদ্দারী ও ষড়যন্ত্র বাঙ্গালার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বার বার বিপর্যস্ত করেছে, দুরবস্থায় ফেলেছে বাঙ্গালার মানুষকে। মুসলমান শাসন উচ্ছেদ করাই এ বিশ্বাসঘাতকতার মূল উদ্দেশ্য। তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ আর ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যেও কিছু লোক

বইঘর.কম ও রোকন
বিশ্বাসঘাতকতা করে। সুলতান দাউদ খান কাররানীর আমলের বিশ্বাসঘাতকেরা এই পরের পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতক ও গাদ্দার। ব্যক্তি-স্বার্থ হাসিলে এরা বিবেক ও ঈমান সহ স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়া লোক। স্বার্থের লোভে গাদ্দারী ঐ হাজীপুরের নৌযুদ্ধে শুরু হয়। অতঃপর চলতেই থাকে এর জের।

তোডরমলের কথার জবাবে খড়্গপুর রাজ সংগ্রাম সিং শশব্যস্তে বললেন— আছে কর্তা, আছে। বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশ করার বিকল্প পথ আছে।

তোডরমল মহোল্লাসে প্রশ্ন করলেন—আছে? বিকল্প পথ আছে? কোথায় সে পথ? কোন দিকে?

ঃ ঐ তেলিয়াগড়ের দক্ষিণ দিকে কর্তা।

ঃ ওখানে কোন পাহারা নেই?

ঃ পাহারা থাকবে কেন কর্তা। ওটা তো আসলে পথ নয়, ওখানেও পাহাড়। তবে অনেকটা নীচু আর ভেঙ্গে ধসে যাওয়া। চেষ্টা করলে ওখান দিয়ে যাওয়া যায়।

ঃ তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা। তাণ্ডার উমরাহদের সাথে শিকারে এসে আমরা এই পথের খোঁজ পেয়েছি। এই পুরনমল বাবুও সাথে ছিলেন আমার।

ঃ আচ্ছা।

ঃ স্থানীয় এই জমিদার বাবুরাও জানলে কেউ কেউ জানতে পারেন। নইলে বেশি লোক এখবরও রাখে না।

ঃ সাব্বাস্! আপনারা তাহলে স্থানটা চিনিয়ে দিতে পারবেন?

ঃ কেন পারবো না প্রভু? হুকুম হলেই পারবো।

পুনরায় টলে গেল দাউদ খানের নসীব। পরম বিশ্বস্ত বলে যে সব রাজা জমিদার এ যাবত বাঙ্গালার সুলতানের অশেষ অনুকম্পা ভোগ করে এসেছেন, তাঁরাই নেচে নেচে গিয়ে দিল্লীর ফৌজকে এই গোপন পথ দেখিয়ে দিলেন। দিল্লীর ফৌজের বিপুল এক অংশ ঐ পথে ঢুকে তাণ্ডার দিকে ধাবিত হতে লাগলো।

খবর পেয়েই চমকে উঠলেন দাউদ খান। চমকে উঠলেন বাঙ্গালার সালার সেপাই সকলেই। অধিকক্ষণ এই গিরিপথ আগলে নিয়ে থাকলে ঐ পথে দিল্লীর তামাম সেপাই ঢুকে গিয়ে রাজধানী তাণ্ডাই দখল করে নেবে। আত্মীয়স্বজন আর ধনসম্পদ রক্ষা করার কোন অবকাশ থাকবে না। তদুপরি এই গিরিপথের দুই মুখই দিল্লীর ফৌজ বন্ধ করে দিলে, তাঁরাও কেউ বেরুনোর পথ পাবেন না। এই দুর্গম গিরিপথেই আটকা পড়ে মরতে হবে। অতএব, লড়াই তাঁদের খতম। আর বাঙ্গালা মুলুক রক্ষে করা নয়, নিজেদের ও স্বজনদের প্রাণ বাঁচানোই এখন তাঁদের জন্যে ফরজ। তাঁদের সামনে পিছে উভয় দিকেই বেশুমার দুশমন। অবস্থান নিয়ে বাহিনী সাজিয়ে লড়াই করার মওকা নেই বিচ্ছিন্নভাবে লড়তে গিয়ে সব হারানো যুক্তিহীন।

প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁরা তাণ্ডার দিকে ছুটলেন। আগমন পথে দিল্লীর বাহিনীর প্রতিরোধ ছিন্ন করতে করতে তাঁরা তাণ্ডায় এসে হাজির হলেন। খোলা পথে দিল্লীর ফৌজ প্লাবনের মতো বাঙ্গালা মুলুকে ঢুকে পড়তে লাগলো। তাণ্ডায় পৌঁছেই সুলতান সহ বাঙ্গালার সালার-সেপাই, সকলেই তড়িৎবেগে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পাটনা গেছে, বাঙ্গালা গেল, একসঙ্গে দলবদ্ধ থেকে আর দিল্লীর শক্তিকে প্রতিহত করা যাবে না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন পথে দিল্লীর ফৌজের উপর এখন নিরলস হামলা চালাতে হবে। বিভিন্ন মুখী চাপে পড়লেই দিল্লীর ফৌজ অবশেষে বাঙ্গালা ছাড়তে বাধ্য হবে।

সেই মোতাবেক সালারেরা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে তৈরি হয়ে গেলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সালার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সালার সোলায়মান মানকলি ও বাবুই মানকলি সহ সালার কালাপাহাড় ঘোড়াঘাটে অবস্থান নেয়ার আর সুলতান দাউদ খান কাররানী ধনসম্পদ, পরিবার পরিজন ও অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে তাঁর একমাত্র স্বাধীন মুলুক উড়িষ্যায় গমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সেখান থেকে দিল্লীর ফৌজের উপর হামলা চালানোর জন্যে তিনি সঙ্গে নিলেন সালার গুজার খান, সিকান্দর উযবেক, কতলু খান ও ইসমাইল খান আব্দুরকে। কতলু খান আগের চেয়ে এখন অনেক বিশ্বস্ত। কারণ, বাঙ্গালার আজাদী না টিকলে তাঁকে প্রধান উজির করবে কে?

কিন্তু সব কিছুতেই প্রয়োজন অর্থ। সৈন্য সংগ্রহ ও সৈন্যদের একাগ্রতা ধরে রাখতে সর্বাগ্রে চাই অর্থ। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে সালারেরা অর্থ প্রার্থনা করলেন। সেই মর্মে সুলতান কোষাগারে গিয়ে কোষাগার খুলে দেখলেন, ভাণ্ডার শূন্য। ধনরত্ন অর্থকড়ির নাম মাত্রও নেই। বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, কোষাগারের কর্মচারীরা জানালেন, কোষাধ্যক্ষ শ্রীহরি বাবু অর্থকড়ি, ধন সম্পদ, মণিমুক্তা তামামই নৌকা বোঝাই করে চলে গেছেন। এটা নাকি সুলতান বাহাদুরেরই আদেশ ছিল, নৌকা বোঝাই পাটনার ধন সম্পদ দেখিয়ে রায় সাহেব এই কথাই সবাইকে বুঝিয়েছেন।

শুনামাত্রই অনেকে মাথায় হাত দিলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে সুলতান একটু হকচকিয়ে গেলেও, বিস্মিত বা নাখোশ তিনি হলেন না। সময় থাকতেই শ্রীহরি রায় যোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন দেখে তিনি শ্রীহরি রায়ের বুদ্ধির আর এক দফা তারিফই করলেন। অতঃপর ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চিত কিছু অর্থকড়ি ও মহিলাদের অলংকারাদির কিছু অংশ সালারদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তাঁদের তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিদায় করলেন। বিদায়ের আগে সকলকে তিনি এই আশ্বাস দিলেন যে, ধন সম্পদ নিয়ে শ্রীহরি রায় তাঁর সাথে মিলিত হলেই সকলের সব চাহিদা তিনি তৎক্ষণাৎ পূরণ করবেন।

সালারেরা তড়িঘড়ি বিদায় হলেন। পরিবার পরিজন, বিশ্বস্তজন ও গুজার খানদের সঙ্গে নিয়ে সুলতান দাউদ খান কাররানীও তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ দিকে ছুটলেন। নদী পথে

বইঘর.কম ও রোকন
কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম ও গড়মন্দারণ হয়ে সুলতান সদলবলে উড়িষ্যার কটক অঞ্চলে পৌঁছলেন এবং সেখানেই রাজধানী খুলে বসলেন। বাঙ্গালার রাজধানী তাণ্ডা অক্লেশেই মুনিম খানের হস্তগত হলো।

www.boighar.com

চৌদ্দ

তাণ্ডা দখল করার পরই খান-ই-খানান মুনিম খান তাণ্ডায় আটকে গেলেন। বাঙ্গালার ফৌজের চতুর্মুখী হামলার মোকাবেলা করা নিয়েই তিনি অতিষ্ঠ হয়ে রইলেন। রাজধানী তাণ্ডা ও তার আশে পাশের কিছু অঞ্চল ছাড়া দিল্লীর ফৌজের অধিকার অধিক বিস্তৃত হলো না। তাণ্ডায় দিল্লীর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ও বৈরী পরিবেশ সামলে নিতে ব্যস্ত থাকায় মুনিম খান আর তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে নজর ফেরাতে পারলেন না। সুলতান দাউদ খান কাররানী উড়িষ্যাতে স্থির হয়ে বসলেন।

কিন্তু স্থির হয়ে বসার কিছুদিন পরই আবার সুলতান দাউদ খান হা-অর্থ হা-অর্থ রবে অস্থির হয়ে উঠলেন। আরামে আয়েসে দিন কাটানোর জন্যে তিনি উড়িষ্যাতে আসেন নি। নিরাপদ এক অবস্থানে বসে দুশমনদের বিরুদ্ধে নতুনভাবে তৈরি হতে এবং তৈরি হয়ে আঘাত হানতে এসেছেন। কিন্তু তৈরি হতে চাইলেই চাই অর্থ। সেপাইদের বেতন, নয়া সেপাই সংগ্রহ, অস্ত্রশস্ত্র খরিদ, সেপাই সেনা ও হাতি ঘোড়ার রসদ—সব কিছুতেই অর্থ চাই। ওদিকে আবার বিভিন্ন স্থানের সেনাপতিরাও অর্থের জন্যে তাগিদ দিতে শুরু করেছেন। অথচ তাঁর তামাম অর্থ যার কাছে সেই শ্রীহরি রায়ের পাত্তা নেই। বিব্রত সুলতান চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ কি শ্রীহরির এই নিষ্ক্রিয়তার? কোন বদ্‌মতলব আছে নাকি তাঁর? প্রথম কয়দিন এ সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু দিন যতই অতিবাহিত হতে লাগলো, সুলতান দাউদ খানের দীলে এ সন্দেহ ততই দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। তিনি এখন উড়িষ্যায় এটা বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার প্রায় তামাম লোকই জানে। সুদূর দিল্লীতে বসে আকবর শাহও এ খবর রাখেন। আর শ্রীহরি রায় এটা জানতে পারলেন না? এতবড় একটা বিপর্যয়, খোদ বাঙ্গালার রাজধানী তাণ্ডার পতনের খবর সর্বজনে জানলো, আর যার সবার আগে জানার কথা, জানার জন্যে যাঁর কান পেতে থাকার কথা, সেই শ্রীহরি রায় জানলেন না? তদুপরি শ্রীহরি রায় নদী পথে এই দক্ষিণ দিকেই এসেছেন। সুলতানও আসার কালে এই পথেই এসেছেন আর বড় বড় নদী বন্দরে জানান দিয়ে এসেছেন, যাতে করে শ্রীহরি রায় এসে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারেন। কিন্তু কৈ? কোথায় শ্রীহরি?

অর্থ চিন্তায় সুলতান আকুল হয়ে উঠলেন। আর চুপ করে বসে না থেকে তিনি শ্রীহরি রায়ের খবর করা প্রয়োজন বোধ করলেন। সঙ্গে তাঁর নগদ পুঁজি অত্যন্ত অল্প। এ দিয়ে কোন বড় উদ্যোগ কিছুই নেয়া সম্ভব নয়। শ্রীহরিকে খোঁজ করে পেতেই হবে তাঁর। বাঙ্গালার সীমান্তদুর্গ গড় মন্দারণ থেকে দিল্লীর ফৌজের উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা সুলতানের আগে থেকেই ছিল। সুতরাং মন্দারণ দুর্গের অবস্থা পরিদর্শন আর সেই সাথে

শ্রীহরি রায়ের খবর করার লক্ষ্যে একদল নিরাপত্তা ফৌজ সহ সুলতান দাউদ খান কাররানী মন্দারণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মাসুম গজনবী ইতিমধ্যেই সৈন্যবিভাগে সহকারী রিসালাদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। মাসুম গজনবী সহ আরো কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সুলতানের সাথে রইলেন।

দিল্লীর ফৌজের অধিকার তাণ্ডার দক্ষিণে অধিক দূর এগোয়নি। এসব এলাকা এখনও সুলতান দাউদ খানের অধিকারভুক্ত। মন্দারণ দুর্গে সার্বক্ষণিকভাবে বাঙ্গালার কিছু ফৌজ আগে থেকেই ছিল। নিরাপত্তা ফৌজ নিয়ে সুলতান এসে মন্দারণে হাজির হলেন। গড় মন্দারণ বাঙ্গালার সুপ্রাচীন দুর্গ। মন্দারণে এসে সুলতান দাউদ খান পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, দুর্গটির আর আগের অবস্থা নেই। এখানে কোন কায়েমী ঘাঁটি স্থাপন করা যাবে না। তবে কিছুটা সংস্কার করে নিলে এখন থেকে দিল্লীর ফৌজের উপর মাঝে মাঝে তড়িৎ হামলা চালানোর মতো একটা অবস্থান পয়দা হবে। তড়িৎ হামলা চালানোর জন্যে অস্থায়ী ঘাঁটিও অনেকগুলো থাকা চাই এখন। এই কারণে সুলতান অল্পব্যয়ে মন্দারণ দুর্গটির সংস্কারে হাত দিলেন। কামিন-মজুর-কারিগর নিয়ে সেনা সৈন্য মন্দারণের সংস্কার কাজ চালাতে লাগলো। সুলতান দাউদ খান শ্রীহরি রায়ের খবর করে বেড়াতে লাগলেন। শ্রীহরি রায়ের এই অঞ্চলেই থাকার কথা। তাঁর বদমতলব থাকলে তিনি সরাসরি সুলতানের সামনে আসবেন না বা সে খবরও সরাসরি সুলতানকে কেউ দেবে না। তাই কিছু গুপ্তচর নামিয়ে দিয়েই সুলতান চুপ হয়ে রইলেন না। গুপ্তচরদের পাশাপাশি নিজেও কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে মন্দারণ ও তার আশেপাশে ছদ্মবেশে ঘুরতে লাগলেন।

সেদিন ছিল জ্যোৎস্নাঝরা রাত। সন্ধ্যার কিছু পরে মাসুম গজনবীকে সাথে নিয়ে আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র সহ সুলতান ছদ্মবেশে বেরুলেন। বেশি দূরে গেলেন না। সেদিন তাঁরা স্রেফ শহরের মধ্যেই ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তাঁরা এক মহল্লায় এসে হাজির হলেন। মহল্লার মধ্যে কিছুদূর এগিয়ে তাঁরা বসতি থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন এক বড়োসড়ো ও নিরিবিলি বাড়ির সামনে এলেন এবং বাড়িটার পাশ দিয়ে সামনে এগুতে গেলেন।

কিন্তু বাড়িটার পাশে এসেই তাঁরা এগুতে আর পারলেন না। কিছু আকর্ষণীয় কথাবার্তা কানে পড়ায় তৎক্ষণাৎ তারা নিকটেই গাছ-গাছড়ার ছায়ায় আড়ালে দাঁড়ালেন। দেখলেন, প্রাচীরঘেরা মস্ত এই বাড়িটার দহলীজ অন্দর থেকে ফাঁকে এবং প্রাচীরের বাইরে। দহলীজের খোলা বারান্দায় জ্যোৎস্না ঢলে পড়েছে। সেই জ্যোৎস্নাঢালা নির্জন বারান্দায় দুইজন লোক পাশাপাশি বসে থেকে মশগুলভাবে গল্প আলাপ করছেন। সুলতান ও মাসুম গজনবী এই বাড়ির কাছে আসতেই এঁদের একজন বললেন—তা যা-ই বলো রাজ্যেশ্বর, তাণ্ডার এই পতনটা আমার কাছে তাজ্জব লাগছে। বাঙ্গালার শক্তিটা তো মোটেই কমজোর ছিল না?

বইঘর.কম ও রোকন

রাজ্যেশ্বর বললেন—কমজোর কি বলছেন দাদা? বাঙ্গালার খোদ সুলতানই তো জব্বোর এক যোদ্ধা। তাছাড়া, তার এক একটা সালার এক একটা দিকপাল। সালারদের একজনকে তো নিজেই আমি জানি। সে যে রকম তুখোড় আর বেপরোয়া, তাতে তাকে সামাল দিতেই তো দিল্লীর ফৌজের নাভিশ্বাস উঠার কথা।

ঃ তবেই বুঝো! ঐ সুদূর দিল্লী থেকে এতদূরে উড়ে এসে থাবা মেরে রাজধানীটা নিয়ে নিলো, এ যেন একটি যাদুর মতো মনে হচ্ছে!

ঃ কুঞ্জদা, মানুষের বেঈমানী আর স্বার্থপরতা যাদুকেও অনেক সময় হার মানায়। ছোট হলেও আমিও তো একজন যোদ্ধা। বিহারের খোলা মাঠে যা পারে তারা করুক, কিন্তু তেলিয়াগড়ের মতো এমন এক সুদৃঢ় প্রাচীর তাণ্ডার সামনে থাকতে দিল্লীর ফৌজের কি সাধ্য সেখানে এসে বাহাদুরি দেখায়? একে ঐ দুর্ভেদ্য পথ, তার উপর এক-একজন দুর্ধর্ষ বীর ঐ পথের পাহারায়। মাথা কুটে মরলেও দিল্লীর ফৌজ কখনোও ঢুকতে পারতো ঐ পথে? কিন্তু ঐ যে বললাম বেঈমানী? নিজ মুলুকের লোকেরাই যদি বেঈমানী করে বসে, তাহলে আর শক্তিটা অধিক হলেই বা হবে কি?

ঃ রাজ্যেশ্বর!

ঃ বাঙ্গালার সুলতান তরুণ হলেও পাগল তো উনি নন। দিল্লীর বাদশাহর বিশাল শক্তির খবর রাখা সত্ত্বেও উনি যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিরেন, তা শূন্যের উপর করেন নি। কিন্তু যাদের মুখ আর ইজ্জতের দিকে চেয়ে তিনি এই ঝুঁকি নিলেন সেই বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার লোকেরাই যদি গাদ্দারি করে বসে, তাহলে তো অবস্থা এমন হবেই।

ঃ ঠিক ঠিক, গাদ্দারি বা ঐরকম একটা কিছু গলদ জরুর আছে পেছনে। নইলে বাঙ্গালার যে শক্তির কথা শুনেছি—

ঃ আছে মানে কি? শুনলাম, ঐ গিরিপথটা নাকি কোন এক গোপন পথে দিল্লীর ফৌজ ডিঙ্গিয়েছে। এই গোপন পথের সন্ধান দিল্লীর ফৌজ পেলো কি করে? এতবড় কাজে সাধারণ লোক থাকার কথা নয়? ঐ গিরিপথের সামনে আর চারপাশে আমাদের স্বজাতীয় অনেক রাজা-জমিদার আছেন। আমার স্থির বিশ্বাস, ওখানের কোন রাজা বা রাজারাই ঐ গোপন পথের সন্ধানটা দিয়েছেন। সুলতানের খুব প্রিয়পাত্র ওরা। অনেক গোপন তথ্যই জানা আছে ওদের।

ঃ ঢালী!

ঃ বলতে আমার লজ্জা নেই কুঞ্জদা। আমি তো বেশিরভাগ সময়ই ঐ অঞ্চলের রাজাদের চাকরি করেছি। আমার স্বজাতি হলে কি হবে? আমার শেষ মুনিব রাজা সংগ্রাম সিং সহ এইসব রাজাদের সবারই চরিত্র আমি দেখেছি আর জানি। এ কাজটি ওদের দ্বারাই হয়েছে আমার বিশ্বাস।

ঃ বলো কি!

ঃ স্বার্থের লোভে ওরা তোয়াজ করে সুলতানের প্রিয়প্রাত্র হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ওদের

আসল মনোভাব আমি জানি। সুলতান বা তাঁর সালতানাতের প্রতি কিছুমাত্র দরদ ওদের ছিল না। স্বার্থ যেখানে, ওরাও সেখানে। আন্তরিকভাবে ওরা কেউ কারো নয়। স্বার্থের পরিমাণ যখন যে দিকে বেশি ওরা তখন সেদিকে। আমার বিশ্বাস, এ গাদ্দারি ওরা ছাড়া আর অন্য কেউ করেনি।

ঃ তাই নাকি?

ঃ যা দেখিনি তাতো আর হলপ করে বলতে পারবো না দাদা! তবে ওদের যা চরিত্র, তাতে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ঃ তা যদি তারা তাই করে থাকে, তাহলে এর স্বাদটাও ওরা শিগগিরই টের পাবে। পড়শীর প্রীতি ভাল লাগেনি, ভিনদেশীয় লাথিগুড়ি খাবে যখন, তখন টের পাবে তা কতটা মিষ্টি।

ঃ কুঞ্জদা!

ঃ যদি কোন হিন্দুরাজার জন্যেও ওরা ঐ বেঈমানী করে থাকতো, নীচ কাজ হলেও বুঝতাম, অধিক সুবিধের লোভেই তা করেছে। কিন্তু এখানে তো সে প্রশ্নটিও নেই। এবার যাও, দিল্লীকা লাড্ডু খেয়ে দেখোগে পস্তাতে হয় কেমন?

ঃ তা দাদা হিন্দুরাজার জন্যেই কি বিশ্বাসঘাতকতা করা যায়? স্বজাতির প্রতি প্রীতি জাগলে ছলনা না করে খোলাখুলি লড়াই করা যায়। যার জন্যেই হোক, বিশ্বাসঘাতকতা করাটা তো জঘন্য কাজ।

ঃ একশোবার-একশোবার। আমি সে মর্মে বলিনি। আমি ওদের ঐ স্বার্থ হাসিলের হিসাব মেলাতে বলেছি। নইলে একেবারেই ইতরবিশেষ জীব ছাড়া, বিশ্বাসঘাতকতা করা কোন মানুষের কাজ নয়।

ঃ ওদের ঐ স্বার্থের কথা থাক দাদা। রাজা হিন্দু হলেই যে হিন্দুরা স্বর্গ হাতে পাবে, এ বিশ্বাসও আমি করিনে। রাজা লম্পট আর অমানুষ হলে, তিনি যে কি সুখ তার স্বজাতিকে দেন, তা আমার জানা আছে।

ঃ আরে ভাই, রাজা হিন্দু না মুসলমান, এর উপর তো কারো সুখ নির্ভর করে না, রাজা মানুষ না অমানুষ, নির্ভর করে এর উপর।

ঃ তাহলে?

ঃ এখানে তো আমি-তুমি ছাড়া আর কেউ নেই কাররানীদেরই দেখো না? খুব শক্ত মুসলমান, পান থেকে চুন খসার জো নেই। কিন্তু বেঈমানী না করে সত্যি কথা বললে, কোন হিন্দু বলতে পারবে, এজন্যে তারা অশান্তিতে আছে?

ঃ দাদা!

ঃ অনেক হিন্দুরাজার খবরই তো জানি ঐ সংগ্রাম সিং এর সুখও তো তুমি খেয়ে এসেছো। তুমিই বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি, তুমি মুসলমান শাসনের অধীনে আছো, কোন কারণেই একথা কি বারবার মনে হয় তোমার?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ কুঞ্জদা!

ঃ সত্যটা স্বীকার করতেও সাহস লাগেরে ভাই! এ সৎ সাহস অনেকের আমাদের থাকে না। নইলে এই কাররানীরা মসনদে থাকার দরুন আমার তো কখনও মনে হয়নি আমি কোন অসুবিধায় আছি।

রাজ্যেশ্বর ঢালী এবার সোচ্চার কণ্ঠে বললেন—হবেনা দাদা, হবে না। কোন শক্ত ঈমানের মুসলমান মসনদে থাকলে, কোন অমুসলমানেরই অসুবিধে হতে পারে না। এই কাররানীদের দিয়েই কেবল কথা নয়।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে জেনেছি, ঈমানদার কোন মুসলমান রাজা অমুসলমানদের প্রতি কোন রকম অন্যায় আচরণ করতে পারে না। তা করলে তিনি ইসলাম থেকে তফাতে পড়ে যাবেন।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমার ঐ বন্ধুটি একজন সাচ্চা লোক। একবিন্দু বানিয়ে বলে না।

ঃ ঢালী!

ঃ তাই বলছি দাদা, নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলমান আর অমুসলমানদের নিয়েই বরং ভাবনা। ওদের তো এসব বাঁধন নেই। খেয়ালখুশি মতো ওরা যে কোন সময় যে কোন আচরণ করতে পারে। কিন্তু সহি মুসলমানের বেলায় ঐ যে বললাম, ওরা নীতির বাঁধনে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। একচুল নড়নচড়নও ওদের জন্যে নিষিদ্ধ।

ঃ বাহ্! ধর্মেরই যদি এই বিধান হয়, তাহলে তো তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয়।

ঃ এই বিধানই দাদা।

ঃ ভাল—ভাল, খুব ভাল। তা এসব কথা যাক। যা বলছিলাম, তুমিও তো একজন সেপাই, তুমি কি মনে করো, দিল্লীর ফৌজ তাদের এই দখল কায়েমিভাবে টিকিয়ে রাখতে পারবে?

ঃ তা মানে—

ঃ অনেকদিন বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলাম রে ভাই। ওরা যদি টিকেই যায়, তাহলে আবার কোন ধরনের ঝুট ঝামেলায় পড়ি, সেই কথা ভাবছি।

ঃ অসম্ভব নয় দাদা, দিল্লীর বাদশাহ নাকি শুনি একজন নড়বড়ে মুসলমান। ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে।

ঃ ঢালী!

ঃ তবে টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা তো দেখিনা দাদা। একমাত্র যদি দিল্লীর ফৌজ বাঙ্গালার তামাম ধন-সম্পদ দখল করে ফেলে আর সেই সাথে গাদ্দারিও চলতে থাকে তাহলে কিছু নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বইঘর.কম ও রোকন

কুঞ্জবাবু নিষ্প্রভ কণ্ঠে বললেন— তা অবশ্য ঠিক। ভবিষ্যতের কথা কি কিছু নিশ্চিত করে বলা যায়?

ইতিমধ্যে এক চাকর এসে রাজ্যেশ্বরকে বললো—বাবু, উস্তাদজি জানতে চাইলেন, বৈঠকের লোকজন কি সবাই এসেছেন?

রাজ্যেশ্বর বললেন—না, শুধু কুঞ্জদাদা এসেছেন। উস্তাদজিকে গিয়ে বলো, তার দু'একজন এলেই তাঁদের নিয়ে উস্তাদজির কাছে আসছি।

"আজ্ঞে আচ্ছা"— বলে চাকরটি চলে গেল। রাজ্যেশ্বর বললেন—কি হলো দাদা? পীরমুহাম্মদ আর গিরিধারীদার তো অবশ্যই আসার কথা?

কুঞ্জদা বললেন—হয়তো কোন কাজে আটকে গেছে। আর কিছুক্ষণ দেখা যাক।

এবার উভয়েই নীরব হলেন। গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো সুলতান দাউদ খান মাসুম গজনবীকে চাপা কণ্ঠে বললেন—চলুন উনাদের সাথে একটু বসা যাক।

মাসুম গজনবী উৎসাহ ভরে বললেন— জি হুজুর, আমিও তাই ভাবছি। ঐ যে রাজ্যেশ্বর বাবু, উনার আসল নাম রাজ্যেশ্বর ঢালী। আমার খুব পরিচিত লোক।

সুলতান সাগ্রহে বললেন—এ্যাঁ! তাই নাকি? তাহলে তো আর কথাই নেই। চলুন, একটু আলাপ করি তাহলে—

ঃ জি হুজুর, চলুন—

ঃ আর শুনুন, গিয়েই যেন আমার পরিচয় দিয়ে বসবেন না। দরকার হলে নিজেই আমি তা দেব।

ঃ জি আচ্ছা হুজুর।

জানান দিতে দিতে তাঁরা বারান্দার সামনে আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালেন। জ্যোৎস্নালোকে লোক দেখেই রাজ্যেশ্বর বললেন— কে?

মাসুম গজনবী বললেন— আমরা দুজন মুসাফির। এদিকে বেড়াতে বেড়াতে এসেছি। আপনি কি রাজ্যেশ্বর বাবু? মানে রাজ্যেশ্বর ঢালী মহাশয়?

রাজ্যেশ্বর ঢালী সবিস্ময়ে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই। কিন্তু আপনি?

আমি মাসুম গজনবী। আপনার গলা শুনেই আপনাকে চিনতে পারলাম আর তাই এখানে এলাম।

আনন্দে লাফিয়ে উঠে রাজ্যেশ্বর বললেন—মাসুম গজনবী মানে? আমার মিতাজি কালাপাহাড় সাহেবের সঙ্গী সেই মাসুম গজনবী?

ঃ জি-জি, আমিই সেই মাসুম গজনবী।

বারান্দা থেকে রাজ্যেশ্বর লাফ দিয়ে আঙ্গিনায় নেমে এলেন। মাসুম গজনবীকে জড়িয়ে ধরে আবেগভরে বললেন—কি ভাগ্য—কি ভাগ্য। আপনি একদম এখানে, মানে আমার এই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে! আসুন-আসুন!

গজনবীকে টানতে টানতে রাজ্যেশ্বর ফের বললেন—আর ইনি বুঝি আপনার সঙ্গী?

বইঘর.কম ও রোকন

মাসুম গজনবী ঢোক চেপে বলেন— এ্যা! জিহাঁ-জিহাঁ।

এবার সুলতানকেও আহ্বান করে মাসুম গজনবী বললেন—আসুন জনাব, আসুন। গজনবী সাহেব আমার বন্ধু মানুষ। এই বারান্দায় এসে মেহেরবানী করে আসন গ্রহণ করুন—

বৈঠকে আহূত লোকজনদের জন্যে কিছু আসন বারান্দায় আগে থেকে পাতা ছিল। সুলতান আর গজনবীকে এনে রাজ্যেশ্বর ঢালী তারই দুটি আসন দুজনকে এগিয়ে দিলেন। সুলতান একটায় বসলেন। সুলতানের পাশে বসতে গজনবী সাহেব ইতস্তত করতে লাগলেন। সুলতান চোখ ইশারায় নির্দেশ দিলে গজনবীও জড়সড় হয়ে বসে পড়লেন। রাজ্যেশ্বর ঢালী এবার মাসুম গজনবীকে কলকণ্ঠে বললেন—ঐ যে আপনাদের বলেছিলাম, ইনিই সেই কুঞ্জদা। কুঞ্জলাল দেব মহাশয়। এই মহল্লার প্রধান। সদাশয় ব্যক্তি। গিরিধারীদা আর পীর মুহম্মদ ভাইকেও এখানেই দেখতে পাবেন। উনারাও আসবেন।

মাসুম গজনবী হাত বাড়াতেই কুঞ্জলাল দেব সানন্দে উঠে এসে মাসুম গজনবী ও সুলতানের সাথে করমর্দন করলেন এবং সরবে বললেন—খুব খুশি হলাম, খুব খুশি হলাম। আপনারা আমার এই ঢালী ভাইটির পরিচিত বন্ধু মানুষ। আপনাদের সাক্ষাৎ পেয়ে বড়ই প্রীত হলাম।

কুঞ্জবাবু তাঁর আসনখানা গজনবীর দিকে টেনে নিয়ে বসলেন। রাজ্যেশ্বর বললেন— তা গজনবী সাহেব, হঠাৎ আপনি এখানে কোত্থেকে? এ দুর্গের কাজে এসেছেন বুঝি?

ঃ ঠিক ধরেছেন। ঐ কাজেই এসেছি আর এখানে কয়দিন আছি।

আপনার সাক্ষাৎ পাবো তা ভাবিনি। জ্যোৎস্নাঢালা রাত দেখে বেড়াতে বেরিয়ে এখানে এসে পড়েছি।

শুনেই কুঞ্জবাবু ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন—আরে বলেন কি? আপনারা তো তাহলে আমাদের রাজ-অতিথি। কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! আপনাদের তো তাহলে বিনা আপ্যায়নে ছেড়ে দেয়া যায় না। রাজ্যেশ্বর, কথা পরে হবে, ভেতরে গিয়ে খবরটা আগে উস্তাদজিকে জানাও। আপ্যায়নের আয়োজনটা ভেতরে হতে থাকুক।

রাজ্যেশ্বর উঠতে গেলেন। এবার হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে সুলতান দাউদ খান বললেন—আহা থাক দাদা, ওসব আপ্যায়ন-আয়োজন থাক না। বরং স্থির হয়ে বসুন, সবাই মিলে একটু গল্প করি—

কুঞ্জলাল কিঞ্চিত আফসোসের সুরে বললেন—কি আর গল্প করবো, ভাই সাহেব! যে মুসিবতের মধ্যে এখন দিন কাটছে আপনাদের! ওসব কথা পরে শুনবো। আগে কিছু মুখে দেয়ার ব্যবস্থা হোক, পরে—

কথার মাঝেই হাজির হলো ভানু সিং। সে এসে বললো—বাবুজী, রাত তো বাড়তি

বইঘর.কম ও রোকন
হো গৈল। বৈঠক আজ চলবে নাই। শিপ্রা মাইজী এইলেন। আখনু উস্তাদজি উনারে তালিম দেবেনরে বাবা।

ভানু সিং তেওয়ারী। রায় সাহেবদের দারোয়ান। ভানু সিংকে এখানে দেখে আর শিপ্রার নাম শুনে সুলতান দাউদ খান কাররানী ভীষণভাবে চমকে গেলেন। এরা এখানে! তাহলে কি রায় সাহেবরাও এখানে? আত্মবিস্মৃত হয়ে সুলতান তৎক্ষণাৎ ভানু সিংহকে ডাক দিলেন—এই শোনো—শোনো—

ভানু সিং তেওয়ারী এগিয়ে এসে থতমত করে বললেন—আজ্ঞে হামারে কুচু কহিলেন বাবুজী?

ঃ হ্যাঁ। তুমি এখানে? তাহলে রায় সাহেবরাও কি এখানে আছেন এখন? মানে শ্রীহরি রায় সাহেব?

কণ্ঠস্বর শুনে ভানুসিং আরো কাছে এগিয়ে এলো। সুলতানকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললো— নেহি বাবুজী। ওহি সাহাবদের সাথে হামার কুয়ী দরছন নাই। ওহি লোক সব কুথায় হামি কুচু জানিনে।

ঃ জানিনে মানে?

ঃ হাইরে বা! ওহি বাবু সাহাবকো নকরী হামি তো বহুত আগারী ছাড়িয়া দিছেরে বাবা। বাল্‌কে আপ্ কৌন হো বাবুজী?

ঃ আমাকে চিনতে পারলে না ভান সিং?

সুলতান তাঁর মস্তকাবরণ খুলে ফেললেন। ধপধপে জ্যোৎস্নার আলো। সুলতানের মুখের দিকে চেয়েই ভানু সিং বাঘ দেখারও অধিক চমকে উঠে গড় হয়ে প্রণামে পড়ে গেলেন। প্রণাম করে উঠেই সে আকুল কণ্ঠে বললো—হা ভাগোয়ান! হা বিশ্বনাথ জি! এতো হাজৌর বাহাদুর! খোদ সুলতান হাজৌর বটে।

সঙ্গে সঙ্গে হলুস্থুলু পড়ে গেল। চমকে উঠে আসন থেকে দাঁড়িয়ে কুঞ্জবাবুরা ভানু সিংয়ের মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইতেই ভানু সিং ফের কাঁপতে কাঁপতে বললো—গৈল—গৈল! গর্দান গৈল বাবুজী। খোদ সুলতান হাজৌর এহি মামুলি আসনে লেইট্ গয়্যারে বাবা! হা রাধামাইজী! হা কিষণজি! বাত্তিউত্তি ভি নাই!

মাসুম গজনবী এবার সুলতানের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে তাঁদের মন্দারণে আসার কাহিনী বলতে লাগলেন। ভানু সিং দৌড় দিয়ে অন্দরের দিকে ছুটতে গেল। সুলতান আবার বললেন—দাঁড়াও ভানু সিং। শিপ্রাদেবী না কার কথা বললে? শিপ্রাদেবী এখানে আছেন?

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভানু সিং বললো—জি হাজৌর। এহি মকানে বটে।

ঃ এখানেও তাহলে আসর জমে উঠেছে বুঝি?

ঃ হাজৌর!

ঃ খুব নাচগান আর ফুর্তিফার্তা চলছে?

ভানু সিং তৎক্ষণাৎ নিজের দুই কান ধরে বললো—কিষণজি কা কিরিয়া! ওহি

বইঘর.কম ও রোকন
হালত নেহি হাজৌর। শিপ্রা মাইজী বিলকুল বদল হো গোয়ী। ওহি কাম বিলকুল বাতিল হো গোয়ী।

ঃ তাজ্জব!

ঃ হাজৌর!

ঃ আচ্ছা যাও—

ভানু সিং অন্দরের দিকে দৌড় দিলো। সুলতানকে যথাযোগ্য সম্মান ও আসন না দেওয়ার অপরাধে কুঞ্জবাবু ও রাজ্যেশ্বর ব্যাকুলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে চেনেন না, কোন কসুর হয়নি, তিনি নাখোশ হমনি—ইত্যাদি বলে সুলতানকে তাঁদের আশ্বস্ত করতে লাগলেন। ভানু সিং-এর মুখে খবর পেয়ে ইতিমধ্যে শশব্যস্ত ছুটে এলেন উস্তাদজি। উস্তাদ গোলাম রসুল। লম্বা-চওড়া এক সৌম্যদর্শন মানুষ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। মাথায় সফেদ কিস্তি টুপি, বুকঢাকা সুবিন্যস্ত সফেদ শ্মশ্রু। আপাদলম্বিত ধপধপে আলখেল্লা পরিহিত এই অতিশয় গৌরবর্ণের উস্তাদজি দরবেশতুল্য লোক। বাক্যালাপ সুমধুর, আচরণ অমায়িক। প্রথম দর্শনেই এই লোকটির প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধা জন্মে গেল। উস্তাদ গোলাম রসুল এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালে, সালামের জবাব দিয়ে সুলতান উঠে দাঁড়ালেন এবং উস্তাদের দিকে এগিয়ে এসে খোশদীলে মুসাফেহা করলেন। এরপর একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উস্তাদের অন্তস্পর্শী আহ্বানে সুলতান দাউদ খান কাররানী অন্দরমহলে গমন করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে অন্যান্যেরাও অন্দরমহলে চলে গেলেন। উস্তাদজি সুলতানকে তাঁর খাস কামরায় এনে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি গদীর উপর বসালেন। অন্যান্যরাও এসে গদীর নীচে আশে পাশে বসে পড়লেন।

অন্দরমহলটি সাধারণ বা সংকীর্ণ অন্দর মহল নয়। প্রাচীরঘেরা প্রশস্ত এক ময়দান। বিস্তীর্ণ আঙ্গিনার চারপাশে প্রাচীরের কোল ঘেঁষে অনেকগুলো ঘর ও পৃথক পৃথক বসতি। উস্তাদের ঘরটি সবগুলোর মাঝখানে। দুই তিনটি কামরাযুক্ত পরিচ্ছন্ন একতলা এক ইমারত। এক কালে কুঞ্জবাবুর এটি একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছিল। আড়তবাড়ি। অল্প ভাড়ায় এটি এখন উস্তাদজির সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান।

উস্তাদজির প্রধান সাগরিদ পীরমুহাম্মদ ইতিমধ্যেই এসে গেলেন। অল্প কিছু আলাপের পরই উস্তাদজী পীরমুহাম্মদকে মেহমানদারির আনযাম করতে বললেন। সুলতান বাধা দিলেন। কিন্তু সকলের অকৃত্রিম আন্তরিকতার কাছে তিনি হার মানলেন। স্থির হলো মাসুম গজনবী দুর্গে খবর দিয়ে কয়েকজন সেপাই আনিয়ে নেবেন। সেপাইরা দহলীজে হাজির থাকবে এবং সুলতানের ফেরত যাওয়ার পথে মাসুম গজনবীর সাথে তারা সুলতানের নিরাপত্তা বিধান করবে।

সুস্থির হয়ে বসে সকলেই দেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে আরো কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। প্রতিষ্ঠানটি নিয়েই কিছু কথা হলো। আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দিলে, সুলতান এই

বইঘর.কম ও রোকন
প্রতিষ্ঠানকে মোটা একটা অনুদান দেয়ার আশ্বাস দিলেন। এরপর কুঞ্জলালদেব ও রাজ্যেশ্বর ঢালী পীর মুহাম্মদের সহায়তায় ছুটে গেলেন। মাসুম গজনবীও উঠে গেলেন মন্দারণ দুর্গে খবর পাঠানোর কাজে। কক্ষের মধ্যে রইলেন সুলতান দাউদ খান কাররানী ও উস্তাদ গোলাম রসুল সাহেব। উভয়ের আলাপের মধ্যে সঙ্গীতের কথা উঠতেই সুলতান দাউদ খান প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা জনাব, শিপ্রাদেবী আর ভানু সিং আপনার এই প্রতিষ্ঠানে কিভাবে এসে জুটলো?

একটু নীরব হয়ে উস্তাদজি বললেন—জাঁহাপনা এদের বোধহয় তাহলে ভালভাবেই চেনেন। এককালে এরা নাকি জাঁহাপনার ঐ রাজধানীতেই ছিল।

ঃ জি-জি, তাই ছিলেন। তবে পরে শুনেছি, শিপ্রাদেবী সেখানে আর থাকেন না। কিন্তু কোথায় কিভাবে গেলেন সে সব কিছু জানিনে।

ঃ তার ঐ অতীত খবর আমিও জানিনে। তবে শেষের দিকের খবর কিছু রাজ্যেশ্বরের কাছে আমি শুনেছি। www.boighar.com

ঃ মেহেরবানি করে তাহলে ঐটুকুই বলুন।

উস্তাদজি নিম্নরূপ বিবরণ পরিবেশন করলেন ঃ-

শিপ্রাদেবী একজন বুদ্ধিমতী ও চৌকষ মেয়ে। সুর সঙ্গীত দখল তার অসাধারণ। এই প্রতিষ্ঠানে আসার আগে সে খড়্গাপুরে ছিল। তারও আগে সে রাজধানী তাণ্ডায় তার মাতুলালয়ে ছিল। নিজের মাতুল না হলেও সম্পর্ক তাদের ছিল। কিন্তু কোন কারণে শিপ্রা সেখানে আর টিকতে পারে না। সে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করতে থাকে। এই সময় খড়্গাপুরের রাজা সংগ্রাম সিং শিপ্রাকে শাদি করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর সেই আগ্রহের প্রেক্ষিতে শিপ্রা তাঁর সাথে খড়্গাপুরে চলে আসে। ভানু সিং তেওয়ারী শিপ্রার সেই মাতুলালয়ে নকরী করতো আর শিপ্রাকে কন্যাবৎ স্নেহ করতো। শিপ্রা খড়্গাপুরে চলে যাওযার সিদ্ধান্ত নিলে, ভানু সিংও নকরীতে ইস্তফা দিয়ে শিপ্রার সাথে খড়্গাপুরে চলে আসে।

কিন্তু খড়্গাপুরে এসেই শিপ্রাদেবী বুঝতে পারে, সে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। খড়্গাপুরে রাজ সংগ্রাম সিং আসলেই একজন মাতাল ও লম্পট। শিপ্রাকে শাদি করার কোন অভিপ্রায়ই তাঁর ছিল না। শিপ্রাকে কিছুদিন ভোগ করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলে, খড়্গাপুরে এনে শাদি করার নামে নানা রকম ভাঁওতা দিয়ে তিনি শিপ্রাকে ভোগ করতে উদ্যত হন। শিপ্রা তাতে রাজী না হলে, প্রথমে তাকে শাসন গর্জন ও পরে তিনি তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা শুরু করেন। শিপ্রাদেবী অতঃপর ভানু সিংকে নিয়ে পলায়নের চেষ্টা করলে, সংগ্রাম সিং উভয়কেই ধরে এনে তাঁর রংমহলে আটক করে রাখেন। এরপর একদিন মদ্যপ অবস্থায় আরো দু'জন মাতাল বন্ধু সহকারে এসে সংগ্রাম সিং শিপ্রার কক্ষে ঢুকেন এবং তাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করতে

বইঘর.কম ও রোকন

উদ্যত হন। নিরূপায় হয়ে শিপ্রাদেবী অনুনয় বিনয় করতে থাকে। কাজ না হলে, বাধাপ্রদান সহ আত্মরক্ষার্থে "বাঁচাও বাঁচাও" বলে চিৎকার শুরু করে।

রাজ্যেশ্বর ঢালী তখন এই সংগ্রাম সিং-এর নকরী করতেন। ঐ রং মহলের পাহারায় সেদিন রাজ্যেশ্বরই ছিলেন। বারবনিতা নিয়ে রাজ রাজাদের এই ফূর্তিফার্তার সাথে রাজ্যেশ্বর সুপরিচিত ছিলেন। তাই মামুলি ব্যাপার বোধে এ নিয়ে আলাদা কোন উৎসাহ তাঁর ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ এই আর্তনাদ শুনে রাজ্যেশ্বর চমকে উঠে ঐ কক্ষের দিকে ছুটেন। ভানু সিং তেওয়ারী পাশের কক্ষেই আটক ছিল। সে রাজ্যেশ্বরকে ডাক দিয়ে তার মাইজীর উপর এঁদের এই বলপূর্বক চড়াও হওয়ার ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে তার মাইজীকে বাঁচানোর জন্যে রাজ্যেশ্বরের প্রতি সে নিরতিশয় আকুতি মিনতি করতে থাকে।

রাজ্যেশ্বরের মাথায় আগুন ধরে যায়। আরো অনেক জঘন্য কাজের জন্যে আগে থেকেই তিনি সংগ্রাম সিং-এর উপর অতিশয় ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর সঞ্চিত ক্ষোভ এবার ফেটে পড়ে। মুহূর্তেই তিনি সিদ্ধান্ত স্থির করে নিয়ে আগে ভানু সিংকে বের করেন এবং পরে দুইজন এক সাথে শিপ্রার কক্ষে ঢুকে ঐ মাতালদের কাবু করে শিপ্রাকে বের করে আনেন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করেন তারা। আহত সংগ্রাম সিং ও মাতালেরা ঐ কক্ষের মধ্যে থাকতেই তাঁরা ক্ষিপ্র বেগে বেরিয়ে এসে কক্ষের দুয়ারে শিকল তুলে দেন।

মাতালেরা কক্ষের মধ্যে আটকা পড়ে রইলেন। শিপ্রা ও ভানু সিংকে নিয়ে রাজ্যেশ্বর নিরাপদ স্থানে চলে এলেন এবং এঁদের সমস্ত কথা শুনলেন। সংগ্রাম সিং-এর নকরী করার ইচ্ছে রাজ্যেশ্বরের আগে থেকেই ছিল না। এবার নিঃসন্তান রাজ্যেশ্বর তাঁর স্ত্রী সহ এদের নিয়ে খড়্গাপুর ত্যাগ করলেন। এই মন্দারণে রাজ্যেশ্বরের কিছু পরিচিতজন ছিল। এখানে এসে তিনি জীবিকার সন্ধান করতে থাকেন। সঙ্গীতে শিপ্রাদেবীর পারদর্শিতার কথা রাজ্যেশ্বর আগেই শুনেছিলেন। এখানে এসে এই উস্তাদের কথা শুনে শিপ্রার একটা হিল্লে করে দেয়ার জন্যে শিপ্রাকে তিনি উস্তাদজির কাছে নিয়ে আসেন। শিপ্রার দক্ষতা দেখে উস্তাদজি মুগ্ধ হন। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষুদ্র কার্যক্রমকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্যে উস্তাদজি শিপ্রাকে লুফে নেন এবং রাজ্যশ্বরকেও এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার কাজে আহ্বান করেন। রাজ রাজড়াদের অধীনে লাঠিয়ালী করার প্রতি রাজ্যেশ্বরের আর মোটেই আগ্রহ ছিল না। তিনি সানন্দে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। কুঞ্জবাবুর এই পরিত্যক্ত আড়তবাড়ির কিংদংশ উস্তাদজি এ যাবত সঙ্গীতচর্চার কাজকর্ম করছিলেন। এবার কুঞ্জবাবু অল্পভাড়ায় গোটা আড়তবাড়ীটাই এই উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেন।

উস্তাদজির পরিকল্পনা সফল হয়েছে। এখানে এখন ছোট বড় অনেক তালেবে-এলেম ও কয়জন শিক্ষক শিক্ষিকা। 'উস্তাদজি ও শিক্ষকেরা বয়সী শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত শিক্ষা দেন। শিক্ষিকারা পৃথক চত্বরে মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুর-সঙ্গীতে তালিম

দেন। আধ্যাত্মিক আর আদর্শভিত্তিক সুর সঙ্গীত শেখানো হয় এখানে। কোন বাণিজ্যিক সুর সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান এটি নয়। তবু এর আয় দিয়ে খুব স্বচ্ছলভাবেই এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হয়।

এই পর্যন্ত বলার পর শিপ্রার কথায় এসে উস্তাদজি বললেন—শিপ্রার যা দক্ষতা আর জ্ঞান-বুদ্ধি, তাঁতে আমি নিঃসন্দেহ জাঁহাপনা যে, আমার অভাবে শিপ্রাই এই প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে চালনা করতে পারবে।

উস্তাদজি থামলে সুলতান দাউদ খান প্রশ্ন করলেন—শিপ্রা দেবী তো আগে আসর খুলে গান শুনাতেন লোকজনকে। এখন উনি আসর জালসায় গান না?

উস্তাদজি বললেন— না জাঁহাপনা। মেয়েটের মধ্যে এখন একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। মহিলা আর বাচ্চাদের ঐ শিক্ষা দেয়ার বাইরে আসর তো দূরের কথা, অনুরোধেও কাউকে সে গান শুনাতে আসেনা।

ঃ তাই তাকি?

ঃ কয়েকবার বিশেষভাবে বলা সত্ত্বেও কোন মেহমানের সামনে সে গান গাইতে আসেনি। শুধুই মাফ চেয়েছে বার বার।

ঃ তাজ্জব! তা আপনাদের এখানে কি মেহমানদের জন্য বরাবরই আসর বসে?

ঃ জি-না, জি-না। ও ব্যবস্থা এখানে নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে, দু' একদিন আসরে বসতেই হয় আমাদের আর শোনাতেই হয় দু' একটা সুর সঙ্গীতের কলি। সবস্থানে তো আর না করা যায় না?

ঃ কেমন?

ঃ এই জাঁহাপনাই যদি আদেশ করে বসেন, তাহলে কি আর না করতে পারবো আমরা? নিতেই হবে যন্তর হাতে। কিন্তু ঐ যে বললাম, খোদ জাঁহাপনার কথা বললেও যে শিপ্রাটা গান গাইতে রাজী হবে, এমনটি মনে হয় না।

ঃ বলেন কি!

ঃ এটা ওর অহমিকা বা বেআদবি নয় হুজুর! আসলেই সে বড় সংযমী আর একাজটির উপর তার জব্বোর অনীহা। একমাত্র আমি, ভানু সিং আর তার রাজুকাকা মানে ঐ রাজ্যেশ্বর ছাড়া। এই প্রতিষ্ঠানের কোন পুরুষ মানুষের সাথেও তার তেমন ওঠাবসা বা গল্প আলাপ নেই।

সুলতান কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে চিন্তা করলেন। এরপর বললেন— আচ্ছা, আমি যদি তাঁর সাথে দু'একটা কথা বলতে চাই, তাহলে কি তিনি তাও নামঞ্জুর করবেন?

একটু থেমে উস্তাদজি বললেন—না জাঁহাপনা, তা বোধহয় করবে না।

ঃ কি করে বুঝলেন? আমি সুলতান বলে?

ঃ জি না, ঠিক সেজন্যেও নয়। জাঁহাপনার আগমনের সংবাদ পাওয়াতে তাকে যে রকম খুশি দেখলাম, আর জাঁহাপনার কাছে যাওয়ার জন্যে ও জাঁহাপনাকে দাওয়াত

বইঘর.কম ও রোকন

করার জন্যে সে যেভাবে আমাকে তাকিদ দিতে লাগলো, তাতে মনে হয়না সে আপত্তি করবে।

ঃ তাহলে কি তাঁর সাথে আমি একটু কথা বলতে পারি?

ঃ আলবত—আলবত। সে ঐ পাশের কক্ষেই আছে, ঘরে ফিরে যায়নি। ডেকে দেবো জাঁহাপনা?

ঈষৎ হেসে জাঁহাপনা বললেন—ডেকে দেবেন কি? আগে তাঁর সম্মতিটা জানুন—

এবার পাশের কক্ষ থেকে শিপ্রাদেবীই বললেন—উস্তাদজি হুজুর, জাঁহাপনাকে আমার সালাম জানিয়ে বলুন, তিনি যদি মেহেরবানি করে এই কক্ষে এসে দুটো কথা বলেন আমার সাথে, তাহলে আমি বড়ই বাধিত হবো। এই অনুগ্রহটুকু পাওয়ার আশাতেই আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

অত্যন্ত খুশি হয়ে উস্তাদজি বলেন—তাই নাকি—তাই নাকি?

শিপ্রাদেবী বললেন—আপনার ওখানে এখন লোকজনের যাতায়াত আর ভিড়। এই কক্ষই নিরিবিলি। এই কারণে এটা আমার বেয়াদবী না ভেবে জাঁহাপনা যদি অনুগ্রহ করে এই কক্ষে আসেন, তাহলে আমি ধন্য হবো।

প্রত্যুত্তরে সুলতান দাউদ খান খোশদীলে বললেন—মঞ্জুর। বরং সেইটেই ভাল হবে।

সুলতান দাউদ খান শিপ্রার কক্ষে প্রবেশ করলেন। প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল ও খোলামেলা কক্ষ। সুলতান শিপ্রার সাথে আলাপে রত হলেন। কিছুক্ষণ একা একা বসে থাকার পর, উস্তাদজি মেহমানদারির আনযাম দেখতে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সুলতানকে আসন দিয়ে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক শিপ্রাদেবী কুণ্ঠাভরে বললেন—আমার মতো একজন পাপিষ্ঠার প্রতি জাঁহাপনা যে হঠাৎ এমন সদয় হবেন, এ আনন্দ আমার রাখার জায়গা নেই।

সুলতান স্মিতহাস্যে বলেন—কেন, নিজেকে আপনি পাপিষ্ঠা ভাবছেন কেন?

ঃ কেন যে ভাবছি, জাঁহাপনার তা অজানা নেই। আমার অতীত জিন্দেগীর সব খবরই তো জানা আছে তাঁর।

ঃ আচ্ছা ও সব কথা থাক। আপনি হঠাৎ তাণ্ডা ছাড়লেন কি কারণে আর এই জিন্দেগী বেছে নিলেন, এটা জানার আগ্রহ আমি চেপে রাখতে পারলাম না বলেই আপনার সাথে কথা বলতে এলাম।

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ আপনার বিশেষ আপত্তি না থাকলে, এই ব্যাপারটা জানতে আমি খুবই ইচ্ছুক।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে শিপ্রাদেবী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—জন্মগতভাবেই আমি ভাগ্যবিড়ম্বিতা জাঁহাপনা। নসীবের দাবাখেলায় গুটি হয়ে কেবলই আমি জিন্দেগীভর ঘুরছি। একেবারে নিজের নাহলেও খুব দূরেরও নন। অথচ আমার সেই মাতুলেরাও আমাকে গুটি বানিয়ে ঐ একইভাবে খেললেন।

ঃ শিপ্রা দেবী!

ঃ সাহেবজাদা জুনায়েদ খান সম্পর্কিত আমার ঐ কেলেংকারীর খবর আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে গেলে আমি পাতকিনী হয়ে যাই আর আমার কুলীন মাতুলদের আত্মসম্মান বিপন্ন হয়ে পড়ে। আমাকে আর তাঁদের গৃহে স্থান দিলে জাতিচ্যুত হবেন দেখে তাঁরা আমাকে তাড়ানোর চেষ্টা করেন আর সেই উদ্দেশ্যে আমার সাথে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করেন।

ঃ বলেন কি!

ঃ তদুপরি, তাঁদের ফায়দা হাসিলের কাজে আমার প্রয়োজনও তাঁদের ফুরিয়ে গেল। আমি কোথায় যাবো, কোথায় থাকবো, তার কোন ব্যবস্থা না করেই তাঁরা আমাকে তাঁদের গৃহত্যাগ করতে বললেন এবং স্বেচ্ছায় না গেলে বলপ্রয়োগ করে তাঁরা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন বলে হুমকি দিলেন। এ অবস্থায় আমি কি করবো, কোথায় যাবো ভাবতেই খড়্গাপুর রাজ সংগ্রাম সিং আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। তার পরের ঘটনা সবই তো জাঁহাপনা উস্তাদজির মুখে শুনলেন।

শিপ্রাদেবী থামলে সুলতান দাউদ খান ইতস্তত করে বললেন—আচ্ছা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? কথাটা অবশ্য একটু নাজুক। তবু আপনাকে যখন কাছে আর খোলামনে পেলামই, তখন এটুকুও আমার জানতে ইচ্ছে করে।

ঃ বলুন জাঁহাপনা। আমার জানামতে কোন কথাই পোপন করার কোন কারণই আর আমার নেই।

ঃ মানে—কথাটা হলো, জুনায়েদ খান ভাই সাহেব কি সত্যিসত্যিই আপনাকে বেহুরমতি করেছিলেন?

শিপ্রাদেবীর মাথাটা নুয়ে পড়লো। তিনি ক্ষীণ অথচ স্পষ্টকণ্ঠে বললেন—তাঁর মতো সৎ চরিত্রের লোকের দ্বারা এমন কাজ কি সম্ভব জাঁহাপনা?

ঃ তার মানে? ঘটনা তাহলে মিথ্যে?

ঃ সর্ব্বৈ মিথ্যে। জনাব তো ঐ সাহেবজাদাকে ভালভাবেই জানেন। তাঁর চরিত্র কত পবিত্র। তিনি আমার গানেরই ভক্ত ছিলেন। ও ধরনের প্রবৃত্তির লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে ছিলনা।

ঃ তাহলে আপনি এই মিথ্যা অভিযোগ আনলেন কেন?

মাথা না তুলেই শিপ্রাদেবী বললেন—ঐ যে বললাম হুজুর, আমি আমার মাতুলদের হাতের গুটি হয়ে গিয়েছিলাম। কতকটা তাঁদের উসকানিতে আর কতকটা আমার নিজের মর্মপীড়ায়।

ঃ কেন, আপনার মর্মপীড়া কেন?

ঃ জাঁহাপনা তো জানেন আমি বালবিধবা। বাল্যকালেই আমি স্বামীহারা হই। জীবনের স্বাদগ্রহণের পথ আমার রুদ্ধ হয়ে যায়। তবুও আমি নিজেকে সংযত করে

বইঘর.কম ও রোকন

রাখি। কিন্তু আমার মাতুলদের চাপে পড়ে নানাজনের মনোরঞ্জনের কাজে আমাকে লিপ্ত হতে হয় আর এতে করেই আমি বেসামাল হয়ে যাই। জীবনের স্বাদ গ্রহণের স্পৃহা আমার জোরদার হয়ে উঠে। ফলে, বিভিন্ন জনের মনোরঞ্জনে লিপ্ত হয়ে থাকলেও, নিজের ইজ্জতটা হেফাজত করে রেখে ঐ অসংখ্য জনের মাঝে আমি একজন ভালমানুষ খুঁজতে থাকি। কিন্তু আমির-উমরাহ-সাহেবজাদা শতজনের ভিড়ে ঐ একমাত্র জুনায়েদ খান সাহেব ছাড়া আর এমন কাউকে পেলাম না। যাকে ঘিরে আমি আমার নয়া জিন্দেগীর স্বপন দেখতে পারি।

ঃ সে কি! আপনি সেরেফ ঐ আমির-উমরাহ-সাহেবজাদা-মানে মুসলমানদের মধ্যে সেই মানুষ খুঁজতে গেলেন কেন? আপনার স্বজাতির মধ্যে কাউকে পেলেন না?

ঃ হুজুর, আমি বিধবা। হিন্দুর বিধবার দ্বিতীয় বিয়ে হয় না। সংগ্রাম সিং নিজে রাজা। তাঁর কাছে সমাজ নীরব। তাই, আচার-নীতিহীন ঐ সংগাম সিং-এর মতো মানুষ শাদি আমাকে করলেও করতে পারেন ভেবেই আমি প্রতারিত হয়েছি। নইলে অন্য কোন হিন্দু সমাজের ভয়ে আমাকে তো শাদি কখনও করবে না। সুতরাং ভেবে দেখলাম, মুসলমান হলে এসব কোন বালাই নেই।

ঃ আচ্ছা।

ঃ ভাল একজন মুসলমানকে অবলম্বন করে আমি ইসলাম কবুল করবো, এই আশাতেই জুনায়েদ খানকে আঁকড়ে ধরি আমি। তাঁর পেছনেই ঘুরতে থাকি। তাঁকে হাত করার যতটা প্রয়োজন আমার মাতুলদের ছিল, আমার প্রয়োজন তার চেয়ে কিছু কম ছিল না জাঁহাপনা। কিন্তু—

ঃ কিন্তু?

ঃ শতভাবে চেষ্টা করেও তাঁকে আমি আমার দিকে প্রলুব্ধ করতে পারলাম না। আমার গানকে ভালবেসে উনি যদি আমার সাথে ঘনিষ্ঠ না হতেন, তাহলে হয়তো তাঁর জন্যে এতটা মরিয়া আমি হতাম না। কিন্তু আমার এত কাছে এসেও আমাকে বিলকুল উপেক্ষা করার বেদনা আমি সইতে পারিনি জাঁহাপনা। অভিমান আর আক্রোশের ভরে ঐ মিথ্যা অভিযোগ আনি আমি।

সুলতান গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হুঁ! তা আপনার কথার মধ্যে কিছুটা যুক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে একজন নির্দোষ মানুষকে ঐভাবে অপমান করা কি ঠিক হয়েছে বলে এখনও বিবেচনা করেন আপনি?

ঃ তা কেন করবো জাঁহাপনা? ঝোঁকের মাথায় পাপ যে আমি করেছি, তা পরে পরেই বুঝতে পেরেছি। আর তারই ফলশ্রুতিতে খড়্গপুরে গিয়ে সে পাপের শাস্তিটাও আমাকে পুরোপুরিই ভোগ করতে হয়েছে।

এরপর উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন! খানিক পরে সুলতান নড়ে চড়ে বললেন—অনধিকার চর্চা যখন অনেকই করলাম তখন আর একটু করি। এই যে এখন

আপনি এই জিন্দেগী নিয়ে একদম আত্মগোপন করে আছেন, ওসব ধ্যানধারণা কি তাহলে আর আপনার নেই? মানে নয়া জিন্দেগীর স্বপন কিছুই কি আর দেখেন না?

ঃ জি না জাঁহাপনা। আর একবিন্দুও ওসব চিন্তা করিনে। নানা ভাবে চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার। বিধাতা সেখানে বিরূপ, সেখানে আমি আর খামাখা চেষ্টা করে করবো কি?

ঃ শিপ্রাদেবী!

ঃ জীবনের স্বাদ ভোগ করা নসীবে আমার থাকবেই যদি, তাহলে আমি বিধবা হবো কেন আর জুনায়েদ খান সাহেবের দ্বারা ফের উপেক্ষিতাই বা হবো কেন? ওটা আমার নসীবে নেই জাঁহাপনা।

ঃ তাহলে এভাবেই বাকী জিন্দেগী কাটিয়ে দেবেন আপনি?

ঃ তাই দেবো জাঁহাপনা। আর তাই দেয়াই আমার উচিত। আমি তো এখনও হিন্দু আর হিন্দুর বিধবা। সে হিসাবে আমার কিভাবে চলা উচিত, এখন তা আমি মনেপ্রাণে বুঝে নিয়েছি জনাব। হিন্দু বিধবার নয়া জিন্দেগীর স্বপন দেখা পাপ এ প্রত্যয়কে এখন আমি সবলে আঁকড়ে ধরেছি। যে ধর্মের লোক আমি সেই ধর্মের বিধান মেনে চলে বাকী জীবন যাতে করে কাটিয়ে দিতে পারি, জাঁহাপনার কাছে আমি এই দোআই চাইবো।

ঃ আপনার প্রত্যয় নিয়ে আপনি সুখে থাকুন, এ দোআ অবশ্যই আমি করবো। তবে—

ঃ তবে কি জনাব?

ঃ আগে আমি আপনাকে যেমনটি দেখেছি, তাতে করে আপনার সঠিক মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এমন একটা সুষমা যে আপনার মধ্যে ছিল, তা আজ জানতে পেরে আমি কেবল তাজ্জবই হচ্ছি আর সেই সাথে বড়ই আফসোস্ হচ্ছে আমার। নসীবের মার সত্যিই বড় নির্মম!

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ নসীব নারাজ হলে কত সুষমা যে অলক্ষ্যে ঝরে যায়, তা আমার চেয়ে আর বেশি বোঝে কে?

ঃ জনাব!

ঃ থাক সে সব কথা। যেভাবেই থাকুন, আপনি সুখে থাকুন, এ কামনা এখন আমি সব সময়ই করবো।

জাঁহাপনা মেহেরবান। তা এদিকে হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে জাঁহাপনা? ঐ দুর্গের কাজে?

ঃ হ্যাঁ, সে কাজেও বটে আর সেই সাথে আপনার মাতুল শ্রীহরি রায় সাহেবের খোঁজ করার জন্যেও বটে।

শিপ্রাদেবী উৎসুক হয়ে বললেন—তাঁর খোঁজ মানে? কি ঘটনা জাঁহাপনা?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমার বিপর্যয়ের কথা তো সবই শুনেছেন। বিপর্যয়ের আলামত দেখেই আমার সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে শ্রীহরি রায় সাহেবকে ফাঁকে সরে যেতে বলি। নৌকা বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে রায় সাহেব এই দিকেই এলেন। কিন্তু আর তাঁর কোন সন্ধান পাচ্ছিনে।

ভীষণভাবে চমকে উঠে শিপ্রাদেবী বললেন—সেকি জনাব! জনাবের সমস্ত ধন-সম্পদ?

ঃ হ্যাঁ। পাটনার আর বাঙ্গালার নগদ অর্থকড়ি ও ধনরত্ন। দিল্লীর ফৌজের হাতে যাতে করে না পড়ে সেই জন্যেই ওগুলো নিয়ে তাঁকে আমি সরে যেতে বলেছি।

শিপ্রাদেবী মাথায় হাত দিলেন এবং বিপুল বিস্ময়ে বললেন—হায় সর্বনাশ! জাঁহাপনা তাঁর তামাম ধনরত্ন আমার মাতুলের হাতে দিয়েছেন?

ঃ নৌকা বোঝাই করে দিয়েছি।

ঃ হায়-হায়-হায়! কি সর্বনাশ করেছেন আপনি জাঁহাপনা? ও সব ধনরত্ন তো আর জীবনেও পাবেন না।

ঃ পাবো না মানে?

ঃ আমার মাতুলদের জাঁহাপনা যে আজও চিনতে পারেননি, তা দেখে আমি তাজ্জব হচ্ছি। তাঁরা তো এইটেই চেয়েছিলেন। যত অঘটন ঘটিয়েছেন তাঁরা, যত ষড়যন্ত্র করেছেন, তার সব কিছুর মূলে ছিল তাদের এই সম্পদের লালসা!

ঃ কি রকম?

ঃ জাঁহাপনার তাবড় তাবড় আমির উমরাহদের উসকে দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত আমার ঐ মাতুলেরা যে কত ষড়যন্ত্র পাকিয়েছেন, তার হিসাব নিকাশ নেই। আমির উমরাহরা চেয়েছেন বড় পদে যেতে আর আমার মাতুলেরা চেয়েছেন তাঁদের কাঁধে চড়ে আখের গুছিয়ে নিতে। তাঁরা পদ চাননি, চেয়েছেন সম্পদ। অঢেল সম্পদ। প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করে নিজেরাই যাতে ভবিষ্যতে রাজা জমিদার হতে পারেন, এই ছিল একমাত্র লক্ষ্য তাঁদের। তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষা জাঁহাপনা নিজের হাতে এমন আশাতীতভাবে পূরণ করে দিয়েছেন?

ঃ শিপ্রাদেবী!

ঃ আমার ঐ মাতুলদের আর ইহজনমে খুঁজে পাবেন না জনাব। যা তাঁরা চেয়েছিলেন, তার চেয়ে এত বেশী যখন অনায়াসে হাতে পেয়ে গেছেন, তখন তাঁরা আর কখনোও ফিরে আসবেন না।

ঃ সেকি! পালিয়ে যাবেন তাঁরা?

ঃ কেন যাবেন না জাঁহাপনা? যত ধনরত্ন আর অর্থকড়ি ওঁদের হাতে পড়েছে শুনছি, তাতে বারো ভূতে লুটেপুটে খাওয়ার পরও যেটুকু থাকবে, তা দিয়ে ওঁরা নিজেরাই এখন অনায়াসে রাজত্ব কিনতে পারবেন। জামিদার নয়, নিজেরাই এখন রাজা মহারাজা বনে

যেতে পারবেন। এ অবস্থায় ধনরত্ন ফিরিয়ে দিয়ে জনাবের গোলামি করতে আর তাঁরা কোন দুঃখে আসবেন জনাব?

ঃ বলেন কি! এতবড় চোর আর প্রতারক ভাবেন ওঁদের?

ঃ এত বড়ই ভাবি। কারণ, আমি ওঁদের নাড়িনক্ষত্র চিনি।

ঃ শিপ্রাদেবী।

ঃ ধন সম্পদের সাথে কি তিনি তার পরিবার পরিজনও নিয়ে গেছেন, না তাঁরা জাঁহাপনার কব্জার মধ্যেই আছেন?

ঃ মানে?

ঃ আমার বড় মামা বসন্ত রায় আর তাঁর স্ত্রী পরিজন, ছোট মামা শ্রীহরি রায়ের স্ত্রী আর ছেলে গোপীনাথ—এদের সবাকে কি ছোট মামা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, না তারা এখনও জনাবের হাতের মধ্যেই আছেন?

ঃ না, তাদের সবাইকে তিনি সঙ্গে নিয়েই গেছেন?

ঃ ব্যস্! তাহলে আর কথা নেই জাঁহাপনা। সর্বনাশটা সাকুল্যেই শেষ হয়েছে।

ঃ তা-মানে—

ঃ যদি ভগবান জনাবকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে একদিন তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন, ওঁরা এখন কোন না কোন স্থানের রাজা বা মহারাজা।

ঃ চুরি করা অর্থ দিয়ে রাজা মহারাজা? লড়াই করে রাজ্যলাভে গৌরব আছে, বাহাদুরি আছে। এতে কোন গৌরব আছে?

ঃ লক্ষ্যই যাদের অসৎ, তাদের কাছে কি জাঁহাপনা নীতিজ্ঞান আশা করেন?

ঃ না-না শিপ্রাদেবী। অতীত ক্রোধের বশেই আপনি তাঁদের এতো ছোট করে দেখছেন। হতে পারেন তাঁরা কিছু অসৎ, অর্থকড়ির কিছুটা গরমিলও করতে পারেন, কিন্তু এমনভাবে তাঁরা আমাকে একেবারেই পথে বসিয়ে দেবেন, এটা কখনও ভাবতে পারিনে।

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ মানুষকে কখনও এত ছোট ভাবা ঠিক নয়।

ঃ তাজ্জব! জাঁহাপনা এখনও ওঁদের উপর এত ভরসা রাখেন?

সুলতান দাউদ খান অসহায় কণ্ঠে বললেন—রাখি রাখি, না রাখলে আমি যে পাগল হয়ে যাবো শিপ্রাদেবী। ভরসা আমাকে রাখতেই হবে।

ঃ জাঁহাপনা।

ঃ এসব কথা থাক। নিশ্চয়ই তাঁরা এসে পড়বেন। ওসব কথা বলে আমাকে কমজোর করে দেবেন না।

সুলতাননের চোখ-মুখ কালো হয়ে গেল। হতাশার নিদারুণ যন্ত্রণা তাঁর মুখমণ্ডলে

বইঘর.কম ও রোকন
স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শিপ্রাদেবী অনুভব করলেন, এই অপ্রিয় সত্য নিয়ে আর বেশি এগুলে তিনি বিকারগ্রস্ত হবেন বা অতিশয় কষ্ট পাবেন। তাই, সুলতানের দুশ্চিন্তা হালকা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে শিপ্রাদেবী বললেন—তা অবশ্য ঠিক জনাব.। মানুষের মনের খবর তো বলা যায় না। দেশের এই দুর্দিন দেখে আসতেও তাঁরা পারেন বৈকি?

সুলতানের মুখমন্ডলে এক ঝলক রক্ত ছুটে এলো। আশান্বিত হয়ে তিনি বললেন—তবে?

ঃ আমি আমার ধারণার কথা বললাম জনাব।

ঃ আসবেন-আসবেন। ঠিক একদিন্‌ এসে যাবেন। সুলতানকে এত না-উম্মিদ হলে চলবে কেন?

ঃ জি জাঁহাপনা। ভগবান যেন তাই করেন।

ইতিমধ্যে মেহমানদারির আহ্বান এলো। শিপ্রাদেবী বললেন—যান জাঁহাপনা, আগে দাওয়াত কবুল করে আসুন। আমি এখানেই আছি। জাঁহাপনাকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে আমি যাবো না।

সুলতান দাউদ খান উঠে গেলেন এবং খানাপিনা শেষ করে উস্তাদজির সাথে সাথে তিনি আবার উস্তাদজির কক্ষে ফিরে এলেন। সুলতানকে আবার শিপ্রার কক্ষে পৌছে দিয়ে মাসুম গজনবীও অন্যান্যদের সহকারে উস্তাদজি নিজে এবার আহার করতে গেলেন।

আহার অন্তে সুলতান যখন শিপ্রার কক্ষে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে অনেকখানি প্রফুল্ল ও দুশ্চিন্তামুক্ত দেখাচ্ছিল। শিপ্রাদেবী এবার ফাঁক পেয়ে বললেন—জাঁহাপনা, অনেক কথাই হলো, কিন্তু জাঁহাপনার ব্যক্তিগত কোন কথাই শোনা হলো না আমার।

সুলতান ঈষৎ বিস্ময়ে বললেন—আমার ব্যক্তিগত কথা! শিপ্রাদেবী বললেন—কসুর না নিলে আমি ঐ দৌলতজাহান বহিনের কথা জানতে চাইতাম। তাঁর সম্বন্ধে যে গুজব রটেছিল তা কি সত্যি?

সুলতানের মুখমণ্ডলে আবার বেদনার ছায়া ঘনীভূত হলো। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—গুজব মানে তাঁর ঐ পিতৃ পরিচয়?

ঃ জি জাঁহাপনা, জি।

ঃ না সত্যি নয়। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের একজন অতিশয় নামজাদা ব্যক্তির কন্যা। জন্ম তাঁর শুধু পবিত্রই নয়, গৌরবমণ্ডিত।

শিপ্রাদেবী উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন—তাই নাকি জাঁহাপনা! ওহ্! কি আনন্দ সংবাদ!

ঃ আনন্দ সংবাদ?

ঃ জি জনাব। জনাবের প্রতি তাঁর গভীর মুহাব্বতের কথা আমি তাণ্ডা ছেড়ে আসার আগে জেনে এসেছি। তাহলে কি তাঁর সাথে জনাবের—

ঃ না। তাঁর সাথে আর আমার দেখা সাক্ষাতই নেই। অবিরাম তালাশ করেও তাঁর কোন সন্ধানই আর পাইনি।

শিপ্রাদেবী চমকে উঠে বললেন—সেকি!

ঃ সেই যে অভিমান করে কোথায় চলে গেলেন, আর তাঁকে খুঁজে আমি পেলাম না। কত যে সন্ধান করেছি আর করছি তা সঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়

ঃ তাজ্জব! তাহলে কি তিনি অন্য কোন সিদ্ধান্ত—মানে জাঁহাপনার প্রতি তাঁর এত মুহাব্বত সবই কি তিনি বরবাদ করে দিয়েছেন?

সুলতান আরো করুণ কণ্ঠে বললেন—তা যদি দিতেন, তবু আমি একটা সান্তনা খুঁজে পেতাম। কিন্তু তাও তিনি দেননি। অন্যের কাছে লেখা তাঁর এক পত্রের মারফত জানলাম, অভিমানিনী এই নিষ্ঠুরের প্রতি আজও তাঁর মুহাব্বত তামামই ধরে রেখেছেন। সেই মুহাব্বাত তাঁর একটুও খোয়া যায়নি।

ঃ জাঁহাপনা।

ঃ আর সেই জন্যেই আমার যত বেদনা। নিজেও তিনি মরছেন, আমাকেও মারছেন।

ঃ সে কি জাঁহাপনা!

ঃ আমাদের নসীবও ঐ আপনার মতোই শিপ্রাদেবী। জীবনের স্বাদভোগ আমাদেরও কারো নসীবে নেই। ঐ যে তখন বললাম, কত সুষমা অলক্ষ্যে ঝড়ে যায়? আমাদের জিন্দেগীর সুষমাও অলক্ষ্যেই ঝড়ে গেল।

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ রাজ্য যেতে বসেছে, এ বেদনা আমি সইতে পারতাম, যদি দীলটা আমার তাজা আর অক্ষত থাকতো। কিন্তু তিনি তার অভিমানের যাঁতাকলে আমার দীলটাও ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।

ঃ কি আশ্চর্য! এতটাই কঠিন হয়ে রইলেন তিনি?

ঃ এতটাই।

শিপ্রাদেবী আর কোন কথা খুঁজে পেলেন না। সুলতানের অবস্থা দেখে বুঝলেন, কি এক নির্মম দহনে দগ্ধ হচ্ছেন তিনি! আবার কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব হয়ে রইলেন। এরপর সুলতান অনুনয়ের সুরে বললেন—বহিন, একটা অনুরোধ রাখবেন আমার?

শিপ্রাদেবী আঁতকে উঠে বললেন—অনুরোধ কেন বলছেন জনাব, আদেশ করুন!

ঃ একটা গান শোনাবেন আমাকে?

পুনরায় চমকে উঠে শিপ্রাদেবী বললেন—জাঁহাপনা!

ঃ একদিন আপনি আমাকে গান শোনানোর জন্যে অনেক আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্ত সেদিন আমি সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারিনি। আজ আমি আপনাকে অনুরোধ করছি বহিন, আজ কি আপনি আমাকে একটা গান শোনাতে পারেন না?

বইঘর.কম ও রোকন

শিপ্রাদেবী বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—জাঁহাপনা আমার গান শুনবেন! একি সত্যি জাঁহাপনা?

ঃ এতে যদি বহিন কোন তকলিফ বোধ না করেন।

ঃ তকলিফ! একি বলছেন জাঁহাপনা? এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই।

ঃ বহিন।

ঃ আমার তামাম গ্লানির এ যে এক মহান মুক্তি-আহ্বান। মেহেরবানি করে বলুন জাঁহাপনা, কোন ধরনের গান গাইবো আমি? কি গান আজ জাঁহাপনা আমার কাছে শুনতে চান?

ঃ আপনার মনে পড়ে, ঐ যে সেবার ঐ ঘোড়দৌড়ের ময়দানে দর্শক ছাউনিতে বসে জুনায়েদ খান ভাই সাহেবদের যে গানটি আপনি শুনাচ্ছিলেন, মানে ঐ যে —"কেয়া তেরী পেয়ার, আওর কেয়া এন্তেজার, ও বেদীল মেহবুবা....?" পারলে ঐ গানটি বহিন।

শিপ্রাদেবী সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র হাতে তুলে নিলেন এবং বঞ্চিত জিন্দেগীর তামাম দরদ ঢেলে গান ধরলেন—"কেয়া তেরী পেয়ার আওর কেয়া এন্তেজার...."

শিপ্রাদেবী তন্ময় হয়ে গাইতে লাগলেন। সুলতান দাউদ খান মুহূর্তেই বিমোহিত হয়ে গানের মধ্যে ডুবে গেলেন। গানটির সুর আর বক্তব্য এমনই ছিল যেন, সুলতান দাউদ খানেরই হৃদয়ের তামাম কথা, তামাম ফরিয়াদ আর তামাম বেদনা ঐ গানের মধ্যে দিয়ে উৎসারিত হচ্ছে।

একটানা অনেকক্ষণ গাওয়ার পর শিপ্রাদেবী গান যখন শেষ করলেন, তখন তিনি দেখলেন, সুলতান প্রায় সংজ্ঞাহীন। বিগলিত আকারে তাঁর দুই চোখ থেকে ঝড়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা বেদনাপিণ্ড!

পনের

সুলতান দাউদ খান কাররানী তাঁর অমাত্য শ্রীহরি রায়কে বুদ্ধির জন্যে বিক্রমাদিত্য উপাধি দিয়েছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজা কিংবদন্তির বিক্রমাদিত্যের অসাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল। তিনি ছিলেন সৎ ও মহৎ ব্যক্তি। ছল-চাতুরি করার মতো হীন বুদ্ধি তাঁর ছিল, এ কথা ইতিহাস বলে না। তা থাকলেও সুলতান দাউদ খানের বিক্রমাদিত্য শ্রীহরি রায়ের কাছে বেচারা কিংবদন্তির বিক্রমাদিত্য জব্বোর মার খেতেন। কিংবদন্তির বিক্রমাদিত্যের জ্ঞান-বুদ্ধি ও পরাক্রম—সব কিছুর পেছনেই নাকি তাল ও বেতাল নামক দুই টি অশরীরী নওকর ছিল। কিন্তু সুলতান দাউদ খানের বিক্রমাদিত্যের পেছনে কয়েকজন গিদ্ধড় জাতের গাদ্দার ছাড়া কোন অদৃশ্য শক্তি ছিল না। তবু সুলতানের বিক্রমাদিত্য শ্রীহরি রায়ের বেধড়ক প্রতারণা ও নির্লজ্জ মিথ্যাচারের কৌশল ও রুচি একেবারেই

অনন্য। কোন অদৃশ্য শক্তি ছাড়াই নিছক বেঈমানীর ব্যবসা তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে চালিয়ে গেছেন এবং সে ব্যবসায় তাঁর লাভ আজ পর্বতপ্রমাণ।

সুলতান দাউদ খানের ধনরত্ন দাউদ খানকে ফেরত দেয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীহরি রায় এত দৌড়ঝাঁপ করে সেগুলো নৌকা-বোঝাই করেন নি। পুণ্য প্রাপ্তির এত সাধ এই রায়বাবুদের ছিল না। সম্পদ প্রাপ্তির সাধনাই বসন্ত রায় ও শ্রীহরি ওরফে শ্রীধর রায়—এই দুই ভাই জীবনভর করেছেন। বাঙ্গালার ধন সম্পদের যতটা সম্ভব, নানাচ্ছলে দিনে দিনে ঝোলায় তুলতে চেয়েছেন। মনস্কামনা তাঁদের পরিপূর্ণ হয়েছে। তকলিফ করে দিনে দিনে ঝোলায় তুলতে হয়নি। যা তাঁরা চেয়েছেন তার চেয়ে হাজারগুণে জিয়াদা ছাপ্পড় ফেঁড়ে পাওয়ার মতো বিনাশ্রমেই পেয়ে গেছেন। সে সম্পদ ফেরত দেবেন এতটাই কি বেয়াকুফ তাঁরা?

ধন-সম্পদ ফেরত তারা দিলেন না। ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ নিয়ে শ্রীহরি রায় পালিয়ে গেলেন। সুলতান দাউদ খানের ছায়া-ছাউনি এড়িয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন সুন্দরবনের অরণ্যে। কিন্তু নিরাপদ স্থানে এসেও তাঁরা এত সম্পদ নিয়ে নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগলেন। একদিকে দাউদ খান ও অন্যদিকে দিল্লীর ফৌজ। হঠাৎ কারো হাতে পড়লে, নিজ বলে তাঁরা ঠেকাতে কাউকে পারবেন না। ধনে-প্রাণে মারা পড়বেন। তারা ভেবে দেখলেন, কোন বড় শক্তির ছত্রছায়ায় না থাকলে এত সম্পদ তাঁরা নিশ্চিন্তে হজম করতে পারবেন না বা এ সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এই অঢেল সম্পদের যতটা খরচ হয় হোক, একটা বড় শক্তির আশ্রয়ে আসতেই হবে তাঁদের। দাউদ খানের আশ্রয়ের প্রশ্নই কিছু উঠে না। একমাত্র ও নিশ্চিন্তভাবে লাভজনক আশ্রয়স্থল দিল্লীর শক্তি। এই শক্তির ছত্রছায়ায় থাকলে দুহাতে অর্থ ঢেলে রাজ্য-মুকুট-আধিপত্য—সব তাঁরা গুছিয়ে নিতে পারবেন। সর্বোপরি, তাঁদের স্বজাতীয় উমরাহদের প্রতিপত্তিই এখন দিল্লীর দরবারে তুঙ্গে। এই উমরাহদের মতো তাঁদের জাতির বান্ধব এখন এই হিন্দুস্তানে দুসরা আর কেউ নেই। রাজা তোডরমল এখন তাণ্ডাতেই আছেন, শ্রীহরি রায় এ সংবাদ জানেন। তাই উপঢৌকন স্বরূপ লোভনীয় মণিমুক্তা হাতে নিয়ে এসে শ্রীহরি রায় রাজা তোডরমলের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করলেন।

একে স্বজাতি তার উপর এই চোখ ধাঁধানো ভেট্। রাজা তোডরমল মহানন্দে শ্রীহরিকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে হেফাজত করার আশ্বাস দিলেন। শ্রীহরির এই করিতকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে তোডরমল বললেন—আপনারা যা করেছেন, এর তারিফ করার ভাষা নেই। এটা জানতে পারলে দিল্লীর বাদশাহ নিজের টানেই আপনাদের হিত সাধনে উন্মুখ হয়ে উঠবেন। এ সংবাদে আপনাদের উপর যে

বইঘর.কম ও রোকন
তিনি কত খুশি হবেন তা এই মুহূর্তে অনুমান করতে পারবেন না। এর উপর ফের আমি যদি আপনাদের হয়ে সুপারিশ করি, জমিদারি কি বলছেন, নামমাত্র খরচে বিশাল এক রাজত্বই আপনারা হাসিল করতে সক্ষম হবেন।

গদ গদ কণ্ঠে শ্রীহরি রায় বললেন—প্রভু বড় দয়াময়। বাদশাহর দয়া পেলে তা হবে উপরি পাওনা। কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহটাই মূল কামনা আমাদের।

ঃ আমার অনুগ্রহের অভাব কিছু ঘটবে না। বদ খেয়ালে যদি ঐ সম্পদগুলো আপনারা বাঙ্গালার সুলতানকে ফেরত দিয়ে না বসেন, তাহলে শুধু আমি কেন, খোদ বাদশাহ থেকে শুরু করে দিল্লীর হুকুমাতের প্রতিটি কর্মকর্তা আপনাদের সবাইকে মাথায় করে রাখবেন।

ঃ জান গলেও ওসব আমরা আর ফেরত কখনও দেই প্রভু?

ঃ কখখনো দেবেন না। বাঙ্গালার সুলতান সম্পদহীন হলে, দিল্লীর ফৌজের বাঙ্গালা বিজয় জলের মতো সহজ হয়ে যাবে। আর এতে করে বাদশাহর কাছে আপনাদের কত কদর বাড়বে, জানেন? গোটা বাঙ্গালা মুলুক দিল্লীর ফৌজ লড়াই করে জয় করলেও, এর সিংহভাগ তারিফের হকদার একমাত্র আপনারাই হবেন।

ঃ সবই প্রভুর সুনজর আর ভগবানের কৃপা। কিন্তু একটা ভয়ের চিন্তা যে থেকেই যাচ্ছে প্রভু?

ঃ কি রকম?

ঃ ভগবান না করুন, কোন কারণে বাঙ্গালা বিজয়ে অসমর্থ হয়ে প্রভুরা যদি দিল্লীতে ফেরত যান, তখন আমাদের কি দশা হবে প্রভু?

ঃ কোন ভয় নেই। আমি তো আগেই বলেছি, আপনাদের হেফাজত করার দায়দায়িত্ব আমি নিলাম। তেমন অবস্থা ঘটার আর কোন সম্ভাবনাই নেই। তবু যদি ঘটে, আপনাদের আমি ফেলে যাবো না। সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো।

ঃ প্রভু!

ঃ এই বিপুল সম্পদ হাতে থাকলে, ওখানেও আপনারা রাজা না হন, এক সুবিশাল জমিদারির মালিক হতে পারবেন। সেই সাথে দরবারেও উচ্চ আসন দখল করতে পারবেন।

ঃ প্রভু কৃপাময়!

ঃ সব ব্যবস্থা আমিই করে দেবো।

ঃ প্রভুর করুণার অন্ত নেই। প্রভুর জয় হোক!

ঃ ওখানে থাকলে দেখবেন, কেমন এক নিশ্চিন্ত পরিবেশে বাস করছেন আপনারা। বাদশাহ মুসলমান হলেও পরিবেশটা বিলকুল হিন্দুয়ানী। বাঙ্গালার মতো এই কট্টোর

বইঘর.কম ও রোকন
মুসলমানদের মধ্যে এমন জড়সড় হয়ে চলার কোন বালাই ওখানে নেই। হিন্দুয়ানী চাল-চলন নিয়ে গা মেলে ওখানে বিচরণ করতে পারবেন।

গড় হয়ে প্রণাম করে শ্রীহরি রায় বিদায় নিলেন এবং ফিরে এসে ধন সম্পদ সহকারে সুন্দরবনের আরো গভীরে চলে গেলেন।

০ ০ www.boighar.com ০

হা-অর্থ হা-অর্থ করে বাঙ্গালার সুলতান দাউদ খান কাররানী সেই থেকে কেবলই বুক ফাটিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় রিক্তহস্তে কি করে তিনি দিল্লীর ফৌজকে ঠেকাবেন, এটা ভেবে কেবলই দিশেহারা হচ্ছেন। চিন্তা করে কোন কুলকিনারা পাচ্ছেন না।

এদিকে দিল্লীর সালার মুনিম খান সাময়িকভাবে হলেও তাণ্ডা ও তার আশেপাশে নিজেকে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। কিছুটা মজবুত হয়ে বসার পর মুনিম খান এবার উড়িষ্যার দিকে নজর দিলেন এবং দাউদ খানের বিরুদ্ধে কয়েকজন অন্যান্য সালার সহ রাজা তোডরমলকে সসৈন্যে প্রেরণ করলেন। তোডরমল সদলবলে এসে গড় মন্দারণে হানা দিলেন। মন্দারণ দুর্গ তখন অনেকটা মজবুত করা ছিল। তোডরমল চেষ্টা করেও মন্দারণের প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেদ করতে পারলেন না। বরং নিজেরাই অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে তিনি মুনিম খানের কাছে আরো ফৌজ প্রার্থনা করলেন। তোডরমলের আবেদনে মুনিম খান মুজাফফর খান মোঘল, মুহম্মদ কুলি বারলাস ও আরো দুইজন সেনাপতির অধীনে আরো একটা বাহিনী তোডরমলের সাহায্যার্থে পাঠালেন। এই মিলিত শক্তির আক্রমণ মন্দারণের ক্ষুদ্র শক্তি আর সামাল দিতে পারলো না। তারা পরাস্ত হয়ে সুলতান দাউদ খানের কাছে কটকে চলে এলো। গড় মন্দারণ দখল করে দিল্লীর ফৌজ সেখানে শক্ত হয়ে বসলো।

উড়িষ্যার দিকে দিল্লীর ফৌজের অভিযানের খবর সুলতান দাউদ খান শুরুতেই পেয়েছিলেন। খবর পাওয়ার পরই তিনি শক্ত হয়ে গেলেন। শ্রীহরির উদ্দেশ্যে আর হা-হুতাশ না করে তখন তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিলেন। উড়িষ্যা রাজ্য তখনও তাঁর অধীনেই ছিল। সেই রাজ্যের রাজস্ব সহ অল্প কিছু সম্পদ যা উড়িষ্যার সদর দপ্তরে জমা ছিলো, সেগুলোতে হাত দিলেন। সেই সাথে জেনানাদের জেওর বেচে আবার তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফেললেন। এই অর্থের কিয়দংশ বিভিন্ন স্থানের সালারদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তাদের জানালেন, দেশপ্রেমে সেপাইদের উদ্বুদ্ধ করে এই অর্থ দিয়েই তাঁদের জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে। অচিরে কোন অর্থ পাঠানো সুলতানের পক্ষে সম্ভবপর হবে না।

অতঃপর অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তিনি তড়িৎ গতিতে বেশ কিছু নয়া সৈন্য ও সমরাস্ত্র সংগ্রহ করলেন এবং সাবেক সেপাইদের মাহিনা আংশিক পরিশোধ করে আবার তাদের একত্র করে নিলেন। সুলতান ও সালারদের আন্তরিক চেষ্টায় নতুন পুরাতন মিলে সুলতানের অধীনে আবার যে বাহিনী তৈরি হলো, সুবিশাল না হলেও নগণ্য তা ছিল

না। তদুপরি, দিল্লীর ফৌজকে চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করার পর সকলের সব পাওনা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেয়ার আশ্বাসের সাথে এই বাহিনীকে তাঁরা ঈমানের বলে ও দেশপ্রেমে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন যে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও দিল্লীর ফৌজের মোকাবেলায় এই বাহিনী কোন দিক দিয়ে কমজোর আর রইলো না।

দাউদ খান কাররানী যখন এইভাবে তৈরি হতে লাগলেন, তখন রাজা তোডরমল মন্দারণ থেকে অকস্মাৎ সংবাদ পেলেন, জুনায়েদ খান কাররানী একদল সৈন্য সহ দিল্লী থেকে বিহারে এসে দিল্লীর ফৌজের বিরুদ্ধে আতংক পয়দা করেছেন এবং সেখানের দিল্লীর ফৌজকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তিনি দুর্বার বেগে সপ্তগ্রাম লক্ষ্য করে ছুটে আসছেন।

জুনায়েদ খান কাররানী একজন শুধু দুর্ধর্ষ লড়াইয়াই নন, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও দেশভক্ত ব্যক্তি। নিরুপায় হয়ে আকবর শাহর অধীনে হিন্দাউনের জায়গীর কবুল করলেও, অধীনতাকে কিছুতেই তিনি ধাতস্থ করতে পারলেন না। আকবর শাহর সাথে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হলো। ফলে, জুনায়েদ খান গুজরাটের বিদ্রোহীদের সাথে মিলিত হলেন এবং আকবর শাহর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। কিন্তু গুজরাটের পতন তখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এই শেষ সময়ে গিয়ে জুনায়েদ খান সুবিধে করতে পারলেন না। গুজরাটের পতন ঘটলে তিনি তাঁর ফৌজ নিয়ে পুব অঞ্চলে চলে এলেন এবং বাঙ্গালার পক্ষ হয়ে দিল্লীর ফৌজের বিরুদ্ধে বিহারের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। দিল্লীর ঘাঁটি তছনছ করে অর্থ সংগ্রহ করত তিনি তাঁর ফৌজকে মজবুত করে নিলেন এবং বিহারে দিল্লীর ফৌজকে তটস্থ করে তুলে দাউদ খানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অভিপ্রায়ে সপ্তগ্রামের দিকে ছুটে আসতে লাগলেন।

তোডরমল নিজে জুনায়েদ খানের সামনে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে গেলেন না। এই সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর দুইজন উঁচুদরের সালারকে জুনায়েদ খানকে রোধ করতে পাঠালেন। লড়াইয়ে জুনায়েদ খান সে বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং বাহিনীর দলপতিকে হত্যা করলেন। খবর শুনেই আঁতকে উঠলেন তোডরমল। সামনে জুনায়েদ খান, পেছনে দাউদ খান। দুই দিক থেকে দুইজন এখন এক সাথে চাপ সৃষ্টি করলে, আত্মরক্ষার পথ তাঁর রুদ্ধ।

কিন্তু নসীবটা বরাবরই দিল্লীর ফৌজের পক্ষে ছিল। দিল্লীর ফৌজকে তাড়িয়ে নিয়ে ঝাড়খণ্ডে এসেই জুনায়েদ খান সিদ্ধান্ত বদল করলেন। এখানে দিল্লীর ফৌজকে হামলা করে সময় ও সৈন্য নষ্ট করার চেয়ে এবং দাউদ খানের সাথে মিলিত হয়ে উড়িষ্যা হেফাজত করার চেয়ে, সালার কালাপাহাড়ের সাথে মিলিত হয়ে বাঙ্গালার রাজধানী তাণ্ডা উদ্ধার করাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। ফলে ঝাড়খণ্ড থেকেই তিনি আবার ঘোড়াঘাট লক্ষ করে উত্তর পূর্ব দিকে সসৈন্যে ছুটলেন।

তোডরমলের দুশ্চিন্তা দূর হলো। জুনায়েদ খান যদি এই সময় দাউদ খানের সাথে এক যোগে দিল্লীর ফৌজের বিরুদ্ধে লড়তেন তাহলে দিল্লীর ফৌজের এই উড়িষ্যামুখী

অভিযানের করুণ পরিণতি ঘটতে পারতো। কিন্তু জুনায়েদ খান তা লড়লেন না। বাঙ্গালার ফৌজের এই বিচ্ছিন্ন আর বিভিন্নমুখী হামলায় দিল্লীর ফৌজের বাঙ্গালা দখল যেমন নড়বড়ে হয়ে রইলো, তেমনি আবার বাঙ্গালার এই খণ্ড খণ্ড শক্তিকে মোকাবেলার ক্ষেত্রে দিল্লীর ফৌজের অনেকটা সুবিধে হলো। জুনায়েদ খানের আতংক দূর হলে মুনিম খানের তাকিদে তোডরমল এবার উড়িষ্যার দিকে ধাবিত হলেন।

কিন্তু তোডরমল কুটবুদ্ধিতে যতটা পারদর্শী ছিলেন, লড়াইয়ের ব্যাপারে তার এক চুতর্থাংশও ছিলেন না। অগ্রসর হয়ে বর্তমান মেদিনীপুর জেলাতক্ এসেই দাউদ খানের দুর্বার প্রস্তুতির কথা শুনে আবার তিনি আঁতকে উঠলেন এবং ওখান থেকেই ফের মন্দারণে ফেরত এসে মুনিম খানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মুনিম খানও আবার একদল সৈন্যই প্রেরণ করলেন শুধু নিজে এগিয়ে এলেন না। সৈন্য সাহায্য পেয়ে তোডরমলও এগুনোর সাহস না করে গড়িমসি করতে লাগলেন। মূলত দাউদ খান কাররানী দিল্লীর সালারদের কাছে আগে থেকেই এক কিংবদন্তির আতংকরূপে পরিচিত থাকায়,ভীত না হলেও, তাঁর মুখোমুখি মোকাবেলা সকলেই এড়িয়ে যেতে চাইতেন এবং পারতপক্ষে অন্যকে এগিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন।

কিন্তু এগুতে হলো সবাইকেই। দাউদ খানের ফায়সালায় এত বিলম্ব হতে দেখে দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ গরম হয়ে উঠলেন। তিনি সরাসরি মুনিম খানকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। আকবর শাহর আদেশে মুনিম খান সসৈন্যে তাণ্ডা ত্যাগ করলেন এবং তোডরমলের সাথে মিলিত হয়ে উড়িষ্যার দিকে রওনা হলেন।

সুলতান দাউদ খান কাররানী ইতিমধ্যেই কটকে এক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। মুনিম খানের আগমন বার্তা পেয়েই পরিবার পরিজনদের দুর্গের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে তিনিও সসৈন্যে মুনিম খানের মোকাবেলায় রওনা হলেন। বর্তমান মেদিনীপুর জেলাভুক্ত তুকোরয় নামক স্থানে দুই দল মুখোমুখি হলো। শুরু হলো ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় যুদ্ধ।

দুইদলই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন। মুনিম খানের বাহিনীর মূল কাতারের কেন্দ্রস্থলে রইলেন মুনিম খান। তার ডাইনে রইলেন সালার শাহাম খান, বামে রইলেন রাজা তোডরমল। মূল কাতারের সামনে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে মুনিম খান পর পর আরো দুইটি কাতার খাড়া করলেন। অগ্রবর্তী কাতারের একেবারেই সামনেরটার পরিচালনায় রইলেন। দিল্লীর সালার আলম খান ও তার পেছন কাতারে রইলেন সালার কিয়া খান।

দাউদ খান কাররানীও ঐ একইভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন। তাঁর মূল কাতারের কেন্দ্রস্থলে তিনি নিজে রইলেন। তার ডাইনে রইলেন সালার সিকান্দর উযবেক ও বামে রইলেন সালার ইসমাইল খান আব্দুর। সৈন্যসংখ্যা কম থাকায় দাউদ খান অগ্রবর্তী

বইঘর.কম ও রোকন
বাহিনী হিসাবে অগ্রভাগে একটি কাতার দাঁড় করালেন। অগ্রবর্তী এই কাতারের সেনাপতি রইলেন বাঙ্গালার বাঘ গুজার খান।

শুরু হলো লড়াই। শুরু হওয়ার কিছু পরেই এ লড়াই প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হতে লাগলো। তবে গুজার খানের দুর্বার বিক্রমের মুখে দিল্লীর বাহিনীর যে পরিমাণ সৈন্যক্ষয় হতে লাগলো, সে তুলনায় বাঙ্গালার ক্ষয় গণ্যের মধ্যে এলো না। তবু প্রথম দিকে কেউ কাউকে পিছু হটাতে পারলো না। এই অবস্থা কিছুক্ষণ চলার পর বিপুল বিক্রমে গর্জে উঠলেন বাঙ্গালার শার্দুল গুজার খান। হস্তিবাহিনী নিয়ে তিনি অগ্রবর্তী দিল্লীর বাহিনীর উপর এমন দুরন্ত বেগে চড়াও হলেন যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই দিল্লীর বাহিনীর সামনের কাতার বিধ্বস্ত হয়ে গেল। সে কাতারের সালার আলম খানকে হত্যা করে গুজার খান এবার তাঁর পিছের কাতার কিয়া খানের বাহিনীকে হামলা করলেন। কিয়ৎকাল পরেই কিয়া খান আহত হয়ে কাতার ফেলে পলায়ন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুনিম খানের অগ্রবর্তী দ্বিতীয় কাতারও উড়ে গেল। গুজার খান এবার জানবাজী রেখে মুনিম খানের মূল কাতারের কেন্দ্রস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

গুজার খান যতই এগুতে লাগলেন, দাউদ খান তাঁর ডাইনে বাঁয়ের দুই সালার সহ মূল বাহিনী নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে এতক্ষণ গুজার খানকে আচ্ছাদন দিয়ে আসছিলেন। দিল্লীর ফৌজের সামনের দুই কাতার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে এবার দিল্লীর মূল বাহিনীর উপর সবাই এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দাউদ খান সুলতান। তাঁর সামলে চলা উচিত। মুহূর্তের জন্যে দাউদ খান একথা ভুলে গেলেন। লড়াইয়া দাউদ খান এবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন। সালার সিকান্দর উযবেক ও ইসমাইল খানকে দুই প্রান্তে পাঠিয়ে দিয়ে মুনিম খানের মূল কাতারের সর্বত্র উল্কার বেগে তিনি এমনভাবে ত্রাস সৃষ্টি করলেন যে দেখতে দেখতে সে মূল কাতার জীর্ণ হয়ে গেল। দুই প্রান্তের দুই দিল্লীর সালার তোডরমল ও শাহাম খান টিকতে না পেরে রণাঙ্গণ ত্যাগ করলেন। আটকা পড়লেন মুনিম খান। পিতৃবন্ধু ও সৎ ব্যক্তি হিসাবে মুনিম খানের প্রতি দাউদ খানের একটা অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছিল। তিনি সেদিকে না এগিয়ে মুনিম খানের জীর্ণ মূল কাতার আরো অধিক জীর্ণ করতে লাগলেন। মুনিম খানের সামনে এলেন গুজার খান।

গুজার খান মুনিম খানের মূল কাতারের কেন্দ্রস্থলেই ছিলেন। মূল কাতার ভেঙ্গে পড়তেই তিনি আরো সামনে এগিয়ে এলেন এবং মুনিম খান তাঁর সামনে পড়ে গেলেন। মুনিম খান তখন অসি কোষবদ্ধ করে একটি বেতের লাঠির সাহায্যে তাঁর পলায়নরত ফৌজকে ফেরানোর চেষ্টা করছিলেন। এই অবস্থায় গুজার খান মুনিম খানের সামনের সেপাইদের শুইয়ে দিয়ে তাঁর উপর এসে চড়াও হলেন ও আঘাত হানতে লাগলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ মুনিম খান তাঁর বেতের লাঠির সাহায্যে সে আঘাত ঠেকানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু এ চেষ্টা কোন কাজেই এলো না গুজার খানের অসির আঘাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেন। মৃত্যু তাঁর তখনই সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু তাঁর কয়েকজন

বইঘর.কম ও রোকন

বিশ্বস্ত সেপাই মরিয়া হয়ে এসে মুনিম খানের অশ্বের লাগাম ধরে প্রচণ্ড বেগে হেঁচকা এক টান মারলো। অশ্বটি চমকে উঠে ভীত সন্ত্রস্তভাবে রণস্থলের বাইরে দিকে ছুটে গেল। মুনিম খান মরতে মরতে বেঁচে গেলেন।

মুনিম খানের মূল কাতারও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দিল্লীর সেপাই সংখ্যায় এত অধিক ছিল যে মূল কাতার ভেঙে গেলে দিল্লীর ফৌজ যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে লড়াই করতে লাগলো তখন তুকোরয় থেকে প্রায় চার ক্রোশ পরিমাণ জায়গা দিল্লীর ফৌজে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এই বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ে বাঙ্গালার ফৌজ এত অধিক পরিমাণ দিল্লীর অর্থাৎ মুঘল ফৌজ মারলো যে, জায়গাটি সেই থেকে 'মুঘলমারী' নামে বাঙ্গালার মানচিত্রে অমর হয়ে রইলো। বাঙ্গালার ফৌজ আর একবার প্রমাণ করলো যে, হয় শহিদ নয় গাজী, এই নিয়াত নিয়ে শৃঙ্খলার সাথে লড়লে প্রতিপক্ষ সংখ্যায় যত অধিকই হোক না কেন, তা কোন গণ্যের বিষয়ই নয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও সুলতান দাউদ খান কাররানীর নসীব সুপ্রসন্ন হলো না। অর্থের অভাবই তাঁর নসিবের তামাম অনর্থ ঘটালো। পরাজিত হয়ে দিল্লীর ফৌজ রণস্থল থেকে পালিয়ে গেলে, তাদের ছাউনি ও অঢেল সম্পদ বাঙ্গালার ফৌজের সামনে উন্মুক্ত হয়ে রইলো। দিল্লীর এই বিশাল বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে এক মুনিম খানের ছাউনিতেই এত নগদ অর্থ ছিল যে, তার দশমাংশের এক অংশও এই সময় দাউদ খান কাররানীর কটকের ভাণ্ডারে ছিল না। মাসের পর মাস মাইনে না পেয়ে দাউদ খানের সেপাইরা দুর্বিষহ অর্থকষ্টে ছিল। এত অর্থ সামনে দেখে তারা আর স্থির থাকতে পারলো না। লড়াইয়ের ময়দান ছাপিয়ে তাদের অনাহারক্লীষ্ট বাল-বাচ্চাদের মুখ তাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠলো। মাথা তাদের বিগড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তারা সালারদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এলো এবং অসি কোষবদ্ধ করে উন্মত্তের মতো শত্রু ছাউনি লুট করতে প্রবৃত্ত হলো। অর্থের লোভে তারা তখন এত উন্মাদ হয়ে গেল যে, লুট করার কালে তারা নিজেদের মধ্যেই কলহ সৃষ্টি করলো এবং কাড়াকাড়ি করে লুট করতে লাগলো। প্রাণপণ করেও সুলতান দাউদ খান ও তাঁর সালারেরা এই উন্মত্ত সেপাইদের হুঁশ ফেরাতে পারলেন না বা তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেন না। অফুরন্ত সম্পদের যিনি মালিক তাঁর সেপাইরা পেটের দায়ে আওয়ারা হয়ে গেল। যুদ্ধে তাঁদের জয় হলেও দুশমনদের ধাওয়া করে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করা তখনও বাকি ছিল। এই সামান্য, সহজ আর শেষ কাজটুকু দাউদ খান আর সম্পন্ন করতে পারলেন না।

রণস্থল ত্যাগ করে পালালেও দিল্লীর ফৌজ তখনও অধিক দূরে যায়নি! বাঙ্গালার ফৌজের এই অবস্থা দেখেই পলায়নরত দিল্লীর সালারেরা ঘুরে দাঁড়ালেন এবং আবার তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁদের পলায়নরত বিচ্ছিন্ন সেপাইদের তাঁরা তড়িৎবেগে আবার একত্র করে নিলেন। বিপুল সংখ্যক দিল্লীর সেপাই নিহত হওয়ার পরও যে সেপাই সেনা তখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তা বাঙ্গালার সেপাইদের চেয়ে প্রায় দুই-আড়াই গুণ

বইঘর.কম ও রোকন
বেশি। এই বিপুল সংখ্যক সেপাইদের আবার একত্র করে নিয়ে দিল্লীর সালারেরা অকস্মাৎ এসে বাঙ্গালার ফৌজকে ঘিরে ফেললেন। যুদ্ধ করার মতো অবস্থা ও শৃঙ্খলা বাঙ্গালার ফৌজের মধ্যে তখন আদৌ আর ছিল না। তবু দিল্লীর বাহিনী ঘিরে ফেললে লুণ্ঠনরত বাঙ্গালার ফৌজ দিশেহারা অবস্থাতেই পুনরায় লড়ায় শুরু করলো। বাঙ্গালার সুলতান আর সালারেরা যথাসম্ভব তাদের আবার শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতে লাগলেন। বিশৃঙ্খল ফৌজ নিয়েই গুজার খান পুনরায় হুঙ্কার ছেড়ে দাঁড়ালেন। লড়াই আবার প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে লাগলো।

কিন্তু নসিব যার বিপক্ষে তার কোন চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয় না। লড়াই আবার তীব্র আকার ধারণ করতে না করতেই অকসস্মাৎ এক বিষাক্ত তীরবিদ্ধ হয়ে এই লড়াইয়ের মেরুদণ্ড গুজার খান অশ্ব থেকে পড়ে গেলেন এবং তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার কিয়ৎ পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। গুজার খানের মৃত্য সংবাদ বাঙ্গালার বাহিনীর মধ্যে জানা-জানি হয়ে যেতেই বাঙ্গালার বেসামাল সেপাইরা একদম হতাশ হয়ে গেল এবং জয়ের আশা শেষ ভেবে তারা চারদিকে পলায়ন শুরু করলো। সুলতান ও সালারেরা বিশৃঙ্খলার পর এই বিশৃঙ্খল সেপাইদের আর ফেরাতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তাঁরাও রণস্থল ত্যাগ করলেন। দিল্লীর ফৌজ তাদের শেষ কাজটি আর অসম্পন্ন রাখলেন না। দীর্ঘপথ পর্যন্ত বাঙ্গালার পলায়নরত সেপাইদের ধাওয়া করে তাদের মুণ্ডু দিয়ে দিল্লীর ফৌজ মিনার তৈরি করলো।

অল্প সংখ্যক সেপাই আর অবশিষ্ট সালারদের নিয়ে সুলতান দাউদ খান কটকে ফিরে এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন। জয়ী হওয়ার পরও যে এইভাবে পরাজয় আসে মানুষের, জীবনে এই প্রথম তিনি এ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেও দিল্লীর ফৌজের বক্ষাপাজর দীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গুজার খানের আঘাতে সালার মুনিম খান তখনও শয্যায় শুয়ে মউতের সাথে বোঝাপড়া করছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে দাউদ খানের মোকাবিলায় উড়িষ্যায় আসার আর সামর্থ্য তাদের ছিল না। তুকোরয়ে বসে বসে তারা ঘা শুকাতে লাগলো।

কটকে ফিরে আসার পরে পরেই দাউদ খান আবার দুশমনদের মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে গেলেন। কিন্তু নিদারুণ অর্থ সংকটের দরুন তেমন কোন শক্তিশালী বাহিনী আর তিনি তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে পারলেন না। ফলে, অবকাশ নেওয়ার প্রয়োজনে সুলতান দাউদ খান মুনিম খানের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন।

অবকাশ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল মুনিম খানেরও। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেও তখনও তিনি দুর্বল। ওদিকে আবার কালাপাহাড়, জুনায়েদ খান ও অন্যান্যদের চাপে তাণ্ডায় দিল্লীর ফৌজের অধিকার বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাণ্ডায় তাঁর অতি সত্বর ফিরে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। দাউদ খানের সন্ধির প্রস্তাব মুনিম খানও লুফে নিলেন।

মুনিম খানের শিবিরেই সন্ধির বৈঠক বসলো। সুলতান দাউদ খান কাররানীকে

খান-ই-খানান মুনিম খান বীরোচিত ও রাজকীয় সংবর্ধনার মাধ্যমে গ্রহণ করলেন এবং দাউদ খানের অসাধারণ বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অতঃপর লড়াই বন্ধের কথা উঠলে দাউদ খানকে পুত্রস্নেহে পাশে বসিয়ে মুনিম খান বললেন, বন্ধুবর সোলায়মান খান কাররানীর এই তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুত্রের সাথে পুনঃ পুনঃ রণলিপ্ত হতে তিনি মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্টবোধ করেন। তাই তাঁরও ঐকান্তিক কামনা, এ লড়াই বন্ধ হোক।

সন্ধির শর্ত হিসাবে তিনি প্রস্তাব দিলেন, যেহেতু দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ বাঙ্গালা মুলুক জয় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেইহেতু বাঙ্গালা ও বিহার দিল্লীর বাদশাহকে ছেড়ে দিয়ে দাউদ খান যদি শুধু উড়িষ্যা রাজ্য নিয়ে তৃপ্ত থাকেন, একমাত্র তাহলেই এ লড়াই বন্ধ হওয়া সম্ভব।

দাউদ খান প্রথমে এ শর্ত মেনে নিতে অসম্মতি জানালেন। অখণ্ড বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রশ্নে দিল্লীর বাদশাহর সাথে তাঁর কোন আপস নেই, এই মর্মে তিনি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। এ প্রেক্ষিতে মুনিম খান কিছুটা অনুনয় করে বললেন যে, কোন সন্ধিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে তা আবার উলট-পালট হয়ে যায়। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি এখন উপস্থিত। আর না হোক, তাঁর জীবদ্দশা-কালতক্ বা যতক্ষণ তিনি এই রঙ্গমঞ্চে আছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সন্ধি মেনে চললে তাঁকে আর এই অপ্রিয় লড়াইয়ে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হতে হয় না। সুলতান এ শর্ত মেনে নিলে তাঁর ফৌজও সুলতানের বিরুদ্ধে আর লড়াই করতে আসবে না।

দাউদ খানও দেখলেন, আকবর শাহকে থামিয়ে রাখতে হলে এ ত্যাগ তাঁকে আপাতত স্বীকার করতেই হবে। সময় এখন বড়ই তাঁর প্রয়োজন। তার উপর এ সন্ধি তিনি অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুনিম খান সাহেবের সাথে করেছেন, আকবর শাহর সাথে নয়। মুনিম খানের অভাবে এ সন্ধি মেনে চলার নৈতিক দায়িত্ব তাঁর তেমন থাকছে না। এসব কথা ভেবে-চিন্তে সুলতান দাউদ খান অবশেষে রাজি হলেন। অনেকটা ব্যক্তিগত চুক্তি হিসাবেই এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। সন্ধির শর্ত মোতাবেক বাঙ্গালা ও বিহার মুলুক দিল্লীর বাদশাহ পেলেন। একমাত্র উড়িষ্যা রাজ্য নিয়েই সুলতান দাউদ খান আপাতত তৃপ্ত রইলেন।

০ ০ ০

লড়াইয়ের হুটপিট এক্ষণে আর নেই। সাঁতারের উপর পানিও আর দাউদ খানের নেই। এখন তাঁর ক্ষণিক বিরতি। পেছনের হতাশা আর সামনের আশা নিয়ে দীর্ঘপথের মাঝখানে তিনি এখন ক্ষণকাল এক থমকে দাঁড়ানো পান্থ। প্রচণ্ড ঝড়ের পর হুমড়ি-খাওয়া কুঁড়ের পাশে নীরব এক গৃহস্বামী, ছেঁড়াপাল-ভাঙাহালের অর্নবতরীতে তিনি এখন নিস্তব্ধ এক নাবিক। নবোদ্যামে যাত্রা শুরু করার আগে তিনি এখন ক্ষণকাল স্থবির।

বইঘর.কম ও রোকন

এ অবস্থার অনুভূতি প্রকাশের বাইরে। এতে না আছে তৃপ্তি না আছে তিক্ততা, না আছে স্বস্তি না আছে অস্থিরতা, না আছে আরাম না আছে ক্লেশবোধ। সুখ দুঃখের অতীত এ এক কেবলই নিঃসীম ঔদাসীন্য এক বোধহীন অস্তিত্ব। এ উদাসীন ওয়াক্তে সুলতান দাউদ খান কাররানী এখন বড় অসহায়। তিনি বড় একা। শ্রীহরি বিশ্বাসহন্তা, কতলু খান নিরাসক্ত, লোদী খান নিহত, গুজার খান শহীদ, সুখ-দুঃখের দোসর নিত্যসঙ্গী কালাপাহাড়ও এখন শত যোজন ফারাকে। বাইরে কোন দরদী নেই, অন্তরও তাঁর দেউলিয়া। মরার পিঠে লাঠি মারার মতো দৌলতজাহানের নীরবতা দীলটাকে তার অনেক আগেই জীর্ণ করে রেখেছে।

এ অবস্থায় দাউদ খানের হপ্তা কয়েক কেটে গেল। পরে তিনি আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়ালেন। কূলহীন সাগরে বিধ্বস্ত এক কিস্তির তিনিই কাণ্ডারী, নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকার তাঁর অবকাশ কোথায়? আবার তিনি অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। নয়া ফৌজ গড়ে তুলে হৃতবল ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায় হাত দিলেন। তবে আগের মতো হুটপিট এখন আর নেই। ধীরে ধীরে এ কাজ তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন। উড়িষ্যার নানা দপ্তরে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করার সাথে নানা স্থানে বাছাই করে জানবাজ নওজোয়ানদের সৈন্যদলে ভর্তি করতে লাগলেন। এমনইভাবে ঘুরতে ঘুরতে এই কাজে একদিন তিনি পুরীতে এসে হাজির হলেন।

মনোরম স্থান পুরী। নিকটেই সাগর। বিশুদ্ধ জলবায়ু। সুবিমল পরিবেশে স্বাস্থ্যকামী মানুষের সুশান্ত সমারোহ। আর পাঁচটা স্থানের মতো কোলাহল-মুখর নয়। পুরী ও তার সাগরতীর হই-হট্টগোলহীন এক পরিচ্ছন্ন জায়গা। অধিবাসীরা অধিকাংশই বিত্তশালী, স্বাস্থ্যকামী আগন্তুকেরাও বেশিরভাগই বিত্তবান। অসংখ্য মন্দির ও ধর্মীয়ভাব গম্ভীর এলাকার অদূরে পুরীর সমুদ্রতীর অপূর্ব এক অঞ্চল। দোকানপাট, কেনাবেচা ও জনসমাগমে ঘাটতি কিছু না থাকলেও, পরিবেশ সম্ভ্রান্ত, সর্বত্রই কমবেশি শালীনতা বিদ্যমান।

সমুদ্রতটে এসে দাউদ খান পরিতৃপ্ত হলেন। তার শুষ্কদীল অনেকখানি সজীব হয়ে উঠলো। কাজের প্রতি তিনি কিছুটা বিমনা হয়ে গেলেন। শহরের অভ্যন্তরে আস্তানা গেড়ে নিয়ে সাধারণ লেবাসে মাঝে মাঝেই তিনি এই সাগরতীরে ভ্রমণ করতে আসতে লাগলেন।

সেদিনও এলেন। সঙ্গে ছিল খাসবান্দা কোরবান আলী। বিভিন্ন জন বিভিন্ন স্থানে চেনাজানা লোকের সাথে দল বেঁধে গল্প করছেন ও ধীরপদে হাঁটছেন। বালবাচ্চা পরিজন নিয়ে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থেকে সমুদ্র দৃশ্য দেখছেন। কেউ আসছেন। কেউ যাচ্ছেন। ফলমূল ও শৌখিন দ্রব্য নিয়ে ফেরিওয়ালারাও ফেরি করে বেড়াচ্ছে। তবে ক্রেতারা অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত লোক হওয়ায়, সংযত হয়েই ফেরিওয়ালারা ফেরির ব্যবসা করছে। হাটবাজারের মতো বেয়াড়া আচরণ বা উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের নেই।

সুলতানকে কেউ চেনে না। হাঁটাহাঁটি করার কালে সুলতানের কাছেও দু'-একজন ফেরিওয়ালা এটা সেটা বিক্রি করার কোশেশ করলো। তবে তা বিরক্তিকর নয়। অবসরে ও প্রসন্নকালে সবিনয়ে তারা সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো। কোনটাকে সুলতান হাত ইশারায় নিজেই সরিয়ে দিলেন, কোনটাকে সরিয়ে দিলো কোরবান আলী।

কিছুক্ষণ পরে আবার এক ফেরিওয়ালা সুলতানের পেছনে এসে দাঁড়ালো। তার একহাতে সুগন্ধি আতরের এক আকর্ষণীয় শিশি, আর একহাতে ফুলের গুচ্ছ ভর্তি এক সুদৃশ্য ঝুড়ি। কিঞ্চিৎ দূরে থেকে আতরের শিশিটা বাড়িয়ে ধরে ফেরিওয়ালা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো— আতর চাই হুজুর, সুগন্ধি আতর?

সুলতান তখন দাঁড়িয়ে থেকে সমুদ্র দৃশ্য দেখছিলেন। সাগরের আর্তির সাথে নিজ দীলের আর্তি তিনি মিল করে নিচ্ছিলেন। কোরবান আলীও ফাঁকে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে চেয়েছিল। ফেরিওয়ালার আহ্বানে পাশ না ফিরেই সুলতান হাত ইশারায় অনিচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। জবাব পেয়ে ফেরিওয়ালা ফিরতে গিয়েও ফিরলো না। একটু থেমে আবার সে ইতস্তত করে বললো—ফুলও ছিল হুজুর! তরতাজা ফুল। জিয়াদা খোশ-বু—

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে সুলতান ঘুরে দাঁড়ালেন। ফেরিওয়ালার মুখের দিকে চেয়েই আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন—কে?

ফেরিওয়ালা মুরাদ খান। দৌলতজাহানের দাদু মুরাদ খান। সুলতানের মুখের দিকে চেয়ে বাঘ দেখারও অধিক পরিমাণ আঁতকে উঠে মুরাদ খানও তৎক্ষণাৎ পেছন দিকে দৌড় দিলেন। সুলতানও তাঁর পেছনে ছুটলেন। সুলতানের আওয়াজ শুনে কোরবান আলী পেছন ফিরে তাকিয়েই মুরাদ খানকে চিনতে পারলো। সে মরিয়া হয়ে দৌড়ে এসে মুরাদ খানের গমনপথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালো। থমকে গিয়ে মুরাদ খান দুস্‌রা রাহা তালাশ করতেই সুলতান এসে মুরাদ খানকে সবলে জড়িয়ে ধরলেন এবং উদ্‌গত কান্নার বেগ রোধ করতে করতে আপ্লুত কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন—খান সাহেব—

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে মুরাদ খান এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন সুলতান। অদূরে দঁড়িয়ে কোরবান আলীও অবিরাম চোখের পানি মুছতে লাগলো।

অভাবনীয় কাণ্ড দেখে চারদিক থেকে লোক এসে জমা হতে লাগলো। তা দেখে মুরাদ খানকে ধরে নিয়ে সুলতান ও কোরবান আলী সেখানে থেকে সরে গেলেন এবং এক নিরালা স্থানে এসে তিনজনই বসে পড়লেন। সুলাতান ও মুরাদ খান মুখোমুখী বসলেন। কোরবান আলী অনেকটা ফাঁকে গিয়ে বসলো।

মুরাদ খানের আজ আর সে চেহারা নেই। তাঁর ভেঙ্গে গেছে শরীর, বদলে গেছে রং, শুকিয়ে গেছে দেহ। তিনি এখন একেবারেই এক হাড্ডিসার মানুষ। লেবাসটা ধোপহীন ধূলি ধূসর না হলেও, তা নিতান্তই মামুলি ও সস্তা দামে কেনা।

বইঘর.কম ও রোকন

নিরালায় এসেও লহমা কয়েক কারো মুখেই বাক্যস্ফূরণ হলো না। একে অন্যের মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থেকে কান্নার বেগ দমন করতে লাগলেন। সবলে নিজেকে সামলে নিয়েই সুলতান ফের রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—খান সাহেব, এত নির্দয়ই হতে পারলেন আপনারা?

জবাবে মুরাদ খান "হুজুর" বলতে গিয়েই ফের কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আবার কিঞ্চিৎ বিরতির পর দাউদ খান বললেন—এতদিন পরও আমাকে এইভাবে এড়িয়ে যেতে চাইলেন আপনি?

মুরাদ খানও আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিলেন। চোখ মুছে বললেন—কি করবো হুজুর, করার যে কিছুই নেই আমাদের।

ঃ কিছুই নেই? এতদিন পরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করারও নেই আপনাদের?

ঃ হুজুর!

ঃ কেমন আছি, কোথায় আছি, কি হালে আছি—এটুকুও জানার আগ্রহ নেই আপনাদের?

ঃ আগ্রহ তো জিয়াদাই আছে হুজুর। কিন্তু—

ঃ কিন্তু?

ঃ দীলের আজার বাড়িয়ে আর ফায়দা কি হুজুর?

ঃ দীলের আজার!

ঃ দীলের তকলিফ। তাছাড়া হুজুরও তো ভাবতে পারেন, কথা বলার অছিলায় আমি হুজুরের করুণা পেতে চাইছি?

ছুরির ফলার মতো কথাটা গিয়ে সুলতানের কলিজায় বিঁধলো। তিনি আর্তনাদ করে বললেন—খান সাহেব!

ঃ হুজুর—

ঃ আপনি এতটাই ভাবতে পারলেন?

ঃ কি করবো হুজুর? যে পরিচয় চুকেবুকে গেছে, সেই পরিচয়ের জের টেনে কথা বলতে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না, আমি তা ঠাহর করবো কি করে?

ঃ উঃ! দিল আপনাদের এত শক্ত? এখনও আপনারা আমাকে মাফ করতে পারেননি?

মুরাদ খান থতমত করে বললেন— কসুর হয়ে গেছে হুজুর। বুঝতে আমার ভুল হয়েছে। মেহেরবানী করে মাফ করে দিন।

মুরাদ খানের মাথাটা নুয়ে পড়লো। সুলতান ফের বিহ্বল হয়ে গেলেন। মুরাদ খানের একহাত খপ্ করে দুই হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে সুলতান দাউদ খান আবেগভরে বলে উঠলেন—খান সাহেব! আমার খান সাহেব!

আকুলি বিকুলি করে উঠে মুরাদ খান বললেন—হুজুর, দোহাই হুজুর, গুনাহ্গারকে আর গুণাহ্গার করবেন না। আমার গল্তি হয়ে গেছে। আমাদের উপর হুজুরের দীলে যে

এখনও এত রহম আছে, আমি তা ঠিক বুঝতে পারিনি হুজুর। কসুর আমায় মাফ করে দিন।

আকুলি বিকুলি করতে করতে মুরাদ খান ধীরে ধীরে দাউদ খানের হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিলেন। মুরাদ খানের হাতখানা ছেড়ে দিয়েই দাউদ খান ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—এবার আপনাদের কথা বলুন খান সাহেব! আপনি এখানে কোথা থেকে? কোথায় আছেন আপনারা? দৌলতজাহান কোথায়? কেমন আছেন তিনি? তাঁর আম্মা কেমন আছেন? কি হালে আছেন সবাই?

এত প্রশ্নের জবাব এক সাথে দেওয়ার কায়দা না পেয়ে মুরাদ খান ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। দাউদ খান ফের প্রশ্ন করলেন—দৌলতজাহান কোথায়? কেমন আছে তিনি?

ঃ কি হুজুর , এখন সে মোটামুটি ভালই আছে।

ঃ কোথায় আছেন তিনি?

ঃ এই পুরীতেই হুজুর।

ঃ পুরীতেই? এই পুরীতেই আছেন?

ঃ জি হুজুর।

ঃ কি আশ্চর্য! তাঁর আম্মা? মানে আপনারা?

ঃ সবাই আমরা এখানেই আছি।

ঃ আচ্ছা! তাঁর আম্মা কেমন আছেন?

ঃ তাঁর তবিয়ত খারাপ হুজুর। বহুৎ দিন যাবৎ বিমারে ভুগছেন তিনি। মাঝে তো একবার প্রায় ইন্তেকালই করেছিলেন।

ঃ খান সাহেব!

ঃ এখন অনেকটা সুস্থ আছেন বটে, তবে বিমার তাঁর সারছে না।

ঃ ইশ্! তাই?

ঃ জি হুজুর, ওইটেই এখন মুসিবত। নইলে আর সবই ঠিকঠাক।

ঃ তা তাণ্ডা ছেড়ে এই দূরেই চলে এসেছেন আপনারা?

ঃ উপায় ছিল না হুজুর। তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন নেই যে সেখানে গিয়ে ঠাঁই নেবো। তাই—

ঃ তাই একদম এই পুরীতে এলেন?

ঃ জি না, সিধা আসিনে। কত জায়গায় যে ঘুরেছি আর কত জায়গায় যে থেকেছি, তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে এখানে চলে এসেছি।

ঃ এখানে এলেন কেন? বাঙ্গালা-বিহারে এত জায়গা থাকতে একদম এই পুরীতে—

ঃ ওই যে বললাম হুজুর, ওই বিমারির জন্যে। কিছুতেই বিমার তার কমে না দেখে এখানে চলে এলাম। এখানের হাওয়া খুব উমদা কিনা, সেইজন্যে।

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ এখানে এসে সুফল কিছু পেয়েছেন?

ঃ জি হুজুর, জি। বিমার তাঁর অনেকখানি কমে গেছে। তবে ঘুম হয় না আর বিমার তাঁর পুরোপুরি সারে না—এই যা মুসিবত। দাওয়াই চলছে, এখন দেখা যাক।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সুলতান আবার বললেন—আচ্ছা খান সাহেব, নকরী করার হালত তো আর আপনার নেই। এই দীর্ঘদিন যাবৎ আপনাদের সংসার চলছে কিভাবে?

ঃ আল্লাহর রহমে এখন আর তকলিফ নেই হুজুর। বেশ ভালভাবেই আমাদের দিন গুজরান হচ্ছে এখন।

ঃ আগে? আগেও কি ভালভাবেই হয়েছে?

মুরাদ খানের মুখমণ্ডল মলিন হলো। তিনি ভারী কণ্ঠে বললেন —জি না হুজুর, মোটেই তা হয়নি। বহুৎ তকলিফ গেছে আমাদের উপর দিয়ে। জিয়াদা তকলিফ।

ঃ খান সাহেব!

ঃ এমন দিনও গেছে, দিনান্তে একখানা রুটি আমরা দু'-তিনজনে ভাগ করে খেয়েছি। বলা যায়, সেরেফ পানি খেয়েই দিন গুজরান করেছি আমরা।

সুলতানের মুখমণ্ডলে বেদনা ফুটে উঠলো। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—সেরেফ পানি খেয়ে?

ঃ উপায় কি হুজুর? রোজগারের রাহা কিছু ছিল না। বড় কিসিমের মোট্ বোঝা যে টানবো, সে তাকত আমার নেই। ওদিকে আবার ঘরে ওই বিমারি। দৌলতজাহান সেলাই করে আর আমি হালকা কিসিমের মোট টেনে যা কিছু দুইজনে রোজগার করি, রুটি কিনতে গেলে দাওয়াই অভাবে বিমারিটা মারা পড়ে। তাই, যেদিন দাওয়াই কিনি সেদিন রুটি হয় না, যেদিন রুটি কিনি, সেদিন বিমারিটা দাওয়াই পথ্য পায় না। কাজেই পানির উপর ভরসা করা ছাড়া উপায় কি হুজুর? কোন কোন দিন সেরেফ পানি খেয়েই আমাদের চালিয়ে নিতে হয়েছে।

যন্ত্রণায় সুলতান তাঁর দুই কান চেপে ধরে বললেন—থাক-থাক, আর নয় খান সাহেব, আর আমি সহ্য করতে পারছি নে।

ঃ হুজুর!

ঃ তবু আপনারা একবারও আমাকে স্মরণ করলেন না? যতবড় কসুরই আমার আপনাদের কাছে থাক, একবারও মনে করলেন না কেন, একদিন আপনাদের আমি কত মুহাব্বত করতাম, আপনাদের প্রতি একদিন আমার কত দরদ ছিল? আপনাদের এহেন দুর্দশার কথা শোনার পরও আমি নীরব হয়ে থাকবো—এই ভেবে আপনারা আমাকে জানাননি?

ঃ না হুজুর, ঠিক তা ভাবিনি।

ঃ তবে?

ঃ ওই দৌলতজাহান কারো কোন করুণা নিতে নারাজ।

সুলতান হোঁচট্ খেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়লো মাসুম গজনবীর স্ত্রীকে লেখা দৌলতজাহানের সেই পত্রের কথা। তিনি নিঃশ্বাস চেপে বললেন—ও!

এরপর ক্ষণকাল উভয়েই নীরব হলেন। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মুরাদ খান প্রশ্ন করলেন—হুজুর কি এখানে সফরে এসেছেন?

সম্বিতে ফিরে এসে দাউদ খান বললেন—এ্যাঁ? হ্যাঁ, সফরে। তা এখন আপনাদের ভালভাবে চলছে কি করে? আপনার এই ফেরি-করা রোজগার দিয়ে?

ঃ জি হ্যাঁ হুজুর। এখানে এসে আগে এই ফেরিওয়ালার কাজই আমার মূল কাজ ছিল। তাতে রোজগারটা ভালই হতো। পেটের খাবার আর বাড়িভাড়া হয়ে যেতো। এখন এই ফেরি করাই আমার মূল কাজ নয় হুজুর, সখের কাজ। মূল কাজ এখন কারবার।

ঃ কারবার! মানে তেজারতি?

ঃ জি, কতকটা সেইরকমই। এখন আমি আতরের ব্যবসা করি।

ঃ বলেন কি!

ঃ মকানে আমার আতরের দোকান আছে হুজুর। খুচরাও বেচি আবার পাইকারি দরে এখানের এইসব ছোট ছোট দোকানে সরবরাহও করি। আজও এক দোকানে আতর পৌঁছাতেই এসেছিলাম। ভাবলাম, ফুলগুলো তো আর বেচাই হয় না, বন্দরে যখন যাচ্ছিই, তখন কিছু ফুলও সাথে করে নিয়ে যাই। ফিরে আসার পথে ফুল আর আতর—দুইটেই কিছুক্ষণ ফেরি করে বেড়াবো। এই কাজটার বরকতেই তো আজ আমি কারবারি।

ঃ আচ্ছা! তা ফুল? ফুলেরও দোকান আছে মকানে?

ঃ জি না হুজুর। বাগিচা আছে মকানে। হুজুরের কাছে তো আমাদের এ কাজে অনেকখানি তালিম নেওয়া আছে। আমার নাতনী ওই দৌলতজাহানই এখন মকানে এই ফুলের চাষ করে। সেলাই-ফাঁড়াই আর করে না। ভাড়াটে বাড়ি বটে। কিন্তু ভেতরে বাইরে অনেক জায়গা হুজুর।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আগে তো বেশিরভাগ ফুলই ফেরি করে বেচতাম। আতর বেচতাম কম। এই ফুলই আমাদের নসিবটা ফেরালো হুজুর। ফুল তো কিনতে হয় না। দামটা তামামই মুনাফা। ফুল বেচতে বেচতে কিছু কড়ি জমে গেল, আর তাই দিয়ে এখন আমার এই কারবার হুজুর। কিছুটা মহাজনী কারবারই বলা যায়।

মুরাদ খান স্মিতহাস্যে মাথা নীচু করলেন। উৎফুল্ল হয়ে উঠে সুলতান দাউদ খান বললেন—তাই নাকি? দেখি—দেখি, আপনার ফুল দেখি—

বলেই সুলতান দাউদ খান মুরাদ খানের ঝুড়ি থেকে ফুলের একটি গুচ্ছ তুলে নিলেন এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন—বাহ্! ফুলগুলো তো সত্যিই খুব সুন্দর। তা

বইঘর.কম ও রোকন

এভাবে আঁটি করে গুচ্ছ বাঁধা কেন? তোড়া বানিয়ে আনলে তো প্রচুর গ্রাহক পেতেন আপনি।

মুরাদ খান বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—তোড়া?

ঃ হ্যাঁ তোড়া। দৌলতজাহান বেগম সাহেবা যে অপূর্ব তোড়া বানাতে পারেন, ওই উমদা তোড়া দেখলে তো লোকেরা লুফে নিতো?

মুরাদ খান আবার মাথা নামিয়ে নিলেন। এরপর ম্লান হেসে বললেন—কি যে বলেন হুজুর! তাই কি কখনও হয়?

ঃ হয় না?

ঃ মাথায় মুগুর মারলেও দৌলতজাহান বেচার জন্যে ওই তোড়া বানাবে?

ঃ মানে?

ঃ যে তোড়া সে হুজুরের জন্যে বানাতো আর হুজুরকে দিতো, লক্ষ মুদ্রা দিলেও দৌলতজাহান কি ওই তোড়া বানিয়ে অন্য মানুষের হাতে দেবে?

সুলতান চমকে উঠে বললেন—খান সাহেব!

ঃ ও তোড়ার যে হুজুরই একমাত্র হকদার। জান গেলেও হুজুরের পছন্দের জিনিস দৌলতজাহান কি আর কারো হাতে দেয়?

সুলতানের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠলো। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—দেবেন না?

ঃ কখ্খনো না। হুজুর তাকে যত ইনকারই করুন, হুজুরকে যা একবার সে দিয়েছে, কোন কিছুর বিনিময়েই তা আর সে অন্য কাউকে দেবে না। সে আউরাতই সে নয়।

ঃ ওহ্ঃ!

www.boighar.com

অন্তরের আর্তনাদ সুলতানের মুখে এসে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। চমকে গিয়ে মুরাদ খান বললেন—কি হলো হুজুর?

জবাবে সুলতান কোনমতে বললেন—কিছু নয়।

বেদনায় সুলতান মুহ্যমান হয়ে গেলেন। আর তিনি কথা বলতেই পারলেন না। চুপ করে নত মস্তকে বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পর সুলতান অকস্মাৎ মাথা তুলে বললেন—আমি আপনাদের মকানে যাবো খানসাহেব। আমাকে আপনাদের মকানে নিয়ে চলুন—

ঃ হুজুর!

ঃ আমি আপনাদের মকানে যেতে চাই। এখনই। আপত্তি আছে আপনার?

ঃ জি না। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে—

ঃ দৌলতজাহান আপত্তি করবেন?

ঃ হ্যাঁ—মানে, তার কিছুটা আপত্তি তো থাকতেই পারে হুজুর।

ঃ আমার সাথে দুর্ব্যবহার করবেন? চরম দুর্ব্যবহার?

ঃ তা- মানে—

ঃ আমি সেইজন্যেই যেতে চাই খান সাহেব। আর কিছু না পাই তাঁর ওই দুর্ব্যবহার পাওয়ার জন্যেই যাওয়া আমার প্রয়োজন।

ঃ হুজুর!

ঃ কসুর করেছি, তার শাস্তি পেতে হবে না? শাস্তিটা পেলেও তো একটা সান্ত্বনা পাই আমি! অপরাধের বোঝা আর কতদিন মাথায় নিয়ে বেড়াবো? চলুন খানসাহেব, মেহেরবানি করে আপনাদের মকানে আমাকে নিয়ে চলুন—

ঃ এইভাবেই হুজুর?

ঃ এইভাবেই। আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনাদের মকানে আমার মাথায় কেউ আজ লাঠি মারলেও, কটু কথা তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটিও করবো না। আপনার কোন ভয় নেই। আমাকে শুধু পথ চিনিয়ে নিয়ে চলুন—

ঃ জি আচ্ছা হুজুর। চলুন তাহলে—

তিনজনই রওনা হলেন। পথ চলতে চলতে এক ফাঁকে সুলতান মুরাদ খানকে মুঙ্গেরের মুমিনউদ্দীনের কাছ থেকে তাঁর পাওনার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুমিনউদ্দীনকে দেওয়া ওয়াদা রক্ষা করলেন। এরপর মুরাদ খানের পিছে সুলতান ও কোরবান আলী মুরাদ খানের মকানে এসে হাজির হলেন।

সামনেই বাহির আঙ্গিনায় ফুলবাগান ও তার পাশেই মুরাদ খানের দোকানঘর। দোকানঘরের পেছন দেওয়ালের সাথেই অন্দরমহলের দেউটি। কোরবান আলী দোকানঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালো। সুলতানকে সাথে নিয়ে দেউটির কাছে এসে মুরাদ খান বললেন—এখানে একটু মেহেরবানি করে দাঁড়ান হুজুর, ভেতরে খবরটা দিয়ে আসি—

উষ্ণ সায় দিয়ে সুলতান বললেন—জরুর-জরুর, যান। দেউটির দুয়ার ঠেলে মুরাদ খান ভেতরে গিয়ে দেওটি আবার ভেজিয়ে দিলেন। সুলতান দেউটির উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুলতানের আগমন সংবাদ শুনেই দৌলতজাহান দিউয়ানা বনে গেলেন। উম্মাদিনীর মতো তিনি তৎক্ষণাৎ দেউটির দিকে ছুটলেন। তার মাথার ওড়না খসে কাঁধে এসে পড়লো। খুলে গেল বেণী। আউলে গেল চুল। দৌলতের ধারণা ছিল, সুলতান এসে ফুলবাগানের ওই দিকে দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে আছেন। সুলতানের নাম শুনেই দৌলতজাহানের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল। দেউটি থেকে তখনই তাঁকে এক নজর দেখার লোভ দৌলতজাহান সম্বরণ করতে পারলেন না। ছুটে এসে ওই অবস্থায় দেউটি খুলে দাঁড়াতেই দৌলতজাহান সুলতানের একদম বুকের সামনে পড়ে গেলেন।

“এ্যাঁ! সেকি!”—বলে চমকে উঠে দৌলতজাহান তৎক্ষণাৎ খোলা দরজার পাল্লার

বইঘর.কম ও রোকন
আড়ালে ছিটকে এসে দাঁড়ালেন এবং সবলে দেউটির পাল্লা আঁকড়ে ধরে নিজেকে সংযত করতে লাগলেন।

দৌলতজাহানের মুখ-মাথা সুলতান দাউদ খান পুরোটাই দেখতে পেলেন। তাঁর চেহারা দেখে সুলতান বেদনাভরে আঁতকে উঠলেন। এ দৌলত যেন আর ঠিক সে দৌলত নয়। মুখের আদল আর গড়ন গঠনের সৌন্দর্যটাই টিকে আছে শুধু, বাদবাকিটা তামামই পুড়ে গেছে। রং-বর্ণ, স্বাস্থ্য-শরীর কিছুই আর নেই। এ যেন চামড়ায় ঢাকা একখণ্ড অর্ধদগ্ধ কাঠ!

দেখামাত্রই সুলতান বুঝতে পারলেন, কতবড় তকলিফ আর আজাব গেছে কুসুম পেলব অন্তর ও অনন্যরূপে অধিকারীণী এই দৌলতজাহানের উপর দিয়ে। সুলতানের অন্তরটা হু-হু করে উঠলো। দেউটির উপর দাঁড়িয়ে থেকেই তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন—আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চলে এসেছি। মুরাদ খান সাহেবের অনীহাটাও মানিনি। অপমান, তিরস্কার, যা হয় আপনি করুন। আমি আজ কোন প্রতিবাদ করবো না।

দৌলতজাহানের তরফ থেকে কোনই উত্তর এলো না দেখে সুলতান ফের বললেন—ক্ষণিকের উত্তেজনা আর ভ্রান্তির বশে হলেও, আমার অপরাধ যে ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য, এই দীর্ঘকাল ধরে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে আমি তা বুঝেছি। ক্ষমার আশা আমি আর করি নে। অপরাধ করেছি, শাস্তি আমার প্রাপ্য। সেই শাস্তিটা আমাকে দিন। দোহাই আপনার! দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেছে, আর এভাবে লুকিয়ে না থেকে, অপমান অপদস্থ—চাইকি চাকরনফর দিয়ে হলেও যা হয় একটা কিছু করুন আপনি। আপনার এই নির্মম নীরবতা আমি আর সহ্য করতে পারছি নে!

সুলতানের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। পাল্লার ওপার থেকে এবারও কোন জবাব এলো না। পরিবর্তে এলো, ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার এক মর্মভেদী আওয়াজ! পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে দৌলতজাহান অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন হতভম্ব হয়ে সুলতান ওখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। দৌলতজাহানের কান্নার বেগ স্তিমিত হয়ে আসতেই মুরাদ খান অদূরে এসে দাঁড়ালেন। চোখ মুছে দৌলতজাহান মুরাদ খানকে বললেন—দাদু, আমার সালাম জানিয়ে তোমার হুজুরকে এনে আমার ঘরে বসাও। অনেকক্ষণ উনি দাঁড়িয়ে আছেন।

জবাবে মুরাদ খান উৎসাহভরে বললেন—আচ্ছা-আচ্ছা। তোমার ঘরটাই তো আমি এতক্ষণ গুছালাম। কিন্তু ভাল কোন কুরসী বা আসন—

দৌলতজাহান নির্বিকার কণ্ঠে বলেলেন—লাগবে না। উনি দৌলতজাহানের কাছে এসেছেন, রাজসভায় আসেন নি।

কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হয়ে মুরাদ খান বললেন—দৌলত!

দৌলতজাহান একই কণ্ঠে বললেন—উনার একটু তকলিফ হবে। হোক। উনি নিশ্চয়ই তাতে কসুর নেবেন না। যাও, আমি এক্ষুণি আসছি—

বইঘর.কম ও রোকন

বলেই দৌলতজাহান দেউটি থেকে দ্রুতপদে সরে গেলেন। সুলতানকে মুরাদ খান তাজিমের সাথে ডেকে নিলেন। অন্দরে এসেই সুলতান দাউদ খান বললেন—ও হ্যাঁ, দৌলতজাহানের আম্মাজান কোন ঘরে? উনাকে আগে সালাম জানানো প্রয়োজন।

মুরাদ খান ইতস্তত করে বললেন—উনি এক্ষুণি একটু ঘুমিয়ে গেলেন হুজুর। গত দুই রাত যাবৎ বহুত কোশেশ করেও ঘুমুতে উনি পারেননি। এইমাত্রই নাকি একটু ঘুমিয়ে গেছেন।

ঃ তাই নাকি?

ঃ এখন ঘুম ভাঙালে হয়তো আবার দুই-তিন রাত—

ঃ না-না, তাহলে ঘুম আর ভাঙ্গাবো না। তবে দূরে থেকে উনাকে একটু দেখবো। অনেকদিন ধরে বিমারে ভুগছেন—

ঃ জি হুজুর জি। তাহলে আসুন। এই যে এইদিকের ওই ঘরে উনি আছেন।

ঃ ওই ঘরে? ওখানে উনি একাই থাকেন!

ঃ জি না। থাকেন দৌলতজাহানের পাশের কামরায়। এইদিকে এখন একটু নিরিবিলি তো—

ঃ ও আচ্ছা। চলুন—

বিমার-বিধ্বস্ত দৌলতজাহানের আম্মা দিনারবানুকে সুলতান দাউদ খান করুণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। অতঃপর ঘুরে মুরাদ খানের সাথে দৌলতজাহানের ঘরে এসে ঢুকলেন। ছোটখাটো সাধারণ এক কামরা। আসবাবপত্র স্বল্প। তবু দৌলতজাহানের রুচির পরিচয় সর্বত্রই সমোজ্জ্বল। সবকিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে সাজানো গুছানো। মামুলি এক পালঙ্কের উপর পাতা দৌলতজাহানের বিছানাটাও ভদ্রোচিত। কমদামী হলেও চাদর-বালিশ ধবধবে। ভাঁজ করা কাঁথা-কম্বল ও পাশবালিশ যথাস্থানে স্থাপিত। দেখলেই বোঝা যায়, চাদরটা কেউ টেনেটুনে দিলেও, কাঁথা-কম্বলে হাত পড়েনি তার। তা পড়লে, ওগুলোর ভাঁজ আরো পরিপাটি হতো।

পাশে একটা ঝাড়া মোছা কুরসী পাতা থাকলেও, সুলতান এসে দৌলতজাহানের বিছানার উপর বসলেন। কুরসীতে বসার জন্যে মুরাদ খানের আবেদনে কানই দিলেন না।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন দৌলতজাহান। তিনি যে চোখ-মুখ ধুয়ে এলেন হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলো ভেজা দেখেই সুলতান তা বুঝতে পারলেন। লেবাস তিনি বদলাননি। আগের লেবাসই টেনেটুনে ঠিকঠাক করে এসেছেন। বাড়তি বলতে ওড়নার বদলে মাথায় এবার খাটো একটা আটপৌরে বোরকা তুলে দিয়েছেন।

সুলতানকে বিছানার উপর বসা দেখেই দৌলতজাহান জিজ্ঞাসুনেত্রে মুরাদ খানের দিকে চাইলেন। মুরাদ খান কাঁচুমাচু করে বললেন—কুরসীতে বসার জন্যে হুজুরকে অনেক অনুরোধ করেছি। কিন্তু হুজুর শুনলেন না।

বইঘর.কম ও রোকন

দৌলতজাহান বললেন—ও। তা না শুনলে আর তুমি কি করবে?

মুরাদ খান বললেন—তুমি আর এখন বসবে কোথায়? এই কুরসীতেই বসো, হুজুর যখন বসলেন না—

ঃ তাইতো বসতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকা বেমানান। তা তুমি যাও দাদু, বাইরে অবশ্যই আর কেউ আছেন। ওদিকে একটু দেখো—

ঃ ও-হ্যাঁ, তাইতো—

মুরাদ খান তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেলেন। দৌলতজাহান এসে কুরসীর উপর জড়সড় হয়ে বসলেন এবং অধোবদনে চুপ করে রইলেন। সুলতানের দীলে তখন অশান্ত আবেগ, অশেষ বেদনা ও অসংখ্য প্রশ্ন। দৌলতকে সামলানো নিয়ে ভয়ও তাঁর অনেক। কোনখান থেকে কি বলে সুলতান কথা শুরু করবেন তা তিনি ভাবতেই, দৌলতজাহান মাথা না তুলে শান্তকণ্ঠে বললেন—খুবই কি দুর্দিন যাচ্ছে এখন?

সুলতান তাজ্জব হয়ে গেলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, মুরাদ খানের সামনে যত সংযতই থাকুন, দৌলতজাহান এবার নির্ঘাত ফুঁসে উঠবেন। কিন্তু তার বদলে এমন শান্তভাবে দৌলতজাহানকে কথা বলতে দেখে সুলতান তাঁর মুখের দিকে অবাকবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। অল্প একটু মাথা তুলে দৌলতজাহান আবার বললেন—মানুষের দুশমনি আর বেঈমানী যে এতটাও হতে পারে, ভাবা যায় না।

সুলতান এবার বিপুল আগ্রহে বললেন—আপনি ওসব শুনেছেন?

ঃ শুনেছি বলেই তো বলছি।

ঃ আমি সুলতান হয়েছি, রাজ্য পেয়েছি, রাজ্য হারিয়েছি—এসব তামাম খবরই শুনেছেন?

ঃ তামামই শুনেছি।

ঃ আমি কি হালে আছি, কি করছি, মানে আমার সব ব্যাপারটাই জানেন?

ক্লিষ্ট হাসির ঈষৎ একটা রেশ টেনে দৌলতজাহান বললেন— অনেকটা জানিই তো।

ঃ কি আশ্চর্য। অথচ—

দৌলতজাহান এবার সরাসরি মুখ তুলে বললেন—অথচ কি?

ঃ আমি যে আপনাদের হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি, এটুকু জানলেন না?

ঃ আগে জানিনি। তবে পরে জেনেছি।

ঃ জেনেও এইভাবে গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন? আপনাদের তালাশে আমি যে পাগলের মতো ঘুরছি, এটা জেনেও আপনার দীলে কোন রহম এলো না?

দৌলতজাহান আবার মাথা একটু নীচু করলেন এবং সংযত কণ্ঠে বললেন—ঐ তো বললাম, আগে সেটা শুনিনি। শুনলাম পরে। তবে আগে শুনলেই বা কি করার ছিল আমার?

ঃ আমার ঐ প্রাণান্ত তালাশে আপনারা সাড়া দিতে পারতেন!

ঃ ফায়দা কি হতো?

ঃ তাজ্জব! না বুঝে একটা অপরাধ করেছি বলেই এতটা নির্মম হবেন? আমাকে শুধরানোর সুযোগ দেবেন না?

দৌলতজাহান এবার কিঞ্চিৎ শক্তকণ্ঠে বললেন—আমার পিতৃপরিচয় ভাল না হলে এই শুধরানোর আগ্রহটা কি জনাবের আসতো?

ঃ মানে?

ঃ পরিচয়টা সুবিধেজনক হয়েছে বলেই তো এ আগ্রহ এসেছে। মান সম্মানের অনুকূল না হলে নিশ্চয়ই এটা আসতো না।

ঃ একি বলছেন?

ঃ এখানে তো দীলের প্রশ্ন উহ্য। এ আগ্রহ লাভ-লোকসানের হিসেব কষা তেজারতি আগ্রহ। আমার এতে চঞ্চল হওয়ার কি আছে?

ঃ এই বুঝেই আছেন আপনি?

ঃ বলুন, বুঝাটা আমার ঠিক নাকি?

সুলতানও এবার শক্তকণ্ঠে বললেন—না, ঠিক নয়। সাক্ষী এক আল্লাহতায়ালা আর আমার জঙ্গীচাচা কালাপাহাড় সাহেব। কালাপাহাড় সাহেব আজ এখানে থাকলে তিনি সাক্ষ্য দিতেন যে, আপনার পিতৃ পরিচয়ের তোয়াক্কা না রেখেই আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, মানুষ কর্মের জন্য দায়ী, জন্মের জন্যে নয়। আপনি নির্দোষ।

www.boighar.com

দৌলতজাহান উৎসুক হয়ে বললেন—তারপর?

ঃ আপনাদের হাতের কাছে পেলে আমার দুর্ব্যবহারের জন্যে আমি মাফ চাইতে পারতাম। আপনার জন্মবৃত্তান্ত অনুজ্জ্বল হলেও, আপনার দীলের সে গ্লানি আমি মুছে দিতে পারতাম। আপনাকে নিয়ে ঘর বাঁধার পথ খুঁজতে পারতাম।

ঃ সত্যিই কি তাই?

ঃ আমার হাতে তো এক্ষণে সাক্ষী নেই। বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি।

দৌলতজাহানের দীলটা হাল্‌কা হয়ে গেল। এবার তিনি স্মিতহাস্যে বললেন—সেই পথ খুঁজতে গিয়েই বা জনাব কি করতে পারতেন? তাঁর পরিবারের অনেককেই তো জানলাম। তাতে তাঁর তকলিফ আর দিগ্‌দারীটাই বাড়তো শুধু।

ঃ তা সে যা-ই বাড়ুক অন্তরে যে আমার তেজারতির প্রশ্ন নেই, এই জন্যেই বললাম।

দৌলতজাহান নীরব হলেন। সুলতান আবার বললেন—আচ্ছা, আমার সাথে এত নিবিড়ভাবে মিশেও কি আপনি আমার দীলের খবর পুরোপুরি পেলেন না? সাময়িক ঐ উত্তেজনা আর বিভ্রান্তির সাথেই কি আপনার সব স্মৃতি মুছে যাওয়ার মতোই আমার দীল?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ তা ভাববো কেন? জনাবকে চিনতে কি আমার এতটাই ভুল হয়েছে?

ঃ তাহলে? তাহলে আর এতটা নীরব হয়ে থাকলেন কেন?

ঃ নীরব হয়ে শেষ পর্যন্ত আমিও হয়তো থাকতাম না বা থাকতেও পারতাম না, জনাব যদি সাধারণ মানুষ হতেন। যদি আমার আর জনাবের মাঝে জনাবের ঐ খানদানি বংশ পরিচয় আর মসনদের দেয়াল না থাকতো। ও পরিবেশের কথা আমি চিন্তাও করতে পারিনে। জনাবদের ঐ হেরেমকে আমি হারাম জ্ঞান করি।

হতবুদ্ধি হয়ে সুলতান দাউদ খান হতাশকণ্ঠে বললেন—এতটাই?

ঃ জি জনাব, এতটাই।

ঃ তাজ্জব!

ঃ কেন, জনাব এতে তাজ্জব হচ্ছেন কেন?

ঃ তাজ্জব হচ্ছি এই কারণে যে, এই যেখানে আপনার অনুভূতি, আমাদের প্রতি আপনার যেখানে এতটাই আক্রোশ, সেখানে আপনি আমার সাথে এমন সহজ ব্যবহার কেমন করে করছেন?

ঃ মানে?

ঃ আমার তো বদ্ধ ধারণা ছিল, আপনি আমার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করবেন।

ঃ কেন, জনাবের এমন ধারণা কি করে হলো? এ নিয়ে তো জনাবের সাথে এর আগে কোন কথা হয়নি আমার?

ঃ ধারণা হলো আপনারই পত্র থেকে। গজনবী সাহেবের স্ত্রীকে আপনি যে পত্র লিখেছিলেন তা তো এই কথাই আপনি বলেছেন।

দৌলতজাহান আনন্দ বিস্ময়ে বললেন—সেকি! সে পত্র জনাবের হাতেও গিয়েছিল?

ঃ গিয়েছিল? আর সেই জন্যেই বলছি। কিন্তু দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে হঠাৎ এই সহানুভূতিশীল কথাবার্তা আর আচরণ? এর হেতুটা কি?

দৌলতজাহান আবার মাথা নীচু করলেন এবং ধীরকণ্ঠে বললেন—দুর্ব্যবহার হয়তো বা নিশ্চয়ই করতাম, যদি না জানতাম, জনাবের দীলটা আমি এখনো পুরোটাই দখল করে আছি। আমার জন্যে জনাব এখনও মজবুর হয়ে আছেন।

ঃ দৌলত!

ঃ আমাকে না পেয়ে যিনি এতটাই ভেঙে আছেন, আমার জন্যে যার দীল এখনও এত কাতর,তার দীলে আঘাত আর কি করে আমি দেই! তার আশা পূরণ করতে না পারলেও, আঘাত করতে তো পারিনি।

ঃ সে কি! এসব কথা কি করে আপনি জানলেন?

সুলতান বিহ্বল হয়ে গেলেন। দৌলতজাহান স্মিতহাস্যে বললেন— আমি শুনেছি।

ঃ কার কাছে?

ঃ শিপ্রাদেবীর কাছে।

বইঘর.কম ও রোকন

সুলতান চমকে উঠলেন। তিনি সবিস্ময়ে বললেন—শিপ্রাদেবী! তাঁকে কোথায় পেলেন?

ঃ এইতো এখানেই তাঁরা আছেন। আমাদের এই কয়টা বাড়ি পরেই উনাদের বাড়ি।

ঃ তাজ্জব! উনারা তো মন্দারণে ছিলেন।

এখন এখানেই এসেছেন। দিল্লীর ফৌজের দৌড়ঝাঁপ আর লড়াইয়ের ঝুটঝামেলায় মন্দারণ তটস্থ হয়ে উঠলে, উনারা এখানে চলে এসেছেন। উনাদের ঐ সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে কুঞ্জলাল বাবু না কে একজন বড়লোক আছেন, এখানেও তাঁর একটা বড়োসড়ো বাড়ি আছে। তীর্থে আর ভ্রমণে এসে এখানে উনি থাকতেন। এখন তাঁরা সবাই এসে সেই বাড়িতে উঠেছেন।

ঃ বলেন কি! তাহলে ঐ উস্তাদজি, রাজ্যেশ্বর বাবু, পীরমুহাম্মদ, ভানু সিং—মানে ওঁরা সবাই?

ঃ সবাই।

ঃ তাঁদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে?

ঃ সবার সাথে হয়নি। তবে শিপ্রা বহিনের সাথে প্রায়ই আমার গল্প হয়। আমার জন্যে জনাব তাঁর সামনেও কেঁদে ফেলেছিলেন? একজন আউরতের জন্যে আর একজন আউতের কাছে—

দৌলতজাহান এবার একটু শব্দ করেই হেসে উঠলেন। সুলতান দাউদ খান গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—তবু আপনি বলবেন, হেরেম আপনার কাছে হারাম?

হাসি থামিয়ে দৌলতজাহানও গম্ভীর হলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—না বলে যে উপায় নেই জনাব।

সুলতান অতিশয় কষ্টের সাথে বললেন—দেখুন, আমি আর সহ্য করতে পারছিনে। আমার স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আপনাকে পাওয়ার কি তাহলে কোন আশাই আমার নেই? আপনি কি কিছুতেই আমাকে কবুল করতে পারেন না?

দৌলতজাহান এবার ম্লানকণ্ঠে বললেন—সেই না-পারার ব্যথাটা যে কতবড় আমার কাছে, জনাব তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তবু —

ঃ তবু?

ঃ কবুল করতে পারলেও এখন নয় জনাব। এখন সে চিন্তা করার মোটেই অনুকূল সময় নয়। এখন বড় দুঃসময়।

ঃ দুঃসময়!

ঃ একদিকে আমার আম্মার এই জীবন্মৃত অবস্থা, আর একদিকে জনাবের এই নিদারুণ দুর্দিন। এগুলো কাটিয়ে উঠার আগে এসব কথা চিন্তা করা সাজে না।

ঃ কিন্তু এই দুর্দিনেই তো আপনার সঙ্গ আমার বড়ই প্রয়োজন ছিল দৌলত!

বইঘর.কম ও রোকন
আমাকে উৎসাহিত করার জন্যে আপনাদের সান্নিধ্য—

ঃ জনাব ভুল করছেন। এখন আমি জনাবের প্রয়োজনের চেয়ে বোঝা-ই হবো বড়। হৃদয়ের দুর্বলতা দিয়ে জনাবকে উৎসাহিত করার বদলে পিছুই টানবো। কমজোর করে দেবো।

ঃ দৌলত!

ঃ লড়াইয়ের ময়দানে যিনি সকলের আতংক, সেই বাহাদুরের দীলে এই দুর্বলতা এক্ষণে বেমানান জনাব! বরং তাবৎ দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে জনাবের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকেই জনাব এখন ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এখানে বসে আমি তাঁর কামিয়াবির জন্যে আল্লাহতায়ালার দরবারে নিরন্তর আরজ পেশ করতে থাকবো।

ঃ তা মানে—

ঃ আমি সেদিনের অপেক্ষা করবো—জনাব যেদিন তামাম দুশমন উৎখাত করে তামাম মুলুক মুক্ত করে মসনদে উঠে বসবেন, কিংবা যেদিন তিনি সর্বস্ব হারিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবেন। এই দুইয়ের যে কোন অবস্থাতেই আমি হৃদয়মন ঢেলে দিয়ে জনাবকে কবুল করবো। তার আগে কখনো নয়।

ঃ কিন্তু—

ঃ এই ঝুলন্ত অবস্থায় আবার সেই মুহাব্বতের খেলা খেলতে গিয়ে ভাঙাবুক দুস্‌রাবার ভেঙে গেলে সে আঘাত আমি আর তরিয়ে উঠতে পারবো না।

কিন্তু যদি তার আগেই মউত ঘটে আমার?

দৌলতজাহান চমকে উঠে থেমে গেলেন। এর পর, করুণকণ্ঠে বললেন—নসীব যদি এতটাই নারাজ হয়, তাহলেও জনাব জেনে রাখুন, আমি জনাবেরই ছিলাম, জনাবেরই আছি আর ও অবস্থাতেও আমি জনাবেরই থাকবো। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু জনাবেরই ঐ বৃহৎ কর্তব্যের মধ্যে ক্ষণিকের সুখের এই ক্ষুদ্র স্বার্থ ঢুকিয়ে তাঁর কর্তব্যপথ আমি পিচ্ছিল করতে পারবো না।

ঃ দৌলতজাহান!

ঃ আর কথা নেই জনাব। এই আমার শেষ কথা। এ প্রসঙ্গ আর না টানার জন্যে জনাবকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

সুলতান দাউদ খান কাররানী নির্বাক হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—বেশ আপনার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু আমার আর একটা কথা রাখতে হবে আপনাকে।

ঃ আর একটা কথা!

ঃ আপনাদের এই সংসার চালানোর ব্যয়নির্বাহ আমি করবো।

ঃ দোহাই জনাব! এটাও আমি কবুল করতে পারবো না। অতীতে আমাদের যত

বইঘর.কম ও রোকন
দুর্দিনই যাক, এখন আর সে অবস্থা নেই। আমরা এখন বেশ স্বচ্ছল। আমাদের এভাবেই চলতে দিন।
www.boighar.com

সুলতান ক্ষুণ্ন হলেন। বললেন—অর্থাৎ আমার কিছুই আপনি নেবেন না?

ঃ জি না জনাব। আমার অক্ষমতার জন্যে আমি দুঃখিত।

ঃ সংসার চালাতে না দিন, এখন যদি নগদ কিছু দেই, সেটাও কি—

সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত জোড় করে দৌলতজাহান বললেন—কেন আর জনাব আমাদের এভাবে ছোট করবেন? আমাদের স্বাবলম্বী হতে দিন।

সুলতান আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এরপর দুঃখিতকণ্ঠে বললেন—আপনার ইচ্ছাকে কোনদিনই আমি হার মানাতে পারিনি, আজও সে কোশেশ করবো না। তবে আপনার কাছে একটা মস্তবড় দায়ে ঠেকে আছি আমি। দান নয়, আমাকে সে দায়মুক্তির মওকা আজ দিতেই হবে আপনাকে।

চঞ্চল হয়ে দৌলতজাহানও উঠে দাঁড়ালেন এবং শংকিতকণ্ঠে বললেন —দায়মুক্তি!

নিজের গলায় পরিহিত একমাত্র মালাটি গাত্রাবরণের তলে থেকে বের করতে করতে সুলতান দাউদ খান কাররানী বললেন—আপনার সেই অপূর্ব ফুলের তোড়ার জন্যে আপনাকে আমি ইনাম দেবো বলে ওয়াদা করে রেখেছি। কি জানি, সে ওয়াদা পালনের মওকা যদি এ জিন্দেগীতে আর না পাই? এই আপনার সেই ইনাম—

বলেই সুলতান মালাটি মেলে ধরে দৌলতজাহানের মাথার উপর ফেলে দিলেন। মালাটি দৌলতজাহানের বোরকাঢাকা গলায় গিয়ে পড়লো। সুলতান বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। আনন্দে-বেদনায়, আফসোসে-উল্লাসে আত্মবিস্মৃত হয়ে দৌলতজাহান সুলতানের সেই মালাটি সবলে বুকের সাথে চেপে ধরলেন।

ষোল

নারায়ে তকবির—আল্লাহু আকবর!

সুলতান-ই বাঙ্গালা—জিন্দাবাদ!

নাঙ্গা তলোয়ার হাতে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটছেন সুলতান দাউদ খান কাররানী। তাঁর পশ্চাতে ছুটছেন তাঁর কয়েকজন সালার। এর পরেই সুলতানের নব গঠিত ফৌজ সকলেই অশ্বারোহী। সকলেরই হাতে হাতে কোষমুক্ত কৃপাণ। পথের ধুলো উড়িয়ে বেশুমার সেপাইরা দুর্মদ বেগে ছুটছে আর মুহুর্মুহু আওয়াজ দিচ্ছে 'আল্লাহু আকবর'। লক্ষ্য তাদের তাণ্ডা।

দিল্লীর সালার খান-ই-খানান মুনিম খান ইন্তেকাল করেছেন। তাণ্ডার বিপদগ্রস্ত দিল্লীর ফৌজ দিশেহারা হয়ে গেছে। কালাপাহাড় ও তাঁর সঙ্গীরা পুব থেকে তাণ্ডার উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিম থেকে করেছেন জুনায়েদ খান। তিনি বিহারে এসে পশ্চিম থেকে চাপ ফেলেছেন তাণ্ডার উপর। কালাপাহাড়ের আহ্বানে সুলতান দাউদ খান দক্ষিণ

বইঘর.কম ও রোকন
থেকে তাড়া করেছেন দিল্লীর ফৌজকে। আতংকিত দিল্লীর ফৌজ পলায়নের পথ না পেয়ে বন-নদী ঝাঁপিয়ে তাণ্ডা থেকে ছুটছে আর ত্রিহুতের পথ দিয়ে পাটনায় এসে পড়েছে।

একদিনে এ অবস্থা হয়নি। বিগত কয়েক মাস যাবত বাঙ্গালার সালারদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা আর পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন এই অবস্থা এনেছে। দিল্লীর সালার মুনিম খান তুকোরয়ে থাকতেই তাণ্ডায় দিল্লীর শক্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে। মুনিম খানের সাথে দাউদ খানের সন্ধি স্থাপন হওয়ার পরও তাণ্ডার উপর বাঙ্গালার ফৌজের হামলা অব্যাহত থাকে। সুলতান দাউদ খান নিজে ঐ সন্ধির শর্ত মানলেও, জুনায়েদ খান, কালাপাহাড়, বাবুই মানকলি ও বাঙ্গালার অন্যান্য সালারেরা এই সন্ধির দ্বারা নিজেদের আবদ্ধ মনে করেন না। সুলতান দাউদ খানের অধিকারভুক্ত ভূখণ্ড, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দরুন তাঁরা সুলতানের এ সন্ধিকে সুলতানের ব্যক্তিগত সন্ধি হিসাবে গণ্য করেন এবং বাঙ্গালা মুলুক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। নৈতিকভাবে আবদ্ধ থাকার দরুন মুনিম খানের জীবদ্দশাতক্ সুলতান দাউদ খান নিজে প্রকাশ্য যুদ্ধ বিগ্রহে অবতীর্ণ না হলেও, বাঙ্গালার ঐ বিচ্ছিন্ন সালারেরা তাদের সংগ্রাম পূর্বাপর চালিয়ে যেতে থাকেন।

দাউদ খানের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের ঝুটঝামেলা নিষ্পত্তি করার পর মুনিম খান যখন তাণ্ডায় ফিরে এলেন, তখন তিনি দেখলেন, তাণ্ডার অবস্থা মুমূর্ষু। সেনাপতি কালাপাহাড় ও তাঁর সঙ্গীরা ইতিমধ্যে শুধু ঘোড়াঘাটের তাঁদের দখল মজবুত করে ফেলেন নি, ঘোড়াঘাটের দিল্লীর সালার মজনুন খান কাকশালকে পরাজিত করে ঘোড়াঘাট থেকে তাঁকে সসৈন্যে তাড়িয়ে এনে তাণ্ডায় তুলেছেন এবং বাঙ্গালার সাবেক রাজধানী গৌড় ও তৎসংলগ্ন এলাকা দখল করে নিয়েছেন। মুনিম খান আরও দেখলেন, মজনুন খান কাকশাল ও তাণ্ডার দিল্লীর ফৌজ একসাথে মিলে সেরেফ তাণ্ডার হেফাজতি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছেন, গৌড়ে অবস্থিত বাঙ্গালার ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার মতো তেমন কোন সৎ সাহসই দেখাচ্ছেন না।

তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে তাণ্ডায় ফিরে এসেই মুনিম খান বাঙ্গালা ফৌজের মোকাবেলায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর নিজের ফৌজের সাথে মজনুন খান কাকশাল ও তাণ্ডার ফৌজ নিয়ে তিনি অবিলম্বে গৌড়ে এসে হানা দিলেন। সর্বাত্মক আক্রমণে তিনি কালাপাহাড় ও তাঁর ক্ষুদ্রদলকে গৌড় থেকে উচ্ছেদ করলেন বটে, কিন্তু ঘোড়াঘাটের দিকে এগিয়েই প্রচণ্ড মার খেয়ে তিনি আবার তাণ্ডায় ফিরে এলেন। এরপর আরো কয়টি অভিযান ঘোড়াঘাটে চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর ঘোড়াঘাট অঞ্চলের এই বাঙ্গালার ফৌজকে চূড়ান্তভাবে মোকাবেলা করার ইরাদায় খান-ই-খানান মুনিম খান বাঙ্গালার রাজধানী তাণ্ডা থেকে পুনরায় গৌড়ে তুলে আনলেন।

এরপরেই শুরু হলো দিল্লীর ফৌজের বিপর্যয়। এই সময় বাঙ্গালার ঐ সব ছড়িয়ে পড়া সৈন্যদলের বিভিন্নমুখী হামলা তীব্র আকার ধারণ করলো। বিহার, ঝাড়খণ্ড,

ঘোড়াঘাট, গৌড়—ইত্যাদি এলাকায় বাঙ্গালার সালারেরা মরিয়া হয়ে দিল্লীর ফৌজের উপর নিরন্তর হামলা চালাতে লাগলো। অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত এই ঝটিকা হামলার বিরুদ্ধে বিশাল লটবহর নিয়ে মুনিম খান কোন সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেয়ার তাল করতে পারলেন না। বাঙ্গালার ফৌজের এই চতুমুর্খী হামলায় দিল্লীর ফৌজের মনোবল ভেঙে পড়লো এবং তারা হতাশ হয়ে গেল। এর সাথে যুক্ত হলো নানাবিধ প্রসঙ্গ। মুনিম খান বাইরে থাকার কালে দিল্লীর সেপাইসালারদের মধ্যে যে কলহ পয়দা হয়েছিল, ক্রমশই তা জোরদার হয়ে উঠতে লাগলো। দিল্লীর ফৌজে শিয়াসুন্নী উভয় প্রকার সেপাই ছিল। শিয়াসুন্নীদের মধ্যে বিরাজমান বিভেদটাও এই সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সবচেয়ে দিল্লীর ফৌজের বড় বিপর্যয় আনলো গৌড়ের মহামারী। গৌড়ের আবহাওয়া অনেক আগেই অত্যন্ত দূষিত হয়ে গিয়েছিল। নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ার কারণেই মরহুম সোলায়মান খান কাররানী রাজধানী গৌড় থেকে তাণ্ডায় সরিয়ে আনেন। মুনিম খান আবার বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ে পার করার কিছুদিন পরেই গৌড়ে ভয়াবহ মহামারী দেখা দিলো।

এই মহামারীর কবলে পড়ে দিল্লীর ফৌজ দলে দলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো। জীবিতেরা অনেকেই আতংকগ্রস্ত হয়ে গৌড় ছেড়ে তাণ্ডায় এবং কেউ কেউ বিহারের দিকে ছুটতে লাগলো। স্থানীয় অধিবাসীরাও অনেকেই প্রাণ দিলো আর অনেকেই গৌড় ছেড়ে পালালো। দেখতে দেখতে গৌড় শহর জনশূন্য প্রেতপুরীতে পরিণত হলো। ঠিক এই সময় জুনায়েদ খান বিহারের দিক থেকে তাণ্ডার উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করলেন।

মুনিম খান নিজেও রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। এই মহামারীর কারণে ও জুনায়েদ খানকে ঠেকা দেয়ার অভিপ্রায়ে আবার তিনি রাজধানী গৌড় থেকে তাণ্ডায় পার করলেন। কিন্তু জুনায়েদ খানকে ঠেকা দেয়া আর তাঁর হলো না। রাজধানী তাণ্ডায় আনার কয়েকদিন পরেই অশীতিপর বৃদ্ধ মুনিম খান কঠিন ঐ মহামারীর ছোবলে ইন্তেকাল করলেন।

বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় দিল্লীর শক্তির কেন্দ্রীয়স্তম্ভ ধসে পড়লো। নেতৃত্বের অভাবে দিল্লীর ফৌজ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। রাজা তোডরমল সহ দিল্লীর অন্যান্য সালারেরা ঐক্যে পৌঁছতে না পেরে দিল্লীর বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দলে লিপ্ত হলেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে দিল্লীর অনেক সেনানায়ক ও সেপাই গোপনে বাঙ্গালা মুলুক ত্যাগ করতে লাগলেন।

পরিস্থিতি যখন এমনই অনুকূল, ঠিক তখনই বাঙ্গালার বিচ্ছিন্ন সালারেরা চারদিক থেকে একযোগে তাণ্ডার দিকে ধাবিত হলেন। ঘোড়াঘাট থেকে কালাপাহাড়, বিহার থেকে জুনায়েদ খান,, ঝাড়খণ্ড থেকে জামান খান, তাণ্ডার পুব-দক্ষিণ দিক থেকে বাবুই মানকলি ও অন্যান্য সালারেরা একযোগে দিল্লীর ফৌজকে ঘিরে ধরলেন। পলায়নের

বইঘর.কম ও রোকন
জন্যে দিল্লীর ফৌজের সামনে এখন একমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটাই কিছু ফাঁকা রইলো।

নূতনভাবে তৈয়ার হয়ে সুলতান দাউদ খান কাররানী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এই ওয়াক্তে কালাপাহাড় সাহেব সুলতানকে খবর দিলেন, একমাত্র এখনই সময়, এ মওকা দুসরাবার আসবে না, সবাই এবার একযোগে দিল্লীর শক্তির উপর আঘাত হানা প্রয়োজন, তিনি অবিলম্বে উড়িষ্যা থেকে বেরিয়ে আসুন।

মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই সুলতান দাউদ খানের তামাম জড়তা কেটে গেল। তিনি তাঁর নবগঠিত বাহিনী ও সাথী সালারদের নিয়ে 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ তুলে বাঙ্গালার দিকে ছুটে এলেন এবং তাণ্ডার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে দিল্লীর ফৌজকে তাড়া করলেন।

দিল্লীর সালার সেপাই এবার দিশেহারা হয়ে গেল। প্রতিরোধের ব্যর্থ কিছু চেষ্টা করেই তারা পড়িমরি পেছন দিকে ছুটলো। পলায়নের তামাম পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় নদীনালা ঝাঁপিয়ে আর বনজঙ্গল পেরিয়ে তারা তাণ্ডা ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগলো এবং যুদ্ধের হতাহতের সাথে এই পলায়নের পথেও তারা অনেকেই প্রাণ দিলো।

বাঙ্গালা মুলুক দুশমনমুক্ত হয়ে গেল। সুলতান দাউদ খান কাররানী অল্পায়াসেই রাজধানী তাণ্ডা পুনরায় দখল করলেন এবং মসনদে উঠে বসলেন। সুলতান দাউদ খানকে নবোদ্যমে তৎপর হতে দেখেই পূর্ব বাঙ্গালার জমিদার ঈশা খানও তলোয়ার ধারণ করলেন। পূর্ব বাঙ্গালায় অবস্থিত দিল্লীর সালার শাহবর্দীকে তিনি পরাজিত ও তাড়া করে দিল্লীর দিকে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর বাঙ্গালার সালারেরা চারদিকে দিল্লীর ফৌজের তালাশ করে ফিরতে লাগলেন। ফলে, দিল্লীর ফৌজ বাঙ্গালা তো ছাড়লোই, বিহারের পূর্ব প্রান্তেও তারা কেউ রইলো না, পড়িমরি পশ্চিম প্রান্তে ছুটে আসতে লাগলো। অনেকেই আবার দিল্লীর পথও ধরলো। সুলতান দাউদ খান কাররানী বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা সহ বিহারেরও অর্ধেক অংশে নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

দিল্লীর ফৌজ পালিয়ে যাওয়ায় যুদ্ধের ডামাডোল আপাতত থেমে গেল। সুলতান দাউদ খান কাররানী এবার দ্রুতগতিতে তার বিধ্বস্ত প্রশাসন গুছিয়ে নিতে লাগলেন। একই সাথে তিনি দিল্লীর পরবর্তী হামলার বিরুদ্ধে তাঁর সামরিক শক্তি পুনর্গঠন করতে লাগলেন। একাজে তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে লাগলেন সালার কালাপাহাড় ও জুনায়েদ খান কাররানী। জুনায়েদ খান খোশদীলে দাউদ খানের বাহিনীতে সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন। সুলতানের পরিবারবর্গ তখনও উড়িষ্যাতেই ছিল। সুলতান এবার তাদের তাণ্ডায় আনার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

কাজের চাপ কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসতেই দৌলতজাহানের প্রসঙ্গ আবার সুলতানের অন্তরে উঁকি দিতে লাগলো। হরেক প্রশ্ন অন্তরে তাঁর ভিড় জমাতে শুরু করলো। দৌলতজাহান পুরীতে। সেখানে বসে তিনি চলমান ঘটনা প্রবাহের দিকে নিশ্চয়ই কান পেতে আছেন চূড়ান্ত কামিয়াবী হাসিল করে কিংবা সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব ও নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে

বইঘর.কম ও রোকন
তাঁর কাছে হাজির হলে, তবেই তিনি সানন্দে কবুল করবেন সুলতানকে। যদিও এ কামিয়াবী চূড়ান্ত কিছু নয়, দিল্লীর বাদশাহ আকবার শাহ আবার যে কোন সময় তার আগ্রাসী থাবা নিয়ে বাঙ্গালার দিকে ছুটে আসতে পারেন, তবু সাময়িকভাবে হলেও, কামিয়াব তো হয়েছেন তিনি জরুর। এ অবস্থায় হাজির হলে কি দৌলতজাহান তাঁকে কবুল করতে পারবেন না? এখনও কি দৌলতজাহানের আপত্তি থাকবে অধিক? আরো কি অধিক কামিয়াবী আশা করবেন তিনি? সুলতানের দীলে এখন এসব চিন্তা ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছে।

কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়লেই এ সব প্রশ্নে সুলতান আগে তাঁর জঙ্গীচাচা কালাপাহাড়ের শরণাপন্ন হতেন। তাঁর সাথে আলাপ করতেন, তাঁর পরামর্শ নিতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হওয়ার পর থেকে পরামর্শ তো দূরের কথা, দৌলতজাহানের প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলাপ হওয়ার আর কোন মওকাই হয়নি। এই প্রাণান্ত প্রলয়ে সে প্রশ্ন এখন তাঁদের মাঝে নাজুক হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে, এ অবস্থায় দৌলতজাহানের প্রসঙ্গ কালাপাহাড় সাহেবের কাছে তোলার প্রশ্নে সুলতান এখন অনেকখানি শরমিন্দাবোধ করছেন। এই দুরাবস্থায় ঐ প্রসঙ্গ তুলে তাঁর জঙ্গীচাচার কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে পড়তে পারেন ভেবে, তিনি একাজে সাহস-উৎসাহ পাচ্ছেন না।

কাজের ফাঁকে সুলতান সেদিন একা বসেই এ সব কথা ভাবছিলেন। সুলতানের খাস দপ্তরে তখন আর কেউ ছিল না। ঘটনাচক্রে এই সময় কালাপাহাড় সাহেব এসে সুলতানের খাস দপ্তরে হাজির হলেন। দরজায় এসে দাঁড়িয়েই তিনি দেখলেন, সুলতান গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। প্রথমে তিনি কিছুটা ইতস্তত করলেন। এরপর সালাম দিয়ে ভেতরে চলে এলেন।

কালাপাড়ার সাহেবকে দেখেই সুলতান উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সালামের জবাব দিয়েই তিনি খোশদীলে উঠে দাঁড়ালেন এবং মোসাফাহ্ করে সালার সাহেবকে বসালেন। আসন গ্রহণ করেই কালাপাহাড় সাহেব প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার জনাব? খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে! কোন দুঃসংবাদ কিছু?

সুলতান মুখ তুলে বললেন—দুঃসংবাদ!

ঃ মানে দিল্লীর বাদশাহর কোন বদ্ মতলবের খবর বা অন্য কোন খারাপ খবর কিছু?

সুলতান হেসে বললেন—না-না, কোন খারাপ খবর নয়। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

ঃ অন্য কথা?

ঃ হ্যাঁ। মানে এই অন্য একটা কথা আর কি।

সুলতান থেমে গেলেন। কালাপাহাড় সাহেব ইতস্তত করে বললেন —কি এমন কথা যার জন্যে জনাব এত বিমনা হয়ে গেছেন! অবশ্য আপত্তি থাকলে—

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ না, আপত্তি নয়। তবে কথাটা হলো—মানে—

সুলতানকে থতমত করতে দেখে কালাপাহাড় সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আচ্ছা থাক জনাব, ওসব কথা থাক। এযাযত পেলে আমি আজ আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

ঃ আর একটা কথা? বেশ, বলুন—

ঃ হুড় হাঙ্গামায় থাকার দরুন অনেকদিন যাবত ব্যাপারটা আর জানাই হয়নি। দৌলতজাহান আম্মির কি জনাব আর কোন হদিসই পেলেন না?

সুলতানের চোখমুখ রোশনাই হয়ে উঠলো। তিনি উল্লাসভরে বললেন—পেয়েছি চাচা হুজুর, পেয়েছি—পেয়েছি!

সমধিক উল্লাস ভরে কালাপাহাড় বললেন—

এ্যাঁ! সেকি! পেয়েছেন?

ঃ জি চাচাজান। সেরেফ হদিসই পাইনি, মোলাকাতও করে এসেছি তাঁর সাথে।

ঃ বলেন কি! এতবড় একটা উমদা খবর জনাব এতদিন বিলকুল চেপে রাখলেন?

ঃ চেপে নয় চাচা, বলার মওকা পেলাম কোথায়? যে তুফানের মধ্যে দিন কাটলো আমাদের!

ঃ কোথায় আছেন তিনি? কেমন আছেন তাঁরা?

ঃ আছেন তাঁরা পুরীতে। দৌলতজাহান বর্তমানে ভালই আছেন। কিন্তু তাঁর আম্মাজান দীর্ঘদিন যাবত বিমারে শয্যাশায়ী।

ঃ তাই নাকি? আর খান সাহেব? মানে মুরাদ খান সাহেব?

ঃ তিনিও এখন ভালই আছেন। তবে তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য একদম ভেঙে গেছে।

ঃ জনাব!

সালার কালাপাহাড়ের কণ্ঠে সমবেদনা ফুটে উঠলো। সুলতান দাউদ খান এবার দৌলতজাহানদের তামাম কথা বর্ণনা করে শোনালেন। শোনার পর কালাপাহাড় সাহেব ইতস্তত করে বললেন—তা জনাব, তিনি কি এখন আর জনাবকে কবুল করতে আগ্রহী আছেন?

ঃ বড় শক্ত প্রশ্ন চাচা। তিনি এখন এক চরম মনোভাব ধারণ করে আছেন। দিল্লীর সাথে সংঘর্ষে আমার চূড়ান্ত কামিয়াবী বা চূড়ান্ত ব্যর্থতা—এই দুই অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় তিনি এখন আমাকে কবুল করতে আগ্রহী আছেন, এর মাঝপথে নয়।

কিঞ্চিৎ নীরব থেকে কালাপাহাড় সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—যে তেজী মেয়ে তাতে এমন সিদ্ধান্ত নেয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এটা তাঁকেই মানায়।

ঃ চাচাজান!

ঃ উপযুক্ত সিদ্ধান্তই উনি নিয়েছেন। এজন্যে তাঁর মানসিকতা তারিফ পাওয়ারই হকদার। এমন নিখুঁত আর আন্তরিক সিদ্ধান্ত আর দুস্‌রা কিছু হয় না।

সুলতান দাউদ খান চিন্তিতকণ্ঠে বললেন—সেই জন্যেই তো আমি এত ভাবছি চাচা। এখন যে কি আমার করা উচিত, কিছু স্থির করতে পারছিনে।

ঃ কি রকম?

ঃ কামিয়াব তো হয়েছিই আমরা যাহোক কিছু। এখন গেলে উনি আমাকে কবুল করতে পারবেন কিনা, সেই কথাই ভাবছি।

লহমাখানেক চিন্তা করে কালাপাহাড় সাহেব বললেন -না পারারই সম্ভাবনা বেশি জনাব। উনি যা চান, আমার ধারণা, জনাবের এ কামিয়াবী সে কামিয়াবী নয়।

ঃ চাচাজান!

ঃ দিল্লীর ফৌজকে আমরা পরাভূত করেছি ঠিকই, কিন্তু দিল্লীর সাম্রাজ্যটা গোটাই আমরা জয় করে ফেলিনি বা দিল্লীর শক্তিটাকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দেইনি। কখন যে আবার ছোবল মারবে তারা—

ঃ সে কথা চিন্তা করলে চাচা, দৌলতজাহানের উম্মিদ কখনো হাসিল হবে না। কারণ, মসনদে যে বসে থাকে সে কখনও বলতে পারবে না, সে অজাতশুক্র। তার মুলুক দুশমনের দ্বারা কখনও আক্রান্ত হবে না।

ঃ অজাতশক্র না হলেও শক্রকে দমন করার যথাযথ তাকত তাঁর বাজুতে থাকা চাই জনাব। হার-জিত নসীবের ব্যাপার। কিন্তু দুশমনকে তাঁর ধারণা দেয়া চাই যে, হামলা করতে এলেই প্রতিপক্ষ ঘায়েল হয়ে যাবে না, সেখানে দুশমনের নিজের বুকও ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম পরিমাণ।

ঃ চাচা হুজুর!

ঃ দিল্লীর ফৌজ পালিয়েছে আর জনাব তাঁর নিজ মুলুকের ভৌগোলিক সীমারেখাটাই লাভ করেছেন। তিনি কোন ধনসম্পদ পাননি আর নিজেকে সেখানে কায়েমিভাবে প্রতিষ্ঠা করতেও পারেননি। শ্রীহরি রায়ের বেঈমানীতে শূন্য রাজকোষ শূন্যই রয়ে গেছে। এই শূন্য কোষাগার পুনরায় পূরণ হলে এবং বাঙ্গালা মুলুকের সাবেক অবস্থার মতো আবার সৈন্যবল, অস্ত্রবল, মনোবল—সব কিছু হাসিল করতে পারলে, তবেই এই সাময়িক কামিয়াবি চূড়ান্ত কামিয়াবির রূপ গ্রহণ করবে। সে অবস্থা ফিরে পেতে তো এখনও অনেক সময়ের প্রশ্ন জনাব?

ঃ বটে! তাহলে সেই চূড়ান্ত কামিয়াবি হাসিল করতে তো আমার এই জিন্দেগীটাও খতম হয়ে যেতে পারে?

ঃ তাও অসম্ভব নয়।

সুলতান দাউদ খান শক্ত হয়ে গেলেন এবং শক্তকণ্ঠে বললেন— তাহলে আর ঐ মরীচিকার পথ চেয়ে অনর্থক কেন বসে থাকবো চাচা? ঢেঁকির রক্ত আনতে সক্ষম না হলে যদি অভিমান কারো না ভাঙ্গে, আর জিদ্ পুরণ না হয়, করলাম না তাঁর জিদ্ পূরণ!

ঃ জনাব!

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ অনেক সয়েছি চাচাজান। দীলের আকিঞ্চন পূরণ করার পেছনে আমি আমার জানটাই বিরাণ করে দিয়েছি। এরপরও এতটা আর সয়না। তাই আমি ভাবছি চাচা, এখনই আমি পুরীতে একবার যাবো। যাবো আর আসবো। আমার এই বর্তমান কামিয়াবিতে খুশি হয়ে তিনি যদি কবুল করেন আমাকে, বহুত আচ্ছা। নারাজ হলে, আল্লাহ হাফেজ। সামনে আমার অনেক কাজ। যত বেদনাদায়কই হোক, দৌলতজাহানকে নিশীথের এক দুঃস্বপ্ন গণ্য করে তাঁর স্মৃতি দীল থেকে মুছে ফেলতেই হবে আমাকে।

সুলতানের মুখমণ্ডলে বেদনা ফুটে উঠলো। তাঁর মর্মপীড়া উপলব্ধি করে সালার কালাপাহাড় আর জবাব খুঁজে পেলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনিও শেষে সায় দিয়ে বললেন—তা জনাবকে অবশ্যই একবার যেতে হবে সেখানে। আমি আমার যুক্তির কথা বললাম। কিন্তু মানুষেরই তো মন! বলা যায়না, জনাবের মুখ চেয়ে আর আপত্তি তিনি না-ও করতে পারেন।

ঃ চাচাজান!

ঃ তবে ইচ্ছে করলেই কারো স্মৃতি মন থেকে সরিয়ে দেয়া যায় না জনাব। না পাওয়ার বেদনা যদি একইভাবে উভয় দীলেই বাজে, তাহলে আর একপক্ষ অন্যপক্ষকে ভুলে থাকবে কয়দিন?

কালাপাহাড়ের কথা সুলতানের দীলে সূঁচের মতো বিধঁলো। না? পাওয়ার বেদনা যে দৌলতকেও পোড়াতে কম কিছু করছে না, সুলতান নিজেই তা জানেন। তিনি অসহায় কণ্ঠে বললেন—আমাকে কমজোর করে দিচ্ছেন চাচা হুজুর? আপনারা সবাই কি কেবল আমাকে ঝুলিয়ে রাখারই পক্ষপাতি?

কালাপাহাড় সাহেব হেসে বললেন—তা হবে কেন জনাব? আমি পরিস্থিতিটা নাজুক বলেই বলছি। আপনি যান। আমার বিশ্বাস জনাবকে আর ঝুলে থাকতে হবে না। দৌলত আম্মিও তো বসে বসে কম ভাবছেন না জনাবকে নিয়ে!

সুলতান দাউদ খান কাররানীকে এই মর্মে আরো কিছু উৎসাহ দিয়ে কালাপাহাড় সাহেব বিদায় নিলেন। এরপর দপ্তরের কাজ শেষ করতে অবেলা হয়ে গেল। কাজ শেষে মহলে ফিরে আসার কালে সুলতান স্থির করলেন, আগামীকাল মোটামুটি দায়দায়িত্ব তাঁর জঙ্গীচাচাকে বুঝিয়ে দিয়ে পরশুই তিনি পুরীতে যাত্রা করবেন এবং তড়িৎ গতিতে গিয়ে দৌলতজাহানের মনোভাবটা জেনে আসবেন। www.boighar.com

ভাবতে ভাবতে সুলতান মহলে ফিরে এলেন এবং সরাসরি তাঁর খাস কামরায় প্রবেশ করলেন। পরিশ্রান্ত হয়ে এসে পালংকের উপর বসেই এমন এক অপ্রত্যাশিত চমকে তিনি চমকে উঠলেন যে, ক্ষণিকের জন্যে সম্বিতটাই প্রায় হারিয়ে ফেললেন সুলতান। বিপুল বিস্ময়ে যা তিনি দেখলেন, তা তিনি ক্ষণকাল বিশ্বাস করতেই পারলেন না। দেখলেন,

তাঁর ফুলদানিতে দৌলতজাহানের ফুলের তোড়া! দৌলতজাহানের না হলেও, এটি এমনই একটি তোড়া যা একমাত্র দৌলতজাহানই তৈরি করতেন তাঁর জন্যে।

দৌড়ে গিয়ে সুলতান ফুলের তোড়ায় হাত দিলেন। নেড়ে চেড়ে দেখলেন, না ধাঁধা বা দৃষ্টিভ্রম নয়। অস্থির হয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ তিনি হৈচৈ করে খাসবান্দা কোরবান আলীকে তলব দিলেন। পড়িমরি ছুটে এলো কোরবান আলী। সে সামনে এসে দাঁড়াতেই সুলতান তাঁকে ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কোথায় পেলে কোরবান আলী? এ তোড়া তুমি কোথায় পেলে? কে এনেছে এটা?

বুঝতে পেরে কোরবান আলী মাথা নিচু করলো এবং স্মিতহাস্যে বললো—দৌলতজাহান বেগম সাহেব, হুজুর।

আর একদফা চমকে উঠলেন সুলতান। হতবুদ্ধি হয়ে বললেন—দৌলতজাহান!

ঃ জি হুজুর। তিনিই এই তোড়া এনে এই ফুলদানিতে রেখে গেলেন।

ঃ সেকি! কোথায় তিনি?

ঃ এই মহলেই আছেন হুজুর।

ঃ এই মহলে!

ঃ আম্মাবেগম হুজুরাইন সহ হুজুরের পরিবারবর্গের সকলেই আজ জোহরের ওয়াক্তের অনেক আগেই উড়িষ্যা থেকে ফিরে এসেছেন। ঐ দৌলতজাহান হুজুরাইনও তাঁদের সাথেই এসেছেন।

সুলতান আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বান্দার সামনে বেসামাল হওয়া ঠিক নয় বোধে নিজেকে তিনি সবলে কিছুটা সংযত করে নিয়ে তখনই আবার প্রশ্ন করলেন—বলো কি! উনি কি তাহলে একাই এসেছেন?

ঃ জি না হুজুর। উনার আম্মাজান আর মুরাদ খান সাহেবও এসেছেন। উনার আম্মাজান এখন অনেকখানি সুস্থ।

ঃ সোবহান আল্লাহ!

সুলতানের ইংগিতে কোরআন আলী বেরিয়ে গেল। সুলতান তখনই ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর আম্মাজানের খাস কামরায় ছুটলেন। আম্মাবেগম খাস কামরায় একাই ছিলেন তখন। সুলতান ছুটে এসে তাঁকে কদমবুঁসি করতেই আম্মাবেগম সুলতানকে তুলে নিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দাশ্রু সহকারে তিনি কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

কুশলাকুশলের পর পাশাপাশি বসে মাতাপুত্র কিছুক্ষণ রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলাপসালাপ করলেন। এরপর আম্মাবেগম বললেন—একটু বসো বাপজান, আমি এক্ষুণি আসছি। চলে যেও না যেন। আরো একটা জরুরি কথা আছে তোমার সাথে।

আম্মাবেগম কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। আম্মাজানের পালংকে বসে সুলতান

বইঘর.কম ও রোকন
দাউদ খান সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন, আম্মাজানের আরো একটা জরুরি কথা মানে? কি কথা আছে আম্মাজানের? কি বলতে চান তিনি? কথাটা তার দৌলতজাহানকে নিয়ে কি? সেই সাথে সুলতান আরো ভাবতে লাগলেন, দৌলতজাহানের কথাটা আম্মিজানের কাছে কোন প্রসঙ্গে তোলা যায়? দৌলতজাহানের এখানে আসার পেছনে আম্মিজানের কোন ভূমিকা আছে কি? থাকলে তা কি ধরনের, আর তা কতখানি?

"আম্মি হুজুর, আমাকে জরুরি তলব দিয়েছেন, আম্মি হুজুর?"—বলতে দৌলতজাহান দ্রুতপদে এসে আম্মাবেগমের খাস কামরায় ঢুকলেন। আম্মাবেগমের পালংকের দিকে নজর দিয়েই তিনি চমকে গিয়ে বললেন—ওমা-সেকি!

জেনানা মহল বলে দৌলতজাহানের মাথায় বোরকার বদলে শুধু তাঁর ওড়নাখানাই তুলে দেয়া ছিল। সেই ওড়না আরো টেনে দিয়ে হাসি মুখে তৎক্ষণাৎ তিনি প্রস্থান করলেন।

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দৌলতজাহানকে সুলতানও এখানে কল্পনা কতে পারেননি। ফলে, তিনিও লহমা খানেক চমকের মধ্যেই রইলেন। দৌলতজাহানকে চলে যেতে দেখে তাঁর চমক ভাঙলো। তৎক্ষণাৎ তিনি শশব্যস্তে বললেন—আরে-আরে! যান কেন? দাঁড়ান—দাঁড়ান—

দৌলতজাহান থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সুলতান ফের বললেন—আসুন—আসুন—। ঐ আসনে বসুন—

ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌলতজাহান ইতস্তত করে বললেন—কিন্তু—

দাউদ খান বললেন—আম্মিজান একটু বেরিয়ে গেলেন। এই এক্ষুণি এসে পড়বেন। বসুন—

দৌলতজাহান শরম পেলেন। শংকিত কণ্ঠে বললেন—তাহলে?

ঃ আরে! তাহলে আবার কি? আমিই তো বসতে বলছি আপনাকে?

ঃ কিন্তু আম্মি হুজুর—

ঃ সেটা আমি দেখবো। আগে বসুন তো। অদম্য কৌতূহলে দম আমার বন্ধ হয়ে এসেছে। আগে আমাকে দম নেয়ার ফুরসুত দিন।

ঃ দম?

ঃ হ্যাঁ দম। দম যে আমার সরছে না। আপনি হঠাৎ এখানে—মানে একদম এই তাণ্ডার হেরেমে! একি আজব কাণ্ড! দুনিয়াটা উল্টে যাওয়ার মতো একি তাজ্জব ব্যাপার! মাথায় যে কিছুই আমার ঢুকছে না।

ওড়নাটাকে ঘোমটার আকারে আরো খানিক নামিয়ে দিয়ে দৌলতজাহান সামনের একটা আসনে জড়সড় বসলেন এবং স্মিতহাস্যে বললেন—তাই?

ঃ তাই মানে? জান ছেড়ে দিয়েও নিজে আমি আপনাকে এতটুকু সদয় করতে

পারিনি। হেরেমের নামে আপনি যেখানে একদম নারাজ, সেই আপনি হেরেমে! হঠাৎ এতটা রহম কেমন করে দীলে আপনার এলো?

ঈষৎ মুখ তুলে দৌলতজাহান সহাস্যে বললেন—জনাব যে খুবই তাজ্জব হবেন, তা আমি জানতাম।

ঃ হবো না? এ যে আসমান থেকে চাঁদটাই স্বইচ্ছায় জমিনে নেমে আসা। এতটা খোশ কিস্‌মতি আমি কেমন করে কল্পনা করি?

পুনরায় ঈষৎ হেসে দৌলতজাহান বললেন—যা ভাবা যায় না, অনেক সময় তা-ই হয়।

ঃ কেমন করে হলো? আপনি কি স্বইচ্ছায় চলে এলেন?

ঃ তাই কি জনাবের মনে হয়?

ঃ তা হয় না বলেই তো এত কথা বলছি।

ঃ আমাকে টেনে আনা হয়েছে।

ঃ টেনে আনা হয়েছে! কে টেনে আনলো?

ঃ খানিকটা নানাজন আর অধিকটা জনাব নিজে।

ঃ তার মানে?

ঃ জনাব আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আসার পর আমার ভাবী, মানে আমার এককালের সঙ্গী ঐ গজনবী সাহেবের স্ত্রী ফিরোজা বানু বেগম আমাদের ঠিকানাটা জেনে ফেললেন। আর যায় কোথায়? তিনি এসে বার বার আমার উপর ভয়ংকর চাপ সৃষ্টি করলেন। এর পরেই এলেন আম্মি হুজুর। মানে জনাবের আম্মিজান। জনাব বোধহয় তখন তাণ্ডার দিকে লড়াইয়ে বেরিয়েছিলেন। আম্মি হুজুর এসে যে কাণ্ড করলেন, তা বর্ণনার অতীত। তিনি যেন তাঁর কোন এক হারানো মেয়েকে হঠাৎ করে খুঁজে পেলেন আবার। এসেই তিনি আমাকে আবেগভরে জড়িয়ে ধরে কোলের উপর তুলে নিলেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে আদর সোহাগের সাথে এমন নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলেন যে, আমি আর প্রতিবাদ করার ভাষা খুঁজে পেলাম না। সেই সাথে আমার আম্মাজানের কাছেও এমন কাতরকণ্ঠে তিনি বার বার মাফ চাইতে লাগলেন যে, আম্মাজানও তাঁর অতীতের তামাম ব্যথা বিলকুল ভুলে গেলেন। তিনিও আর নারাজ হতে পারলেন না।

ঃ তারপর?

ঃ উড়িষ্যা থেকে এই সপরিবারে তাণ্ডায় আসার সময় আম্মি হুজুর পুনরায় পালকি নিয়ে নিজে আমাকে আনতে গেলেন এবং আমরা সপরিবারে তাঁর সাথে তাণ্ডায় আসতে রাজী না হলে পালকি তিনি তুলবেন না বলে জিদ ধরে বসে রইলেন। সঙ্গে ফের ঐ ফিরোজাভাবীও ছিলেন। আমি রাজী না হলে উনি আমাকে চুল ধরে পালকিতে তুলে নেবেন বলে সস্নেহ শাসনে আমাকে অবশ করে দিলেন। এতটার পর না এসে কি আর করি আমি বলুন?

বইঘর.কম ও রোকন

দৌলতজাহান হাসতে লাগলেন। দাউদখান কিছুটা ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন—ও, তাহলে ওঁদের হাত এড়াতে না পেরেই আপনি বাধ্য হয়ে এসেছেন? দীলের টানে আসেননি?

ঃ তাই বুঝি?

ঃ আপনার কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।

ঃ ওঁদের হাতগুলো কি জনাবের হাতের চেয়েও বেশি শক্ত হাত, না আমার জন্যে জনাবের হাতের চেয়ে এ দুনিয়ার আর কোন শক্ত হাত আছে? সেই জনাবের হাতই যদি এড়িয়ে যেতে পারি আমি, তাহলে ওঁদের হাত এড়ানোটা এতই কি কঠিন ছিল আমার কাছে?

ঃ তাহলে?

ঃ উনারা সবাই হলেন উপলক্ষ্য। এখানে আমাকে টেনে এনেছেন জনাব নিজে।

ঃ আমি নিজে!

ঃ জনাবের এই ইনাম।

দৌলতজাহান তাঁর গলায়-পরা সুলতানের সেই মালাটি টেনে দেখালেন। সুলতান দাউদ খান আপ্লুত কণ্ঠে বললেন—আমার ইনাম?

ঃ কি যে যাদুর ফাঁস জনাব আমার গলায় জড়িয়ে দিয়ে এলেন, যার নিরন্তর টানে আমি প্রাণান্ত হয়ে গেলাম। না পারি একে গলা থেকে খুলতে, না পারি একে বুকে নিয়ে স্থির হয়ে থাকতে। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, শয়নে, স্বপনে—সর্ব অবস্থায় এই দুরন্ত দুশমন আমাকে এক লহমার জন্যেও জনাবকে ভুলে থাকতে দিলে না। কি যে আমার হলো! অতীতের তামাম গ্লানি আর বর্তমানের তামাম যুক্তি, তামাম বিবেচনা, সবই আমার পানি হয়ে গেল। জনাবের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

সুলতান দাউদ খান বিহ্বল কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন—দৌলতজাহান!

ঃ জনাবের তাবত খবরের দিকে আমি কান পেতে রইলাম। আলাহ তায়ালার পরম করুণায় জনাবের এই কামিয়াবির খবর যখন আমার কাছে পৌঁছলো, তখন আমার এমন অবস্থা হলো যে, পাখা থাকলে হয়তো বা নিজেই আমি উড়ে আসতাম এই তাণ্ডায়।

ঃ দৌলত!

ঃ এমত অবস্থায় আম্মি হুজুরের এই আহ্বান আর এই দরদ আমি উপেক্ষা করতে পারি কখনোও?

ঃ কি আনন্দ! কি খোশনসিব! আমার উপর আল্লাহ তায়ালার একি অপার করুণা!

সলজ্জ হাসিমুখে দৌলতজাহান মাথা নীচু করলেন। সুলতান ফের বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—আমি ধন্য দৌলত। সত্যিই আমি নিজেকে খুবই ধন্যবোধ করছি।

ঃ এবার আমার কসুর মেহেরবানি করে মাফ করলে আমিও ধন্য হই।

সুলতান সোল্লাসে বলে উঠলেন—মাফ-মাফ—বিলকুল মাফ!

পরক্ষণেই হোঁচট খেয়ে বলে উঠলেন—এ্যাঁ! মাফ মানে! কসুর করলাম আমি আর আমিই আবার মাফ করবো মানে? কভ্‌ভি নেহি। উও কভ্‌ভি নেহি হো সাক্‌তা—কভ্‌ভি নেহি।

সুলতান হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার শুরু করলেন। দৌলতজাহান চমকে উঠে চাপা কণ্ঠে বললেন—আরে ছিঃ! একি? আম্মি হুজুর এসে পড়তে পারেন তো।

হুঁশ ফিরতেই দাউদ খান ফের থম্‌কে গিয়ে বললেন—এ্যাঁ? হ্যাঁ-হ্যাঁ,তাই তো। নির্ঘাত আমাকে বেয়াদব সমঝে নেবেন।

ঃ তবে? আমি যাই—

দৌলতজাহান উঠতে গেলেন। দাউদ খান বাধা দিয়ে বললেন—আরে না-না, প্রশ্ন আমার শেষ হয়নি। আচ্ছা, আমার কথা আলাদা। কিন্তু আম্মিজান আপনার ব্যাপারে এতটা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলেন কি কারণে?

ঃ কি জানি! আমার জন্যে তাঁর আওলাদের এন্তার হা-হুতাশ হয়তো তাঁর কানেও পড়েছে।

ঃ দৌলত!

ঃ শিপ্রাদেবীর মতো একজন অনাত্মীয় আউরত একদিন দেখেই জনাবের দীলের খবর করতে পারলেন। আর নিজের গর্ভধারিণী জননী হামেশাই দেখে নিজ পুত্রের মন বুঝতে পারবেন না?

ঃ আলবত আলবত। ঠিক ধরেছেন।

ঃ আমি যাই—

ঃ আহ্‌হা! বসুন না? আরো কথা আছে।

ঃ জনাব!

ঃ আচ্ছা, সেবার আপনার মুখ দেখে মনে হলো, একদম পোড়া কাঠ। আজ দেখে মনে হচ্ছে বিলকুল সেই সাবেক মুখ! সেই বজরাঘাটের কদমতলায় দেখা বিলকুল সেই ডানাকাটা পরী। ব্যাপার কি?

শরম পেয়ে দৌলতজাহান মেঝের দিকে নজর দিলেন। দাউদ খান ফের বললেন—এতটা পরিবর্তন কি করে সম্ভব হলো?

মাথা না তুলেই দৌলতজাহান হাসিমুখে বললেন—তা আমি কি করে বলবো?

ঃ সত্যি বলছি, আমি তাজ্জব হয়ে গেছি!

দৌলতজাহান কিঞ্চিৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জনাব, দীলের আলো নিভে গেলে, দেহের আলো থাকে না। দীলে আবার আলো জ্বললে দেহের আলো জ্বলে উঠতে আর কতক্ষণ?

সুলতান জাররা রসিকতা করলেন। বললেন—তাই নাকি? দীলে আবার সত্যিই তাহলে আলো জ্বলে উঠেছে? সেই সাবেক আলো?

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ আমি জানিনে।

এই মুহূর্তে আম্মা বেগম কক্ষে ফিরে এলেন। দৌলতজাহানকে দেখেই তিনি খোশ দীলে বলে উঠলেন—আরে! এই যে আম্মিজান! তুমি এখানে? তোফা তোফা! তোমাকেই তো তালাশ করছি আমি?

চমকে উঠে দৌলতজাহান আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন। শরমে তিনি জবাব দিতে পারলেন না। জবাব দিলেন সুলতান দাউদ খান। তিনিও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আম্মিজান নাকি তলব দিয়েছেন ওঁকে? উনি এসে তাই এন্তেজারে আছেন।

আম্মিজান তৃপ্তকণ্ঠে বললেন—বহুত আচ্ছা-বহুত আচ্ছা। তা বাপজান, যেজন্যে তোমাকে বসতে বললাম। তোমার এই বীরত্বপূর্ণ কামিয়াবির জন্যে জরুর তুমি ইনাম পাওয়ার হকদার! তাই আমি বুকভরা স্নেহ আর দোয়াই শুধু তোমার জন্যে আনিনি, ইনামও এনেছি। এই তোমার ইনাম বাপজান।

—আম্মাবেগম দৌলতজাহানের লজ্জানত মুখখানা তুলে ধরলেন। শরমে দৌলতজাহান চোখ বন্ধ করলেন। সুলতান দাউদ খান শরমিন্দা ভাবে মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন। আম্মাবেগম ফের বললেন—আমারই জন্যে তমি একে হারিয়েছিলে। তাই আমিই আবার এনে দিলাম। আমার দাযিত্ব শেষ বাপজান।

আম্মাবেগম তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

০ ০ ০

আম্মা বেগমের দীর্ঘদিনের অপূর্ণ সাধ শেষে পূরণ হলো। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় আর সেনাপতি কালাপাহাড়, মুরাদ খান, মাসুম গজনবী, কোরবান আলী, ফিরোজাবানু, দিনারবানু প্রভৃতি নিরতিশয় উৎসাহী লোকসহ অন্যান্য সভাসদ ও সালার সেপাইয়ের বিপুল উদ্যোগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুলতান দাউদ খান কাররানীর সাথে দৌলতজাহান বেগমের শাদি মুবারক সুসম্পন্ন হলো।

নয়া জিন্দেগী শুরু হলো সুলতান দাউদ খান কাররানী ও দৌলতজাহান বেগমের। পরমতম পাওয়ার নিবিড়তম আনন্দে বঞ্চিত জীবন তাদের কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রং-রস-গন্ধ ভরা নয়া জিন্দেগীর মদিরা তাঁরা পেয়ালার পর পেয়ালা পান করতে লাগলেন। রসঘন জীবনের সমধুর স্বাদে তাঁরা ধন্য হলেন, তৃপ্ত হলেন।

প্রিয়ার প্রেরণা লাভে দাউদ খান কাররানী অধিকতর সজীব হয়ে উঠলেন। কর্মের প্রতি আগ্রহ তাঁর দুইগুণ বেড়ে গেল। অফুরন্ত প্রাণ নিয়ে এখন তিনি সাঁঝ-সকাল সমানে কাজ করেন। কাজ অন্তে দৌলতজাহান প্রেমের পরশ দিয়ে তাঁর তামাম ক্লান্তি মুছে নেন। আনন্দ দেন, উৎসাহ দেন, হতাশায় ঢেলে দেন আশার অমিয় ধারা।

দৌলতজাহান বেগম এখন সুলতান দাউদ খানের প্রণয়িনীই নন শুধু,তিনি এখন সুলতানের বিশ্বস্ত সঙ্গী, পরম বন্ধু ও সুখ-দুঃখের দোসর। পরামর্শ ও পরিকল্পনায় তিনি এখন সুলতানের একান্তই পয়লা জন। তাঁদের মাঝে এখন শুধু প্রেমের গল্পই হয়না,

বইঘর.কম ও রোকন
রাজনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক গল্প হয়। সুলতান রাতভর লড়াই, রাজনীতি ও প্রশাসনের অনেক গল্প করেন। দৌলতজাহান নিবিষ্ট চিত্তে সেসব গল্প শুনেন এবং প্রয়োজনে মাঝে মাঝে মন্তব্যও রাখেন।

সেদিনও শুয়ে শুয়ে সুলতান দাউদ খান দৌলতজাহান বেগমকে বাঙ্গালার রাজনীতির অতীত ঘটনাবলী এক এক করে শোনাচ্ছিলেন। সুলতান বায়াজিদ খানের হত্যা, লোদী খানের মৃত্যু, গুজার খানের প্রাণদান, মুনিম খানের মহত্ত্ব এমন কি আকবর শাহর নির্লজ্জ লোভ, শ্রীহরির বেঈমানী, কতলু খানের পরিবর্তন—সব কিছুই এক এক বয়ান করে যাচ্ছিলেন। শুনতে শুনতে এক সময় দৌলতজাহান বললেন—আচ্ছা জনাব, কতলু খান লোহানী সাহেব তো বাঙ্গালার বাহিনীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এখন। কিন্তু তাঁকে কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করা যায়?

গল্প বলা বন্ধ করে সুলতান প্রশ্ন করলেন—কেন বগেম?

দৌলতজাহান বললেন—শিপ্রাদেবীর কাছে আমি যতদূর শুনেছি, তাতে তিনি একজন গাদ্দার। জ্ঞানবুদ্ধিহীন এই লোকটাকে নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে রায়বাবুরা নাকি তাঁকে নিয়েই অবিরাম খেলেছেন! নানারকম অকর্মে কুকর্মে রায়বাবুরা নাকি তাকেই বারবার উস্‌কে দিয়েছেন।

সুলতান দাউদ খান নীরব হলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তাহলেও আমার কিছু করার নেই বেগম।

ঃ কেন জনাব?

ঃ বাঙ্গালার সেপাইদের বিপুল এক অংশ এই কতলু খান লোহানীর হাতে। কতলু খানকে বেহাত করলে ঐ বিপুল সংখ্যক লোহানী সেপাইরা আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। আকবর শাহ যেখানে বাঙ্গালার বিরুদ্ধে অনুক্ষণ ছুরি ধরে আছেন, সেখানে আমি বাঙ্গালার শক্তি কমজোর করি কি করে?

ঃ কিন্তু দিল্লীর হামলা তো এখন আর নেই?

ঃ না থাকলেও তা থাকতে আবার কতক্ষণ। হিংস্রকে কি কখনও বিশ্বাস করা যায়?

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ বর্তমানের এই কামিয়াবির পেছনে আমাকে আমার বিপুল সংখ্যক সেপাই কোরবানি দিতে হয়েছে। সৈন্যবল আমার এখন অত্যন্ত সীমিত হয়ে গেছে। নেমকহারাম শ্রীহরি রায়ের বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। অর্থ বলতে—হাতে আমার এখন এমন কিছু নেই, যা দিয়ে আমি অচিরেই নয়া বাহিনী তৈরি করতে পারি। বাঙ্গালার অবশিষ্ট সেপাইয়ের সাথে কতলু খানের ঐ অনেকগুলো সেপাই-ই আমার এখন শক্তি। এদের আমি ক্ষুব্ধ করি কি করে!

ঃ কিন্তু ঐ অনেকগুলো সেপাই নিয়ে চরম মুহূর্তে আবার যদি—

বইঘর.কম ও রোকন

ঃ না বেগম সাহেবা। সেদিক আমি বিবেচনা করে দেখেছি। তা তিনি করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

www.boighar.com

ঃ আলমপনা!

ঃ কতলু খানের মধ্যেই যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। অতীত আচরণ ত্যাগ করে তিনি এখন বাঙ্গালা মুলুকের স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। দিল্লীর বিরুদ্ধে এ যাবত আমাদের তামাম লড়াইয়ে তার মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের কোন আলামতই পরিলক্ষিত হয়নি। বরং তিনি সর্বত্রই জান ছেড়ে দিয়ে লড়েছেন।

ঃ তবু একজন গাদ্দারকে বিশ্বাস কি জনাব? আবার কোন প্রলোভনে পরে যদি বেঈমানী করে বসেন?

সুলতান এবার কিঞ্চিৎ বিব্রত কণ্ঠে বললেন—তা করলে শুধু কতলু খান কেন বেগম? আমার যে কোন সালার বা ফৌজদারও তা করতে পাবেন!

ঃ জনাব!

ঃ আমার কোন উপায় নেই বেগম। সকলের একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, অটুট ঈমান আর একতাই আমার এই ক্ষুদ্র বাহিনীর একমাত্র বল। কেউ বেঈমানী না করলে, আমার সালার-ফৌজ সকলেই যে রকম দক্ষ, তাতে ইনশাআল্লাহ্ আমি অপরাজেয়। বেইমানী করলে সেটা আমার নসিব। আমার বিপর্যয় সে ক্ষেত্রে অনিবার্য। এখানে আমার কোন হাত নেই।

ঃ জনাব!

ঃ এ অবস্থা কবুল করে নিয়েই আমাকে এগুতে হবে বেগম। আমার কোন অর্থ নেই, আর তাই এর কোন বিকল্পও এখন আমার নেই। বিশ্বাস আমাকে করতেই হবে।

দৌলতজাহান নীরব হয়ে গেলেন। বাস্তব এই অবস্থাকে তিনি আর অস্বীকার করতে পারলেন না। সুলতান দাউদ খানও এরপর আর কোন কথা বললেন না। উভয়েই অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর দৌলতজাহান আবার ইতস্তত করে বললেন—কসুর না নিলে আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম জনাব!

দাউদ খান বললেন—কোন সংশয় না রেখে বেগম সাহেবা তার মনোভাব ব্যক্ত করবেন, এই তো আমি কামনা করি বেগম?

ঃ কথাটা আমার অনেকটা বুঝদীলের মতো নাজুক কথা জাঁহাপনা! কাপুরুষ মাফিক কথা। তবু—

ঃ নিঃসংকোচে বলুন।

ঃ দিল্লীর বাদশাহর সাথে কি কোন মিটমাট করে নেয়া যায় না?

সুলতান দাউদ খান কাররানী পুনরায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর তিনি ম্লান কণ্ঠে বললেন—মিটমাট মানেইতো আকবর শাহর অধীনতা কবুল করা বেগম। তাঁর হুকুমের গোলাম হয়ে থাকা।

ঃ কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাসে তো দেখা যায় জনাব যে, অনেক বিশ্ববিখ্যাত বাহাদুরই একজন মাত্র খলিফার নেতৃত্ব অম্লানবদনে কবুল করে নিয়ে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেছেন?

ঃ যথা?

ঃ যথা, খালেদ বিন-আল-ওয়ালিদ, আমর-ইবনে-আল-আ'স্, হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ, মুহম্মদ-বিন-কাসিম, মুসা, তারিক—প্রমুখ বিশ্বের সেরা বাহাদুরেরাই তো একজন খলিফার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেছেন। তাঁরা পৃথক পৃথক আজাদ মুলুক প্রতিষ্ঠা করতে যান নি?

ঃ মা'শাআল্লাহ! বেগম সাহেবার এই গভীর এলেম তারিফ পাওয়ারই হকদার। তিনি কি বলতে চান, আরো খোলাসা করে বলুন—

ঃ আমি এই বলতে চাই জনাব, এই হিন্দুস্থানে দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহই এখন মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি। তাঁর প্রতিনিধি হয়ে থাকাকে কি জনাব খুবই অগৌরবের কিছু বলে বিবেচনা করেন?

ঃ মনেপ্রাণে করি।

ঃ জনাব!

ঃ ফ্যাক্ড়াটাতো এখানেই বেগম। একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের নেতৃত্ব মেনে নেবে, এ নিয়ে তো কথা নেই। কিন্তু একজন নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলমান ও বেদাতির নেতৃত্ব একজন মুসলমান কবুল করবে কিভাবে?

ঃ মেহেরবান!

ঃ অতীতের যে সব খলিফাদের প্রসঙ্গ বেগম সাহেবা টানলেন,তাঁরা সবাই ছিলেন আগে মুসলমান, পরে খলিফা বা রাজা-বাদশাহ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার ও সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার সাথে ইসলামের মাহাত্ম্য অর্থাৎ তৌহিদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। যেসব বাহাদুরের নাম বেগম সাহেবা বললেন, তাঁরাও সবাই ছিলেন দীন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম। দীন ইসলামের পতাকাবাহী একজন কেন্দ্রীয় নেতার নেতৃত্ব তো তাঁরা সানন্দে মেনে নেবেনই! আর তা নেয়াটাই তো তাঁদের জন্যে ফরজ।

ঃ জাঁহাপনা।

ঃ এটা তো তাঁদের অনিহার বিষয় নয়, এটা তাঁদের এক মস্তবড় খোশ কিস্‌মতি। কিন্তু বাঙ্গালার সুলতান সেই দুর্লভ খোশ-কিস্‌মতী আর পেলেন কৈ বেগম?

ঃ জনাব।

ঃ সেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা আকবর শাহর কোথায়? দীন ইসলামের মাহাত্ম্য সমুন্নত রাখার তিল পরিমাণ সদিচ্ছাও আকবর শাহর নেই। আগে তিনি বাদশাহ পরেও তিনি বাদশাহ। নাম-কা-ওয়াস্তে মুসলমান যেমন হয় ঠিক তেমনই,

বইঘর কম ও রোকন
ইসলামের বিধান আকবর শাহর কাছে নিতান্তই একটি নগণ্য বিষয়। তিনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চান না, তিনি চান নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। সবার উপরে নিজের অধিকার ও নিজের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। সেই লক্ষ্য হাসিল করার সুবিধার্থে সহির বদলে বাতিলকে, জায়েজের বদলে না-জায়েজকে আর সুন্নাতির বদলে বেদাতিকে তিনি নির্দ্বিধায় কবুল করে নিচ্ছেন এবং প্রাধান্য দিয়ে চলেছেন। ছল বল, কলা কৌশল, চালাকি চাতুরী যে কোন উপায়ে হিন্দুস্তানের উপর তিনি তার নিজের প্রাধান্য বিস্তারের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। মর্যাদা পাওয়ার পরিবর্তে দীন ইসলাম তাঁর হাতে লাঞ্ছিতই হচ্ছে শুধু।

ঃ সেকি আলমপনা!

ঃ আমি ঐ সব মহান খলিফাদের কথা বলিনে, খোলাফায়ে রাশেদীন তো নয়ই, তাঁদের একজন নিম্নমানের সাহাবার কথাও বলিনে। যদি আকবর শাহরই কর্মচারী খান-ই খানান মুনিম খানের মতোও একজন ঈমানদারি কেউ দিল্লীর তখ্‌তে থাকতেন, তাহলেও তার প্রতিনিধি হয়ে বাঙ্গালা মুলুক শাসন করাকে আমি গৌরবের কাজই মনে করতাম। কিন্তু নির্লজ্জ আগ্রাসী আকবর শাহর মতো একজন ফাসেক ও বেদাতির নেতৃত্ব কবুল করলে আমার নিজের ঈমান থাকে কোথায়? এমন অবস্থা মেনে নেয়ার চেয়ে মউতকেই আমি অগ্রাধিকার দিই।

ঃ অবশ্যই জনাব, অবশ্যই। কিন্তু মুনিম খান সাহেব তাহলে—

ঃ উনি পেটের দায়ে আকবর শাহর নকরী করছেন। কোন জাতির বা রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব তাঁর কাঁধে নেই। আর আমার মতো তা রাখা বা বিকিয়ে দেয়ার প্রশ্নের সাথেও জড়িত তিনি নন।

ঃ ঠিকই জনাব। প্রকৃত অবস্থা না জেনে এমন প্রস্তাব তুলে আমি জনাবের তকলিফেরই কারণ হয়েছি। আমার কসুরের জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ঃ প্রকৃত অবস্থাটা এমনই বেগম। সুতরাং আকবর শাহর সাথে আমার কোন আপস নেই। দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমি সংগ্রাম করে যাবো। এরপর আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা।

ঃ তাই হোক জনাব। আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাই পুরণ হোক।

সতের

নিশ্চিন্তে দাম্পত্য জীবন ভোগ করার কিস্‌মত সুলতান দাউদ খান কাররানী পক্ষকালও পেলেন না। এর মধ্যেই খবর এলো দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ আবার তাঁর আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে দিয়েছেন। হোসেন কুলি বেগের অধীনে বিশাল এক দিল্লীবাহিনী আবার বাঙ্গালার দিকে ছুটে আসছে।

মুনিম খানের মৃত্যু, দিল্লীর ফৌজের পলায়ন এবং দাউদ খানের বাঙ্গালা মুলুক পুনর্দখলের খবর যুগপৎ দিল্লীতে এসে পৌঁছলে দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ মাথায় হাত

দিলেন। তাঁর দীর্ঘদিনের তামাম সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। যে বেইজ্জতির ভয়ে তিনি এত ফৌজ, এত অর্থ আর এত মগজ ক্ষয় করলেন, সেই বেইজ্জতিই কায়েমত হয়ে গেল দেখে তিনি আওয়ারা হয়ে গেলেন। এতবড় কলংক নিয়ে উঁচু মাথা আর উঁচু রাখতে পারবেন না বুঝে আকবর শাহ্ আবার নয়া উদ্যম সঞ্চয় করে বাঙ্গালা জয়ে প্রবৃত্ত হলেন। মুনিম খানের স্থানে তিনি এবার তাঁর নীতি আদর্শহীন হীনমন্য এক সালার হোসেন কুলি বেগকে 'খানজাহান' উপাধি দিয়ে বাঙ্গালা বিজয়ের তামাম দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করলেন এবং দিল্লীর ঘাঁটি উজাড় করে শুমারহীন সেপাইয়ের এক বিশাল বাহিনী তাঁর অধীনে নিয়োগ করলেন।

বিশাল এই বাহিনী নিয়ে খানজাহান হোসেন কুলি বেগ বিহারে ছুটে এলেন। সেখানে এসে তোডরমল ও অন্যান্য সালারদের সাথে মিলিত হয়ে তিনি পলায়নরত দিল্লীর ফৌজকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে ফিরিয়ে আনলেন। সবাইকে একত্র করে নিয়ে খানজাহান হোসেন কুলি অতঃপর বাঙ্গালার দিকে ধাবিত হলেন।

হোসেন কুলির অভিযানের খবর পেয়েই সুলতান দাউদ খান কাররানী তাঁর রণবিদদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন। কালাপাহাড়, জুনায়েদ খান ও অন্যান্যদের পরামর্শে সীমিত ফৌজ নিয়ে মুখোমুখি দিল্লীর ফৌজের মোকাবেলায় না গিয়ে, সুলতান দাউদ খান কৌশলগত যুদ্ধপদ্ধতি গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুলতান আগে বাঙ্গালার প্রবেশ পথ তেলিয়াগড়ের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করলেন এবং সেই সাথে শরকি-গলিতেও একদল সেপাই বসিয়ে দিলেন। অতঃপর সুলতান এক কৌশলগতস্থান রাজমহলের ময়দানে সৈন্য সমাবেশ করলেন। একদিকে রাজমহলের পাহাড় অন্যদিকে সুবিশাল গঙ্গানদী। মাঝখানে পাহাড় থেকে গঙ্গার দিকে ঢালু এক সংকীর্ণ ভূখণ্ড। এর পরেই রাজমহলের প্রশস্ত ও সমতল ময়দান। ময়দানেরও একদিকে পাহাড় ও অপরদিকে গঙ্গানদী। বাঙ্গালার ফৌজকে আঘাত করতে হলে দুশমনদের ঐ সংকীর্ণ ঢালু পথ বেয়েই এই ময়দানে প্রবেশ করতে হবে। দুস্‌রা পথ নেই। নদীর তীরে কামান আর নৌবহর বসিয়ে সুলতান দাউদ খান নদীপথও রুদ্ধ করে দিলেন।

খানজাহান হোসেন কুলি সসৈন্যে এসে তেলিয়াগড়ের গিরিপথ রুদ্ধ দেখে রাজমহল পাহাড়ের ঐ ঢালু পথ দিয়েই বাঙ্গালার ফৌজের মোকাবেলায় অগ্রসর হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান দাউদ খান ঐ সংকীর্ণ ভূখণ্ডের এ প্রান্ত চেপে ময়দানে প্রবেশপথ আগ্‌লে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন। তিনি তাঁর তামাম ফৌজকে দুই কাতারে ভাগ করলেন। দুশমনদের পথ আগলে অগ্রবর্তী কাতারের মাঝখানে রইলেন "বাঙ্গালার তলোয়ার" দুর্ধর্ষ লড়াইয়া জুনায়েদ খান কাররানী। তাঁর ডাইনে রইলেন কতলুখান লোহানী, বামে রইলেন সেনাপতি জামান খান। পেছনে মূল

বইঘর.কম ও রোকন

কাতারের মাঝে রইলেন সুলতান দাউদ খান নিজে। তার পাশে রইলেন দুশমনত্রাস কালাপাহাড়, ডান প্রান্তে সিকান্দর উযবেক ও বাম প্রান্তে রইলেন সালার ইসমাইল খান আব্দুর।

পাহাড়ের ঐ সংকীর্ণ ঢালু পথে প্রমত্ত বেগে সেপাই চালনা করেই দিল্লীর সালার হোসেন কুলি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। ঐ ঢালু পথে যাত্রাকালেই তাঁর কিছু সেপাই গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার বুকে প্রাণ দিলো। ময়দানে প্রবেশ করতে এসে হোসেনকুলি দেখলেন, প্রবেশ করার পথ একদম রুদ্ধ। দুয়ারে কামান পেতে বসে থাকার মতো তাঁদের পথ আগ্‌লে বাঙ্গালার ফৌজের অগ্রবর্তী কাতার এমনভাবে অবস্থান নিয়ে আছে যে, সেখান থেকে সেটা উচ্ছেদ করে ময়দানে প্রবেশ করা প্রকৃতই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

প্রাথমিকভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হোসেন কুলি হতাশ হয়ে পেছনে ফিরে এলেন এবং রাজমহল পাহাড়ের এপারে এসে ছাউনি ফেলে বসে নিরন্তর ভাবতে লাগলেন। তেলিয়াগড়ের পথও এবার দুর্ভেদ্য। তদুপরি সেদিক দিয়ে রাজমহলের ময়দানে আসতে গেলে অনেক পথ এবং আসাটাও বিপজ্জনক। প্রতিপক্ষকে অক্ষত রেখে প্রতিপক্ষের কবজার মধ্যে ঢুকে পড়ে এতটা পথ ঘুরতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা অত্যধিক। এছাড়া, শরকি-গলিতেও বাধা আছে আর একটা। তোডরমল ও অন্যান্য সালারদের নিয়ে হোসেন কুলি ছাউনিতে বসে বসে ভাবতে লাগলেন এবং কালাতিপাত করতে লাগলেন। বিপুল ফৌজ সঙ্গে নিয়ে ভিন মুলুকের একেবারেই এক নাজুক স্থানে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। মওজুদ রসদ ছাড়া এমন স্থানে রসদ সংগ্রহের প্রশস্ত কোন রাহা নেই। মওজুদ রসদ ফুরিয়ে যেতেও অধিক সময় লাগবে না। www.boighar.com

কিছুদিন বসে বসে চিন্তাভাবনা করে তোডরমল ও অন্যান্যরা। সালারদের সাথে হোসেন কুলি বেগ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, মওজুদ রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। যতটা ফৌজ খরচ হয় হোক, বাঙ্গালার ঐ অগ্রবর্তী কাতার ভেঙে মূল কাতারের উপর চরম আঘাত হানতে হবে। সিদ্ধান্ত স্থির করে নিয়ে তামাম সেপাইসালার সহ হোসেন কুলি একযোগে অগ্রসর হলেন এবং অগ্রবর্তী কাতারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

শুরু হলো তুমুল লড়াই। বেকায়দা অবস্থায় লড়তে গিয়ে দলে দলে দিল্লীর সেপাই গড়িয়ে পড়তে লাগলো। জামান খান, জুনায়েদ খান ও কতলু খান তিনজন তিন অবস্থান থেকে সমানে দিল্লীর ফৌজের লাশ ফেলতে লাগলেন। দিল্লীর ফৌজের লাশের উপর দিয়েই দিল্লীর বাহিনী কয়েকদিন যাবত লড়াই চালিয়ে গেল। কিন্তু অফুরন্ত সেপাই খরচ করা ছাড়া তারা ফল কিছু পেলো না। বাঙ্গালার অগ্রবর্তী বাহিনী যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। ভেদ করা তো দূরের কথা, ঐ লোহ প্রাচীরের গায়ে কোথাও একবিন্দু ছিদ্র করতে পারলো না

বইঘর.কম ও রোকন
বা সেটাকে একদম পিছু ঠেলতে পারলো না। অবশেষে একদিন দিল্লীর মশহুর সালার ও হোসেন কুলির দক্ষিণ হস্ত খাজা আব্দুল্লাহ তাঁদের ছাউনির প্রায় তিন চতুর্থাংশ সেপাই নিয়ে এসে বাঙ্গালার অগ্রবর্তী কাতারের মাঝখানে জুনায়েদ খানের উপর মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জানবাজী রেখে লড়তে লাগলেন। কিন্তু ফলশ্রুতিতে জানটাই তাঁকে দিতে হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই 'বাঙ্গালার তলোয়ার' জুনায়েদ খানের তলোয়ারের ঘায়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর সেই অগণিত সেপাইরাও অতঃপর ফিরে আসতে পারল না। ইতিমধ্যেই জামান খান ও কতলু খান বেড়ার মতো তাদের দুই দিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফলে বেকায়দা জায়গায় আরো বেকায়দায় পড়ে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর দিল্লীর ঐ সেপাইরা রাজমহল পাহাড়ের সংকীর্ণ ঐ স্থানে লাশের আর এক পাহাড় রচনা করে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়লো।

খানজাহান হোসেন কুলির ছাউনিতে হাহাকার পড়ে গেল। তাঁর ঐ শুমারহীন সেপাই সংখ্যা এতটা ক্ষীণ হয়ে এলো যে, লড়াই করা পড়ে মরুক, তাঁর শিবিরের নিরাপত্তাটাও এখন প্রশ্নবোধক হয়ে উঠল। এর সাথে শুরু হলো শিবিরে আত্মকলহ। খানজাহান হোসেন কুলি ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। সেপাই ডালি দেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে দিল্লীর সুন্নী সম্প্রদায়ের সেপাইরা হোসেন কুলির নেতৃত্বে লড়াই করতে অস্বীকার করতে লাগল। সবার উপরে দেখা দিল রসদের আতংকজনক অভাব। অচিরেই দিল্লী থেকে রসদ আর সৈন্য যোগান না এলে আর যুদ্ধ জয় নয়, এতদূর থেকে দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও সংকীর্ণ হয়ে এলো।

পরিস্থিতি উপলব্ধি করে হোসেন কুলি তখনই সেখান থেকে ছাউনি তুলে নিয়ে বিহারের আরো খানিক ভেতরের দিকে সরে এলেন এবং সেখান ছাউনি ফেলে রসদ ও সৈন্য প্রাপ্তির প্রার্থনা নিয়ে রাজা তোডরমলকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন।

হোসেন কুলি বেগের যে কোমর ভেঙ্গে গেল সুলতান দাউদ খান তা বুঝতে পারলেন। এখানে বোধহয় তিনি চালে একটা ভুল করলেন। রাজমহল থেকে বাহিনী তুলে নিয়ে এসে এই মুহূর্তে হোসেন কুলির ছাউনির উপর চড়াও হলে হয়তো বা হোসেন কুলির ভাঙ্গা কোমর তিনি আরো অধিক গুঁড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কি জানি কি ভেবে তিনি তা করলেন না। হোসেন কুলি ছাউনি নিয়ে পেছন দিকে সরে এলে এবং লড়াই আপাততঃ বন্ধ হয়ে গেলে, রাজমহলের সৈন্য সমাবেশ অক্ষুণ রেখে সালার কালাপাহাড় সহ কিছু ফৌজ নিয়ে তিনি রাজধানীতে চলে এলেন এবং হোসেন কুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

পড়িমরি দিল্লীতে ছুটে এসে রাজা তোডরমল আকবর শাহর কাছে পুনর্বার দিল্লীর ফৌজের এই বিপর্যয় আর খাজা আব্দুল্লাহর মৃত্যু খবর দাখিল করার সাথে সাথে দিল্লীর

বইঘর.কম ও রোকন
বাদশাহ আকবর শাহ বিকারগ্রস্ত হয়ে গেলেন। এক অব্যক্তব্য মর্মদাহে কেবলই তিনি হাত পা ছুড়তে লাগলেন। অতঃপর তোডরমল ভয়ে ভয়ে অতি সত্বর রসদ ও সৈন্য পাওয়ার আবেদন পেশ করলে আকবর শাহ একদম ফেটে পড়লেন। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তোডরমলকে তিনি তস্করের অধিক একটানা তিরস্কার করতে লাগলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁদের এই ব্যর্থতার কারণে তাঁকে ধিক্কারের পর ধিক্কার দিকে লাগলেন।

এই বর্তমান ব্যর্থতার কারণ হিসাবে তোডরমল বাঙ্গালার ফৌজের কৌশলগত অবস্থান ও জুনায়েদ খানের উপস্থিতির কথা তুলে ধরলেন। আকবর শাহ এতে আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বাঙ্গালার একজন সাধারণ সেপাইয়ের একটা আঙ্গুলের যোগ্যও তোডরমলেরা সবাই মিলে নন বলে তোডরমলকে তিনি তিক্ত ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলেন।

তোডরমলের হজমশক্তি অসাধারণ। অম্লান বদনে কটুকথা হজম করতে দিল্লীর অনেক উমরাহ্‌র মতো তিনিও খুব পারদর্শী। এতটার পরও তোডরমল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন বা হতোদ্যম হলেন না। তিনি সবিনয়ে বললেন—প্রভু দিল্লীশ্বর, প্রভু জগদীশ্বর, রসদ ও সৈন্য প্রাপ্তিতে অধিক বিলম্ব ঘটলে,দিল্লীর ঐ অবশিষ্ট সালার সেপাই একজনও আর ঐ দূর মুলুক থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হবেনা। জগদীশ্বর!

জবাবে আকবর শাহ দাঁত পিষে বললেন—ফিরে এলেও তারা কেউ আর দুনিয়ার বুকে থাকবে না রাজা। ঐ অপদার্থদের সবাইকে আমি জীবন্ত কবর দেবো।

দুই হাত জোড় করে তোডরমল বললেন—দিল্লীশ্বর! জগদীশ্বর! একটু বিবেচনা করুন প্রভু। এতটার পর বাঙ্গালা বিজয় সম্পন্ন না করলে—

কথা তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই আকবর শাহ বললেন—বাঙ্গালা বিজয়ের জরুরত নেই আমার আর। আপনাদের হিম্মত বুঝতে আর আমার বাকী নেই।

ঃ প্রভু।

ঃ আপনারা সবাই মিলে যা পারেননি, দাউদ খানকে কাবু করতে শ্রীহরি রায় একাই তার শতগুণে অধিক কাজ করেছে। শ্রীহরি একাই বাঙ্গালার পরাজয়কে অর্ধেকটা নিশ্চিত করে দেয়ার পরও এই দীর্ঘদিন যাবত আপনাদের সবাই মিলে কিছুই করতে পারলেন না?

ঃ জগদীশ্বর!

ঃ এরপরও বাঙ্গালা জয়ের খাহেশ আর আমার সাজে? ও আশা আমার শেষ। আপনারা মরুন-বাঁচুন, তা দেখার দায়িত্বও আমার খতম। আপনি বিদেয় হোন।

ঃ আর একবার চেষ্টা করে দেখি প্রভু। কিছু রসদ আর ভারী একদল সৈন্য মঞ্জুর হলে—

আকবর শাহর গায়ে আগুনের ছেঁকা লাগলো। তিনি গর্জে উঠে বললেন—খামুশ! মতলব কি আপনাদের? আপনারা কি চান, এই দিল্লীর মসনদটাও হারাই আমি?

ঃ প্রভু দিল্লীশ্বর!

ঃ সেই পাটনার দুর্গ ভেদ করা থেকে এই রাজমহলের যুদ্ধতক্ কত ফৌজ আপনারা সবাই মিলে কোরবানি দিয়ে এসেছেন, তার হিসেব আছে? দিল্লীর সামরিক ঘাঁটিটা কি কোন ঐশ্বরিক ভাণ্ডার যে মুক্ত হস্তে বিতরণ করার পরও তা পরিপূর্ণ থাকবে? গিয়ে একবার দেখুন দেখি, সেখানে কিছু রেখেছেন নাকি সবাই আপনারা?

ঃ প্রভু!

ঃ এক বাঙ্গালা বিজয়েই আমার তামাম শক্তি খরচ করে ফেলে কি আমি সন্নাসধর্ম অবলম্বন করবো? দিল্লীর এই মসনদটা আমাকে রক্ষে করতে হবে না? বাইরের হামলার কথাটা না হয় বাদই দিলাম, এই হিন্দুস্থানেরই বা কতটুকু জায়গা নিয়ে আমার সাম্রাজ্য? দাক্ষিণাত্য সহ হিন্দুস্তানের অর্ধেকেরও অধিক অংশ এখনও আমার দুশমন। বাঙ্গালা বিজয়ে বেরিয়ে আমার পাঁজরটাই ভেঙ্গে গেছে। এরপরও আরো ফৌজ বাঙ্গালার পেছনে ঢাললে, এই দিল্লীর মসনদ থাকবে আমার? দিল্লীর মসনদ আক্রান্ত হলে, আমি সেটা ঠেকাবো কি দিয়ে?

রাজা তোডরমল এবার কাঁচুমাচু করে বললেন—তাহলে কি বাঙ্গালা বিজয়ের পরিকল্পনা বিলকুলই পরিহার করলেন জগদীশ্বর?

ঃ পরিহার আমাকে করতেই হবে। আমার সামরিক ঘাঁটিতে আর সালারদের মধ্যে বাঙ্গালার নামে ইতিমধ্যেই যে আতংক পয়দা হয়েছে, তাতে এখনই কেউ আর মানসিকভাবে বাঙ্গালার অভিযানে শরিক হতে আগ্রহী নয়। এরপর আবার আপনি নতুন করে সেপাইদের নিয়ে গিয়ে সেগুলোও কবর দিয়ে এলে, সালার সেপাই আর কাউকেই আমি চাবুক মেরেও বাঙ্গালার দিকে চালিত করতে পারবো না। বাঙ্গালা জয়ের পরিকল্পনা পরিহার না করে আর উপায় আমার আছে?

ঃ জগদীশ্বর!

আকবর শাহ থামলেন। কিছুক্ষণ দম নিয়ে বললেন—রাজা সাহেব, বাঙ্গালা মুলুক আর পাঁচটা মুলুকের মতো কোন মামুলী মুলুক নয়। এ মুলুক আজব মুলুক। এর মাটি ও মানুষগুলোও আজব। ইতিহাস কেউ আপনারা পড়েন না। পড়লে দেখতেন,আবহমান কাল থেকে আজ পর্যন্ত কেউই সেরেফ সৈন্য দিয়ে বাঙ্গালা মুলুক জয় করতে পারেন নি। বাহুবলে বাঙ্গালা মুলুক জয় করার ইতিহাস অস্পষ্ট। যাঁরা করেছেন, তাঁরা কেউ করেছেন বলের সাথে বুদ্ধি দিয়ে, কেউবা আবার বিজয়টা গোটাই খরিদ করে নিয়েছেন। শুধু সেন্য সৈন্য করলেই কামিয়াব হবেন আপনারা?

ঃ দয়াময়!

ঃ যান, আবার আমি দিচ্ছি সৈন্য। এবার গিয়ে বলের সাথে বুদ্ধি খরচ করুন গে।

বইঘর.কম ও রোকন
বুদ্ধিতে না কুলোলে, কিনেই ফেলুন গে বিজয়টা। সম্পদে ও ঐশ্বর্যে দিল্লী মুলক খাটো নয়। ইজ্জতের প্রশ্ন আমার। পদ, অর্থ, ভূখণ্ড, যা আর যতটা পরিমাণ প্রয়োজন, তাই দিয়েই পারেন তো খরিদ করুনগে বিজয়।

আনন্দে নেচে উঠে তোডরমল বললেন—জয় হোক! দিল্লীশ্বরের জয় হোক! জগদীশ্বরের জয় হোক!

ঃ কিন্তু হুঁশিয়ার! এই চেষ্টাই আমার একদম শেষ চেষ্টা। পারলে বাঙ্গালা মুলুক জয় করবেন, না পারলে গলায় দড়ি দিয়ে ওখানেই সকলে আত্মহত্যা করবেন। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে, সবাইকে আমি তোপের মুখে উড়িয়ে দেবো!

মুজাফফর খান তারবতী নামক আর একজন বিখ্যাত সালারের অধীনে আখেরী চেষ্টা হিসাবে আকবর শাহ নিজের মসনদের নিরাপত্তার প্রতি অনেকখানি ঝুঁকি নিয়েই আগের বাহিনীর তুল্য পরিমাণ আর এক বিশাল সৈন্যদল ও বিপুল পরিমাণ রসদ খানজাহান হোসেন কুলির সাহায্যার্থে বাঙ্গালা মুলুকে প্রেরণ করলেন। মুজাফফর খান তারবতী সেনাসৈন্য নিয়ে হোসেন কুলির শিবিরের দিকে রওনা হওয়ার আগেই তোডরমল সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং তামাম কাজ তামাম চিন্তা পরিহার করে বিজয় খরিদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিপুল অর্থ খরচ করে আগে তিনি একদল একনিষ্ঠ দালাল খরিদ করলেন এবং বাঘ সিংহ ধরার জন্যে এই দালালদের তিনি বাঙ্গালার মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। বাঙ্গালার রাজধানীতে, সেনাঘাঁটিতে, লড়াইয়ের মাঠে সর্বত্রই এই দালালেরা ছড়িয়ে পড়লো।

মুজাফফর খান তারবতী ঐ বিপুল ফৌজ সঙ্গে নিয়ে হোসেন কুলির শিবিরে এসে পৌঁছার সাথেই সুলতান দাউদ খান সে খবর পেলেন। খবর পেয়েই সুলতান রাজমহলের ময়দানে সন্নিবেশিত তাঁর সালার সেপাইদের সতর্ক করে দিলেন এবং হোসেন কুলির অগ্রসর হওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

প্রতীক্ষার পাঁচটা দিনও পেরুলো না। সুলতান দাউদ খানের তামাম ভরসা ধুলিস্মাৎ করে দিয়ে তাঁর কাছে অকস্মাৎ খবর এলো—শুরু হয়েছে গাদ্দারী। তেলিয়াগড়ের প্রতিরক্ষা ফৌজের অধিপতি বেইমানী করে তেলিয়াগড়ের গিরিপথ মুক্ত করে দিয়েছে এবং হোসেন কুলি ও মুজাফফর খান তারবতীর মিলিত ফৌজের বিশাল এক অংশ বন্যার বেগে এ ফাঁকা পথে ঢুকে পড়ছে। তারা শরকি-গলি হয়ে রাজমহলের ময়দানের দিকে এগুচ্ছে আর অবশিষ্ট তামাম ফৌজ নিয়ে হোসেন কুলি পূর্বের ঐ সংকীর্ণ ঢালু পথেই রাজমহলের ময়দানের দিকে ছুটছে।

বার্তাবাহক সেই সাথে দাউদ খানকে জানালেন যে, বেইমানীর চক্রান্ত শুধু তেলিয়াগড় এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বাঙ্গালার গুপ্তচর বাহিনী যে তথ্য পেয়েছে, তাতে

এ চক্রান্ত বাঙ্গালা মুলুকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এখন কে যে কোথায় বেইমানী করে বসবে, তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। বার্তাবাহক আরো জানালেন, দিল্লীর ফৌজের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, বাঙ্গালা বিজয়ের এই যুদ্ধই দিল্লীর বাদশাহর শেষ যুদ্ধ। ছলে বলে যেভাবেই হোক জয়ী তাদের হতেই হবে। জয়ী হতে না পারলে শেষ সেপাইটি পর্যন্ত তাদের লড়াই করে মরতে হবে। দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। কারণ, সেখানে তাদের জন্যে কামান পাতা আছে।

বেইমানীর কথা শুনেই সুলতান দাউদ খান মনে মনে কেঁপে গেলেন। পরাজয় তাঁর এলে একমাত্র এই পথেই আসতে পারে। নইলে তাঁকে এ যুদ্ধে পরাজিত করার সাধ্য দিল্লীর ফৌজের নেই। সুলতান দাউদ খান উপলব্ধি করলেন, বাঙ্গালা বিজয়ের লক্ষ্যে আকবর শাহর এই লড়াই সত্যিই শেষ লড়াই। সুলতান যদি এবারও দিল্লীর ফৌজ বিধ্বস্ত করে জয়ী হন, স্বাভাবিকভাবেই আকবর শাহর আর বাঙ্গালা জয়ে দুঃসাহসী হওয়ার কথা নয়। সুলতান যদি হেরে যান, তাহলে তো লড়াইয়ের আর প্রশ্নই উঠবে না।

সম্বিতে ফিরে এসে সুলতান দাউদ খান তখনই রাজমহলের ময়দানে লোক পাঠিয়ে দিয়ে সালার সিকান্দর উযবেক আর সালার জামান খানকে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে তেলিয়াগড়ের উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়ার এবং যথা সম্ভব ধাবমান দুশমনদের ঐ গিরিপথের মুখেই আটকিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সালার কালাপাহাড় সাহেবকে ময়দান থেকে নিয়ে আসা সৈন্যদল শাহী প্রসাদের সামনের ময়দানে সজ্জিত করতে বলেই সুলতান দাউদ খান নিজে রণসাজে সজ্জিত হওয়ার জন্যে শাহীমহলে প্রবেশ করলেন।

খবর শুনেই দৌলতজাহানের বুকের মধ্যে দপ্ করে উঠলো। বিপদের আশংকায় তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগলো। কিন্তু এই মুহূর্তে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করলে খসম তাঁর কমজোর হয়ে যাবেন ভেবে তিনি নিজেকে সবলে সংযত করে নিলেন এবং খসমকে রণসজ্জায় সজ্জিত হতে সাহায্য করতে লাগলেন। কারো মুখে কথা নেই। মুখ খুললেই আবেগ আর কেউ চেপে রাখতে পারবেন না বুঝে, সুলতানও নীরবে রণসাজে সজ্জিত হতে লাগলেন। রণসাজ শেষ হলে সুলতান দাউদ খান দৌলতজাহানের ললাটে গভীর এক চুম্বন এঁকে দিলেন এবং রুদ্ধ কণ্ঠে 'আল্লাহ হাফেজ' বলে ঝড়ের বেগে মহল থেকে বেরিয়ে এলেন।

শাহী প্রাসাদের সামনের ময়দানে বাহিনী সজ্জিত করে নিয়ে সালার কালাপাহাড় এন্তেজারে ছিলেন। সুলতান বেরিয়ে এসেই আনুষ্ঠানিক ভাবে বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে দিতে দিতে আবেগভরে বলে উঠলেন—

উড়ো-উড়ো, হে স্বাধীন বাঙ্গালার স্বর্ণোজ্জ্বল নিশান, দাউদ খান কাররানীর দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ, ততক্ষণ তুমি সগৌরবে উড়তে থাকো। দাউদ খানের প্রাণ যদি

বইঘর.কম ও রোকন
মিলিয়ে যায় বাতাসে, দুশমন এসে তোমায় যদি মিশিয়ে দেয় ধুলোয়, তুমি সেখান থেকেই পথিকদের ডেকে ব'লো—বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কাররানী জান দিয়েছেন, তবু তিনি মান দেননি, তিনি কখনোও মান দেননি।

পতাকা উড়িয়ে দিয়েই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সামরিক কায়দায় সালাম জানালেন উড্ডীন পতাকায়। মনপ্রাণ ঢেলে মোনাজাত করলেন আল্লাহতায়ালার দরবারে। অতঃপর তিনি চোখ মুছেই লাফিয়ে উঠলেন অশ্বে। কোষবদ্ধ তলোয়ার ক্ষিপ্রহস্তে টেনে ঊর্ধ্বমুখী করলেন। রবির করে ঝল্‌সে উঠলো তলোয়ার। জ্বলে উঠলো দাউদ খানের দুই চোখ। তিনি মুখ ফিরিয়ে বীর সেনানী কালাপাহাড়কে বললেন—জঙ্গীচাচা, জানবাজী—রাজমহল—

লাগাম টেনে দাউদ খান অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। চমকে উঠে সেনাপতি কালাপাহাড় মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে গেলেন দশবছর অতীতে। তিনি যেন শুনতে পেলেন, জঙ্গীচাচা, জানবাজী—ঐ বজরা—

নিমেষখানেক তন্ময় থেকেই লাগাম টানলেন তিনিও। সজ্জিত বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েই তিনিও ছুটতে লাগলেন সুলতানের পশ্চাতে।

ময়দানে ছুটে এসেই সুলতান দাউদ খান কাররানী আগে সন্নিবেশিত কাতার দুটি পরীক্ষা করে নিলেন। তৎপরেই মূলকাতারের যথাস্থানে তিনি ও কালাপাহাড় সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন। সালার জামান খান তেলিয়াগড়ে যাওয়ায় অগ্রবর্তী কাতারে এবার জুনায়েদ খান কাররানী ও কতলু খান লোহানী এই দুইজনই রইলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মার মার রবে ছুটে এলো দুশমন। হোসেন কুলি বেগ বিশাল বাহিনী নিয়ে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে। পুনরায় শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। পুনরায় জুনায়েদ খান দিল্লীর ফৌজের লাশ দিয়ে পাহাড় গড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ এই অবস্থাই চললো।

www.boighar.com

এরপরেই জুনায়েদ খান তাজ্জব হয়ে দেখলেন, দিল্লীর তামাম ফৌজের লক্ষ্য এবার একমাত্র তাঁর উপর। সালার সেপাই সকলেই একযোগে এবার একমাত্র তাঁর উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কতলু খানের দিকে দিল্লীর একটা সেপাইও যাচ্ছে না বা কতলু খানও এদিকে এগিয়ে আসছেন না। ফলে, জুনায়েদ খানকে এবার জামান খান, কতলু খান ও তাঁর নিজের—এই তিনজনের লড়াই একা একাই লড়তে হতে লাগলো। তবুও হয়তো বিপর্যয় কিছু ঘটতো না। কিন্তু এই চরম মহূর্তে দুশমনের দিক থেকে হঠাৎ এক গোলা এসে জুনায়েদ খানকে আঘাত করলো। তিনি অশ্ব থেকে পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হলেন।

ভেঙ্গে গেল 'বাঙ্গালার তলোয়ার'। জুনায়েদ খান নিহত হওয়ায় তাঁর নেতৃত্বহীন

বইঘর.কম ও রোকন

সেপাইরা দিশেহারা হয়ে গেলো এবং নেতৃত্বের অভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। বিনা বাধায় এবার মহাপ্লাবনের বেগে দিল্লীর ফৌজ মূলকাতারের উপর এসে ঢেলে পড়তে লাগলো। কতলু খান ইচ্ছে করলে বাধা দিতে পারতেন। নেতৃত্ব পেলে জুনায়েদ খানের সেপাইরাও লড়াই করতে পারতো। দুশমনদের গতি তারা রুদ্ধ করতে না পারলেও, কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারতো। কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে দিলেই মূলকাতার সামনে এসে যথাযথভাবে শূন্যস্থানে অবস্থান নেয়ার মওকা পেতো। কায়েমীভাবে রুদ্ধ হতো দিল্লীর ফৌজের গতি। কিন্তু কতলু খান এগুলেন না। তাঁর নজরে তখন এসব কিছু ছিল না। তাঁর দুই চোখের সামনে তখন ঐ বিস্তৃত বিহার রাজ্য।

ঘটনা—বেইমানী।

দিল্লী থেকে ফিরে এসেই রাজা তোডরমল বিজয় খরিদ করার জন্যে যে দালালবাহিনী ছড়িয়ে দিলেন সেই দালালেরা জুনায়েদ খান, জামান খান, সিকান্দর উযবেক, ইসমাইল খান আব্দুর প্রমুখ কোন ব্যক্তির কাছে কোলেও ভিড়ার মওকা না পেয়ে, অবশেষে ধরে বসলো কতলু খানকে। কতলু খান একজন মেরুদণ্ডহীন গাদ্দার। তিনি একটি মেড়া। কোন প্রলোভন বা লোভে টোপে না পড়লে তখন তিনি ভালো মানুষ। মেড়ার কান কেউ না মুচড়ালে, তিনি বিকলুক ঠিকঠাক। কিন্তু শক্ত কোন প্রলোভন বা মোটা কোন লোভটোপ সামনে এলেই তিনি আবার কাত। একদিকে তাঁর ভাল হয়ে চলার ইচ্ছে, অন্যদিকে তাঁর দুর্বার লালসা। দিল্লীর দালালেরা গোটা উড়িষ্যা রাজ্য তাঁর নামে লিখে দেয়ায় প্রস্তাব তাঁর সামনে তুলে ধরলো।

কতলু খানের আগেকার গাদ্দার সঙ্গীরাও এই দিল্লীর দালালদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। সবাই মিলে তারা শ্রীহরি রায়ের ঐ বিপুলভাবে লাভবান হওয়ার প্রতি ইংগিত করে কতলু খানকে বোঝালো, প্রধান উজির হওয়ার আশা এমনিতেই খুব অনিশ্চিত। তবু প্রধান উজির হওয়াটা একটা গোটা মুলুকের মালিক হওয়ার কাছে একেবারেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার। দাঁও বুঝে ঘা মেরেছেন রায় বাবুরা। এমন দাঁও দুস্রাবার আসবে না। কতলু খান এটা গ্রহণ না করলে, এটা গ্রহণ করার লোকের এ মুলুকে অভাব নেই। ফলে, সুলতান দাউদ খানের পতন আজ না হোক, আগামীকাল ঘটবেই। এই পেয়ে ধন পায়ে ঠেলার জন্যে কতলু খানকে জিন্দেগীভর আফসোস্ করে ফিরতে হবে।

গোটা বিহার রাজ্যের মালিকানা! কোন ফালতু সওদা নয়! কতলু খান পটে গেলেন। রাজা তোডরমলের সাথে বসে বিহার রাজ্যের বিনিময়ে লড়াইয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন। মোটা অর্থের বিনিময়ে এর আগেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেন কতলু দলের আর এক গাদ্দার তেলিয়াগড়ের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঐ বেইমান অধিনায়ক। শরকি-গলিতে দালাল এখনও ঘুরছে।

বইঘর.কম ও রোকন

কতলু খান বেইমানী করলেন। সালার জামান খান পাশে থাকলে কতলু খানের এই বেইমানী হয়তো শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হতো না। জুনায়েদ খানের স্থান তিনিই পূরণ করে ঠেকিয়ে দিতেন দুশমনদের। কিন্তু বাঙ্গালার বদ নসীব! তেলিয়াগড়ের গাদ্দারীর মাসুল দিতে তিনি তখন তেলিয়াগড়ে ব্যস্ত।

যাদু মন্ত্রের মতো দুশমনদের এই মহাপ্লাবন অকস্মাৎ সামনে এসে ধাক্কা মারায় সুলতান দাউদ খান কাররানী ও সেনাপতি কালাপাহাড় উভয়েই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। লড়াই করতে করতে অর্থাৎ বাধা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসা দুশমনদের প্রতিরোধ করা এক কথা, আর অকস্মাৎ পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার মতো বিশাল দুশমন বাহিনী সামনে এসে পড়লে তা প্রতিরোধ করা আর এক কথা। জুনায়েদ খানের মৃত্যুর খবরে বাঙ্গালার ফৌজের ভেতরে সর্বত্রই ইতিমধ্যে হতোদ্যম ও বিশৃঙ্খলা পয়দা হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি এই আচমকা ঘটনা ঘটায় সুলতান দাউদ খান, সেনাপতি কালাপাহাড়, ইসলামাইল খান আব্দুর, কেউ আর মূল কাতারের রণপদ্ধতি ঠিক রাখতে পারলো না। কাতার ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে এলোমেলোভাবে লড়াই করার কালে সালার ইসমাইল খান আব্দুর দুশমনের তীরবিদ্ধ হয়ে অশ্ব থেকে পড়ে গেলেন। ঠিক এই মুহূর্তেই আর এক গোলার আঘাতে সেনাপতি কালাপাহাড় গুরুতরভাবে আহত হলেন। অশ্ব থেকে গড়িয়ে না পড়লেও সেনাপতি কালাপাহাড়ের আর সবিক্রমে লড়াই করার শক্তি সামর্থ্য রইলো না। পর পর দুই দুইটি দুর্ঘটনা একই সাথে ঘটার ফলে, বিশেষ করে কালাপাহাড় সাহেব আহত হয়ে পড়ার ফলে, বাঙ্গালার মূল কাতারের সেপাইরাও জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে সামনের কাতারের সেপাইদের মতোই চারদিকে ছুটে পালাতে লাগলো

কালাপাহাড় সাহেব বুঝলেন, লড়াই খতম। পলায়নরত সেপাইদের আহত অবস্থাতেই তিনি কিছুক্ষণ ফেরানোর চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হয়ে তিনি সুলতান দাউদ খানকে রণস্থল ত্যাগ করার অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। সুলতান দাউদ খান তখন সংজ্ঞাহীন। উন্মত্তের মতো তিনি তখন দুশমন নিধন করছেন আর দুশমনদের কব্জার মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে শহীদ হবেন বলে সুলতান জিদ্ ধরলেন। কালাপাহাড় সাহেব তাঁকে বোঝালেন, একা একা লড়াই করে শহীদ হয়ে ফায়দা নেই। বরং বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে কিছু আশা থাকবে। নতুন করে আবার হয়তো চেষ্টা করে দেখা যাবে।

কিন্তু সুলতান কিছুই শুনলেন না। বাধ্য হয়ে কালাপাহাড় সাহেব সুলতানের অশ্বের সাথে তাঁর নিজ অশ্ব ভিড়িয়ে দিলেন। সুলতান কিছু বুঝে উঠার আগেই তড়িৎ গতিতে কালাপাহাড় সাহেব সুলতানের অশ্বের লাগাম ধরে নিজ অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। সুলতানকে পিঠে নিয়ে সুলতানের অশ্ব রণস্থল থেকে বেরিয়ে এলো। নিশ্চিত মউত থেকে যে সুলতান

বেরিয়ে এলেন, তখনও সুলতান তা উপলব্ধি করতে পারলেন না। তখনও তিনি সংজ্ঞাহীন ও হতবুদ্ধি। কি দিয়ে কি হয়ে গেল আর হয়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারলেন তখন, যখন দেখলেন তাঁদের ধরার জন্যে দিল্লীর ফৌজ তাঁদের পেছনে ধাওয়া করে ছুটে আসছে। হুঁশ ফিরতেই সুলতানও তখন অশ্বের লাগাম টানলেন এবং সালার কালাপাহাড়ের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন।

ঈসায়ী ১৫৭৬ সনের বর্ষাকাল। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হচ্ছে আর এলোমেলো ঝড় বইছে। তখনও ফের বৃষ্টি নামলো আর ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো। এই ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে সুলতান দাউদ খান সালার কালাপাহাড়ের সঙ্গ হারিয়ে ফেললেন। পথ ভুল করে তিনি কর্দমময় এক নিম্নভূমির দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। কিয়ৎ-দূর এগিয়েই তাঁর অশ্বের পা কাদার মধ্যে আটকে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও আর অশ্বকে তিনি সামনে নিতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর অশ্বের মুখ ঘোরালেন। আবার পেছনে ফিরে এসে ডাঙ্গায় উঠতে গেলেন। কিন্তু এত সময় খরচ করার অবকাশ তিনি পেলেন না। ইতিমধ্যেই দিল্লীর ফৌজ এসে তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো। তিনি বন্দি হলেন।

শেষ হলো বাঙ্গালা মুলুকের স্বাধীনতা। স্বাধীন সালতানাতের পরিসমাপ্তি ঘটলো। বাঙ্গালার বিপর্যয়ের আবহমানকালের ইতিহাস বেইমানীর ইতিহাস। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। দালালদের দালালীর ইতিহাস আর গাদ্দারদের নির্বুদ্ধিতা ও স্বার্থপরতার ইতিহাস। পূর্বপর প্রতিবারের মত্যেই এবারও নিদারুণ বেইমানীর কারণে স্বাধীনতা হারিয়ে বাঙ্গালা মুলুক ভিন্‌মুলুকের পদানত হলো।

অর্থ হাতে না থাকায় সুলতান দাউদ খান কাররানী নতুন করে বিশ্বস্ত বাহিনী তৈরি করতে পারলেন না। জেনেশুনেই তাঁকে বেইমান ও গাদ্দারদের উপর ভরসা করতে হলো আর বেইমানেরা যথা সময়েই বেইমানী করে বসলো। বেইমানী করে তেলিয়াগড়ের পাহারাদার অর্থলাভ, কতলু খান লোহানী বিহারে রাজত্বলাভ, এবং শ্রীহরি রায়, বসন্তরায় ও পরবর্তীতে শ্রীহরির পুত্র গোপীনাথ রাজা প্রতাপাদিত্য নামে চুরি করা অর্থ দিয়ে যশোহরে রাজত্ব করার মওকা লাভ করলেন বটে, কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থে তাঁদের ঐ জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বাঙ্গালা মুলুকের কয়েকশো বছরের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা পানির দামে বিক্রি হয়ে গেল।

সুলতানের পরাজয় ও বন্দি হওয়ার খবর অল্পক্ষণের মধ্যেই শাহী প্রাসাদে পৌঁছলো। খবর শুনামাত্রই শাহীপ্রাসাদের সকলেই আতংকগ্রস্তভাবে পলায়ন শুরু করলেন। হাতের কাছে সম্বল-পুঁজি যে যা কিছু পেলেন, তাই নিয়েই প্রাসাদ থেকে ছুটে

বেরিয়ে এলেন। ছুটে বেরিয়ে এলেন দৌলতজাহান, আম্মাবেগম, মুরাদ খান ও আরো কয়েকজন। পালিয়ে যাওয়ার জন্যে নয়, এঁরা ছুটলেন খানজাহান হোসেন কুলির ছাউনির দিকে। এঁদের উদ্দেশ্য দাউদ খানের প্রাণভিক্ষা করা। www.boighar.com

প্রাণভিক্ষা পান না পান, সে আরজটা পেশ করার মওকাও তাঁরা পেলেন না। হোসেন কুলির হীনতাই সে মওকা তাঁদের দিলো না। হোসেন কুলি বেগ একজন হীনমন্য কাপুরুষ। প্রভু-ভৃত্য উভয়েই তাঁরা একই চরিত্রের লোক। বীরের সাথে বীরের মতো ব্যবহার করার আর বীরকে বীরোচিত সম্মান প্রদর্শন করার মতো কিছুমাত্র মহত্ত্ব আকবর শাহরও ছিল না, তাঁর ভৃত্য এই হোসেন কুলিরও ছিল না। আর না হোক, আকবর শাহর কর্মচারী মুনিম খানের অর্ধেক পৌরুষ আর মহত্ত্ব যদি আকবর শাহর আর হোসেন কুলির থাকতো, তাহলে তাঁরা তামাম হিন্দুস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহাদুর দাউদ খান কাররানীর সাথে ভিন্ন আচরণ করতে পারতেন। কিন্তু বুঝদীলের দীল ভয়ে কাঁপে অনুক্ষণ। বন্দী দাউদ খানকে হোসেন কুলির সামনে আনার সাথে সাথেই কিছুমাত্র মানবিক চিন্তা না করে হোসেন কুলি সুলতান দাউদ খান কাররানীকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ ঝল্‌সে উঠলো ঘাতকের তলোয়ার। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই থম্‌কে গেল পৃথিবী, চমকে উঠলো দশদিক, বিমূর্ত বেদনায় স্তব্ধ হলো বাতাস! জল্লাদের অসির মুখে জমিনে গড়িয়ে পড়লো জানবাজ বাহাদুর, স্বাধীনতার প্রতীক ও উত্থান পতন সাপেক্ষে বাঙ্গালার কয়েকশো বছর কালস্থায়ী স্বাধীন সালতানাতের শেষ প্রহরী দাউদ খান কাররানীর চির উন্নত শির!

ঘটনাস্থলে দৌলতজাহানই আগে এসে পৌঁছলেন। সুলতান দাউদ খানের ছিন্ন শিরে নজর পড়তেই মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর সে মূর্ছা আর কোনদিনই ভাঙ্গেনি।

সমাপ্ত

www.boighar.com